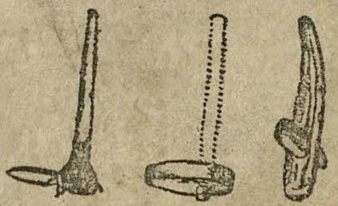
জল, বাতাস ও ধাতুর কথা



প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

জল, বাতাস ও ধাতুর কথা

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি—৭৩

প্রকাশক
দুলাল বল
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৪

প্রচ্ছদ ঃ সুবল দে

মূল্য ঃ ৪৫·০০ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
সত্যনারায়ন মণ্ডল
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

জলের কথা

জলের কথা

জলের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা এত বেশী যে জলের সম্বন্ধে আমাদের মনে সহসা কোন কৌতূহল জাগে না। ঘরের কলসীতে জল, জল বাইরের বৃষ্টি-ধারায়, দীঘি-পুষ্করিণী জলে টলমল, নদনদীতে জলের স্রোত—জলের এই বহুধা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এত সহজ ও সাধারণ যে পৃথিবীর বুকের জীবন-প্রবাহে জলের অসামান্য অবদানের কথা আমাদের মনেই আসে না। আমাদের বেঁচে থাকার মূলে যে জলের এক প্রধান ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা সাধারণতঃ সচেতন নই।

নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল জলের মাধ্যমে। সেই সুদূর অতীত থেকে সর্বচরাচরে জলই জীবনকে লালন করেছে। জল ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কি জীবকোষ, কি উদ্ভিদকোষ, যেখানেই প্রাণের স্পন্দন, সেখানেই জলের প্রয়োজন। বাতাসের মতই জলও প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য। তাই জলের অপর এক নাম জীবন। জল প্রাণস্বরূপ, তাই পুরাকালের ঋষিদের কাছে জল ছিল উপাস্য।

আমাদের দেহেতেই রয়েছে প্রচুর জল। শরীরের রক্ত, মাংস, মজ্জা সব কিছুরই অনেকাংশ জল; মানবদেহের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশই জল। শুধু মানুষ কেন, অন্যান্য জীবদেহে, গাছপালা, ঘাসপাতা, শাক-সবজী সবার মধ্যেই অনেকটা অংশ জল। একটা পাতা ঝরে পড়ে যখন শুকিয়ে যায়, তখন তার ওজন যায় কমে, কারণ সেটা থেকে জল উবে যায়। আমরা জলের চাহিদা মেটাই সরাসরি জল পান করে অথবা নানা খাদ্য আর পানীয়ের সঙ্গে। আর গাছপালা জল সংগ্রহ করে মাটি থেকে শিকড় দিয়ে টেনে নিয়ে। জলের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, জল পৃথিবীতে না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্বই থাকত না। চাঁদে জল নেই, নেই জল শুক্রগ্রহে, তাই সেখানে এরকম প্রাণেরও বিকাশ ঘটেনি। পৃথিবীর বুকেও যেখানেই জলের অভাব সেখানেই গাছপালা নেই, জীব-বাসের অযোগ্য সব মরু অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন দেখা যায় বিস্তীর্ণ সাহারাতে বা আরব মরুপ্রান্তরে।

১। জলের উৎস

জল বললে তরল জলের কথাই আমাদের মনে আসে। তরল পদার্থকে তাপ দিলে সেটা গ্যাস হয়ে যায়, আবার শীতল করলে তরল বস্তু কঠিনাকার ধারণ করে। জলেরও তাই হয়। বস্তুতঃ পৃথিবীতে জল তিন রকমেই রয়েছে ঃ কঠিন, তরল এবং বাষ্পাবস্থায়। দৈনন্দিন কাজে আমরা জলের চাহিদা মেটাই নদী, পুকুর বা কুয়ো থেকে। কিন্তু তরল জলের প্রধান ভাণ্ডার হচ্ছে সাগর, মহাসাগর ; তারপর হ্রদ, নদনদী, দীঘি, সরোবর এসব। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের নীচেও আবদ্ধ হয়ে আছে যথেষ্ট জল। ভূপৃষ্ঠের জমিতে যেখানে শস্য জন্মায়, সেখানেও খানিকটা জল বিধৃত আছে।

মহাসাগর, হ্রদ, নদনদী ইত্যাদি জলাশয় থেকে সৌরতাপে জল নিরন্তর বাষ্পায়িত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সুতরাং জলীয় বাষ্পের আবাস হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে বা ঘামের সঙ্গে যে জল বেরিয়ে আসে, তাও বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। গাছের পাতা থেকেও বাতাসে জলীয় বাষ্প আসে। বাতাসের জলীয় বাষ্প থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি। "বাতাসের কথায়" এই জলীয় বাষ্পের বিষয় অনেক আলোচনা করা হয়েছে, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

জল জমে বরফ হয়ে যায় 0°C তাপমাত্রায়—জলের হিমাঙ্ক এই উষ্ণতা। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে তাপমাত্রা এর চেয়ে কম সেখানে স্বভাবতঃই জল কঠিনাকারে থাকবে। এই কারণেই বরফ বা তুষারস্তূপ প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে বিশেষ করে দেখা যায় ঃ (১) মেরু-অঞ্চলে আর (২) বড় বড় পর্বতের উচ্চ শিখরে। বায়ুমণ্ডলের উঁচু স্তরে যেখানে ঠাণ্ডা হয়ে জলবাষ্প মেঘে পরিণত হয়, সেখানেও অতিশীতলতার জন্যে খানিকটা বাষ্প জমে তুষারকণায় পরিণত হয়, অর্থাৎ কঠিনাকারে থাকে।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশই ত সমুদ্র মহাসমুদ্র দিয়ে জলাবৃত। হিসাব করে দেখা গেছে বছরে গড়ে প্রায় 5300 কোটি ঘনফুট জল এই সব জলাধার থেকে বাষ্পায়িত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এই বাষ্পের ওজন হবে 150 কোটি টন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে জলরাশি বাষ্পীভূত হয়ে চলে যায়, বৃষ্টি, নদীনালার প্রবাহ দিয়ে আবার সাগরের সে ক্ষতির পূরণ হয়ে থাকে।

জল কি পরিমাণে বিভিন্ন অবস্থায় পৃথিবীতে রয়েছে তার একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া যেতে পারে ঃ—

	আয়তন, সহস্র ঘন কিলোমিটার	জলের মোট শতাংশ (%)
সমুদ্রের জল	1370000	93.93
ভূপৃষ্ঠের নীচে আবদ্ধ জল	60000	4.12
তুষার ও হিমবাহ	24000	1.65
হ্রদ ইত্যাদি	230	0.016
নদীর জল	1.2	0.0001
জমিতে বিধৃত জল	80	0.005
বায়ুমণ্ডলের বাষ্প	15	0.001
মোট	~1454326	100

২। তুষার-কাহিনী

উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুদেশ আর তাদের সন্নিহিত অঞ্চল চিরতুষারাবৃত স্থায়ী বরফের রাজ্য। পৃথিবীর কঠিনাকার জলের অধিকাংশই রয়েছে এই দুই মেরুপ্রান্তে। বস্তুতঃ এরা জনমানবহীন, গাছপালাশূন্য বরফের মরুভূমি। উত্তরমেরুর কাছে গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে তবু কিছু এস্কিমোর বাস আছে, দক্ষিণমেরুতে তাও নেই। দক্ষিণমেরুর তুষারপ্রান্তে কখনও কখনও সামান্য শৈবাল ও ছত্রাক শুধু দেখা যায়। কল্পনাতীত এই তুষার-স্তূপের বিস্তার আর বিশালতা। অ-লবণাক্ত জলের তিন-চতুর্থাংশই—তিন কোটি ঘন কিলোমিটার—এমনি করে তুষারে বন্দী হয়ে আছে। পৃথিবীতে ষাট বছরে যে পরিমাণ বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়—এই আবদ্ধ বরফ পরিমাণে তার সমান। অনেক সময় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রবক্ষে, বিশেষতঃ আটলাণ্টিক মহাসাগরে, প্রকাণ্ড সব ভাসমান তুষারের স্তূপ দেখা যায়। এদের নাম "আইসবার্গ" (Iceberg) বা হিমশৈল। আইসবার্গের সব চেয়ে বড় কারখানা গ্রীনল্যাণ্ডে। গ্রীনল্যাণ্ডের সবটাই বরফাবৃত, অন্ততঃ 1025000 বর্গ কিলোমিটার ; উত্তরাংশের বরফ প্রায় দুই হাজার মিটার পুরু। এখান থেকে বড় বড় বরফের চাঁই সমুদ্রে নেমে আসে এবং দক্ষিণদিকে ভেসে যেতে থাকে। প্রতি বছরে অন্ততঃ একশ কোটি টন আইসবার্গ এক গ্রীনল্যাণ্ড থেকেই বেরিয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর জলের সংস্পর্শে এসে ছোট ছোট আইসবার্গ গলে যায়, কিন্তু বড়গুলো অনেকসময় প্রায় হাজার মাইল পর্যন্ত চলে আসে। জাহাজ চলাচলে এরা এক মহাবিভীষিকার সৃষ্টি করে। এই ভাসমান তুষারস্তূপগুলির এক-অষ্টমাংশ মাত্র জলের উপরে থাকে। বাকীটা জলের নীচে। তিন চারতলা দালানের সমান উঁচু এবং হাজার ফিটেরও বেশী লম্বা আইসবার্গও দেখা গেছে। 1912 সালের ১৪ই এপ্রিল সেদিনের বিশালতম বিখ্যাত ব্রিটিশ জাহাজ "টাইটানিক" এরকম একটা

আইসবার্গের সংঘর্ষেই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। দেড় হাজার যাত্রীর সলিল-সমাধি হয়েছিল।

একদিকে সাইবেরিয়া, অপরদিকে কানাডার উত্তরের দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে বেষ্টিত উত্তর-মেরু ঘিরে যে বিস্তীর্ণ জলভাগ সেটাই উত্তর বা সুমেরু মহাসাগর। এর প্রায় সবটাই বরফ দিয়ে ঢাকা। এই তুষার-রাজ্যের তাপমাত্রা গড়ে –76°F-এরও নীচে। এই দুরধিগম্য মেরুরাজ্যে অভিযান আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকেই। এসমস্ত অভিযানের ইতিহাস মানুষের কষ্টসহিষ্ণুতার, অধ্যবসায়ের, দুর্জ্ঞেয়কে অধিগত করার দুর্নিবার ইচ্ছা ও দুঃসাহসের পরিচয়। সেই ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই মেরু-অভিযানে যাঁদের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন: ফ্র্যাঙ্কলিন (1845), রস (1848), ম্যাকক্লিওয় এবং ম্যাকক্লিনটক (1850) ইত্যাদি। এরপর 1903-এ বিখ্যাত অভিযাত্রী অ্যামুণ্ডসেন মেরুর খুব কাছে পেঁছেছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রথম উত্তরমেরুতে পেঁছান আমেরিকার কম্যাণ্ডার রবার্ট পিয়ারী ; তারিখটা এপ্রিল 6, 1909।

এরপর 1926-এ আমেরিকার অ্যাডমিরাল রিচার্ড বায়ার্ড এবং ফ্লয়েড বেনেট প্লেনে করে গিয়ে উত্তরমেরুতে পেঁছেছিলেন। 1958-এ পারমাণবিক ডুবোজাহাজ তুষারের তলা দিয়ে গিয়ে উত্তরমেরুতে উপস্থিত হতে পেরেছে।

একসময়ে মনে করা হত, উত্তরমেরুর মত দক্ষিণমেরু ঘিরেও রয়েছে এক বিরাট মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর। কিন্তু এখন জানা গেছে দক্ষিণমেরুতে রয়েছে এক বিশাল স্থলভাগ, বাস্তবিকপক্ষে এক মহাদেশ। এই মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাণ্টার্কটিকা—Antarctica। এর বিস্তার ষাট লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী, অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একত্রে যে বিস্তার তার চেয়েও বড়। কিন্তু এই মহাদেশের সবটাই কয়েক হাজার মিটার বরফের তলায়। এখানকার তাপমাত্রা উত্তরমরুর চেয়েও কম। উত্তরমেরুর তুলনায় দক্ষিণমেরুর অভিযান আরও কষ্টকর। দক্ষিণমেরুর প্রথম অভিযাত্রী ছিলেন ফরাসী নৌ-সেনানী পিয়েরে বুভে (1739)। তারপর 1774-এ কুক 70° দঃ অক্ষাংশ পেরিয়েও খানিকটা অগ্রসর হয়েছিলেন। রস (1842) আরও খানিকটা এগিয়ে 78° 10′ দঃ অক্ষাংশে পেঁছে এক বিরাট উঁচু বরফের পর্বতে বাধা পান, আর অগ্রসর হতে পারেন নি। 1902 সনে ক্যাপ্টেন স্কট 82° 17′ দঃ অক্ষাংশে মেরু থেকে 463 মাইল দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। অভিযাত্রী-ইতিহাসে স্কটের এই অভিযানের কাহিনী নানাদিক দিয়ে অবিস্মরণীয়। এরপর স্যাকেলটন (1909) আরও এগিয়ে মেরু থেকে প্রায় 97 মাইল দূরে হাজির হয়েও রসদ এবং খাদ্যের অভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হন। উত্তরমেরুর কাছে তবু বল্গা হরিণ, সামুদ্রিক সীল ও অন্যান্য কিছু মাছ পাওয়া যায়, খাদ্যরূপে সেসব ব্যবহার করা যায়। অ্যাণ্টার্কটিকার বাইরের সমুদ্রে তিমি, সীল প্রভৃতি থাকলেও মেরুঅঞ্চলে এসব কিছুই নেই, তাই সমস্ত খাবার ও পানীয় সঙ্গে নিতে হয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমস্ত রসদ নিয়ে

বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যে কি দুঃসহ তা বর্ণনাতীত। এর পর ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড অ্যামুণ্ডসেন দক্ষিণমেরুতে প্রথম পদার্পণ করেন—ডিসেম্বর 14, 1911। অন্য একটি পথ ধরে একমাস পরে স্কটও গিয়ে দক্ষিণমেরুতে উপস্থিত হন —জানুয়ারী 17, 1912 ; কিন্তু গিয়ে দেখেন অ্যামুণ্ডসেন তাঁর আগেই পোঁছে গিয়েছেন। স্কট আর তাঁর সহকর্মীরা ফিরে আসতে পারেন নি, এক দুর্যোগে প্রাণ হারান। 1958-এ সার ভিভিয়ান ফুক্‌স্‌ অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দেন দক্ষিণমেরুর মধ্য দিয়ে (2158 মাইল)। দক্ষিণ-মেরুতে গিয়ে তিনি স্যার এড্‌মণ্ড হিলারীর সঙ্গে মিলিত হন।

অ্যাণ্টার্কটিকার তুষার-রাজ্যে দুঃসহ শীত ত আছেই, তার উপর দিনের পর দিন হিমশীতল তীব্র ঝড়ো-হাওয়া বয়ে যায়। এ ছাড়া বরফ থেকে ঠিকরে-আসা চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর জ্যোতিতে অন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। শীত এত তীব্র যে কয়েকবার চোখ মিটমিট করলে চোখের পাতাদুটি বুজে বন্ধ হয়ে যায়। একটুক্ষণ জিভ বের করে রাখলে সেটা শক্ত হয়ে ঠোঁটের সঙ্গে জমে যায়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে-আসা বাষ্প গোঁফ-দাড়ির ওপর তুষার হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে গিয়ে মুখ আটকে দেয়। একটুকরো ধাতু বা ছুরির ফলা শরীরের সংস্পর্শে এলে, তখুনি সেখানে ঘা হয়ে জ্বলতে থাকে।

1957-58-এ নানাদেশের বিজ্ঞানীরা একত্র হয়ে আন্তর্জাতিক ভূপ্রাকৃতিক বর্ষে [International Geophysical Year, IGY] পৃথিবী সম্পর্কে নানা তথ্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁদের কর্মতালিকার মধ্যে অ্যাণ্টার্কটিকার তথ্য সন্ধান ছিল একটা প্রধান বিষয়। এর জন্যে দক্ষিণমেরুর চারদিকে বেশ বিপদসঙ্কুল কয়েকটি স্থানে তুষার-স্টেশন বসান হয়েছিল। এমন একটি স্টেশন ছিল, Byrd স্টেশন। এই স্টেশনের জন্য ট্র্যাক্টার-টানা মালের ওয়াগন নিয়ে পাঁচ সপ্তাহ বরফের উপর দিয়ে 1035 কিলোমিটার অতিক্রম করে যেতে হয়েছিল। এই দুরূহ যাত্রায় যে কোন মুহূর্তে বরফের ফাটলে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা। ম্যাকমার্ডো প্রণালী থেকে 14000 পাউণ্ড ওজনের ট্রাক্টর সহ আটশ টন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি প্লেনে করে একেবারে মেরুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অনুসন্ধানের ফলেই সেই তুষার-রাজ্য সম্পর্কে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন সঠিক ভাবে অ্যাণ্টার্কটিকার পরিধি জানা গেছে। দেখা গেছে, সেই বরফের মহাদেশে রয়েছে বেশ কয়েকটি পাহাড় (অবশ্যই তুষারে ঢাকা), রয়েছে সুগভীর হ্রদ ও সাগর (জমাট বরফে ভরা), আছে বিশাল সব বরফাবৃত মালভূমি। কোন কোন জায়গায় বরফ জমে আছে চার হাজার মিটার পুরু হয়ে। খাস দক্ষিণমেরুতেই বরফের উচ্চতা 3000 মিটার। প্রমাণ পাওয়া গেছে সমুদ্রতল থেকে মহাদেশটির উচ্চতা গড়ে অন্ততঃ 274 মিটার। অ্যাণ্টার্কটিকাতে যে বিপুল পরিমাণ বরফ জমে আছে, তার সামান্য কিছু অংশও গলে গেলে সমস্ত মহাদেশের অধিকাংশই প্লাবিত হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে মানুষের গড়া সবকিছুই। কলকাতা, লণ্ডন, নিউইয়র্কের আর অস্তিত্ব থাকবে না। নানা দেশ থেকে বর্তমানে এখন অ্যাণ্টার্কটিকা-অভিযান শুরু হয়েছে আরও

তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। ভারত তার দ্বিতীয় অ্যান্টার্কটিকা অভিযান করেছে 1982-ডিসেম্বর মাসে। ভারতের তৃতীয় অভিযানের যাত্রীরা ১৯৮৩ সনের ২৭শে ডিসেম্বর আন্টার্কন্টিকাতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং নানা পরীক্ষার কাজ শুরু করেছে।

মানুষের স্মরণকালে মেরুঅঞ্চল চিরকালই বরফাবৃত। কিন্তু এরকমটা সবসময় ছিল না। ভূতাত্ত্বিকেরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে শুধু মেরুঅঞ্চল নয়, পৃথিবীর আরও অনেকটা অংশই ছিল বিরাট বরফ-স্তূপের নীচে। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ দিকে সমগ্র উত্তর ইউরোপ, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানীর অধিকাংশ, এমন কি রাশিয়ার মস্কো পর্যন্ত বরফে ঢাকা ছিল। তুষারাবৃত ছিল সম্পূর্ণ কানাডা এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশও। আজ থেকে প্রায় 13000 বছর আগে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সেই বরফের স্তূপ ধীরে ধীরে গলতে আরম্ভ করে। বরফের রাজ্য আস্তে আস্তে উত্তরে সরে যেতে যেতে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। আরও কয়েক হাজার বছর এমনি করে চললে উত্তরমেরুর সব বরফই গলে যাবে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ উচ্চতর হবে। উত্তরমেরুতে তখন হবে জলের সমুদ্র। তারপর সেই সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন হবে। বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্রের লেভেল নেমে যাবে অন্ততঃ 90~100 মিটার। এরপর উষ্ণতা কমলেই সেই বাষ্প বরফ হয়ে জমতে শুরু করবে। বিষুবাঞ্চল থেকে উষ্ণ জলস্রোত আর উত্তরমেরু অঞ্চলে পৌঁছুবে না। হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে সমস্ত মেরুঅঞ্চলের জল জমে যাবে। তারপর তুষারপাত আর হবে না। মেরুদেশে এখন আর তুষারপাত হচ্ছে না। কেননা তুষারপাত হতে হলে সংলগ্ন জলাধার থাকা প্রয়োজন। এমনি করে বরফ জমে হাজার হাজার বছর ধরে, অর্থাৎ "তুষার-যুগ" চলে। তারপর তার গলন শুরু হয়। তুষারপাত আর তার গলন এমনি পালা-বদল করে চলে।

এখন জানা গেছে, গত দশ লক্ষ বছরে এরকম তুষার-যুগ চারবার এসেছে এবং চলে গেছে। সর্বশেষ প্রধান তুষার-যুগ আরম্ভ হয়েছিল প্রায় 130,000 বছর আগে। পৃথিবীর উষ্ণতা নেমে যাওয়াতে মেরুঅঞ্চলে তুষার পড়তে থাকে, ক্রমশঃ বরফের বিরাট স্তূপ তৈরী হতে থাকে। প্রায় 40,000 বছর ধরে এই তুষার-পাত চলে এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর গোলার্ধের স্থলভূমির এক-তৃতীয়াংশ বরফাবৃত হয়ে পড়ে ছিল। তুষারে পরিণত হওয়ার ফলে সমুদ্রের লেভেল গিয়েছিল নেমে, বিষুবাঞ্চলের উষ্ণ জলস্রোত আর মেরুদেশে পৌঁছুতে পারে নি। তখন সমস্ত মেরুঅঞ্চলই জমাট বরফে ঢেকে যায়। এই বরফস্তূপের উচ্চতা 2500~3000 মিটার এবং তার প্রচণ্ড চাপে পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানারকম পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে, কোথাও চাপের ফলে স্থলভাগ বসে গিয়ে প্রকাণ্ড সব গহ্বরের সৃষ্টি হয়। উত্তর আমেরিকার বড় বড় হ্রদ—সুপিরিয়র, মিচিগান, প্রভৃতি—এমনি করেই সৃষ্ট হয়েছে। চল্লিশ হাজার বছর পর তুষার-পাত বন্ধ হল, কিন্তু তার পরেও 70000~80000 বছর তাপমাত্রার একটা মোটামুটি সমতা ছিল। সেই শীতল তাপমাত্রায় আর তুষারপাত হয় নি বটে, তবে প্রচণ্ড সব ধূলিঝড় বা তুষার-ঝড় বয়ে চলেছিল যুগ যুগ

ধরে। এরপর পৃথিবীর তাপমাত্রা একটু একটু করে বেড়ে গেল, আর বরফ গলা আরম্ভ হল। তুষার-যুগ পার হয়ে উষ্ণতর যুগ দেখা দিল। মনে হয়, এই উষ্ণতর যুগ আরম্ভ হয়েছিল 13000~14000 বছর আগে। বর্তমানে আমরা উষ্ণতর যুগের শেষ অঙ্কে রয়েছি। ক্রমশঃ উষ্ণতা বাড়ছে; একশ বছর আগেও আমেরিকার হাডসন নদীতে শীতের দিনে বরফ জমত, কিন্তু আজ আর সেখানে বরফ জমে না। গ্রীনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের হিমবাহের আয়তন অতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ ক্রমে উচ্চতর হচ্ছে এবং হয়ত 25000~30000 হাজার বছর পরে একদিন আবার সমস্ত উত্তরমেরু অঞ্চল জল-প্লাবিত হবে। এটা কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে এসব আমরা জেনেছি। কেন লক্ষাধিক বছর পরপর তুষার-যুগ এসে হাজির হয়—তার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও দেওয়া যায় নি। কেউ কেউ মনে করেন, লক্ষ লক্ষ বছর পরে সূর্যের অভ্যন্তরে তেজ-উৎপাদনের একটা বৈষম্য ঘটে মহাশূন্য থেকে সূর্যের অতিরিক্ত প্রোটন বা হাইড্রোজেন অধিশোষণের ফলে (লিটলটন ও হয়েল)। এতে তাপ-বিকিরণ যায় কমে, পৃথিবীর উষ্ণতাও কিছু কমে যায়। তুষার-যুগ দেখা দেয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যখন প্রচুর ধূলিকণা আর ঘনমেঘের ও বাষ্পের আধিক্য দেখা দেয়, তখন সৌররশ্মির অনেকটাই বায়ুমণ্ডলের উপর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়; তাপ-তরঙ্গ এসে পৃথিবীতে অনেকটা কম পৌঁছুতে পারে। তাই তাপমাত্রা কমে, তুষারপাত শুরু হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী, যেমন, আয়ারল্যাণ্ডের ওপিক (E. J. O'pik), মনে করেন, সূর্যের দেহাভ্যন্তরে যে নিরন্তর হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর ঘটছে, স্বাভাবিক নিয়মে তার মধ্যে অনেক যুগ পরে পরে একটু অসাম্য দেখা দেয়। এর ফলে সৌর বিকিরণের তীব্রতা একটু হ্রাস পায়, তাই পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায় এবং তুষার-যুগ শুরু হয়। সূর্যের আভ্যন্তরিক সাম্য ফিরে এলেই তুষার-যুগের সমাপ্তি আরম্ভ হয়।

মেরুঅঞ্চল দুইটি বাদ দিলে প্রকৃতিতে আর বরফ দেখা যায় উঁচু পাহাড়ের মাথায়। হিমালয়, কারাকোরাম, আল্পস্, অ্যান্ডিস এসব পর্বত শিখর চির-তুষারাবৃত। উঁচু পাহাড়ের উপরের অংশের তাপমাত্রা খুবই কম। জলবাষ্পভরা বাতাস যখন এই সকল উচ্চ পর্বতশিখরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য তখন বাষ্প তুষারকণায় পরিণত হয়ে যায়। সেই অপরিমেয় তুষার পাহাড়ের উপর জমতে থাকে, যেন "শুভ্র উত্তরীয়প্রায় শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনারে নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে নিঃশব্দে নিভৃতে"!

এই তুষার থেকে ক্রমে বিরাট জমাট বরফের সৃষ্টি হয় আর পর্বতের উপরের দিকটা সেই বরফে ঢেকে থাকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে জল অপসারিত হয় তার খানিকটা পাহাড় উদ্ধার করে ধরে রাখে। একটু ভাবলে দেখা যাবে, পৃথিবীর শতশত পর্বতে কি বিপুল জলরাশি এমনিভাবে বরফ হয়ে আটকে আছে। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নদনদীর। পাহাড় যে শুধু সন্নিহিত দেশের জলবায়ু, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করছে তাই নয়, দেশের নদনদীর সৃষ্টি করে জমির উর্বরতা ও ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। বস্তুতঃ সভ্যতা ও দেশের সামগ্রিক উন্নতির

উপর রয়েছে পর্বতের অসামান্য গৌণ প্রভাব। পাহাড় পর্বত না থাকলে বৃষ্টিপাত সমানভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ত। তাতে হয়ত শুষ্ক অঞ্চলের আর্দ্রতা খানিকটা বাড়ত, কিন্তু সামগ্রিক উর্বরতা যেত অনেক কমে। আজ হিমালয়ের সানুদেশে দাঁড়িয়ে যে নদনদী-অধ্যুষিত শস্যশ্যামলা গাঙ্গেয় উপত্যকার ছবি দেখতে পাই, যে শ্যাম বনানীর অপরূপ স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য দেখতে পাই, হিমালয়ের অন্তর্ধানে তা আর সম্ভব হত না। গঙ্গা-সিন্ধু পরিণত হত ক্ষীণস্রোতা জলধারায়।

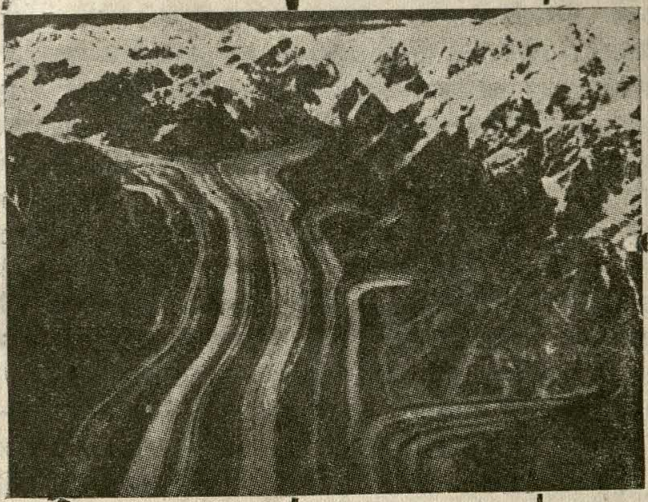
পর্বতের উপরের অংশটাতেই বরফ জমে, মাটি থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে সবটাই বরফাবৃত নয়। প্রত্যেকটি পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা আছে, যার, উপরের অংশে সারা বছর ধরে বরফ জমে থাকে, গ্রীষ্মকালেও সেখানে বরফ থাকবে। যে উচ্চতার ঊর্ধ্বে পাহাড় চিরতুষারাবৃত, তার নাম "হিমরেখা"। শীতকালে হিমরেখার নীচেও তুষারপাত হয়, বরফ জমে ; কিন্তু গরমকালে সেটা গলে যায়, নীচের দিকে আর বরফ থাকে না। কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশিখর চিরকাল তুষারে নিদ্রিত, কিন্তু নীচের দিক, যেমন দার্জিলিং, শীতের সময় বরফে ঢেকে যায়, অথচ গরমকালে সেখানে কোন বরফ নেই। এই হিমরেখার উচ্চতা নির্ভর করে প্রধানতঃ অক্ষাংশের উপরে। মেরুদেশের হিমরেখা সমুদ্রসমতলের সমান, ইউরোপের আল্পস্ শৈলমালার হিমরেখা প্রায় 2750 মিটার উপরে, আর বিষুবাঞ্চলে অ্যাণ্ডিস পর্বতের হিমরেখা 5500 মিটার উচুঁতে। ভারতের উত্তরের হিমালয়ের হিমরেখা মোটামুটি 4570 মিটার উচ্চতায়।

হিমরেখারও উঁচুতে নিরন্তর তুষার পড়ছে ; আর উপরের তুষারের চাপে নীচের তুষাররাশি জমাট বরফে পরিণত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উপরের চাপে আর মাধ্যাকর্ষণের ফলে সেই বিরাট বরফের স্তূপ পর্বতের গা বেয়ে ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হতে থাকে নীচের দিকে। প্রবহমান এই বরফস্তূপকে বলা হয় "হিমবাহ" বা "গ্লাসিয়ার" (Glacier)।

হিমবাহের নিম্নগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বরফ গলতে শুরু করে, আর তা থেকে ছোট ছোট পাহাড়ী জলস্রোতের উদ্ভব হয়। হিমরেখার নীচে এলে হিমবাহ যায় গলে, বিগলিত তুষার তরল জলস্রোতে পরিণত হয়—উৎপত্তি হয় নদীর। ছোট জলস্রোতগুলিও এসে আস্তে আস্তে মিশে যায় এই নদীর সঙ্গে। যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এমনি করে সৃষ্টি হয়েছে যমুনা আর গঙ্গার। যতদূর জানা গেছে, কারাকোরামের গ্রেট বল্টোরো (Great Boltoro) পৃথিবীর দীর্ঘতম পার্বত্য হিমবাহ।

বিশাল হিমবাহ যখন নীচের দিকে নামতে থাকে তখন তার ভয়ঙ্কর চাপে পাহাড়ের গা থেকে অসংখ্য শিলাখন্ডকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে। কখনও কখনও শতশত টন ভারী শিলাও এর সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে নেমে আসে। যেখানে গিয়ে হিমবাহ গলে যায় সেখানে এসব চলমান শিলাখণ্ডগুলি সারি বেঁধে স্তূপীকৃত হয়। হিমবাহের দু'পাশের বা শেষপ্রান্তের জড় হওয়া শিলাগুচ্ছকে বলে "গ্রাবরেখা" বা "মোরেন" (moraines)। বরফের প্রচণ্ড চাপে এবং শিলাখণ্ডগুলির ঘর্ষণের ফলে

পর্বতগাত্র ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে যায়, পাথরগুলোও ভেঙ্গে কাঁকর, বালি আর কর্দমে পরিণত হয়। হিমবাহ যেখান দিয়ে প্রবাহিত হয় তার দু'দিকটা উঁচু থাকে আর মাঝখানে খাতের সৃষ্টি হয়। সেখানকার উপত্যকা U-আকার নেয় (চিত্র ১)। নদনদীর সৃষ্টি ছাড়াও পর্বতের ক্ষয় সাধন করে জমি তৈরীতে এইসব হিমবাহের রয়েছে অসামান্য অবদান।



চিত্র ১। হিমবাহে শিলার ক্ষয়

তুষার-যুগের শেষ অঙ্কে যখন বরফ উত্তর ইউরোপ, সাইবেরিয়া এবং উত্তর আমেরিকা থেকে সরে যেতে আরম্ভ করল, তখন বহুবিস্তৃত বিশাল সব হিমবাহ ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হয়ে গেল। অধিকাংশই নীচু সাগরের দিকে সরতে লাগল। এদের বলা হয় "মহাদেশীয় হিমবাহ"। এই হিমবাহেরই একাংশ আজকের দিনে দেখতে পাওয়া যায় গ্রীনল্যাণ্ডে আর মেরুপ্রদেশে। এই সকল হিমবাহ এসে ধীরে ধীরে সাগরে পড়ছে। এখানকার হিমরেখা সমুদ্র সমতলের সমান। এই হিমবাহই সমুদ্রে এসে ভাসমান তুষারস্তূপের সৃষ্টি করে—যার কথা আগেই বলেছি।

অনেক সময়, বিশেষতঃ মেরুঅঞ্চলে উপরের শিখরদেশ থেকে হিমবাহ নেমে এসে পর্বতের পাদদেশে ছড়িয়ে পড়ে ; এরকম প্রায়ই দেখা যায় আলাস্কা বা আইসল্যাণ্ডে, এদের নাম "পিড্‌মণ্ট হিমবাহ" (Piedmont glacier)। কোন কোন সময় মস্ত একটা বরফস্তূপ হিমবাহ থেকে পৃথক হয়ে হঠাৎ দ্রুত নীচে পড়ে যায় ; এটা "হিমানী সম্প্রপাত" (avalanche)। এতে প্রচণ্ড ধ্বংস সাধিত হয়। গাছপালা বাড়ীঘর সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সময় সময় হিমবাহের মধ্যে ফাটল থাকে। এগুলো আবার হালকা তুষারে থাকে ঢাকা। তাই উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। পর্বত-অভিযাত্রীদের এর চেয়ে সংকট আর কিছু নেই! এর মধ্যে পড়লে নিশ্চিন্ত ধ্বংস ও

মৃত্যু। প্রতিবছরেই এরকম অনেক মৃত্যুসংবাদ আসে। হেনরী আর্করাইট মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) পর্বত চূড়ায় উঠতে গিয়ে এমনি এক ফাটলে পড়ে মারা যান (1866)। দীর্ঘ একত্রিশ বছর পরে সেখান থেকে প্রায় আড়াই হাজার মিটার নীচে তাঁর দেহ এবং সমস্ত জিনিষপত্র, জামাকাপড় বরফের তলদেশে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল (1896)।

মানুষ সৌন্দর্যের উপাসক। উত্তুঙ্গ চিরতুষারাবৃত শৈলশিখরগুলি পৃথিবীর এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য। সূর্যের কিরণ-সম্পাতে এদের উপর থেকে যে অপরূপ বর্ণচ্ছটার উদ্ভব হয় তার তুলনা নেই। তার অবর্ণনীয় দীপ্তি, প্রতিমুহূর্তে তার রঙের পরিবর্তন, তার কল্পনাতীত বর্ণসুষমা, তার উদার বিস্তার দেখে মানুষ অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কি হিমালয়, কি আল্পস, কি রকি পর্বতশ্রেণী—সর্বত্র হিমগিরিশৃঙ্গে রূপের এই অদ্ভুত মনোরম বিকাশ যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করেছে। মানুষ শুধু এদের কোলে শৈলনিবাস তৈরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, এসব দুরারোহ শৃঙ্গের উপরে উঠে তাদের জয় করেছে। আমাদের গৌরব পৃথিবীর সর্বোচ্চ আর বিশালতম গিরিমালা দেবতাত্মা হিমালয়। দার্জিলিঙে দাঁড়িয়ে যখন সূর্যকরোজ্জ্বল তুষার-কিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চোখ মেলে ধরি তখন সৃষ্টির যে অপরূপ বিকাশ দেখতে পাই তা অনির্বচনীয়। সেই পরিবেশে মনের সব আবিলতা যায় ধুয়ে মুছে, স্নেহ মোহবন্ধন হয় অবলুপ্ত, প্রত্যহ-জীবনের শত অভাব-অভিযোগ তুচ্ছ হয়ে পড়ে। হিমালয় অতুলনীয়, তার "অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অটুট স্বাস্থ্যশ্রী, অসংখ্য উপত্যকা—তার সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশৃঙ্গতলে উপলখণ্ডময় নদীসঙ্গমের উদার বিস্তার আর তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ডদলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর উপরে গগনে মহামৌন শান্তি" (১) আমাদের নির্বাক নিস্তব্ধ করে দেয়। সৌন্দর্যের চর্চা এখানকার আলোচ্য নয়, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না এই দীপ্তোজ্জ্বল মহিমার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে ধরিত্রীর জলের একাংশ তুষার হয়ে পর্বতশীর্ষে স্থিতি লাভ করেছে বলেই।

তুষারের কাহিনী থেকে এখন তরল জলের কথায় আসা যাক। পৃথিবীর জলের প্রায় সবটাই রয়েছে মহাসাগর, সাগরও উপসাগরে। সামান্য কিছু রয়েছে হ্রদ, নদনদী দীঘি-সরোবর ইত্যাদিতে। প্রয়োজনীয়তার বিচারে সাগরের জলের আর নদীর জলের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য আছে। এই হেতু এদের আলাদা করে দেখাই ভাল।

৩। সমুদ্রের কথা

পৃথিবী সসাগরা। সব কয়টি মহাদেশ আর দ্বীপ নিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থলভূমি হচ্ছে মাত্র 29·2%। বাকী 70·8% সাগর আর মহাসাগর ; এরা মহাদেশ-গুলিকে ঘিরে আছে। ধরিত্রী সত্যিই সমুদ্র-মেখলা-পরা। এই বিরাট জলরাশি প্রধানতঃ সঞ্চিত হয়ে আছে তিনটি মহাসাগরে—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক

(১) দেবতাত্মা হিমালয়—প্রবোধ কুমার সান্যাল।

মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর। মহাসাগরের কোন অংশ যখন মহাদেশের প্রান্তে বা উপকূলে এসে স্থল দিয়ে অনেকটা বেষ্টিত হয়ে পড়ে তখন তাকে আমরা বলি সাগর বা কখনও উপসাগর ; যেমন, আরব সাগর, পীত সাগর, বঙ্গোপসাগর। কখনও কখনও বিস্তীর্ণ জলখণ্ড প্রায় সম্পূর্ণই চারিদিকে স্থল দিয়ে ঘেরা থাকে, মহাসাগরের সঙ্গে সামান্য সংযোগ থাকে, সেগুলোকে বলা হয় "মধ্যদেশবর্তী সাগর", যেমন ভূমধ্যসাগর, বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণসাগর।

সমুদ্র বিশাল হলেও তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। সুদূর নীহারিকা নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে আমরা যতটা জানি, মেরুঅঞ্চল বা তুষারমৌলি পর্বত সম্পর্কে আমরা যা জানি, সেই তুলনায় সমুদ্রের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এই বিংশ শতাব্দীতেই মাত্র সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং সমুদ্র-বিজ্ঞানের (Oceanography) পর্যালোচনা আরম্ভ হয়েছে। IGY-এর অনুসন্ধানের ফলে সমুদ্র বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি ; এই সব তথ্য সংগ্রহের কাজে নানা দেশের গবেষক জাহাজ আজকাল ব্যবহার হচ্ছে, এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুয়েডিশ জাহাজ Albatross, রুশীয় জাহাজ Vityaz ও Akademik Kurchatov, আমেরিকান জাহাজ Atlantis এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত Nautilus ইত্যাদি। এর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সেই বিখ্যাত চ্যালেঞ্জারের নামও করা যেতে পারে, যাতে করে ডারউইন "অরিজিন অফ স্পিসিস্"-এর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

তিনটি মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রাধান্যই সর্বাধিক—বিস্তৃতিতে, আয়তনে, গভীরতায় সবদিক দিয়েই এটি শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সম্পূর্ণ জলভাগের বিস্তৃতি 360,000,000 বর্গ কিলোমিটারের উপরে ; এর শতকরা 43 ভাগ রয়েছে উত্তর গোলার্ধে। বিভিন্ন মহাসাগরের বিস্তৃতি, আয়তন প্রভৃতির একটা ধারণা পাওয়া যাবে নীচের সারণী থেকে।

মহাসাগর	বিস্তৃতি [বর্গ কিলোমিটার]	আয়তন [ঘন কিলোমিটার]	গড় গভীরতা [মিটার]
প্রশান্ত	$165{\cdot}2 \times 10^6$	$707{\cdot}6 \times 10^6$	4282
আটলান্টিক	$82{\cdot}4 \times 10^6$	$323{\cdot}6 \times 10^6$	3926
ভারত	$73{\cdot}4 \times 10^6$	$291{\cdot}0 \times 10^6$	3963
অন্যান্য মহাসাগর সাগর ইত্যাদি	$39{\cdot}8 \times 10^6$	$48{\cdot}2 \times 10^6$	—
মোট	$360{\cdot}8 \times 10^6$	1370×10^6	—

সমুদ্রের তল কিন্তু বেশ এবড়ো-খেবড়ো, মোটেই সমতল নয়। তলদেশে রয়েছে সুগভীর খাত, প্রশস্ত মালভূমি আর বেশ উঁচু উঁচু বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী বা শৈলশিরা। পর্বতগুলি বেশ উঁচু হলেও ওদের চূড়া জলের বেশ কয়েক শত

মিটার নীচেই রয়েছে। শুধু যে সকল জায়গায় পাহাড় বা মালভূমি অত্যধিক উঁচু, সেগুলিই জলের উপরে এসে দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এই দ্বীপগুলি অবশ্য সব একরকম নয়। এদের কতগুলি হচ্ছে প্রবাল-দ্বীপ। প্রবাল একপ্রকার ছোট্ট সামুদ্রিক কীট, এরা দল বেঁধে থাকে সামান্য উষ্ণ জলে এবং মোটামুটি পঞ্চাশ বা ষাট মিটার জলের নীচে। এদের শরীর থেকে একটা রস বেরিয়ে এসে সমুদ্রের লবণ এবং চুনের সঙ্গে মিশে যায় এবং সেটা ওদের দেহের চারদিকে একটা কঠিন আবরণ তৈরী করে। মরে গেলে এদের দেহাবশেষ সমুদ্রতলে কোন উঁচু পাহাড়ের উপরে জমে। পরে যেগুলো আসে তাদেরও দেহাবশেষ সেখানেই সঞ্চিত হতে থাকে। এমনি করে হাজার হাজার বছর ধরে স্তরের পর স্তর জমতে জমতে জলের উপরে এসে পেঁছে যায় আর দ্বীপ তৈরী হয়—এরাই প্রবাল-দ্বীপ। অনেক সময় প্রবাল-দ্বীপ গোলাকার বলয়ের মত আকার নেয়। মাঝখানে উপহ্রদ বা লেগুন থাকে। এরকম দ্বীপের নাম প্রবাল-বলয় (atoll)। আমাদের মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ এরকম প্রবাল-বলয়। আবার আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে একটি নিমজ্জিত শৈলশিরা থেকে। ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম ইয়োমা পর্বত পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত রয়েছে—তার কিছু উচ্চতর শিখরই আন্দামান-নিকোবর। শ্রীলঙ্কাও সেইরকম মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত, নিমজ্জিত শৈলশিরার মাধ্যমে। এরা মহাদেশীয় দ্বীপ।

গভীর খাতগুলির বেশীর ভাগই দেখা যায় প্রশান্ত মহাসাগরে। গভীরতম খাত হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের "মারিয়ানা খাত"—গুয়াম দ্বীপের কাছে। এর গভীরতা এগার কিলোমিটারেরও বেশী। অতএব পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টকে তুলে নিয়ে যদি এই খাতে বসান হয়, তাহলে সেটি ডুবে যাবে এবং তার উপরেও দুই কিলোমিটার জল থাকবে। ভারত মহাসাগরের খাত অত গভীর নয়। কয়েকটি গভীর খাতের মাপ দেওয়া হল।

মহাসাগর	সমুদ্রখাত	গভীরতা [মিটারে]
ভারত	সুণ্ডা খাত	7455
আটলান্টিক	(১) পোর্টোরিকো খাত	8750
	(২) স্যাণ্ডউইচ খাত	8264
প্রশান্ত	(১) ফিলিপাইন খাত	10497
	(২) মারিয়ানা খাত	11022

পারস্য উপসাগরের গভীরতা সব চেয়ে কম, গড়ে মাত্র 25 মিটার। তারপর নাম করা যেতে পারে বাল্টিক সাগর, আইরিশ সাগর, উত্তর সাগর। উত্তর সাগরের গভীরতা গড়ে 95 মিটার।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রতল ছিল কঠিন শিলাময়। ভূগর্ভ-নিঃসৃত লাভা জমাট বেঁধে সেই শিলা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই শিলার উপরে রয়েছে সূক্ষ্ম কণার এবং কর্দমের পলল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নদীনালা বেয়ে প্রচুর ধূলিকণা

সমুদ্রে অবক্ষিপ্ত হয়েছে। এই অজৈব অবক্ষেপ ছাড়াও, সামুদ্রিক কীট, প্রাণী, শামুক, উদ্ভিদের দেহাবশেষ জৈব গাদ হয়ে সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়েছে। এইসব মিলে বেশ পুরু কর্দমাক্ত পলিস্তর জমেছে সমুদ্রের তলায়। প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের তলায় এই পলির স্তর 300~400 মিটার পুরু, আটলাণ্টিকে আরও বেশী। এই কর্দমস্তরের অধিকাংশই নীলাভ, আবার কোথাও সেটা লাল বা সবুজ। এই পলির বিভিন্ন গভীরতার স্তরের নমুনা তুলে এনে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছেন নানা বিষয়ে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, কোন কোন পলি সেখানে জমেছে প্রায় এক কোটি বছর আগে। গভীর সমুদ্রের তলার লাল পলিতে দেখা যায় নিকেলের পরিমাণটা বেশ অধিক, যা পৃথিবীর অন্যত্র দেখা যায় না। অনুমান হচ্ছে, প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য উল্কাপাতের ভস্মাবশেষ সমুদ্রে পড়ে, সেটা তলদেশে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে, তাই নিকেলের পরিমাণ বেশী।

সমুদ্রের তাপের বাজেট

আমাদের অলক্ষ্যে সমুদ্র এক খেলায় মত্ত হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে তার তাপ-শক্তি নিয়ে খেলা। নানাভাবে সমুদ্র তাপ সংগ্রহ করে, আবার তার তাপের খরচাও বিস্তর। সমুদ্র সাধারণতঃ তাপ পায় সৌরকিরণ থেকে। বায়ুস্তর পার হয়ে যে সূর্যরশ্মি এসে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছয় তার বেশীর ভাগ পায় সমুদ্র। এই রশ্মির কিছুটা আলোক-তরঙ্গ, অধিকাংশই তাপ-তরঙ্গ। আপতিত রশ্মির খানিকটা অবশ্যই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু একটা মোটা অংশ সমুদ্র শোষণ করে নেয়। এই জন্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উষ্ণতা সমুদ্রের তলদেশের জলের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী। সব অক্ষাংশে অবশ্য সূর্যরশ্মি সমানভাবে পড়ে না। সৌর কিরণ ছাড়াও সমুদ্র তাপ পায় বাতাসের জলীয় বাষ্প এবং মেঘস্তর থেকে। মেঘ অনেকটা তাপ আটকিয়ে রাখে, পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে দেয় না। সেই মেঘ বা বাষ্প থেকে তাপ বিকিরণ হয় এবং তার অনেকটা সমুদ্র পায়। আবার যেখানে উষ্ণতর বায়ু উপর দিয়ে বয়ে যায়, সমুদ্র তার সংস্পর্শ থেকে খানিকটা তাপ শুষে নেয়।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর কেন্দ্র ত খুব উত্তপ্ত, সেখান থেকেও সমুদ্র তাপ পেতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, সেখান থেকে যেটুকু তাপ আসার সম্ভাবনা সেটা একেবারেই নগণ্য। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে পাওয়া তাপের পরিমাণ প্রতিমিনিটে প্রতি বর্গ মিটারে গড়ে এক (1) ক্যালোরি আর সেই অবস্থায় সৌরকিরণ থেকে পাওয়া তাপের পরিমাণ 3300 ক্যালোরি। এ হিসেবটা $20^\circ \sim 30^\circ$ অক্ষাংশের। সেইরকম সমুদ্রের জল সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেই জলপ্রবাহের গতীয় শক্তি থেকে উৎসারিত তাপের পরিমাণ খুবই কম, ধর্তব্যই নয়।

এত গেল পাওনার কথা। এখন তাপের ব্যয়টা দেখা যাক। সমুদ্র থেকে সব সময়েই তাপ বিকিরণ হচ্ছে। বিভিন্ন অক্ষাংশে এই বিকিরণের পরিমাণ বিভিন্ন হবেই। মেরুঅঞ্চল যতটা সৌরকিরণ পায় তার চেয়ে বেশী তাপ বিকিরণ করে।

আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র যতটা সৌরতাপ পায় তার চেয়ে কম তাপ বিকিরণ করে। তবে সব মহাসাগর একত্র করে হিসাব করলে দেখা যায় পাওনার দিকটাই বেশী। অর্থাৎ খানিকটা উদ্বৃত্ত সৌরতাপ সমুদ্রে থেকে যাচ্ছে। A যদি আহৃত তাপশক্তি হয় এবং B যদি বিকিরণের পরিমাণ হয়, তবে মোট উদ্বৃত্ত হবে A−B। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠে থেকে প্রচুর জল প্রতি মুহূর্তে বাষ্পায়িত হচ্ছে। প্রতি গ্রাম জলের বাষ্পায়নে 540 ক্যালোরি তাপ প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের আহৃত তাপের অধিকাংশ এর জন্যেই ব্যয় হয়। আবার যেখানে ঠাণ্ডাবাতাস বয়ে যায়, সমুদ্র থেকে সেটাও অনেকটা তাপ পরিবহণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু খোদাতাল্লাহ এক পরম গাণিতিক, তার খতিয়ানে জমাখরচের নির্ভুল হিসাবে সমুদ্রের তাপশক্তির আয় এবং ব্যয় একেবারে সমান। তাই একশ বছরেও সমুদ্রের গড় উষ্ণতার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। যদি বাষ্পীভবনে মোট তাপ ব্যয় হয় C ক্যালোরি এবং ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে D ক্যালোরি শোষণ করে, তা হলে, সীমিত সময়ে A−B=C+D। যত্র আয় তত্র ব্যয়।

প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গমিটারে উদ্বৃত্ত তাপ সমুদ্র পায় গড়ে 1660 ক্যালোরি আর বাষ্পীভবনে ব্যয় হয় 1490 ক্যালোরি এবং বাতাস টেনে নেয় 170 ক্যালোরি। এটা 20°∼30° অক্ষাংশের হিসাব।

এক গ্রাম কোন বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বাড়াতে যে তাপ দরকার হয় তাকে বিজ্ঞানীরা বলেন তার আপেক্ষিক তাপ। এই আপেক্ষিক তাপ দিয়ে বস্তুর তাপ-ধারণ শক্তি মাপা হয়। মাটি বা বাতাসের তুলনায় জলের আপেক্ষিক তাপ খুব বেশী। এর অর্থ, জল প্রচুর তাপ গ্রহণ করতে পারে, বা একই তাপ প্রয়োগে অন্য বস্তুর তুলনায় জলের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। তাই সমুদ্র বাতাসের তুলনায় অনেক বেশী তাপ শুষে রাখতে পারে। সেই তাপ দিয়েই জল বাষ্পীভূত হতে থাকে।

সমুদ্র থেকে বাষ্প নিয়ে উত্তপ্ত বাতাস উপরের দিকে ওঠে। সেই তপ্ত জলীয় বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে শীতল মেরুঅঞ্চলের দিকে যেতে থাকে। কিন্তু মেরু অঞ্চল সৌরকিরণ পায় কম, সেখানকার শীতল বাতাস পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নীচ স্তর দিয়ে বিষুবাঞ্চলের দিকে আসতে থাকে। পথে দুই বিপরীতধর্মী এবং বিপরীতগামী বায়ুস্রোতের সংঘর্ষে ছোট বড় ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়, উষ্ণতা যায় নেমে ; জলীয় বাষ্প তখন ঘনীভূত হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির ধারা নামে। জলে পরিণত হওয়ার সময় বাষ্প থেকে লীনতাপ ছাড়া পায়। সেই তাপ ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে। অর্থাৎ যে তাপটা সমুদ্রে ছিল সেটা পরিবাহিত হয়ে গেল নানা দূর দূরান্তরে। পরোক্ষে এই ভাবে সমুদ্র নানাদেশের, বিশেষতঃ উপকূলবর্তী দেশের, আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে। সেইজন্য সমুদ্রের কাছের দেশগুলিতে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বা তীব্র শীত হয় না। সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে এসে স্থলভাগের উপর বৃষ্টির ধারা না দিলে বসুন্ধরার শস্যশ্যামলা হওয়া দুষ্কর হত। তাই সমুদ্রের কাছেই আমরা ঋণী।

প্রতি বছরে শুধু সাগর মহাসাগর থেকে 320000 ঘন কিলোমিটার জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় আর হ্রদ, নদী প্রভৃতি থেকে বাষ্প হয় প্রায় 60000 ঘন কিলোমিটার। অথবা বলা যেতে পারে, সমস্ত মহাসাগরের পৃষ্ঠ হতে বছরে 100 সেন্টিমিটার পুরু জলস্তর উড়ে চলে যায়। যে কোন সময়ে বাষ্পাবস্থায় সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যে জল থাকে তার পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠের 2·5 সেন্টিমিটারের সমান উচ্চতার স্তরের সমান। বাষ্পীভূত জলের অধিকাংশই বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে সমুদ্রে। কিছু অংশ স্থলভাগে পড়ে বা পর্বতশীর্ষে জমে, সেটা প্রায় 96000 ঘন কিলোমিটার। সেটাও আবার শেষ পর্যন্ত সমুদ্রেই ফিরে আসে। এ হচ্ছে জলের প্রাকৃতিক আবর্তন-চক্র। সমুদ্রে মোট জলের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এই জলীয় চক্রের ফলেই তাপশক্তির চারিদিকে বণ্টন ও পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। তা না হলে পৃথিবীর অধিকাংশই মানুষের বাসযোগ্য হত না। এবং এই আবর্তন সম্ভব হয়েছে সমুদ্রের জলের তাপ-ধারণ ক্ষমতার জন্যই। পরে দেখতে পাব, সমুদ্রের নিজের অভ্যন্তরেও বড় বড় স্রোত এই তাপ পরিবহণ ও পরিবেশনে সাহায্য করছে। এই জন্যই মহাসাগরগুলিকে পৃথিবীর তাপাধার ও তাপ-পরিবাহক বলা হয়।

সমুদ্রের স্রোত

উপল উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালে তার অনন্ত বিস্তার, অপার বিশালতা, অতল গভীরতা, তার ফেনোচ্ছল ঊর্মিমালার উন্মত্ত উল্লাস আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে তটভূমিতে আছড়ে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। এর শেষ নেই, দিনরাত অবিরাম এই তরঙ্গাভিঘাত চলছে। "রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্বসুখে" সেই কল্লোল বেলাভূমিকে সতত আশীর্বাদে সিক্ত করে যাচ্ছে। সমুদ্রের বুকের উপর এই তরঙ্গ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ বহমান বায়ুর সঙ্গে জলের সংঘর্ষের ফলে। উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় বাতাসের গতিশক্তির খানিকটা জলে সঞ্চারিত হয় এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় জলের তরঙ্গের। বাতাসের বেগ যত বেশী হবে, ঢেউয়ের আকার আর গতিও তত বেড়ে যাবে। ঝড়-বাদলের সময় ঘন কালো জলদ মেঘ আর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-তরঙ্গও প্রচণ্ড মত্ততায় পৃথিবীর বুকে এক প্রলয় নাচন শুরু করে দেয়। তখন

"হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ-গর্জনে—"

সেই তরঙ্গ ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। সমদ্রের সেই রূপ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই সুন্দর। এর সুন্দরতম প্রকাশে কবিগুরুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"— ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি

লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে।"

পুরীর সমুদ্রের ধারে গেলে দেখা যায়, সর্বদা অসংখ্য ঢেউ এসে বালুতটে আছড়ে পড়ছে, তার শেষ নেই। বায়ুর সঙ্গে গভীর সমুদ্র-পৃষ্ঠের ঢেউ উঁচুনীচু বঙ্কিম গতিতে উপকূলের দিকে ছুটে আসে। কূলের কাছে জলের গভীরতা যখন কমে যায়, তখন তরঙ্গের নীচের তলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে, কিন্তু তরঙ্গের শীর্ষকে বাতাস টেনে নিয়ে চলে। ফলে ঢেউগুলো লম্ব হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষদেশ ভেঙে গিয়ে জলের শুভ্র ফেনার সৃষ্টি করে। ঊর্মিভঙ্গের এই ফেনিল জল মুহূর্তে এসে বালু-বেলায় ছড়িয়ে পড়ে।

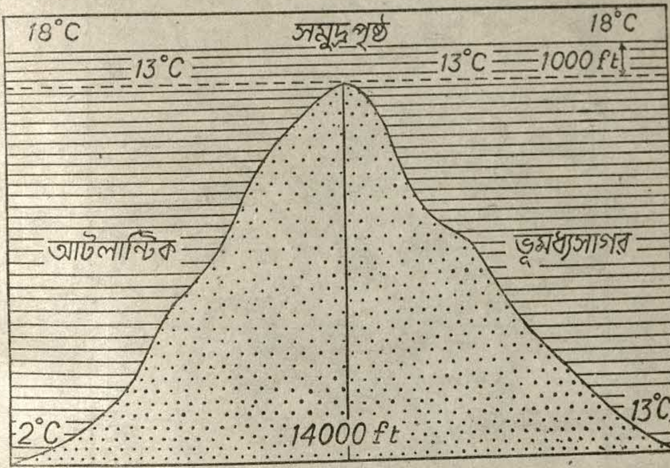
কখনও কখনও ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ যদি খুব বেশী থাকে, তখন ঢেউয়ের উচ্চতা 18～20 মিটারও হতে পারে। এসব ঢেউ প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে। সেই ভীষণ তরঙ্গ ছুটে আসে তীরে উন্মত্ত আবেগে, যেন

"মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খলজল ছলভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।"

মহাসাগরের অম্বুরাশির সচলতা কেবল এই তরঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়। বায়ুমণ্ডলে যেমন আয়ন-প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহ আছে, মহাসমুদ্রেও বারিরাশি সেইরকম এক অংশ থেকে অন্য অংশে অহরহ প্রবাহিত হয়। সমুদ্রজলের এই গতিকে আমরা বলি স্রোত। সাগরজলের বহমানতার একাধিক কারণ রয়েছে। সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় জলস্তরগুলি ঠিক এক রকম নয়। যত গভীরে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রা ক্রমশঃ তত কমতে থাকে। আবার বেশী লবণতার জন্য নীচের জলের ঘনত্বও অপেক্ষাকৃত বেশী। বিভিন্ন স্তরে এই উচ্চতা ও ঘনত্বের তারতম্য স্রোতের অন্যতম কারণ। তা ছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যও স্রোত বইতে থাকে। প্রধান বায়ুপ্রবাহগুলি সমুদ্র-পৃষ্ঠের জলকে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ে নিতে চায়। ফেরেলের নিয়ম মেনে উত্তর গোলার্ধের স্রোত ডানদিকে হেলে যেতে থাকে, আর দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত। বিভিন্ন সাগরের মধ্যে যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু একই গভীরতায় বিভিন্ন সাগরের জলের উষ্ণতা এক নাও হতে পারে। একটি উদাহরণ দিই। ভূমধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আলাদা হয়েছে নিমজ্জিত জিব্রাল্টার পর্বতশিরা দিয়ে। সঙ্কীর্ণ জিব্রাল্টার প্রাণালী দিয়ে এই দুই সমুদ্রের সংযোগ। এই দুটি সাগরের উপরের তাপমাত্রা সমান। কিন্তু 14000 ফিট নীচে ভূমধ্যসাগরের উষ্ণতা 13°C আর আটলান্টিকের উষ্ণতা 2°C (চিত্র ২)। আবার, ভূমধ্যসাগরের যে জল বাইরে আসে তার লবণতা 38·6°/₀₀ আর আটলান্টিক থেকে যে জল প্রবেশ করে তার লবণতা 36·4°/₀₀।

[°/ সহস্রাংশ ভাগ, অর্থাৎ 1 হাজারে এক ভাগ 1°/₀₀]

সবচেয়ে ঘন আর সব চেয়ে শীতল জল থাকে অ্যান্টার্কটিকার কাছের সমুদ্রের গভীর তলে আর উত্তরমেরুর নিকটস্থ গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে ইরমিঞ্জার ও ল্যাবরাডোর সাগরের তলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠে সৌরকিরণ পেয়ে জল সব চেয়ে বেশী তাপিত হয়ে ফুলে ওঠে ও হালকা হয়ে যায়। এই উষ্ণ জল



চিত্র ২। ভূমধ্যসাগর এবং আটলাণ্টিকের জলের উষ্ণতা

তখন সেখান থেকে মেরুঅঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। সাম্য বজায় রাখতে দুই মেরুঅঞ্চলের ঘন শীতল জলও সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিষুবরেখার দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে। ফলে, উপরের স্তরে উষ্ণ জলস্রোত বইবে আর নীচের স্তরে বিপরীত দিকে বইবে শীতল স্রোত। প্রত্যেক মহাসাগরেই এরকমের স্রোত রয়েছে, তবে আটলাণ্টিকের স্রোতগুলি বিশেষ লক্ষণীয়।

অ্যান্টার্কটিকা থেকে শীতল "কুমেরু স্রোত" আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করে। এখানে এই স্রোতের নাম "বেংগুয়েলা স্রোত"। মকরক্রান্তির কাছে এসে সেটা দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা পরিচালিত হয়ে বাঁদিকে যেতে থাকে, পৃথিবীর আহ্নিক গতিও তাতে সাহায্য করে। এখানে আসতে আসতে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ে এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এই উষ্ণতর স্রোত তখন বেশ প্রশস্ত এবং দক্ষিণ আটলাণ্টিক অতিক্রম করে এসে ব্রেজিলের উপকূলে উপস্থিত হয়। ব্রেজিলের "রক অন্তরীপে' (Cape Roque) এসে এই স্রোত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখা "ব্রেজিল-স্রোত" হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল দিয়ে মেরুর দিকে ফিরে যায়, কিন্তু অপর শাখা ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে গিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। স্পষ্টই দেখা যায়, স্থলভাগের উপস্থিতি সমুদ্রস্রোতের দিক এবং গতিবেগ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্রোতই বিখ্যাত "উপসাগরীয় স্রোত" বা Gulf Stream। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং

পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধির মূলে এর অবদানই সর্বাধিক। এই স্রোতের তাপমাত্রা এখানে যথেষ্ট আর এর সন্নিহিত বায়ুও উষ্ণতর এবং যথেষ্ট জলীয় বাষ্পে ভরা।



চিত্র ৩। আটলান্টিকের সমুদ্রস্রোত

এর পর উপসাগরীয় স্রোত ফ্লোরিডার নিকট দিয়ে বেরিয়ে এসে আটলান্টিক অতিক্রম করতে আরম্ভ করে। এখানে এই স্রোতের বিস্তার প্রায় 70 কিলোমিটার। কিন্তু আটলান্টিকের মাঝামাঝি গেলে এর বিস্তার হয় 1400 কিলোমিটার, গভীরতা 90 মিটার, বর্ণ ঘন নীল, উষ্ণতা 80°F। মধ্য আটলান্টিকের কাছ থেকে স্রোতটি দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। একটি শাখা—Gulf Stream Drift—সরাসরি গিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং নরওয়ের উপকূলে পৌঁছয়—এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরমেরু অঞ্চলে বিলীন হয়ে যায়। অপর শাখাটি ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল বেয়ে এসে নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশে যায়। এর ফলে কর্কটক্রান্তির কাছে এক ঘূর্ণস্রোতের সৃষ্টি হয়। মাঝখানের অংশে কোন স্রোত থাকে না এবং সেখানে অজস্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও আবর্জনা এসে জমে। এই স্রোতবেষ্টিত স্থির জলভাগকে বলা হয় "শৈবাল-সাগর" বা Sargasso Sea (চিত্র ৩)।

উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের আনুকূল্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে, ফ্রান্স, পর্তুগালের উপকূলে বরফ জমতে পায় না, বন্দরগুলো সারাবছর কার্যক্ষম থাকে। কিন্তু বাল্টিক সাগরের উপকূল বছরের বেশ কয়েকমাস বরফাচ্ছন্ন থাকে। ল্যাবরাডোর এবং ব্রিটিশ



সমুদ্রস্রোত

চিত্র ৪। বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত

দ্বীপপুঞ্জ একই অক্ষাংশে। কিন্তু ল্যাবরাডোরে বা কানাডার উপকূলে উষ্ণতর কোন স্রোত পৌঁছয় না, তাই সে সব উপকূল বছরে ৭।৮ মাস বরফাবৃত। তাছাড়া, উপসাগরীয়

স্রোতের সঙ্গে যে পশ্চিমাবায়ু আসে তাতে ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি উষ্ণতর হয় এবং সেখানে বারিপাতও হয় যথেষ্ট। সমুদ্রের জলস্রোত কিভাবে স্থল-ভাগের বিশেষ অংশকে সমৃদ্ধ করে এবং তার জলবায়ুকে প্রভাবিত করে, এটি তার এক বিশিষ্ট উদাহরণ।

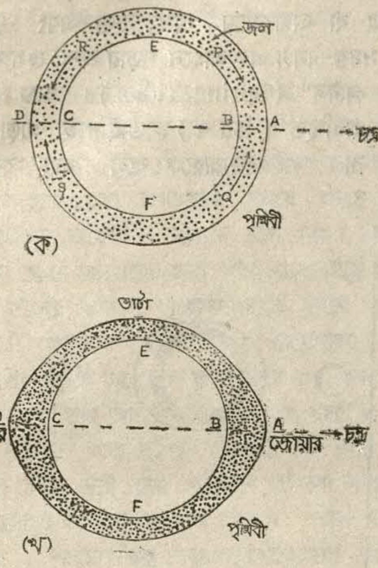
উপসাগরীয় স্রোত যখন উত্তর-পূর্বদিকে যেতে থাকে তখন অতি শীতল "সুমেরু স্রোত" গ্রীনল্যান্ডের কাছ থেকে কানাডার উপকূল বেয়ে দক্ষিণের দিকে আসে—এর নাম "ল্যাবরাডোর স্রোত"। শীতল সবুজ ল্যাবরাডোর স্রোত আর উষ্ণ ঘননীল উপসাগরীয় স্রোতের সংঘর্ষ ঘটে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে। এই দুই স্রোতের মাঝখানের অতি স্পষ্ট সীমারেখাকে বলে, "হিম-প্রাচীর" (Cold Wall)। এই দুইটি স্রোতের উপরের বাতাসের উষ্ণতাও ভিন্ন। এই দুইটি বায়ুপ্রবাহ মিলিত হলে এখানে জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে প্রায়ই এক বিস্তীর্ণ কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে। এখানকার সমুদ্র অগভীর এবং এখানে এক বিরাট মৎস্য-ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, অগভীর সমুদ্রে যদি বিভিন্ন তাপমাত্রার স্রোত মিলিত হয় তবে মৎস্যক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটে, যেমন উত্তর সাগরে, জাপান সাগরে।

আটলাণ্টিকের মত প্রশান্ত মহাসাগরেও একই ধরনের স্রোত রয়েছে। সেখানে "কুরোসিয়ো স্রোত" আটলাণ্টিকের উপসাগরীয় স্রোতের ভূমিকা নিয়েছে। সেখানেও শৈবাল সাগর রয়েছে। এই স্রোতের কল্যাণেই জাপানের বন্দরগুলির এত সমৃদ্ধি। ব্রিটেন ও জাপান বিশেষভাবে প্রকৃতির আশীর্বাদ লাভ করেছে। ভারত মহাসাগরের স্রোতধারা একটু পৃথক, তার কারণ সমস্ত উত্তর ভাগ স্থলভূমি দিয়ে আবদ্ধ। এখানে মৌসুমী বায়ু দ্বারাই সমুদ্র স্রোত বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। ভারত, ব্রহ্মদেশ, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা উষ্ণতর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোতের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত। বিভিন্ন সমুদ্রের স্রোতের একটা ধারণা চিত্র ৪ থেকে পাওয়া যাবে।

জোয়ার-ভাটা

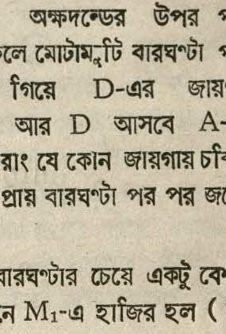
সমুদ্র-জলের সঞ্চলনের সঙ্গে আর একটি ব্যাপার জড়িত, সেটি হচ্ছে জোয়ার-ভাটা। জোয়ার-ভাটার মূলে রয়েছে পৃথিবীর উপর চন্দ্র আর সূর্যের আকর্ষণ। এর মধ্যে চাঁদের আকর্ষণই প্রধান। চাঁদের চেয়ে সূর্যের ভর তিনশত লক্ষ গুণ বেশী, কিন্তু পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব চাঁদের দূরত্বের 390 গুণ। চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে বলে তার টানটাই প্রবলতর। এ যেন রাষ্ট্রপতির চেয়ে গ্রামের চৌকিদারের প্রতাপ বেশী। বহুদূরে বলে সূর্যের টান ক্ষীণতর। এদের টান পৃথিবীর স্থলের উপর যেমন জলের উপরেও তেমনই। কিন্তু কঠিন ও ভারী বলে স্থলভূমির উপরে টানের প্রভাবটা বোঝা যায় না। তরল বলে সমুদ্রের উন্মুক্ত জলরাশি এই টানে সহজেই সঞ্চালিত হয়। যেদিকে আকৃষ্ট হয় সেদিকে জল ফুলে ওঠে আর চারদিক থেকে জল সেখানে ছুটে আসে—একে বলি জোয়ার। যেখান থেকে জল চলে আসে সেখানে জলের পৃষ্ঠতল বা লেভেল নেমে যায়। সেখানে ভাটা দেখা দেয়। এই জোয়ার অথবা ভাটা পৃথিবীর দুই বিপরীত পৃষ্ঠে এক সময়েই দেখা দেয়—চিত্র থেকে সেটা বোঝা সহজ

হবে (চিত্র ৫)। ধরা যাক, চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে। A বিন্দুটি চাঁদের কাছে বলে চাঁদের টান সেখানে B স্থলবিন্দু থেকে বেশী জোরালো। A বিন্দুতে আছে জল, সেই জল এগিয়ে যায়, ফলে আশ-পাশের P,Q থেকে জল সেখানে ছুটে আসে—A-তে জোয়ার দেখা দিল। A-এর সরাসরি বিপরীতে পৃষ্ঠে রয়েছে C আর D। স্থলবিন্দু C-তে চাঁদের টান D-জলপৃষ্ঠ থেকে বেশী। সুতরাং C যতটা চাঁদের দিকে সরছে D ততটা নয়। ফলে আশপাশের অঞ্চল থেকে জল এসে জমছে, অর্থাৎ D-তেও জোয়ার হবে। তাই পৃথিবীর দুই বিপরীত বিন্দুতে এক সঙ্গে জোয়ার দেখা দেয়। E এবং F থেকে জল চলে যায়, তাই এই দুই বিপরীত বিন্দুতে ভাটা পড়ে। পৃথিবীর অক্ষদন্ডের উপর পাক খাওয়ার ফলে মোটামুটি বারঘণ্টা পরে A-বিন্দু গিয়ে D-এর জায়গায় পৌঁছুবে আর D আসবে A-এর জায়গায়। তখন আবার জোয়ার হবে চাঁদের টানে। সুতরাং যে কোন জায়গায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুবার জোয়ার এবং দুবার ভাটা দেখা যায় ; প্রায় বারঘণ্টা পর পর জলের লেভেল বেড়ে যায়।



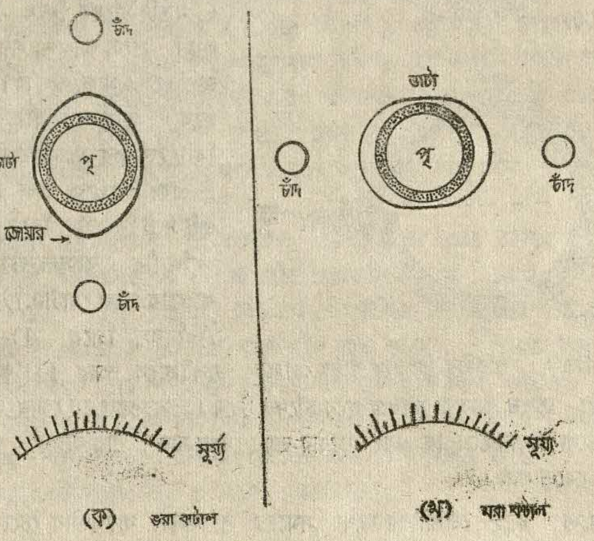
চিত্র ৫। পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠের জোয়ার

বস্তুতঃ দুই জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা বারঘণ্টার চেয়ে একটু বেশী। মনে কর, A বিন্দুতে জোয়ার এল, সে যখন চাঁদের সামনে M_1-এ হাজির হল (চিত্র ৬)। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে A-বিন্দু যখন M_1-এ এসে উপস্থিত হল তখন চাঁদ M_1-থেকে M_2 বরাবর সরে গেছে। সুতরাং A-কে চাঁদের সামনে যেতে হলে M_2-তে গিয়ে হাজির হতে হবে, তবেই জোয়ার হবে। চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে আটাশ দিনে, সুতরাং একদিনে চাঁদ সরে যায় কক্ষপথের 1/28 অংশ। পৃথিবীর এই অংশটুকু পাক খেতে লাগবে $(24 \times 60)/28$ মিনিট $= 52$ মিনিট। অর্থাৎ প্রতি 24 ঘণ্টা 52 মিনিট পরে পৃথিবীর একটি স্থান চাঁদের মুখোমুখি হয়—এর মধ্যে দুবার জোয়ার হয়। অতএব 12 ঘণ্টা 26 মিনিট পর পর জোয়ার দেখা দেবে। এই হিসেবেই গঙ্গার জোয়ারের সময় প্রতিদিনের কাগজে বের হয়।



চিত্র ৬। দুই জোয়ারের সময়ের ব্যবধান

জোয়ারের জন্যে জলের স্ফীতি কিন্তু রোজ সমান হয় না। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় জোয়ারের জল খুব বেড়ে যায়, কিন্তু সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে যে জোয়ার আসে তার জলের স্ফীতি অনেকটা কম। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী মোটামুটি একই রেখায় থাকে, দুইয়েরই সমস্ত টানটা এক লাইনে পড়ার জন্য জলস্ফীতি হয় বেশী। একে বলা হয়, "ভরা কাটাল" (spring tides)। আর সপ্তমী-অষ্টমীতে সূর্য পৃথিবী ও চন্দ্র সমকোণে অবস্থিত (চিত্র ৭)। তাই দুই আড়াআড়ি টানের ফলে জলের স্ফীতি তত হয় না। এই জোয়ারকে বলে "মরা কটাল" (neap tides)।



চিত্র ৭। ভরা কটাল ও মরা কটাল

আগের পরিচ্ছেদে যে ঢেউয়ের কথা বলা হয়েছে, সেটা বায়ুপ্রবাহের জন্যে কেবলমাত্র সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু জোয়ারের সময় চাঁদের টান পড়ে সম্পূর্ণ বারিরাশির উপরে। জোয়ারের জল সঞ্চলনের ফলে যে ঢেউয়ের উদ্ভব হয়, সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। স্থলের উপকূলের সমুদ্র যদি অগভীর এবং প্রশস্ত হয় তবে জোয়ারের জলস্ফীতি বিশেষ লক্ষ্য হয় না, যেমন উত্তর সাগরের উপকূলে বা প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপের কাছে। কিন্তু যেখানে জল দুইটি স্থলভাগের মধ্যের সরু পথে প্রবাহিত, সেখানে জোয়ার তীব্র হয় ; যেমন ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, বা কানাডার উত্তরে ফাণ্ডি উপসাগরে।

জোয়ারের জলের লেভেল যখন বাড়ে তখন নদীর মোহনা দিয়ে সেই জল নদীর ভিতরে প্রবেশ করে। সংকীর্ণ এবং অগভীর নদীতে এসে স্বভাবতঃই জোয়ার বাধা পায় আর জল স্ফীত হয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। মোহনায় কোন চর বা দ্বীপ থাকলেও জোয়ারের ঢেউ খুব উঁচু হয়। আমাদের দেশে এরকম বিরাট তরঙ্গের জোয়ারকে বলে

"বান"। হুগলী নদীতে যখন বান ডাকে তখন জল কখনও কখনও 5-6 মিটার উঁচু হয়ে আসে। ইয়াং-সিকিয়াং, আমাজোন, সীন প্রভৃতি নদীতেও এরকম বান দেখা যায়। চীনের সিনটিয়াং নদীতে 15 কিলোমিটার বেগে যে বান প্রবেশ করে অনেক সময় তার উচ্চতা 8 মিটারও হয়।

জোয়ার-ভাটার উপরে আমাদের অনেক সময় নির্ভর করতে হয়। জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজ নদীতে প্রবেশ করে বন্দরে পৌঁছুতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাতে সুবিধা হয়। বেলোর্মি-অধ্যুষিত নদীগুলো তাই খুব নাব্য থাকে। কলকাতাতেই বড় জাহাজগুলো জোয়ারের সময়ে আসে এবং বেরিয়ে যায়। ভাটার টানে নদীর আবর্জনার অধিকাংশ সাগরে চলে যায়। সুতরাং নদীর খাত গভীর থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জোয়ারের জন্য বন্দর তুষারমুক্ত থাকতে পারে।

সুমেরু অঞ্চলে শ্বেত সাগরের তীরে কোথাও কোথাও উঁচু উঁচু কাঠের খুঁটির উপরে জাল বেঁধে রাখা হয়। জোয়ারের সময় সেই খুঁটিগুলো জলে ডুবে যায়। তারপর ভাটার টানে জল যখন নেমে যায়, তখন দেখা যায় খুঁটির উপরের জালে মস্ত বড় বড় স্যামন মাছ আটকে আছে। মাছ ধরার এ এক বিচিত্র পদ্ধতি।

বর্তমান শতাব্দীতে কল-কারখানা আর পরিবহণের সম্প্রসারণ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, তাই প্রচুর পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কয়লা আর পেট্রোলের ভাণ্ডার ক্ষীণতর হচ্ছে। এজন্য মানুষ সন্ধান করছে প্রকৃতির অন্যান্য শক্তি-উৎস। পারমাণবিক বিভাজন থেকে শক্তি সংগ্রহ করার এত তোড়জোড় এই কারণেই। জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাস যখন প্রচণ্ড বেগে নদীতে প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে প্রচুর গতীয় শক্তি থাকে, এই শক্তিকে কাজে লাগানোর কল্পনা বহুদিনের। অধুনা ফ্রান্সে রান্স (Rance) নদীর মোহনায় অপেক্ষাকৃত নীচু বাঁধ তৈরী করে তার নীচে বিশেষ ধরনের টারবাইন বসান হয়েছে। জোয়ার ও ভাটার জলের প্রবল স্রোতে ঐ টারবাইন ঘুরতে থাকে এবং তা থেকে তড়িৎ উপাদন হচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ কম নয়, 240,000 কিলোওয়াট। নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য নদীর মোহনায় এরকম ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

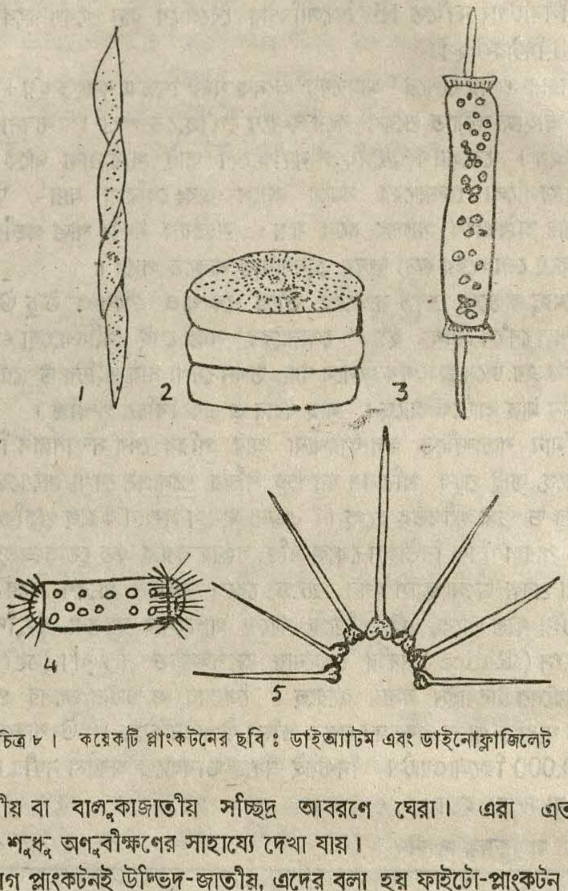
৪। সমুদ্রের সম্পদ

সমুদ্র এক অশেষ এবং অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার। এই সম্পদ প্রধানতঃ দুই রকমের—জৈব সম্পদ এবং খনিজ সম্পদ।

সমুদ্রের অভ্যন্তরে জীবজগতের বিস্তার অসীম। ক্ষুদ্রতম এককোষী জীব থেকে পৃথিবীর বিশালতম প্রাণী তিমি—সবই সমুদ্রে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের জৈব জগৎকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করে দেখেন : (১) প্লাংকটন (২) নেকটন এবং (৩) বেনথোস্।

প্লাংকটন। জৈব সম্পদের বেশীর ভাগই হচ্ছে প্লাংকটন। প্লাংকটন জলে ভাস-মান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণশীল বস্তু। এরা জলের স্রোতে ভেসে থাকে, সাঁতার কাটতে পারে না। এদের বহু প্রজাতি। এদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র মৎস্যাণু, মাছের শূক,

অনেক এককোষী প্লাংকটন যেমন, diatoms, dianoflagellates, cocolithophores প্রভৃতি আছে (চিত্র ৮)। এরকম ছোট্ট প্লাংকটনের দেহের প্রোটোপ্লাজম



চিত্র ৮। কয়েকটি প্লাংকটনের ছবি : ডাইঅ্যাটম এবং ডাইনোফ্লাজিলেট

একটা চুনজাতীয় বা বালুকাজাতীয় সচ্ছিদ্র আবরণে ঘেরা। এরা এত ছোট, যে অধিকাংশকেই শুধু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়।

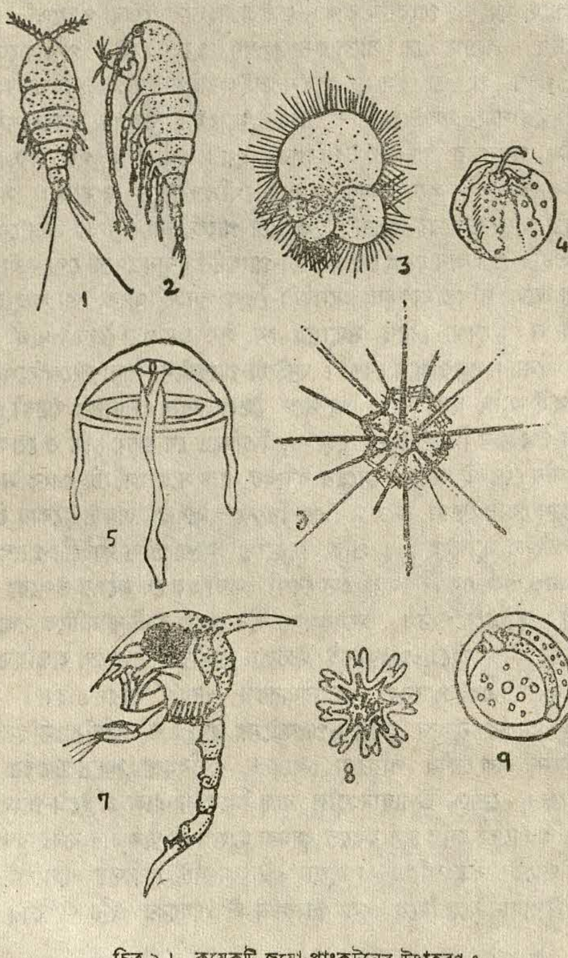
বেশীর ভাগ প্লাংকটনই উদ্ভিদ-জাতীয়, এদের বলা হয় ফাইটো-প্লাংকটন (phytoplankton)। অপরগুলি প্রাণিজ-প্লাংকটন বা জুয়ো-প্লাংকটন (zooplankton)। বছরে সমুদ্রে মোট ষাট হাজার কোটি টন (600,000,000,000 টন) জৈব সম্পদের সৃষ্টি হয় এবং এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কোটি টনেরও বেশী ফাইটো-প্লাংকটন, অর্থাৎ শতকরা 92 ভাগ হচ্ছে উদ্ভিজ্জ-প্লাংকটন। স্থলভূমির উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সারা বছরে ভূভাগে যে উদ্ভিদ, তৃণলতা ইত্যাদি জন্মায় তার মোট পরিমাণ ত্রিশ হাজার কোটি টন ; এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বন-জঙ্গল, আর বিশ হাজার কোটি টন আবাদী ফসল।

সম্পূর্ণ ফাইটো-প্লাংকটনটাই তৈরী হয় সমুদ্রের উপরের জলস্তরে। এর জন্যে সূর্যের আলো এবং একটু বেশী তাপমাত্রা প্রয়োজন। উন্মুক্ত স্বচ্ছ সমুদ্রে আলো প্রায়

100 মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করে আর নীচের তুলনায় উপরের স্তরের তাপমাত্রাও বেশী। তাই ফাইটো-প্লাংকটন 100-150 মিটার গভীরতার মধ্যেই জন্মায়। সমুদ্রের নীচের তলায় ফাইটো-প্লাংকটন থাকে না। ফাইটো-প্লাংকটনের কোষের প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে সবুজ ক্লোরোফিল কণাও থাকে। এই সবুজ কণা সূর্যালোক শোষণ করে এবং তার সাহায্যে দিনের আলোতে ফাইটো-প্লাংকটন কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে জৈব পদার্থে পরিণত করে। অর্থাৎ গাছের পাতায় যে সালোকসংশ্লেষণ হয়, সেই পদ্ধতিতেই ফাইটো-প্লাংকটনেও খাদ্য প্রস্তুত হয়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলেই দ্রবিত অবস্থায় থাকে, তাই যথেষ্ট। যে সমস্ত জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ মরে যায়, তাদের দেহাবশেষ ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা নানারকম সরলতর পদার্থে পরিণত হয়। ধ্বংস ও পচনের ফলে সমুদ্রতলে এইভাবে প্রচুর অবশেষ পড়ে আর সেখানে খনিজবস্তুও রয়েছে। সমুদ্রস্রোত এর কিয়দংশ নিয়ে আসে উপরের তলায়। ফাইটো-প্লাংকটনের বৃদ্ধির জন্য যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি প্রয়োজন সেগুলো ফাইটো-প্লাংকটন ওখান থেকে পেয়ে যায়। তাছাড়াও পচনের ফলে জলে দ্রবিত অবস্থায় অনেকটা জৈব পদার্থ থাকে, তা ফাইটো-প্লাংকটনের বিশেষ প্রয়োজন। দেখা গেছে সমুদ্রের যে সব জায়গায় জৈব পদার্থ প্রচুর সেখানে ফাইটো-প্লাংকটনের ফসলও খুব বেশী। ফাইটো-প্লাংকটনে খাদ্য-সংশ্লেষণে শুধু শর্করা জাতীয় পদার্থই সৃষ্টি হয় না; এর সঙ্গে তৈলজাতীয় পদার্থও তৈরী হয়। তিমি প্রচুর ফাইটো-প্লাংকটন নিয়ত খেয়ে ফেলে; তিমিতে যে প্রচুর চর্বি ও তেল আছে সেটা ফাইটো-প্লাংকটন থেকেই আসে। দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাইটো-প্লাংকটন-কোষ বিভক্ত হয় এবং নতুন কোষ তৈরী করে। এক দিনের মধ্যেই একটা কোষ থেকে অসংখ্য ফাইটো-প্লাংকটনের সৃষ্টি হয়। প্রতি মুহূর্তে সংখ্যাতীত ফাইটো-প্লাংকটনের উদ্ভব হচ্ছে। কখনও এক এক জায়গায় এত বেশী তৈরী হয় যে জলের উপরের স্তরটা একটা ভারী সূপের মতো হয়ে ওঠে। অনেকসময় দূর থেকে সেই স্থানটিকে সবুজ বা হলদে দেখায়। অনেকটা ফাইটো-প্লাংকটনই উচ্চতর প্রাণীর খাদ্যরূপে অন্তর্হিত হয়, আবার এক অংশ মরে যায় এবং পচনের ফলে নানারকম পদার্থে পরিণত হয়। জীবজগতের ধ্বংস থেকেই আবার নতুন ফাইটো-প্লাংকটনের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয়। এইভাবে সমুদ্রের জীবনের এক চক্রীয় পরিক্রমা চলছে। এ বিষয়ে সমুদ্রস্রোতের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্রোত উপাদানগুলি বয়ে নিয়ে না এলে ফাইটো-প্লাংকটনের সৃষ্টি দুষ্কর হত। আমাদের জমি চাষ করতে আমরা লাঙল বা ট্রাক্টার ব্যবহার করি, জমিতে সার মিশিয়ে তাকে উর্বর করি। সমুদ্রে এই কাজটি স্রোতের সাহায্যেই হয়ে থাকে। স্রোতই নানা উপাদান বয়ে নিয়ে এসে প্লাংকটন উৎপাদনের জন্য উপরের স্তরকে উর্বর করে দেয়।

প্রাণিজ-প্ল্যাংকটন বা জুয়ো-প্ল্যাংকটন বছরে জন্মায় প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টন। উদ্ভিজ্জ প্লাংকটনের তুলনায় অবশ্যই অনেক কম, কিন্তু সমস্ত স্থলজ প্রাণী উৎপাদনের চেয়ে বহুগুণ অধিক। প্রাণিজ-প্লাংকটনে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং ভাইটামিন। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন খাদ্যের জন্য আমরা এই উৎসের দিকে হাত বাড়াতে বাধ্য হব।

জ়ুয়ো-প্লাংকটনে এককোষী অনেক প্রজাতি ত আছেই, তা ছাড়া আছে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাধরনের চিংড়ি জাতীয় মাছ বা কোপেপড, নানারকম বড় মাছের ডিম আর প্রথম অবস্থার চারা, বিভিন্ন জলজ প্রাণীর শুক, ছোট্ট ছোট্ট জেলী মাছ ইত্যাদি (চিত্র ৯)।



চিত্র ৯। কয়েকটি জুয়ো-প্লাংকটনের উদাহরণ ঃ
1-2—কোপেপড ; 3—গ্লোবিজেরিনা, 4—নক্টিলুকা
5—জেলিমাছ, 6—রেডিয়োলারিয়ান, 7-9—বিভিন্ন লার্ভা

এককোষী জ়ুয়ো-প্লাংকটনগুলি বস্তুতঃ প্রোটোজোয়া বা আদিপ্রাণী, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্রতম প্রতিনিধি। এদের কোন কোন প্রজাতি নগ্ন বা আবরণহীন, আবার অনেকের একটি বাইরের সচ্ছিদ্র আবরণ বা খোলস আছে। এদের হাত-পা, মুখ, চোখ, মস্তিষ্ক

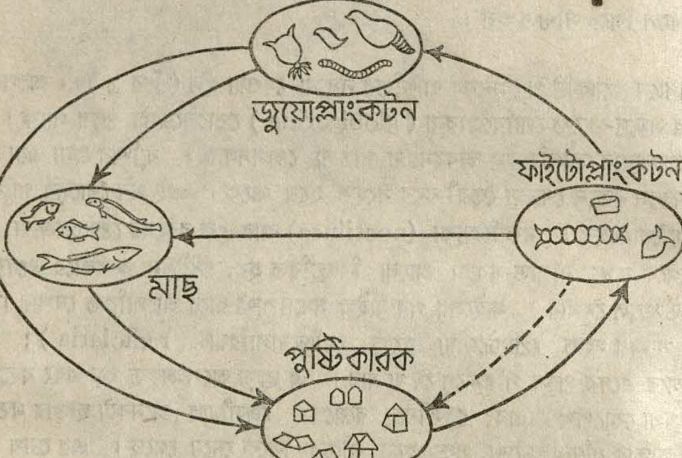
কিছু নেই, কিন্তু প্রাণীর বৈশিষ্ট্য অনেক আছে। সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে এরা দেহের অংশকে সরু সূতার মতো বের করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এগুলোর দ্রুত বিভাজন ঘটে এবং অতি অল্প সময়ে একটি প্রোটোজোয়া থেকে একই রকমের বহু প্রোটোজোয়ার সৃষ্টি হয়। কোন কোন প্রোটোজোয়াতে নীচের অংশ সরু হয়ে লেজের আকার নেয় এবং সেটাকে পরিচালিত করে প্রোটোজোয়া স্থানান্তরে যেতে পারে। দেহের উপরের সচ্ছিদ্র আবরণের সাহায্যে এদের শ্বাস-প্রক্রিয়া চলে। মরে গেলে এদের দেহাবশেষ সমুদ্রতলে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

এখানে কয়েকটি প্লাংকটনের আকৃতির নমুনা দেওয়া হল (চিত্র ৯)। অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর সমুদ্র-পৃষ্ঠে গ্লোবিজেরিনা (globigerina) প্রোটোজোয়া প্রচুর থাকে। এরা ছোট গোলাকার ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পাতলা খোলসযুক্ত। বৃদ্ধির জন্য এরা অনেক সময় নতুন নতুন খোলস তৈরী করে সংহত হয়ে থাকে। এই সব খোলের গায়ে সরু সরু শুঁয়ো থাকে। নকটিলুকা (noctiluca) আর এক রকমের প্রোটোজোয়া, এদের দেহ থেকে মৃদু নীলাভ-সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হয়, সেইজন্য অন্ধকারে এদের দূর থেকে উজ্জ্বল দেখায়। মাইলের পর মাইল সমুদ্রপৃষ্ঠ রাত্রে আলোকিত দেখায়। আর একটি সুন্দর স্বচ্ছ প্রোটেজোয়া হচ্ছে রেডিয়োলারিয়া (radiolaria); ভারত মহাসাগরে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত বড় এবং বহুকোষী প্রাণী, যথা কোপেপড এবং জেলীমাছ রয়েছে। জেলীমাছ অনেকটা ছাতার মত, এর মুখটি ছাতার বাঁটের মতো সরু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। এর চোখ আছে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য হাতের মত দুইটি সরু নল আছে দুপাশে। ক্ষুদ্রতর প্লাংকটন খেয়ে এগুলো বৃদ্ধি পায়। নানা ধরণের জেলীমাছ দেখা যায়। কোপেপডগুলো চিংড়ির মতো দেখতে, চার-পাঁচ মিলিমিটার মাত্র ও দেহের উপর শক্ত খোল থাকে। বিভিন্ন খণ্ড যুক্ত হয়ে এদের দেহ তৈরী, পাগুলোও তাই। সমুদ্রে প্রচুর কোপেপড রয়েছে ; এরা বিভিন্ন প্লাংকটন উদরসাৎ করে বড় হয়। আবার এগুলো মাছের অতি প্রিয় খাদ্য।

ফাইটো-প্লাংকটনই হচ্ছে প্রাণিজ-প্লাংকটনের প্রধান খাদ্য। অধিকাংশ ফাইটো-প্লাংকটনই জুয়ো-প্লাংকটনের পেটে যায়। কোন কোন মাছ এবং বিশেষ করে তিমি ফাইটো-প্লাংকটন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। ফাইটো-প্লাংকটনের সাহায্যে যে জুয়ো-প্লাংকটন হয় সেগুলো আবার ছোট ছোট চিংড়ি জাতীয় মাছ, যথা কোপেপডের শিকার। আবার এই কোপেপড বা ছোট মাছগুলি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় মাছের আহার। এদের সাহায্যেই মাছের পুষ্টি। কোপেপড খেয়ে সার্ডিন মাছ পুষ্ট হয় আবার সার্ডিন মাছ খেয়ে মেকেরেল মাছ বেড়ে ওঠে। এমনি করে ক্ষুদ্রতম প্লাংকটন থেকে বৃহত্তম তিমি পর্যন্ত একে অপরকে সংহার করে এবং আত্মসাৎ করে বাঁচার লড়াই করছে। বস্তুতঃ সমুদ্রের বিশাল জৈব সম্পদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে ফাইটো-প্লাংকটনের উপরে। কোটি কোটি টন ফাইটো-প্লাংকটন নিরন্তর তৈরী না হলে সমুদ্রের প্রাণসম্পদ লয় পেয়ে যেত

(চিত্র ১০)। সমুদ্রের জৈব জগতে খাদ্যের সংস্থান এবং দেহের পুষ্টিসাধন এই ভাবেই চলে।

নেকটন। এরা হচ্ছে সমুদ্রের সতত সন্তরণশীল প্রাণী। ছোট ছোট মাছ থেকে হাঙর, তিমি পর্যন্ত সবই নেকটন। সমুদ্রের সব স্তরেই এদের দেখা যায়, তবে যেগুলো বেশী দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে সেগুলো প্রায়ই জলের উপরের স্তরে থাকে।

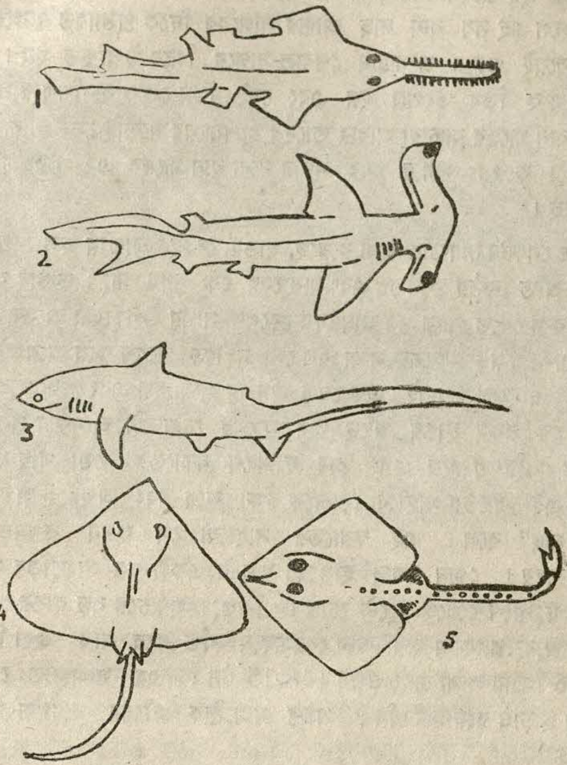


চিত্র ১০। সামুদ্রিক জৈবজগতের পরিক্রমা

সমুদ্র-সম্পদের কথা উঠলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে মাছের কথা। যদিও এ পর্যন্ত 40000-এরও বেশী বিভিন্ন জাতের মাছের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তবুও সমুদ্রের সমগ্র জৈব সম্পদের তুলনায় মাছের পরিমাণ বেশী নয়। ছয়-সাত লাখ মাছ-ধরা জাহাজের সাহায্যে বছরে যে মোট প্রাণিজ খাদ্য সংগ্রহ করা হয় তার মোট পরিমাণ তিন-চার কোটি টনের অধিক নয়। এর প্রায় নব্বই শতাংশই মাছ আর বাকীটা কাঁকড়া, হাঙর, শামুক, চিংড়ি ইত্যাদি। সমুদ্রের অসীম ভাণ্ডারের তুলনায় এই পরিমাণটা কিছুই নয়। এই মাছের অনেকটা অবশ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আরও নানা প্রয়োজনে মৎস্যজাত দ্রব্য কাজে লাগান হয়। বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে কড, হ্যালিবাট জাতীয় মাছ; এদের তেল মূল্যবান ঔষধ হিসাবে গণ্য। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছ নির্ভর করে প্লাংকটনের উপরে। এই কারণেই অধিকাংশ মাছ দেখা যায় 100∼150 মিটার গভীরতার মধ্যে। বিশেষ করে একাধিক স্রোত এসে যেখানে মেশে সেখানে প্লাংকটন প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং সেই সব জায়গাতেই মাছের প্রাচুর্য দেখা যায়।

অধিকাংশ মাছেরই কঠিন শিরদাঁড়া থাকে এবং শরীরের কাঠামোটা হয় শক্ত হাড়ের তৈরী। এদের ডানা বা পাখনা থাকে, যা সন্তরণের সহায়ক। ফুলকোর সাহায্যে এরা

জলের দ্রবিত বায়ু গ্রহণ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। সব চেয়ে ছোট মাছ—“ফিলিপিন গোবি”—ফিলিপিন দ্বীপের কাছের সমুদ্রে দেখা যায় ; এরা মোটে 5~6 মিলিমিটার লম্বা। অনেক মাছের গায়ে প্রজাপতির মতো নানা রঙের সুন্দর বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনেক মাছেরই দেহচ্ছটা রুপোর মতো উজ্জ্বল। কোন কোন



চিত্র ১১। হাঙর, স্কেইট প্রভৃতির কয়েকটি নমুনা

বেশ বড় বড় মাছও খুব নিরীহ এবং শান্ত, আবার অনেক মাছ অত্যন্ত চঞ্চল এবং হিংস্র প্রকৃতির। সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে মাছ রয়েছে তাদের দেহের অনেক রকম বিবর্তন দেখা যায়। কোনটার প্রকাণ্ড পাকস্থলী, কোনটার ঠোঁট আঁকশির মত তিন-চার ফিট লম্বা, কোনটার বুকের নীচে খাদ্য আটকাবার জন্য জালের সরঞ্জাম, কোনটার গায়ে তীক্ষ্ম কাঁটা ইত্যাদি। গভীর তলের অনেক মাছের থেকে আবার আলো-বিচ্ছুরণও হয়। খাদ্যসংগ্রহ, সঞ্চয়, আত্মরক্ষার তাগিদ—এই সব কারণেই এসকল ব্যবস্থা।

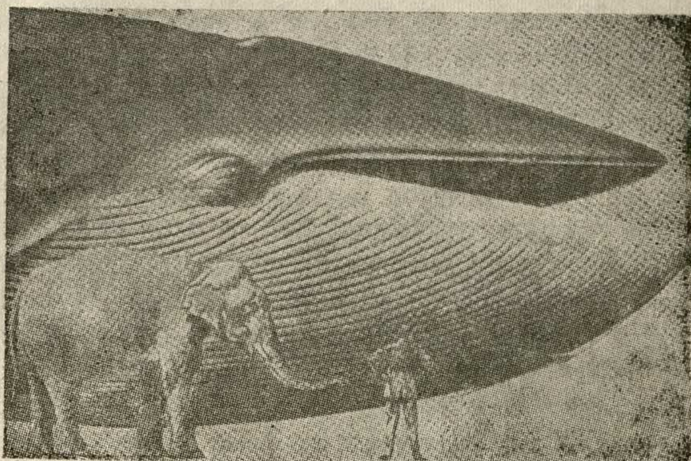
অসংখ্য মাছের নানা বৈচিত্র্যের সব কথা এখানে বলা সম্ভব নয় ; তবে সামুদ্রিক বান মাছের (eels) একটা অদ্ভুত প্রকৃতির কথা সত্যিই আশ্চর্যের। আটলান্টিকের শৈবাল সাগরে সর্পাকৃতি বান মাছ প্রচুর ডিম পাড়ে। এক একটি মাছ এক কোটিরও বেশী

ডিম দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ডিম থেকে সরু সুতোর মত অসংখ্য বান মাছ বেরিয়ে আসে। সেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব দিকে চলতে শুরু করে। প্রায় তিনবছর ধরে সাঁতার কেটে কেটে এরা উত্তর সাগর ও বাল্টিক সাগর পেরিয়ে এসে ইউরোপের নদীগুলিতে ঢুকে পড়ে। নদীর স্বাদু জলের মধ্য দিয়ে অনেক দূর প্রবেশ করে এবং সেখানেই দীর্ঘদিন থাকে। পরে বেশ বড়সড় হয়ে সাবালক হলে এই সব বান মাছ আবার সাগরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সেই পুরানো পথ বেয়েই ওদের জন্মস্থান শৈবাল-সাগরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে আবার এদের থেকে ডিম উৎপন্ন হয় এবং সেই ডিম থেকে বানশিশুর সৃষ্টি হয়। নতুন উৎপন্ন বান মাছের বাচ্চারা আবার তাদের বাপমায়ের মতোই সেই পুরাতন পথেই নদীর দিকে যাত্রা করে। সমুদ্র আর নদীর মধ্যে বান মাছের এই পরিক্রমা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

মাছ ছাড়াও নেকটন গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে, হাঙর, স্কেইট জাতীয় জলজ প্রাণী (চিত্র ১১)। হাঙর অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং মানুষের এক পরম শত্রু। ডাঙার বাঘের সঙ্গে এদের তুলনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশের সাগর উপকূলের অনেক জায়গাতেই যথেষ্ট হাঙর দেখা যায়। অনেক সময় এগুলো নদীতে প্রবেশ করে অনেকটা ভিতরেও চলে আসে। এগুলো প্রায়ই এক-দেড় মিটার লম্বা হয় এবং এরা খুবই হিংস্র ও শক্তিশালী। এক রকম হাঙর আছে যার মুখের চোয়ালটা অনেকটা প্রলম্বিত হয়ে দীর্ঘ "তুণ্ডে" পরিণত হয় এবং তার দুপাশে করাতের মতো খুব ধারালো শক্ত দাঁত থাকে। এই করাতের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করে এবং অপরকে আক্রমণ করে। এদের "করাত মাছ" বলে। এই করাতের সাহায্যে সে কখন কখনও মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। কোন কোন হাঙরের মাথাটা একটা শক্ত হাতুড়ির মতো, আর সেই হাতুড়ির দুপাশে রয়েছে দুটো চোখ। কিন্তু সবচেয়ে বড় হাঙর হল তিমি-হাঙর। এরা শুধু প্লাংকটন খায়, মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এরা বিশালাকার, অনেক সময় 16 মিটার লম্বা এবং ওজন 14~15 টন। এরা সাধারণতঃ মেরু-অঞ্চলে থাকে। এসব ছাড়াও রয়েছে তিমি; সমস্ত সামুদ্রিক জীবের মধ্যে অবশ্যই তিমির স্থান সর্বোচ্চে।

তিমি। তিমি বিধাতার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তিমি নানা রকমের: বিশালকায় নীল তিমি, ডানাওয়ালা তিমি, স্পার্ম তিমি। কোনটার দাঁত আছে, কোনটার দাঁত নেই, বিভিন্ন সব তিমি। প্রাণি-বিজ্ঞানীদের মতে, শিশুক থেকে নীল তিমি পর্যন্ত, প্রায় চল্লিশ রকমের এই স্তন্যপায়ী জলচর (Catacea) রয়েছে। এর মধ্যে গভীর সমুদ্রের নীল তিমিই প্রধান। এর মত অতিকায় জীব পৃথিবীতে আর দেখা যায়নি। একটি পূর্ণ বয়স্ক নীল তিমি লম্বায় ত্রিশ মিটার আর ওজনে 130 টন পর্যন্ত হতে পারে। চিত্র ১২ থেকে এর একটা ধারণা হতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডায়নোসরের চেয়েও নীল তিমি বৃহদাকার। এর হৃদ্‌পিণ্ডের ওজনই 180 কিলোগ্রাম, অর্থাৎ একটি বৃহদাকার মোষের চেয়েও বড়। এর মস্তিষ্কের পরিমাণ সাড়ে আট কিলোগ্রাম! এর জিভের ওজনই একটা হাতীর ওজনের চেয়ে অনেক বেশী।

খাদ্য প্রয়োজন প্রতিদিনে এক টন। আর হবেই না কেন, যোলমাস মাতৃজঠরে থেকে যখন সে গভীর সমুদ্রতলে জন্ম নেয় তখনই তার সাড়ে চার মিটার লম্বা দেহটির ওজন এক টন। এরপর ঐ শৈশবেই প্রতিদিনে সে অন্ততঃ তিন কিলোগ্রাম করে গতরে বাড়তে থাকে। ঐ বিরাট দেহ নিয়েও কিন্তু তিমি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাঁতার কেটে চলে—প্রতিদিন শত শত মাইল, চলে যেতে পারে শত শত মিটার জলের নীচে উপরের প্রচণ্ড জলের চাপকে উপেক্ষা করে।



চিত্র ১২। তিমির বিশালত্ব

বাইরে থেকে তিমিকে মাছের মত মনে হলেও বস্তুতঃ তিমি মাছ নয়। মাছদের লেজ দেহের সঙ্গে লম্বভাবেই থাকে কিন্তু তিমিদের লেজ দেহের সঙ্গে আড়াআড়ি হয়ে থাকে। তিমির শ্বাস-প্রশ্বাস স্থলচর প্রাণীর মত ফুসফুসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়, ওদের ফুলকো নেই। মাছের মত তিমির ডিম হয় না, সরাসরি শিশু তিমি জন্ম নেয় এবং মাতৃস্তন্যে বর্ধিত হয়। তিমির চোখ এবং কান কিন্তু দেহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

তিমিরা থাকে দল বেঁধে—এদের মধ্যে পারিবারিক এবং দলগত সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জন্ম দেবার পর প্রায় দুই বছর পর্যন্ত শিশুকে তিমি জননী যে পরম যত্ন ও স্নেহে লালন করে এবং রক্ষা করে সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা। এমন দৃষ্টান্ত জলচর এমন কি স্থলচর জন্তুদের মধ্যেও বিরল। নানা রকম শব্দের সাহায্যে এরা পরস্পরের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করে। একবার একটি ছোট্ট তিমি হঠাৎ বিপন্ন হয়ে বিপদের এক সংকেত-ধ্বনি পাঠিয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরে। মুহূর্তের মধ্যে বেশ কয়েক মাইল দূর থেকে অন্ততঃ সাতাশটি স্ত্রী-তিমি ছুটে এল তার কাছে। দুটি তিমি আহত তিমিটির নীচে গিয়ে পিঠে করে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল, অন্যগুলো চারদিক ঘিরে এদের পাহারা দিয়ে এগোতে লাগল। এ দৃশ্যটি অনতিদূরের এক জাহাজ

থেকে ক্যামেরায় তুলে রাখা হয়েছে। এরকম ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত যাঁরা তিমি-জগতে ঘোরাফেরা করেন তাঁদের লেখাতে রয়েছে। নিশ্চিত বিপদের মুখেও কোন তিমি আহত সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ছেড়ে যায় না। এজন্য শিকারীরা প্রায়ই স্ত্রী-তিমিকে বিস্ফোরক হারপুন্ দিয়ে প্রথমে আঘাতে করে। তার সঙ্গী পালিয়ে যায় না, সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাই সেটিকেও সহজে শিকার করা সম্ভব হয়।

এক একটি তিমি এক বিপুল সম্পদের খনি। একটি মাত্র দাঁতাল স্পার্ম তিমি থেকে তেল আর চর্বি পাওয়া যায় কুড়ি টনেরও বেশী। এই তেলের থেকে তৈরী হয় সাবান, মার্গারিন প্রভৃতি। পেশীর মাংস থেকে গৃহপালিত পশু-পাখীর খাবার পাওয়া যায়। কণ্ডুরা আর শিরা গ্রন্হিগুলো থেকে সার্জনের শল্য-চিকিৎসার সুতো, ঘোড়ার চাবুক ইত্যাদি থেকে শুরু করে টেনিস-র‍্যাকেটের স্ট্রীং পর্যন্ত নানা জিনিস তৈরী হয়। অস্থিচূর্ণ জমির ফসফেট সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জিলাটিন আর আঠা জাতীয় পদার্থগুলো জেলী তৈরীতে, ফটোগ্রাফির ফিল্মে লাগে। তাছাড়াও ব্রাসের কাঠি, জুতোর পালিশ, বোতাম তৈরীতে অনেক সময় বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হয়। মোট কথা, তিমির কোন কিছুই ফেলে দেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য, মানুষের দৃষ্টি এর উপর পড়বেই, তাই তিমি শিকারের আয়োজন বহুধা-বিস্তৃত। কিন্তু মানুষের ত লোভের শেষ নেই। মানুষের অদূরদৃষ্টির ফলে যেমন অনেক সুন্দর স্থলজন্তু লোপ পেয়ে গেছে, তিমিরও প্রায় সেই অবস্থা। 1935-এ নীল তিমির মোট সংখ্যা ছিল অন্ততঃ এক লাখ, সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মোট ছয়শ'তে 1970-এ। মানুষ কি বিপুল ধ্বংস করেছে এই প্রাণীর! নীল তিমি এখন কদাচিৎ দেখা যায়। ডানা-ওয়ালা তিমির স্থান নীল তিমির পরেই। তার উপরে এখন নজর পড়েছে—1946-এ এদের সংখ্যা ছিল 200,000 আর 1970-এ সেটা হয়েছে 35000। তিমির কথা বলতে গিয়ে অনেকদূর চলে এসেছি, আবার পুরানো কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

কোটি কোটি বছর আগে মাটির উপর যেসব জন্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের অস্তিত্ব এখন আর নেই। নানা প্রতিকূল অবস্থায় দুর্বার বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে সেই সব প্রাণীর বহু পরিবর্তন হয়ে আজকের দিনের নর, বানর, পশু-পাখীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সমুদ্রে তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল কম। খাদ্য সংগ্রহের এবং চলাফেরার কষ্ট ছিল না। তাই সেখানকার প্রাণীর বিবর্তন হয়েছে কম। যে "সিলাকান্থ মাছ" (coelacanth), থেকে সেই আদিমকালে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়, আকারে ছোট হলেও আজও সেই সিলাকান্থ মাঝে মাঝে দেখা যায়। স্থলভাগের ডায়নোসরের মত তারা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যসংকট যে রকম তীব্র হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে যে আমাদের সমুদ্রের জৈব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে সেটা সুনিশ্চিত। একদিন জুয়ো-প্লাংকটন আর ছোট ছোট মাছ, চিংড়ি এসবই আমাদের খাদ্যের যোগান দেবে। কিন্তু ভাণ্ডার থেকে শুধু লুঠ করে আনলেই চলবে না, সেখানকার ফসল যেন অব্যাহত থাকে তারও সুষ্ঠু পরিকল্পনা চাই। কি ভাবে উদ্ভিজ্জ-প্লাংকটন সহজে আবার নিরন্তর তৈরী হবে তার ব্যবস্থাও প্রয়োজন হবে। তা না হলে

একবার সমুদ্রের প্রাণসাম্য নষ্ট হয়ে গেলে ভাণ্ডার আর বেশীদিন পূর্ণ থাকবে না। এর জন্যে সমস্ত সমুদ্রকেই সারা বিশ্বের যৌথ সম্পদ-ভাণ্ডার করতে হবে।

প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমক সভ্যতার যুগেও উপকূলের সাগরে ও নদীর মুখে শুক্তি, কাঁকড়া প্রভৃতির চাষ হত। আরিস্টোটল এবং প্লিনি এই সব চাষের বিবরণ লিখে রেখে গেছেন।

সমুদ্রের জৈব উৎস থেকে আরও দুইটি জিনিষ আমরা সংগ্রহ করি। একটি মুক্তা আর অপরটি আয়োডিন। মুক্তা থাকে বিশেষ কতকগুলো শামুক-জাতীয় প্রাণীর দেহে। বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্যের জন্য রত্ন হিসাবে মুক্তা খুবই সমাদৃত। কৃত্রিম উপায়ে আজকাল মুক্তা তৈরী হয় বটে, তবে আসল মুক্তার কৌলীন্য এখনও রয়েছে। পারস্য উপসাগরের বাহেরিন দ্বীপের কাছে, সিংহলের উপকূল অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ-গিনির মধ্যবর্তী সমুদ্রে মুক্তা বেশী পাওয়া যায়। কোন কোন মুক্তার ঐতিহাসিক



চিত্র ১৩। সামুদ্রিক শৈবালের কয়েকটি উদাহরণ

প্রসিদ্ধি আছে। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের রানীর মুকুটের বিরাট মুক্তাটি ছিল সৌন্দর্যে

অতুলনীয়। মেরী অ্যান্টোয়ানেটকে ফরাসী সম্রাট লুই যে মুক্তাহার উপহার দিয়েছিলেন তার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। পারস্য সম্রাট একটি অপরূপ মুক্তার জন্য সেই যুগেই (1633) ব্যয় করেছিলেন 64000 পাউণ্ড।

সামুদ্রিক উদ্ভিদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হচ্ছে ফাইটো-প্লাংকটন। এর অপরিসীম গুরুত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর উদ্ভিদ, লতাপাতার আগাছা দেখা যায়। সামুদ্রিক উদ্ভিদের ফুল বা ফল নেই। ছত্রাক বা পর্ণাঙ্গও সমুদ্রে নেই। প্রধানতঃ লাল বা বাদামী অ্যালজী (algae) সমুদ্রে বেশী দেখা যায় (চিত্র ১৩)। এই অ্যালজীর ঘন জঙ্গল দেখা যায় বিশেষ করে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের Sargasso Sea বা শৈবাল-সাগরে। অনেক সময় এই শৈবালের এক একটি 30-40 মিটার দীর্ঘ হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার টন এই সকল উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে এই শৈবাল পশু-খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট মিশান হয়। সমুদ্র-শৈবাল থেকে আগর-জেলি, ভিনিগার, কোন কোন কোহল এবং দুই একটি ঔষধও তৈরী করা হয়। সমুদ্র-শৈবাল পুড়িয়ে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাকে বলে কেল্প (kelp)। কেল্প আয়োডিন উৎপাদনের এক প্রধান উৎস।

কৃত্রিম উপায়ে সূর্যালোকের সাহায্যে জলের মধ্যে আজকাল সবুজ অ্যালজী ক্লোরেলা (chlorella) উৎপাদন করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলন খুব বেশী—প্রতি হেক্টারে প্রায় 40 টন সবুজ ফসল পাওয়া সম্ভব। ক্লোরেলাতে প্রোটিনের অংশ প্রায় 50%, যেখানে গমে প্রোটিনের পরিমাণ 12%। ভবিষ্যতে সাগরের উপকূলে এবং হ্রদগুলিতে বিস্তীর্ণ ভাবে ক্লোরেলার চাষ হবে এবং এ থেকে খাদ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হবে—এটাই বিশ্বাস।

সমুদ্রের খনিজ সম্পদ

সমুদ্রে খনিজ সম্পদ রয়েছে দুইভাবে। এক, সমুদ্রের তলার মেঝেতে যুগযুগ ধরে যে পলল জমেছে সেখানে প্রচুর মূল্যবান খনিজ পদার্থ আছে। দুই, সাগরের জলে দ্রবিত হয়েও রয়েছে অসামান্য পরিমাণ নানারকমের লবণ।

সমুদ্রের তলার পাললিক স্তরের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা শক্ত। 20° উঃ অক্ষাংশে এই পলিস্তর 300 মিটার পুরু আর বিষুবরেখার কাছে সেই স্তর প্রায় 500 মিটার পুরু। এ থেকে বোঝা যায় পলিস্তর কত বিরাট। এই স্তর জমেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে।

অসংখ্য নদনদী যুগ যুগ ধরে স্থলভূমি ক্ষয় করে নিয়ে এসে কাদামাটি, বালুকণা এসব হাজির করেছে সমুদ্রে। বড় বড় অদ্রাব্য অংশগুলি উপকূলের কাছেই সমুদ্রের তলায় স্থান নিয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্মতর কণাগুলো দূরের গভীর সমুদ্রে গিয়ে তলার মেঝেতে থিতিয়ে গিয়েছে।

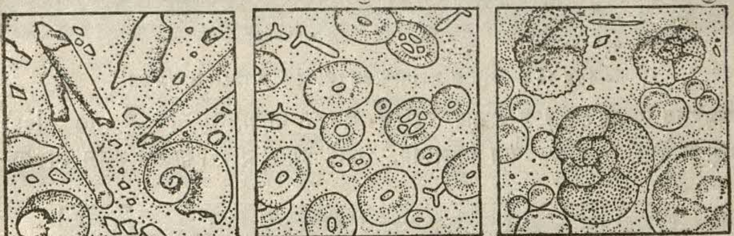
আবার সমুদ্রের ভিতরের অনেক আগ্নেয়গিরি থেকে বিস্ফোরণজাত প্রচুর সূক্ষ্ম-কণাময় পদার্থও নীচের পললে গিয়ে স্থান পেয়েছে। উল্কাপাতের ভস্মাবশেষও এসে সমুদ্রে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের তলায় গিয়ে সঞ্চিত হয়।

তাছাড়াও সামুদ্রিক জীব, যেমন প্লাংকটন, শামুক, ঝিনুক, মাছ ইত্যাদি এবং নানা জলজ-উদ্ভিদের ধ্বংস ও বিনাশের পর তাদের দেহাবশেষ এক পিচ্ছিল-কর্দমাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এই জৈব কর্দমও আস্তে আস্তে নীচে চুঁইয়ে পড়তে থাকে এবং পললে স্থান নেয়।

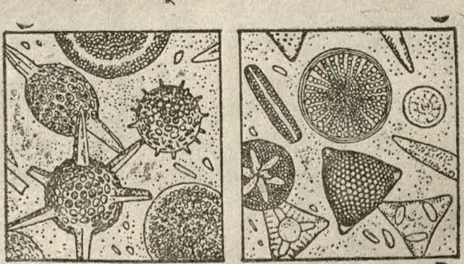
যে পলিস্তরে এই জৈবাবশেষের পরিমাণ শতকরা ত্রিশভাগের বেশী তাকে বলা হয় "সিন্ধুপঙ্ক" বা Ooze। কিন্তু, পললে জৈব পদার্থের ধ্বংসাবশেষ 30%-এর কম হলে সেগুলো "লোহিত কর্দম"। বস্তুতঃ এই লোহিত কর্দমের স্তর এক নরম এবং মিহি পলি।

লোহিত কর্দম সমুদ্রের প্রায় 102400000 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে আছে এবং সেটা অন্ততঃ 100 মিটার পুরু। লোহিত কর্দমের উপাদান প্রধানতঃ বালু (50%), অ্যালুমিনা (20%), আয়রন অক্সাইড (13%), এছাড়া আছে কিছু ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, নিকেল ঘটিত পদার্থ। এই কর্দমে অন্ততঃ 10^{14} টন অ্যালুমিনিয়াম এবং 10^{12} টন কপার রয়েছে। এর সামান্য অংশও উদ্ধার করা সম্ভব হলে পৃথিবীতে এই ধাতুদ্বয়ের আর কোনদিন অভাব হবে না।

ডাই-অ্যাটম, রেডিয়োলারিয়া এবং অন্যান্য জুয়ো-প্লাংকটনের ধ্বংসাবশেষ যে সকল পলিস্তরে আসে সেই কর্দমে বালুকার ভাগ বেশী। উপকূল থেকে অনেকদূরে দক্ষিণ মহাসাগরে এটা অধিক দেখা গেছে।



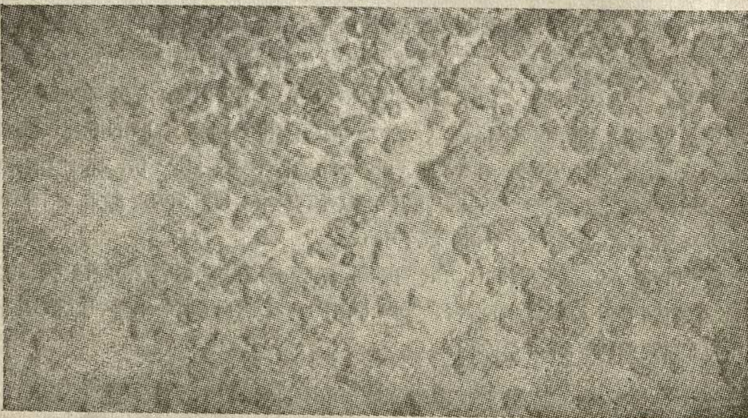
চিত্র ১৪। চুণজাতীয় নিঃসৃত কর্দম



চিত্র ১৫। বালুজাতীয় নিঃসৃত কর্দম

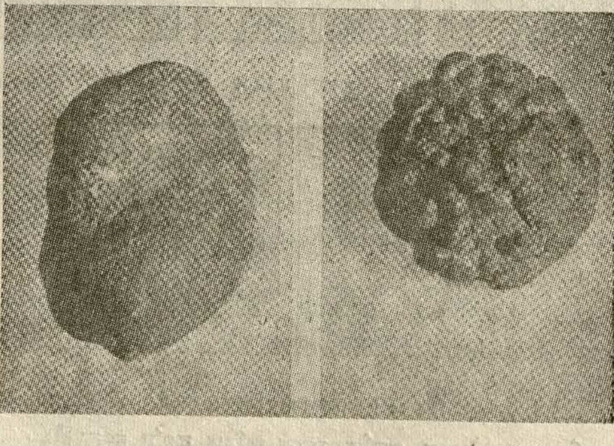
গ্লোবিজেরিনা, পেট্রোপড্ প্রভৃতি থেকে ক্ষরিত কর্দম চুণজাতীয়। এই কর্দম সমন্বিত সিন্ধুপঙ্ক প্রচুর রয়েছে সমুদ্রে, প্রায় 120 কোটি বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রতল জুড়ে। এই স্তরও প্রায় 100 মিটার পুরু। এই চুণজাতীয় সিন্ধুপঙ্ক মহাদেশের

উপকূল থেকে কয়েকশ' কিলোমিটারের মধ্যেই থাকে। এই সিন্ধুপঙ্কে শতকরা 95 ভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। সুতরাং এই উত্তম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে সহজেই সিমেন্ট প্রস্তুতির কাজে লাগান যেতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। এখানে পললের বালুজাতীয় এবং চুণজাতীয় ক্ষরিত কর্দমের ছবি দেওয়া হল (চিত্র ১৪,১৫)।



চিত্র ১৬। প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝেতে ম্যাঙ্গানিজ নডিউল

সমুদ্রের তলার মেঝেতে আবার রয়েছে অসংখ্য ম্যাঙ্গানিজ নডিউল (nodules) বা বড় বড় গুটি। এগুলো নানা আকারের, প্রায়ই আলু বা পেঁয়াজের মতো দেখতে—



চিত্র ১৭। ম্যাঙ্গানিজ নডিউল

সাধারণতঃ 5~20 সেমি লম্বা। কখনও কখনও বেশ বড়, এক মিটার লম্বা এবং প্রায় 4~5 কুইন্টাল ওজনের দুই একটাও দেখা যায় (চিত্র ১৬, ১৭)।

ব্রিটিশ গবেষণা-জাহাজ চ্যালেঞ্জার ১৮৭০ সালে সমুদ্রতল থেকে এদের নমুনা প্রথম সংগ্রহ করে। তখনই জানা গেল, এই সব নডিউলে যথেষ্ট ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড রয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়াতে অ্যালবাট্রস জাহাজ এদের বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছে। দেখা গেল, বিভিন্ন মহাসাগরের তলদেশের অনেক জায়গাতেই এরকম প্রচুর নডিউল রয়েছে, বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায়। গত IGY বৎসরে (1957-58) এই গুটিগুলির জন্য বিশেষ অনুসন্ধান চালান হয় এবং নানারকম বিশ্লেষণ করা হয়।

পরীক্ষাতে দেখা গেছে, অতি ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বছরে অক্সাইড কণাগুলি সংহত হয়ে হয়ে এই নডিউলগুলি তৈরী হয়েছে। তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, প্রতি হাজার বছরে একটি নডিউলের ব্যাস 1～2 মিমি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের নডিউলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরের নডিউলে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড সাধারণতঃ 30～40% কিন্তু আটলান্টিকে তার পরিমাণ 18%। সবগুলি সমুদ্রের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গড়ে 32% ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, 22% আয়রন অক্সাইড, 19% বালু নডিউলে থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকুল থেকে মাত্র 700/800 কিলোমিটার দূরের সাগরতলে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউলের এক মস্ত বড় ক্ষেত্র, প্রায় 50 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান নিয়ে। এখানকার নডিউলে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ খুব বেশী। এখানে প্রতি বর্গ মিটারে গড়ে 20～25 কিলোগ্রাম নডিউল আছে। যদি 5 কিলোগ্রাম করেও ধরা হয় তবে এখান থেকেই অন্ততঃ 2600 কোটি টন নডিউল পাওয়া যাবে। এই নডিউলের এখনও কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়নি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে এখন। কিন্তু এর একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে। বর্তমান সভ্যতা লৌহ-নির্ভর; ভাল স্টীল তৈরী করতে ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে নিতে হয়। যাদের ম্যাঙ্গানিজ নেই, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, সমুদ্র-তলের নডিউল তাদের প্রয়োজন মিটাবে। ড্রেজার দিয়ে নডিউল তোলার উপায় ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে। নডিউল থেকে ম্যাঙ্গানিজ উদ্ধার করে লৌহ-শিল্পে চালান দেওয়া সম্ভব হবে।

এই সব নডিউলে প্রায়ই কিছু কিছু কিছু নিকেল, কপার ও কোবাল্ট থাকে। এই ধাতুগুলি খুব মূল্যবান। দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে তাহিতি দ্বীপের কাছে প্রায় 350 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এক নডিউল অঞ্চল আছে। এই নডিউলে 37% ম্যাঙ্গানিজ, 1.6% কপার, 1.6% নিকেল এবং 0.3% কোবাল্ট আছে। প্রতি বর্গমিটারে 5 কিলোগ্রাম করে ধরলে এখান থেকে অন্ততঃ 20000 কোটি টন নডিউল পাওয়া যাবে। হাওয়াই দ্বীপের কাছে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরেও এই ধরণের নডিউল যথেষ্ট রয়েছে।

সমুদ্রতলে আর একরকম ছোট বড় পাথুরে চাঁই পড়ে থাকে—এগুলিতে থাকে ফসফরাস-ঘটিত পদার্থ। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্ত রাষ্ট্রের নিকটবর্তী সমুদ্রতলে এদের বেশী দেখা যায়। প্রায়ই এগুলো উপকূলের কাছে অগভীর সমুদ্রের মেঝেতে পাওয়া যায়। এই সব পাথরে শতকরা প্রায় 30% ফসফরাস

পেণ্টোক্সাইড থাকে। ফসল বাড়াবার জন্য জমিতে ফসফেট সার দেওয়া হয়। খনি-থেকে-পাওয়া ফসফরাইট আকরিক থেকে ঐ সার এখন তৈরী হয়। সমুদ্রতলের এই ফসফরাস-নডিউলও এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই এর হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছে এবং হয়তঃ শীগগীরই কোন কোন দেশে এই সমুদ্রতলের ডেলাগুলো থেকেই ফসফেট-সার সংগৃহীত হবে।

একথা এখন সবাই জানে, সমুদ্র-উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্র-তলের মেঝে খুঁড়ে আজকাল পেট্রোলিয়াম তুলে আনা হচ্ছে। সেখানে বিপুল তৈল-ভাণ্ডার রয়েছে। মধ্য প্রাচ্যে এবং অন্যান্য উপকূলে এ ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশে গুজরাটের উপকূল থেকেও তেল সংগ্রহ করা হচ্ছে। এটাকে ঠিক সমুদ্র-সম্পদ বলে গ্রহণ করা যায় কিনা সেটা বলা শক্ত।

সমুদ্রের জলে দ্রবিত লবণের মোট পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে, 50,000,000,000,000,000 মেট্রিক টন। এর অধিকাংশই হচ্ছে খাদ্যলবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লবণ হচ্ছে, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট ইত্যাদি। এই সবটা লবণ শুকিয়ে স্থলভাগের উপর রাখলে সেখানে 45 মিটার পুরু একটা স্তর পড়বে। নদীগুলো বছরে $2{\cdot}73 \times 10^9$ টন পদার্থ স্থলভাগ থেকে ক্ষয় করে সমুদ্রে নিয়ে আসে।

সাগরজলে লবণের গাঢ়ত্ব গড়ে হাজার করা পঁয়ত্রিশ ভাগ (35 ‰) অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম জলে 35 গ্রাম লবণ রয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য লবণের পরিমাণ 27 ‰ ; এর পরের স্থান ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের 4 ‰ । মোটামুটি হিসাব,

সাগরজলের সহস্রাংশ (ওজনে)		মোট লবণের শতাংশে			
$NaCl$	— 27‰	Na^+	= 30·4%	Cl^-	= 55·2%
$MgCl_2$	— 4‰	Mg^{++}	= 3·7%	SO_4^{--}	= 7·7%
$MgSO_4$, $CaSO_4$	— 3‰	Ca^{++}	= 1·16%	Br^-	= 0·19%
K_2SO_4 ইত্যাদি	— 1‰	K^+	= 1·1%	CO_3^{--}	= 0·35%

সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ ঠিক সোজাসুজি মাপা যায় না। রসায়নবিদেরা অতি সহজে সাগরজলের ক্লোরিনের পরিমাণটা স্থির করেন। যদি ক্লোরিনের পরিমাণ x‰, হয়, তা হলে মোট লবণতা (s) হবে,

$$s‰ = 0{\cdot}03 + 1{\cdot}805\ x$$

পৃথিবীর বস্তুসম্ভার মোটামুটি 92টি মৌলিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত। সমুদ্রজলে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী মৌলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি, সামান্য সোনা, রুপা, রেডিয়াম প্রভৃতিও আছে ঃ

সোনা 4×10^{-12}%, রুপা 15×10^{-11}%, রেডিয়াম 1×10^{-16}%, আয়োডিন 5×10^{-8}%।

এ ছাড়া অন্যান্য মৌলগুলির যৌগ এত স্বল্প পরিমাণে সাগর জলে থাকে যে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করাই দুষ্কর। অনেক সময় প্লাংকটন এবং অন্যান্য ছোট ছোট সামুদ্রিক

প্রাণী সেগুলোকে জল থেকে টেনে নেয় নিজের প্রয়োজনে এবং প্রথমে সেখানেই তাদের সনাক্ত করা হয়েছে। যেমন, রেডিয়োলারিয়া শোষণ করে স্ট্রনসিয়াম, জেলিমাছ গ্রহণ করে জিঙ্ক আর টিন ; শামুক নেয় কপার ; অ্যাসিডিয়ানে পাওয়া যায় ভ্যানেডিয়াম।

সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জলের লবণতা এক নয়। যে সকল অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় এবং নদীর জল বেশী নিষ্ক্রান্ত হয় সেখানে লবণমাত্রা কম হবেই। বাষ্পীভবনের উপরেও লবণতা নির্ভর করে ; বেশী জল বাষ্পীভূত হলে, লবণের গাঢ়ত্ব বেড়ে যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টি সাধারণতঃ খুব বেশী হয় ; বায়ুর আর্দ্রতা অধিক থাকাতে বাষ্পীভবন কম হয়। আবার এই অঞ্চলেই বড় বড় নদী যেমন, আমাজোন, কঙ্গো ইত্যাদি এসে সমুদ্রে পড়েছে, এই সব কারণে নিরক্ষীয় সাগরগুলিতে লবণমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঠিক উত্তরে ও দক্ষিণে (20～30° অক্ষাংশে) শুষ্ক আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং বাষ্পীভবন বেশী, নদ-নদীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তাই এই অঞ্চলের সমুদ্রের জল নোনা বেশী, মেরু অঞ্চলের সাগরজলে কিন্তু লবণতা হ্রাস পায়, 20～30°/₀₀। তার কারণ উষ্ণতা কম বলে বাষ্পীভবন কম। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত, বিগলিত হিমবাহ থেকে প্রচুর স্বাদুজলের প্রবাহ এবং বেশ কিছু নদীর মুখ (উত্তর মেরু প্রদেশে) এখানে থাকার জন্য লবণতা হ্রাস পেয়েছে।

যে সমস্ত সাগর প্রায় সম্পূর্ণ স্থল দিয়ে পরিবৃত, তাদের লবণমাত্রা এক একরকমের। ভূমধ্যসাগরের লবণতা খুবই অধিক প্রায় 40°/₀₀। একমাত্র নীলনদ ছাড়া আর কোন বড় নদীর জল এখানে পড়ে না, আর শুষ্কবায়ুর জন্য এখানকার বাষ্পীভবনও অত্যধিক। সেই হেতু লবণের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরের জল সর্বাধিক লবণাক্ত সেই একই কারণে। কিন্তু বাল্টিক সাগরের ব্যাপার আলাদা। সেখানে তাপমাত্রা কম, বৃষ্টি বেশী, বাষ্পীভবন বেশী নয়। তদুপরি কতগুলি ছোট বড় নদী, ওডার, ভিশ্চুলা ইত্যাদি এসে বাল্টিক সাগরে পড়েছে। ফলে এখানকার লবণমাত্রা খুবই কম, মাত্র 2°/₀₀ ; জল প্রায় স্বাদু।

সমুদ্র-জলে যে লবণ দ্রবিত থাকে তার মধ্যে ক্লোরাইড লবণই বেশী। বিভিন্ন ধরনের লবণের অনুপাত ঃ

	শতকরা ভাগ (%)
১। ক্লোরাইড (সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম)	88·5
২। সালফেট (ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম)	11·0
৩। কার্বনেট (ক্যালসিয়াম)	0·3
৪। অন্যান্য	0·2
	100%

একটা খুব আশ্চর্যের কথা, সাগর ও মহাসাগরের নানা অঞ্চলে লবণতা বিভিন্ন বটে কিন্তু সর্বত্রই উপরোক্ত লবণগুলির অনুপাত একই দেখা যায়।

এর সঙ্গে বড় বড় হ্রদের একটা তুলনা করা যেতে পারে। যে সমস্ত হ্রদের সঙ্গে নদী সংযুক্ত রয়েছে এবং নদীপথে জল প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে সব হ্রদের জল লবণাক্ত হতে পারে না। এ ব্যবস্থা না থাকলেই হ্রদের জল লাবণ হবে।

সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সমস্ত জলভাণ্ডার হ্রদে পরিণত হয়েছে, তাদের জল ত লবণাক্ত হবেই। ক্যাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর লবণাক্ত, কিন্তু রাশিয়ার বড় বড় নদী এসে পড়েছে বলে এদের লবণতা অপেক্ষাকৃত কম। এদের চেয়ে বেশী দূরে নয়, মরু সাগর (Dead Sea) রয়েছে—এর লবণমাত্রা সর্বাধিক 240 °/₀₀। মরুর সন্নিকটে তাই তাপমাত্রা বেশী, বৃষ্টির একান্ত অভাব, বাষ্পায়নের আধিক্য এবং কোন নদীর উল্লেখযোগ্য দান নেই বলে এর জল এত লবণাক্ত।

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, আর তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু, ব্রোমিন এবং সর্বোপরি খাদ্য লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড)—এই কয়টি পদার্থই প্রধানতঃ সমুদ্র-জল থেকে সংগ্রহ করা হয়। বাষ্পীভবনের ফলে সমুদ্রজল গাঢ় হলে প্রথমে খাদ্যলবণ কেলাসিত হয়। অবশিষ্ট তরল শেষদ্রব থেকে আংশিক কেলাসিত করে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট উদ্ধার করা হয়। এটিকে চিকিৎসকেরা প্রচুর ব্যবহার করেন। সমুদ্র-থেকে-পাওয়া ম্যাগনেসিয়াম যৌগপদার্থ থেকে আজকাল, বিশেষতঃ আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ টন ম্যাগনেসিয়াম ধাতু তৈরী হচ্ছে। উড়োজাহাজে এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে বর্তমানে অনেকস্থলে ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রিত ধাতুসংকর ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রজলে খানিকটা ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইডও রয়েছে। সামান্য হলেও সেটাকে যত্ন করে উদ্ধার করে তা থেকে অতি মূল্যবান ব্রোমিন তৈরী করা হয়। ব্রোমিন নানা কাজে লাগে, বিশেষ করে জ্বালানি-তেলের সঙ্গে যে ইথিলীন ব্রোমাইড মেশান হয় সেটা তৈরী করার জন্য এই ব্রোমিন খুব প্রয়োজন। এক টন সমুদ্র-জল থেকে পঞ্চাশ গ্রামেরও কম ব্রোমিন পাওয়া যায়। এত স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও উন্নত ধরণের রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে এর উৎপাদন লাভজনক করা সম্ভব হয়েছে।

এবার খাদ্যলবণের কথায় আসা যাক। খাদ্যলবণ, সচরাচর যাকে "লবণ বা নুন" বলা হয়, সেটা আমাদের দেহের পক্ষে একান্ত দরকার। আমাদের শরীর থেকে মূত্র এবং ঘামের সঙ্গে দ্রবিত অবস্থায় 2·5% লবণ বের হয়ে যায়, দেহের লবণের এই ক্ষতির পরিপূরণ না হলে শরীরে নানারকম ব্যাধি দেখা দেয়। সেইজন্যেই আমাদের খাদ্যের এক অপরিহার্য উপাদান লবণ। খাদ্য উপাদান ছাড়াও আরও নানা কাজে লবণের প্রয়োজন রয়েছে। সোডা (কাপড় কাচার জন্য), কস্টিক সোডা (সাবান তৈরী করার জন্য), সোডিয়াম সালফেট (ঔষধের জন্য) ইত্যাদি আমরা প্রচুর ব্যবহার করি। আর এসব তৈরী করার কাঁচামাল হল সমুদ্র-থেকে-পাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ। মাছ, মাংস, হ্যাম্ ইত্যাদির পচন রোধ করে অনেকদিন রাখতে হলে নুনের মধ্যে রাখতে হয়। আমাদের দেশের নোনা ইলিশ এভাবে অনেকদিন থাকে। লবণকে বিশ্লেষিত করলে সোডিয়াম ধাতু আর ক্লোরিন পাওয়া যায়। শিল্প-প্রয়োজনে উভয়েরই যথেষ্ট সমাদর। ক্লোরিনের বিশেষ চাহিদা ব্লীচিং-পাউডার তৈরী করার জন্য এবং কাগজ-শিল্পে। আমাদের মাছের বাজারে গেলে প্রায়ই দেখা যায় বরফের সঙ্গে নুন মিশিয়ে তাতে মাছ রাখা হয়। নুন মিশালে বরফের গলনাঙ্ক অনেক কমে যায়। তাই অতি-শীতল "হিমায়ক মিশ্র" হিসাবে নুন-বরফ ব্যবহার করা হয়।

সবদেশের লবণের চাহিদার প্রায় সবটাই সমুদ্র থেকে মেটান হয়। শুধু কোন কোন যায়গায় কিছু লবণের খনি আছে। যেমন, পাঞ্জাবের কলাবাগ আর খেওরা খনি থেকে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। যে সব দেশের সমুদ্র-উপকূল নেই, তাদের অপর দেশ থেকে লবণ আমদানী করতেই হয়। নেপাল, তিব্বত, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের সমুদ্র-উপকূল নেই, এদের লবণের জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হয়। এসব দেশে লবণ অত্যন্ত মূল্যবান। শোনা যায়, একসময় রোমান সৈন্যদের খানিকটা বেতন কেটে নিয়ে তার বদলে নুন দেওয়া হত। লবণের জন্য কোথাও কোথাও পৃথক বৃত্তি দেবার রীতি ছিল, এর নাম ছিল "স্যালারিয়াম"। এই থেকেই বেতন অর্থে "স্যালারি" (Salary) কথাটার উদ্ভব হয়েছে।

সাগরের জল থেকে লবণ তৈরী করাটা যেমন সহজ তেমন সস্তা। উপকূলের কাছে বাঁধ দিয়ে বড় বড় পুকুরের মত চৌবাচ্চা তৈরী করা হয়। জোয়ারের সময় জল এসে সেখানে জমে। খানিকটা থিতিয়ে যাবার পর সেই নোনা জলকে পাম্প করে ভিতরের দিকে অপর চৌবাচ্চায় পাঠান হয়। কয়েকদিন সেখানে থাকলে সূর্যের তাপে অনেকটা জল উবে গেলে জিপসাম ও চকের দানা নীচে পৃথক হয়ে পড়ে। এবার উপর থেকে নোনা জল নিয়ে অগভীর (2" গভীর) বড় বড় ট্যাঙ্কে রাখা হয়। এখান থেকেও সূর্যের উত্তাপে জল বাষ্পীভূত হতে থাকলে লবণের দানা কেলাসিত হতে থাকে। হাতায় করে সেই লবণের পলি তুলে এনে শুকিয়ে নিলেই বাজারের নুন তৈরী হল। আমাদের দেশের লবণ তৈরীর বড় কারখানা-গুলি গুজরাট, মহারাষ্ট্রের উপকূলে। সেখানে এই রকম করেই লবণ তৈরী হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশী সেখানে ঘন লবণোদক নিয়ে বড় বড় কড়াতে আগুনে জ্বাল দিতে হয়। যথেষ্ট গাঢ় হলে কড়াইয়ের তলায় লবণ জমে।

বহু প্রাচীন যুগ থেকেই আমাদের দেশে সমুদ্রজল থেকে লবণ তৈরী হয়ে আসছে। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আইনের বলে এদেশে লবণ তৈরী নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ইংল্যাণ্ডের লবণ এখানে এনে বিক্রীর সুযোগ দেবার জন্য। পরাধীনতার এমনই মহিমা। তা ছাড়া লবণের উপর শুল্কও বসান হয়েছিল। ফলে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন এক মন লবণ তৈরী করতে খরচ পড়ত দশ পয়সা, তখন আমাদের কিনতে হত প্রতি সের দশ পয়সায়। এই নিয়ে 1930-এ মহাত্মা গান্ধী লবণ-সত্যাগ্রহ করেন। এই উপলক্ষেই তাঁর সেই বিখ্যাত ডাণ্ডি পদযাত্রা ও শেষ পর্যন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি। ঐ চুক্তি যে শুধু লবণ-তৈরীর কিছু সুবিধা এনে দিয়েছিল তাই নয়। সারা ভারতবর্ষে সেই পদযাত্রা যে রাজনৈতিক চেতনা এনেছিল ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

সামুদ্রিক জীবের পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস। এই দুয়েরই অনেকরকম যৌগ জলে দ্রবিত অবস্থায় রয়েছে। নদীর কাছ থেকে সমুদ্র অনেকটা নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যৌগ প্রতিনিয়ত পায়। আবার সামুদ্রিক প্রাণীর বিনাশ বা ধ্বংসের পরে তাদের দেহাবশেষের উপর ব্যাক্টীরিয়ার ক্রিয়ার ফলেও ঐসকল পদার্থের যথেষ্ট উৎপাদন হয়।

খনিজ লবণ ছাড়াও নানারকম জৈবপদার্থ (organic matter) মহাসিন্ধুতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সমুদ্রের সমস্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদে মিলে যে মোট জৈব-পদার্থ আছে তার তিনশতগুণ জৈবপদার্থ জলে দ্রবিত হয়ে আছে। প্লাংকটন ও ছোট ছোট প্রাণীর উৎপাদন ও বৃদ্ধিতে ঐসব জৈবপদার্থের অবদান অসামান্য।

খনিজ এবং জৈবসম্পদ ছাড়াও সমুদ্র শক্তির এক অশেষ ভাণ্ডার। এই শক্তিকে মানুষ এখনও ভালভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় নি। সমুদ্রের উপরে সারাক্ষণ ঢেউয়ের পর ঢেউ ছুটে চলেছে, তরঙ্গ এসে নিরন্তর উপকূলে আছড়ে পড়ছে। এই তরঙ্গ-প্রবাহে রয়েছে প্রচুর গতীয় শক্তি। যার বেশীর ভাগটাই এসেছে বায়ুপ্রবাহ থেকে। তা ছাড়া রয়েছে জোয়ার-ভাটার প্রবাহ। কিন্তু এই গতীয়-শক্তিকে তাপ বা অন্য কোন শক্তিতে সার্থক রূপান্তর করা যায় নি। একথা সকলেই জানে, তাপশক্তি উচ্চতর উষ্ণতা থেকে আপনা থেকেই নিম্নতর উষ্ণতায় চলে যায়। তাপগতি-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে প্রবাহিত তাপের খানিকটা কাজে লাগান সম্ভব। যেমন, কয়লা পোড়ান থেকে পাওয়া তাপ আমরা স্টীম-ইঞ্জিনের সাহায্যে ব্যবহার করে রেলগাড়ী চালাতে পারছি। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশী, সমুদ্রতলের তাপমাত্রা কম। সুতরাং উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারলে এই দুই অসম তাপমাত্রার স্রোত থেকে শক্তি আহরণ করে কাজে লাগান যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু করা সম্ভব হয়নি। যদি করা যায়, তবে একদিন প্রায় নিখরচায় জাহাজ চালান যাবে। প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, ফ্রান্সের রান্স্ নদীর মোহনায় "টাইডেল টারবাইন" বসিয়ে খানিকটা শক্তি জোয়ারপ্রবাহ থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

সমুদ্র ছিল বলেই প্রাচীনকালে বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছিল ; যেমন, হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে গ্রীক সভ্যতার। অথবা মিশরীয়, গ্রীক ও রোমক সভ্যতার প্রসার সহজ হতে পেরেছিল। সমুদ্রের সহজ নাব্যতার জন্যেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি শ্যাম, মালয়, জাভা-সুমাত্রা পর্যন্ত, আবার অপরদিকে পারস্য, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পেরেছিল। আজও দেশে দেশে সংযোগের এবং পণ্য-বিনিময়ের প্রধান উপায় সমুদ্র পথ। সভ্যতার প্রগতিতে সমুদ্রের অবদান অপরিসীম। সমুদ্রপথ না থাকলে আজ এখান থেকে হিমালয় পেরিয়ে স্থলপথে জাপানে যেতে হলে সেটা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার হত তা ভাবা যায় না। উড়োজাহাজের দক্ষতা সর্বাধিক, কিন্তু প্রয়োগ সীমিত।

ভারতের রয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র-উপকূল। তার জলবায়ু, তার বাণিজ্য, তার বন্দর উন্নয়ন, এমনকি তার নিরাপত্তাও সমুদ্রের উপর নির্ভর করে। সমুদ্র থেকে আমাদের আরও খাদ্য সংগ্রহও প্রয়োজন। এজন্যে আমাদের সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। সমুদ্র-বিজ্ঞানের চর্চা প্রায় এদেশে শুরুই হয় নি, এ বিষয়ে উদ্যম ও উৎসাহের একান্ত প্রয়োজন।

সমুদ্রের দূষণ

আজকালকার নানাধরণের বিস্ফোরণের ফলে সমুদ্র-জল বিষাক্ত হচ্ছে ; প্রাণবস্তুর

অপচয় ও বিনাশ ঘটছে। এটা বন্ধ না হলে এই বিপুল জৈবসম্পদ ভবিষ্যতে আর আমাদের উপকারে আসবে না।

সমুদ্রের জলে দ্রবিত অবস্থায় পটাসিয়াম, ইউরেনিয়াম, রুবিডিয়াম ইত্যাদির অতি সামান্য কিছু আইসোটোপ আছে যৌগরূপে। এদের তেজস্ক্রিয়তা এত সামান্য যে তা'তে জলজ প্রাণী বা মানুষের কোন অপকার হয় না। কিন্তু বিকিনি প্রবাল দ্বীপ-পুঞ্জের কাছে অধুনা যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের মহড়া চলছে তার ফলে সমুদ্র খুবই দূষিত হচ্ছে। ওখানে একবার একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করার পর দেখা গেল, সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের তেজস্ক্রিয়তা দশলক্ষগুণ বেড়েছে এবং চারমাস পরেও বিকিনি থেকে 900 কিলোমিটার দূরে তেজস্ক্রিয়তা সাধারণের চেয়ে তিনগুণ বেশী ছিল। তেজস্ক্রিয়তা সব চেয়ে বেশী ঘনীভূত হয় ফাইটো-প্লাংকটনে এবং তার ফলে জলের সমস্ত জৈবজগতে। বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মাছের হাড়ের মধ্যে স্থান পায় এবং সেখানে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই সকল তেজস্ক্রিয় মাছের মাধ্যমেই বিষ মানবদেহে আসে। শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরের উপরেও এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

আবার শক্তি-উৎপাদনের জন্য অনেক পারমাণবিক রি-অ্যাক্টার সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখান থেকে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় অবশেষ (wastes) উৎপন্ন হয়। কোন কোন উন্নত দেশ সেই অবশেষ ড্রামে আবদ্ধ করে সমুদ্রের গভীর খাতে নিক্ষেপ করে। দীর্ঘকাল পরে এই ড্রাম ভেঙে গিয়ে সমুদ্রজলকে দূষিত করে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অগ্রগতির সঙ্গে এই অবশেষের পরিমাণও শত শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সমস্ত জাতি মিলে এর বিকল্প ব্যবস্থা এখনই করা প্রয়োজন।

সমুদ্র-দূষণের আরও একটি বড় কারণ আছে। বর্তমানে হাজার হাজার তেলের ট্যাঙ্কার সমুদ্রে চলছে। তাছাড়া সব জাহাজেই প্রচুর তেল ব্যবহার হয়। জাহাজ পরিষ্করণের সময় অনেকটা তেল সমুদ্র জলে মিশে যায়। একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে বছরে এভাবে 3,000,000 ঘন মিটার তেল সমুদ্রজলে চলে আসে। এর জন্য জৈবসম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়। জাপানের সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে তাদের বন্দর উপকূলে জাহাজ চলাচলের ফলে বছরে 5,000,000 ইয়েন মূল্যের মৎস্য-সম্পদ নষ্ট হয়। উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের কাছে আজকাল মাছ দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তার কারণ ওখানে সর্বদা জাহাজের আনাগোনা এবং তাদের তেল থেকে উপকূলের সমুদ্র-জল খুবই দূষিত।

বছরে মোট উৎপাদিত আড়াই হাজার মিলিয়ন টন উৎপাদিত তেলের মধ্যে 1700 মিলিয়ন টনই ট্যাঙ্কারে করে সমুদ্রের উপর দিয়ে নানাস্থানে পাঠান হয়। সেখান থেকে অন্ততঃ দুই মিলিয়ন টন তেল সমুদ্র গর্ভে যায় ; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একশত লিটার তেল সমুদ্রে মিশছে। এ ছাড়া আছে ট্যাঙ্কারের দুর্ঘটনা। টৰি ক্যানিয়ান নামক ট্যাঙ্কারটি পারস্য উপসাগর থেকে ইংলণ্ডে যাচ্ছিল তেল নিয়ে (1967)। পথে নিমজ্জমান শৈলশ্রেণীতে ধাক্কা খেয়ে ছটি ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে প্রায় সাতাশ হাজার টন তেল

পড়ে যায়। তীব্র তৈল-দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞেরা ভাঙা জাহাজটিকে বোমা ছুঁড়ে ধ্বংস করে বাকী তেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এই রকম আরও দুর্ঘটনা ঘটেছে 1974 এবং 1978 সালে, তাতে যথাক্রমে 5000 ও 1000 টন তেল সমুদ্রজলে মিশেছে।

আজকাল আবার উপকূলের কাছে সমুদ্রগর্ভ থেকে তৈল উত্তোলন করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে, আমাদের বম্বে-হাইয়ে, ইংল্যাণ্ডের উত্তর সাগরে ও অনান্য দেশে এমনি তেল সংগ্রহ হচ্ছে। তৈলকূপ খননের সময়, ট্যাঙ্কারে তেল ভরার সময় সর্বদাই খানিকটা তেল সমুদ্রজলে মিশে সেটাকে দূষিত করে।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কলকারখানা, ইঞ্জিন প্রভৃতি থেকে যে প্রচুর বিষাক্ত দ্রব্য ও আবর্জনার সৃষ্টি হয় সেগুলি শেষ পর্যন্ত নদী-নালা বেয়ে সমুদ্রে স্থানান্তরিত হয়। ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মে কিছুটা জৈব কলুষ পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বিষাক্ত দ্রব্যই সাগরে সঞ্চিত হয়। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত ঃ আমাদের মোটর কার বা বাসের ইঞ্জিনের তেলে যথেষ্ট লেড টেট্রাইথাইল মেশান হয়। এর থেকে যে সীসাঘটিত বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় সেটা শেষ পর্যন্ত সাগরে পৌঁছয়। গত বিশ বছরে উপকূলের জলে সীসার পরিমাণ দশগুণ বেড়েছে। 1950-এর দশকে জাপানের মিনামাতা উপসাগরের জলে স্থানীয় প্লাস্টিক কারখানা হতে পারদ-সমন্বিত ধোয়ানী ফেলা হত সমুদ্রের জলে। এই জল মাছের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই দূষণের ফলে ঐ অঞ্চলের বহু লোক পঙ্গু হয়ে যায়। সমুদ্র-দূষণে শুধু যে মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী ধ্বংস বা বিকৃত হয় তা নয়, তার ফলে মানুষেরও অকল্যাণ হয়।

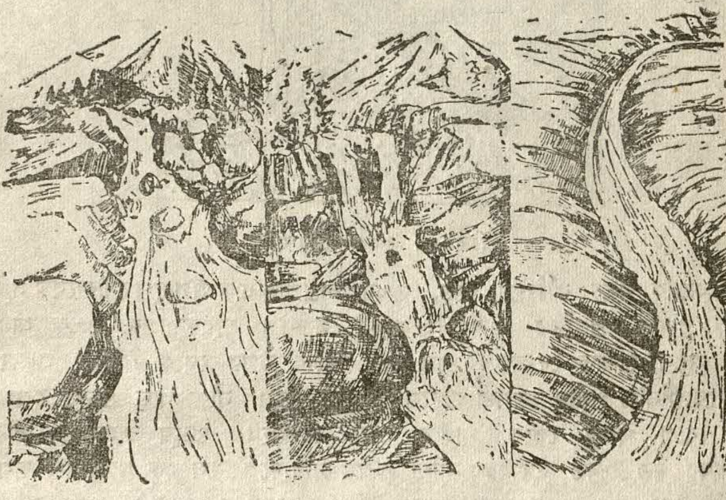
৫। নদীর কথা

সমুদ্র থেকে এবার নদীর কথায় আসা যাক। সমুদ্র গর্বিত সম্রাট, আর নদী মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী। সমুদ্রকে আমরা দূর থেকে দেখি, তার বিশালতা বিস্ময় জাগায় মনে। কিন্তু নদী আমাদের অতি নিকট, প্রতিদিনের ঘরকন্নার সাথী। সমুদ্রের আছে অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার, নদী কিন্তু তিল তিল করে যা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে সব উজাড় করে দিয়ে যায় সমুদ্রকে, এমনকি নিজেকেও। সমুদ্র রাজদন্ড নিয়ে সমস্ত প্রকৃতিকে শাসন করতে ব্যস্ত, আর নদী ত্যাগ আর সেবা দিয়ে সকলকে আপন করে নিতে চায়। সমুদ্র দেয় অসীম অনন্তের, উদারতার উপলব্ধি ; নদী দেয় স্নেহ, আনন্দ, জীবনের অমৃত।

উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপরের তুষারস্তূপ হিমবাহ হয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে হিমরেখার তলে এলে সেটা গলতে শুরু করে। হিমবাহ থেকে তখন অনেক ক্ষীণ জলধারা পড়তে থাকে। এই সব জল ধারা একত্র হয়ে সৃষ্টি করে জলস্রোতের। এরকম অনেক জলস্রোত একত্র মিশে গিয়ে পাহাড়ী নদীতে পরিণত হয়। ওদিকে আবার মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে মাটির উপরে আর পাহাড়ের উপরে। স্বভাবতঃই বৃষ্টির জল যে দিকটা ঢালু সেই দিকেই বয়ে যায়। এই জলস্রোতও

তুষার-থেকে-আসা জলস্রোতের সঙ্গে প্রায়ই মিশে যায়। নদী তখন প্রশস্ততর হতে থাকে। পর্বতের সানুদেশ অতিক্রম করে বহতা নদীর ধারা এসে সমতল ভূমিতে নামে। উঁচু থেকে নেমে আসার ফলে এই জলস্রোত প্রবল বেগে চলে। ফলে, ঢালু সমতলের দুইপাড় ভেঙ্গে আর তলার দিকে খাত তৈরী করে নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সাগরে বা কোন হ্রদে গিয়ে নিজেকে বিসর্জন দেয়।

পাহাড়ের গা বেয়ে জলস্রোত যখন নামতে থাকে তখন সেটা শীর্ণ বটে কিন্তু ঢাল বেশী থাকার জন্য তার বেগ প্রচণ্ড। এই খরস্রোতের প্রধান কাজ হচ্ছে শিলার ক্ষয় সাধন করা। শিলাখণ্ডগুলিকে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে জলস্রোত খাত তৈরী করে নামতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড় পাথরও নেমে আসে। এই শিলাখণ্ডগুলি প্রবল ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়ে গিয়ে মসৃণ উপলখণ্ডে বা নুড়িতে পরিণত হয়। পাথরের নুড়ি স্রোতের সঙ্গে নদী যেখানে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে সেখানে এসে জমে (চিত্র ১৮)।

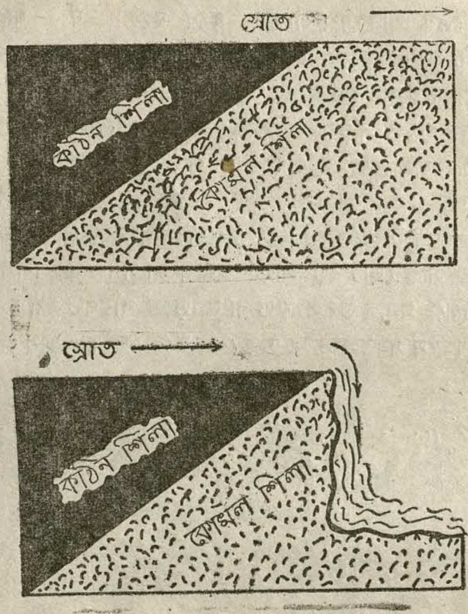


চিত্র ১৮। পাহাড়ী নদের খাত সৃষ্টি

সূক্ষ্ম বালু ও ধূলিকণা জলস্রোতের সঙ্গে বাহিত হয়ে আসে। জলে কিছু অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকে, নরম শিলা এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও ক্ষয়িত হয়ে যায়।

আর একটি ব্যাপার মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদি পর্বতের অধিত্যকায় কঠিন শিলা এবং কোমল শিলার স্তর থাকে, উপর দিয়ে জলস্রোত বয়ে যাবার সময় কঠিন শিলার স্তর তেমন ক্ষয় হয় না। কিন্তু কোমল শিলা খুব বেশী ক্ষয়ে যায়। এর ফলে কোমল শিলার স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। জলস্রোত তখন কঠিন শিলা পেরিয়ে হঠাৎ অনেক নীচে পড়ে, একে বলা হয় "জলপ্রপাত"। অনেক পাহাড়েই

ছোট বড় জলপ্রপাত দেখা যায় (চিত্র ১৯)। কিন্তু যখন বিরাট এবং প্রবল জলধারা



চিত্র ১৯। জলপ্রপাতের সৃষ্টি

সহসা অনেক নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন জলপ্রপাত এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। প্রপাত প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। দূরদূরান্তর থেকে মানুষ ছুটে আসে প্রপাত দেখতে। শত শত মিটার উপর থেকে বিপুল জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নীচে পড়ছে ভয়ঙ্কর গর্জনে যুগযুগ ধরে। নীচে পড়ে প্রচণ্ড কল্লোলে ভীষণ বেগে পাথর থেকে পাথরে ধেয়ে চলেছে। প্রচুর জলবুদ্বুদ জীবন্ত ঘন মেঘের মত শ্বেত ধূম্রাবরণ সৃষ্টি করছে চারিদিকে—সে এক অলৌকিক দৃশ্য। কয়েকটি বড় বড় জলপ্রপাতের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভেনেজুয়েলার জলপ্রপাতই পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত. এর পতন হাজার ফিটেরও উপরে। পৃথিবীর এক প্রশস্ত প্রপাত হচ্ছে সুবিখ্যাত নায়গারা জলপ্রপাত, দুইভাগে মোট 4000 ফিট প্রশস্ত আর পতনের পরিমাণ 150 ফিট। এর সমতুল্য হচ্ছে মধ্য আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া প্রপাত। দক্ষিণ আমেরিকায় আরও উঁচু উঁচু জলপ্রপাত রয়েছে। গায়নার কাইতুর প্রপাত নায়গারার চেয়েও পাঁচগুণ খাড়া হয়ে পড়েছে—এর পতন-তল 822 ফিট নীচুতে। ব্রেজিলের পাওলো আফন্সো প্রপাত উত্তুঙ্গ পর্বত থেকে চারটি প্রশস্ত ধারায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তিনশ ফিট নীচে। নায়গারার চেয়েও দেড়হাজার ফিট চওড়া ইগুয়াসু প্রপাত রয়েছে ব্রেজিলের কুরিতবা নদীপথে, দুশ ফিট এর খাড়াই। একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রপাত হচ্ছে লা-প্লাটা নদীর গেইরু ; আঠারটি ধাপে ধাপে এই প্রপাত পর্বত থেকে নেমে আসছে। এর জলোচ্ছ্বাসে বিশ ফিট উঁচু সব ঢেউ ফণা ধরে

উঠছে। বহুদূর থেকে এর গর্জন শোনা যায়, দেখা যায় এর উজ্জীবন্ত জলকণার শুভ্র মেঘ। প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ লক্ষ ঘন ফুট জল নেমে আসছে। কত অপরিসীম শক্তি রয়েছে এসব জলপ্রপাতে। আমাদের পশ্চিমঘাটের যোগ জলপ্রপাত প্রশস্ত নয় তেমন, কিন্তু 830 ফিট উঁচু থেকে পড়ছে বলে অতি মনোরম দেখায়।

সমতলভূমিতে প্রবাহের সময় নদীর স্রোত-বেগ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু তখনও নদী পাশের তটভূমি ক্ষয় করে নিয়ে চলে, তার বিস্তারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। গতিবেগ কম হলে বড় বড় পাথর নদীগর্ভে থিতিয়ে যায়। মাটি, সূক্ষ্ম বালুকণা ইত্যাদি স্রোতের সঙ্গে নদীর মোহনার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সুতরাং ক্ষয়-সাধনের সঙ্গে পাথর, মাটি, বালু ইত্যাদি অপসারণ করে নিয়ে আসাটাও নদীর আর এক কাজ। যতই স্রোতের বেগ মন্দীভূত হতে থাকে, নদীখাতে তত পলি সঞ্চিত হতে থাকে। অনেকদিন ধরে এরকম পলি জমে জমে নদীখাতে সমভূমি গড়ে ওঠে। আমাদের এই সুজলা-সুফলা বাংলা যে আর্যাবর্তের অংশ, লক্ষ লক্ষ বছর আগে এটা এরকম ছিল না। যুগ যুগ ধরে সিন্ধু আর গঙ্গা হিমালয় থেকে পলল বয়ে নিয়ে এসে এই উপত্যকার সমভূমি সৃজন করেছে। নদীবহুল অনেক দেশেই এরকম পাললিক সমভূমি দেখতে পাওয়া যায়।

মোহনার কাছে নদীর বিস্তার বেড়ে যায় কিন্তু স্রোতের বেগ কমে আসে। জলের ভাসমান ধূলিকণা ইত্যাদি এখানে নদীগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। মোহনার কাছে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ ও মৃত্তিকার স্তর জমে জলে নূতন স্থলভূমির সৃষ্টি হয়। স্বরচিত এই পলল স্তরের ভূমিতে বাধা পেয়ে নদীস্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে সাগরে উপনীত হয়। নদীমুখে পলল দিয়ে যে ভূখণ্ড তৈরী হয় সেটা ত্রিকোণাকার, তাই এর নাম ব-দ্বীপ। নদী শুধু ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় সাধন করে না। ভূখণ্ডের সৃষ্টিও করে। যে নদী বেশী পলি বয়ে আনে তাদেরই বড় বড় ব-দ্বীপ থাকে। আবার নদী যদি খুব উঁচু থেকে প্রবল বেগে সাগরে পড়ে সেখানে ব-দ্বীপ দেখা যায় না, বিশেষ করে সেখানকার সমুদ্র যদি গভীর হয়। পশ্চিমঘাটের উচ্চ কঠিন শিলার উপর থেকে আরব সাগরে নর্মদা ও তাপ্তী পড়ছে, তাই এদের ব-দ্বীপ নেই। আমাজোন, কঙ্গো এসব বড় বড় নদীর মোহনাতেও এই কারণেই ব-দ্বীপ হয় নি। পলল-জাত ভূখণ্ডের উর্বরতা খুব বেশী, প্রমাণ আমাদের সুন্দরবন। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পলিমাটিতে তৈরী এই সুন্দরবন পৃথিবীর বিশাল ব-দ্বীপগুলির মধ্যে অন্যতম।

হাজার হাজার বছর ধরে পলি পড়তে পড়তে সমুদ্র সরে যেতে থাকে, দেশের চেহারা যায় বদলে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাবিলন এখন পারস্য উপসাগরে থেকে 560 কিলোমিটার ভিতরে, কিন্তু এককালে এটি ছিল সমুদ্রতটে। পলি জমে জমে এখন সেখানে প্রকাণ্ড ভূখণ্ড হয়েছে। এই রকম ইটালীর আড্রিয়া একসময় আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে ছিল; এখন পলি জমাতে বত্রিশ কিলোমিটার ভিতরে চলে গেছে। পলি জমার ফলে বড় বড় জাহাজের বন্দরে ঢুকতে বিশেষ অসুবিধা হয়, যেমন আজকের দিনে কলকাতার অবস্থা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, কত প্রচুর পলি নদী বয়ে নিয়ে আসে। একটা উদাহরণ দিই। পৌনে তিন হাজার মাইল দীর্ঘ মিসিসিপির

মোহনায় যে ব-দ্বীপের ক্ষেত্র তার আয়তন 32000 বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বছর যে পলি স্রোতের সঙ্গে সেখানে আসে তার পরিমাণ 17000000 ঘন কিলোমিটার।

বাষ্প হয়ে চলে যাওয়ার জন্য সমুদ্র যে জল হারায় অসংখ্য নদনদী জল এনে সেই ক্ষতি পূরণ করে দেয়। বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলের বড় নদীগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ জল এসে সাগরে পড়ে। আমাজোন, কঙ্গো, নীল, সেণ্ট লরেন্স, এসব নদী সারাক্ষণ অপরিমেয় জলরাশি এনে সাগরে ঢালছে। আমাজোনের মোহনাতে যে খাঁড়ি তা এত প্রশস্ত যে এপার থেকে ওপার দেখা যায় না, প্রায় সমুদ্রের তুল্য। জলের সঙ্গে নদী সাগরকে দেয় যথেষ্ট শিলাচূর্ণ, খনিজ, মাটি ইত্যাদি। এদের পরিমাণও প্রচুর। কয়েকটি বড় নদীর দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে ;

নদী	দৈর্ঘ্য (মাইল)	নদী	দৈর্ঘ্য (মাইল)
নীলনদ (আফ্রিকা)	4145	কঙ্গো (আফ্রিকা)	2718
আমাজোন (দঃ আমেরিকা)	3900	হোয়াংহো (চীন)	2700
মিসিসিপি (যুক্তরাষ্ট্র)	3760	মারে (অস্ট্রেলিয়া)	2310
ইর্তিশ্ (রাশিয়া)	3200	ভোল্গা (রাশিয়া)	2290
ইয়াংসিকিয়াং (চীন)	3100	সিন্ধু (এশিয়া)	1980

নদী বিচিত্ররূপিণী। নানা বর্ণে বৈচিত্র্যে দীপ্তিতে সৌন্দর্যে নদীর যাত্রাপথ ভরপুর। গতি তার কোথাও উদ্দাম, কোথাও তার বজ্রহুঙ্কার, আবার কোথাও শুধু মৃদু কলগুঞ্জন। কোথাও নদী তট ভেঙে দিয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও পলল সঞ্চিত করে ধরিত্রীকে উর্বরা করে তুলছে। নদীর রূপের কোন শেষ নেই। অমরকণ্টকের শীর্ষ থেকে এক ক্ষীণ স্রোত তরতর করে নীচে নামছে। তার সঙ্গে এসে মিশছে আরও কত জলধারা, জন্ম নিল শংকর-কন্যা নর্মদা। ক্ষিপ্রা নর্মদা অমৃত বয়ে নেমে এল পর্বত হতে, ছুটে চলল সমুদ্রের পানে। কত দেব দেউল প্রদক্ষিণ করে, কত জনপদ কলুষমুক্ত করে, কত ছোট ছোট ছায়াস্নিগ্ধ গ্রামকে আশীর্বাদ করে, কত শ্যামল বনানীকে অমৃতের পরশ দিয়ে নর্মদা ছুটে চলেছে সুদূর সাগরে আত্মাহুতি দিতে। নর্মদার কথা বলছি, কিন্তু সব স্রোতাস্বিনীই ত এমনি। আমাদের এ পুণ্যভূমি নদীমাতৃক দেশ। নদীর সঙ্গে আমাদের নিবিড় আত্মীয়তা। নদীকে দেখে দেখে আমাদের আশ মেটে না। আমরা ডাঙার উপরে থাকি, সে ডাঙা স্তব্ধ নিশ্চল, কিন্তু নদীর জল দিনরাত বয়ে যায়, তার চলার ছন্দে একটা বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে।

দেখেছি বর্ষশেষের কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় তীরে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কালো যমুনাকে। উপরে নিকষ কালো সজল মেঘের সঙ্গে দুর্বার ঝড়ো হাওয়ার মাতামাতি। আর নীচে পূর্ণযৌবনা যমুনা আবেগের মত্ততায় মাতঙ্গিনী উদ্দাম উল্লাসে প্রলয় বেগে লক্ষ ফণা তুলে ছুটে চলেছে মহাসাগরের বুকে বিলীন হতে। সে এক অবিস্মরণীয় ছবি।

দেখেছি, চন্দনবর্ণা উপল-উচ্ছল অলকনন্দা হরিণ-শিশুর মত নৃত্যের ছন্দে ছন্দে অপার আনন্দে ঝরঝর করে নেমে আসছে। আর হিমদুহিতা স্ফটিক-স্বচ্ছ

মন্দাকিনী চঞ্চল আবেগে এসে দিশেহারা হয়ে মিশেছে অলকনন্দায়—রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী-অলকনন্দার সঙ্গম। নদীর এই আর এক অপরূপ ছবি।

দেখেছি, পাষাণকারা ভেঙে ভাগীরথীর প্রপাত শৈলশিখর থেকে অতল নিম্নে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আনন্দে-উল্লাসে। প্রচণ্ড কল্লোল তুলে নেমে আসছে পর্বতের পাদমূলে মর্তলোকের সমভূমিতে। তারপর নিবিড় অরণ্যের কান্তার পথে কিশোরীর মত আপন মনে কলস্রোতা ধেয়ে চলেছে বিভোর হয়ে। আরও দেখেছি, মোহনার কাছে এসে সেই চঞ্চলা ভাগীরথীর গতি হয়েছে শ্লথতর। মন্দাক্রান্তা গঙ্গা প্রৌঢ়া গৃহিণীর মত অঞ্চল জড়িয়ে যাচ্ছে সাগর সমীপে আত্মনিবেদনে।

রূপ আর গুণ। সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও অপেয়, কিন্তু নদীর জল স্বাদু এবং পেয়। সুদূর অতীতে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল কঠোর। বন্য শ্বাপদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, প্রকৃতির ফলমূল সম্বল করে তাদের যাযাবর জীবন কাটাতে হত। জলের ছিল তার একান্ত প্রয়োজন। সলিল-সন্ধানী মানুষ তাই মরু-কান্তার অতিক্রম করে এসে নদীতীরে জড় হল। নদী ইশারা দিল তাদের নতুন সরস জীবনের। ক্রমে ক্রমে যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ নদীর সন্নিকট ভূমিতে বসতি করার প্রয়াস পেল, ভবিষ্যৎ সমাজের বীজ অঙ্কুরিত হল। নদীজল পিপাসার্ত মানুষকে দিল অমৃত-পানীয়, দিল অবগাহনের অনাবিল আনন্দ। ধরিত্রীকে স্নেহরসে উর্বরা করে দিল খাদ্যশস্য। মানুষ স্বর্গসুখ পেল নদীর কাছে। তাই দেশে দেশে মানুষ নদীকে বন্দনা করেছে, অর্ঘ্য দিয়েছে, দেবতা বলে পুজো করেছে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষ শিখল নদীজলের সাহায্যে মাটির বুকে ফসল ফলাতে, শিখল ঘর বাঁধতে ; সভ্যতার পথে মানব এমনি করে এগিয়ে গেল। প্রাচীন বড় বড় সভ্যতা সবই নদীর উপকূলেই গড়ে উঠেছিল নানা দেশে। আর্যাবর্তের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশও ঘটেছিল গঙ্গা-সিন্ধু-বিধৌত উপত্যকায়। নদী সভ্যতার ধাত্রীদেবতা। এই সব নদীতীরে ছিল কত প্রাচীন দেবতুল্য মুনি-ঋষির আশ্রম। সেইসব সামবেদগান-মুখরিত তপোবনে কত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের জ্ঞানের, তপস্যার, মনীষার আলোকে মানবসমাজ বিভাসিত হয়েছিল। এইসব নদী কত জাতির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে, কত রাষ্ট্রের বিকাশ ও বিলয় দেখেছে। মানচিত্র খুললে দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীনকালে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠেছিল কোন না কোন নদীর উপকূলে। আজও ত অন্তর্দেশীয় প্রধান জনপদগুলি নদীতীরেই।

অতিবর্ষণ হলে বা প্রখর সূর্যতাপে যদি খুব বেশী হিমবাহ গলে যায় তবে প্রচুর জল নদীতে নেমে আসে। নদীতে হঠাৎ জলের স্ফীতি দেখা দেয়। নদীজল তখন দুকূল ছাপিয়ে ভূভাগকে প্লাবিত করে দেয়—এরই নাম বন্যা। পলি জমে যদি নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে ওঠে, তবে এই প্লাবন খুবই সহজে এবং বিরাট আকারে আসে। বন্যায় স্রোতের বেগ খুব তীব্র হয়, সেইজন্য ক্ষতিসাধনও খুব বেশী হয়।

প্লাবন যেখান দিয়ে যায় সেখানকার ঘরবাড়ী, শস্যক্ষেত্র, গাছপালা সবকিছু ধ্বংস করে, নিশ্চিহ্ন করে যায়। বন্যায় নদীর রূপ ভয়ঙ্কর। বরাভয়া বিগলিত-করুণা ছন্দোময়ী স্নিগ্ধ তটিনী তখন দুর্বার বেগবতী প্রলয়ঙ্করী করালীর মূর্তি ধারণ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম এই বন্যা। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ভয়াবহ, মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা তো আছেই, তাছাড়া সারাদেশের এক সর্বনাশ ডেকে আনে বন্যা, তার পায়ে পায়ে এসে উপস্থিত হয় দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। অনেক সময়েই বন্যা নেমে আসে হঠাৎ, তাই ক্ষতিটা হয় প্রচণ্ড রকমের।

বন্যার দুঃখের ইতিহাস রয়েছে সবদেশেই—চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, মিশর আরও নানাদেশের বন্যার মর্মন্তুদ কাহিনীতে সেই ইতিহাস ভরা। বন্যার সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ আরম্ভ করেছে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু আজও পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে উঠতে পারেনি। আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে চীন-সম্রাট ইউ (*Yü*) ইয়াংসি-নদীর তলদেশ কেটে গভীরতর করে মাঝে মাঝে পরিখা তৈরী করে বন্যার স্রোত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও যেসকল পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে তার মধ্যেও সেই পুরাতন নীতি অন্যতম। বন্যার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(১) নদীর উপরের দিকেই উপযুক্ত জায়গায় আড়াআড়ি ভাবে উঁচু অবরোধ তৈরী করে জল আটকিয়ে রেখে নদীর জলপ্রবাহ সীমিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে বাঁধ বা ড্যাম (dams)। অবরোধগুলো মজবুত হতে হবে, তাই প্রায়ই সিমেণ্ট-কংক্রীট দিয়ে তৈরী। বাঁধের উপরের দিকে তখন বিরাট জলাধার তৈরী হয়, অর্থাৎ হ্রদের সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন মত জল ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত রাখা হয়। আমাদের দেশের ভাক্‌রা-নাঙ্গাল, তিলাইয়া প্রভৃতি ড্যাম এই রকমের। আমেরিকার কোলোরাডো নদীর উপরের বোল্‌ডার ড্যাম, মিশরের নীলনদের উপরের আসোয়ান ড্যাম প্রভৃতি এই ধরনের। জল আটকিয়ে ড্যামের উপরের দিকে যে কৃত্রিম হ্রদ হয় সেগুলোও অনেক সময় বিশাল আকারের ; দৃষ্টান্ত আসোয়ান বাঁধের নাসের হ্রদ, ওয়েন ফলস্‌ ড্যামের ভিক্টোরিয়া হ্রদ। সাইবেরিয়ার ব্রাটস্ক (Bratsk dam) ড্যামের হ্রদ 517800 হেক্টার।

বাঁধ ছাড়াও অপেক্ষাকৃত কম উঁচু ব্যারাজ তৈরী করে এবং তার নীচের দিকে জলকপাট (lock gate) রেখেও জলস্রোত নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আমাদের খুব কাছেই এরকম একটি ব্যারাজ আছে। সিউড়ির তিলপাড়া-ব্যারাজ। নদীর বাঁকের কাছে আড়াআড়ি করে পাথর ফেলে বা খুঁটি পুঁতে খানিকটা অবরোধ সৃষ্টি করে জলস্রোত মন্দীভূত করাও প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ যেখানে পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এগুলোকে বলে উইয়ার (weir)।

(২) নদীর যেখানে ব্যারাজ দেওয়া হয়, তারও উপর থেকে ক্যানাল বা খাল কেটে

জলের কতকাংশ প্রবাহিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খালগুলো প্রায়ই দূরে দূরান্তর ঘুরে আবার নদীর নিম্নভাগে কোথাও এসে মিলিত হয়। এভাবে জল অপসারিত হওয়ায় বন্যার সম্ভাব্যতা কিছু হ্রাস পায়, দেশের আর্থিক উন্নয়নের দিক থেকে এই খালগুলোর মূল্য যথেষ্ট, সে কথায় পরে আসছি।

(৩) নদীকূলের সমভূমি যদি নীচু হয় তবে মাটি আর পাথর দিয়ে উঁচু বাঁধ তৈরী করে দেওয়া হয়, যাতে সমভূমির শস্যক্ষেত্র ও বাড়ীঘর প্লাবিত না হয়। এ পদ্ধতি বহুকাল থেকেই নানাদেশে প্রচলিত। আমাদের দেশেও অনেক নদীর তীরেই এরকম বাঁধ রয়েছে।

(৪) নদীর তলদেশ থেকে ড্রেজার দিয়ে পলিস্তর নিয়মিত অপসারণ করে নদীর গভীরতা যতটা সম্ভব বেশী রাখার চেষ্টা করা হয়।

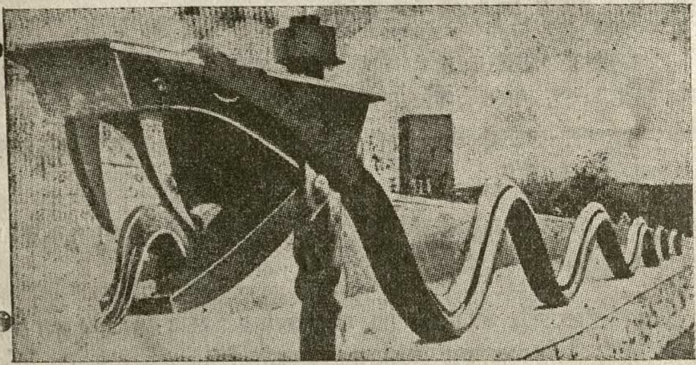
(৫) বন্যা প্রতিরোধে সাহায্য করার জন্য ভূমিক্ষয় রোধ করা এবং জল শোষণ করার জন্য মাটির শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বনভূমি সৃষ্টি করা ও রক্ষা করা দরকার। অনেক সময় বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করে জমিতে শস্য আবাদ করা হয়। বৃষ্টিতে সেই সব অঞ্চলের জমি ধুয়ে চলে আসে। পরে শুধু যে জমির উর্বরতা লোপ পায় তাই নয়, বৃষ্টিপাত কমে, বৃষ্টিপাতের জলকে জমি আর ধরে রাখতে পারে না। বনরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে আজকাল সবদেশেই দৃষ্টি দেওয়ার এটি একটি বড় হেতু।

এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বন্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। এ শতাব্দীর সব চেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল 1931-এ চীনদেশে ইয়াংসি নদীতে। প্রচুর বৃষ্টিপাতে ইয়াংসির দুকূলের হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার জনবহুল অঞ্চল নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। পনেরো মিটার উঁচু জলস্রোতের প্লাবনে সমস্ত বাড়ীঘর, শস্যভাণ্ডার, সব কিছু একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি হিসেবে দেড় লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল আর অন্ততঃ আড়াই কোটি লোক সর্বহারা হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষের অনাহারে আরও কত প্রাণ গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এক একটি বড় বন্যাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, বড় বড় মহাযুদ্ধেও সেরূপ হয় না। ধ্বংসের এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি আর কদাচিৎ দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপিতে আর জার্মানীর রাইন নদীতে প্রায়ই বন্যা দেখা দিত। বহু বাঁধ আর ব্যারাজ ও খাল দিয়ে এদের এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। রাইন নদীতীরের ডুসেলডর্ফ সহরের অনেকবারই বন্যায় খুব ক্ষতি হয়েছে। বাঁধ দিয়ে রাইনকে সংযত করার পর, ডুসেলডর্ফের বাঁধের উপর প্রতীক হিসাবে লোহার তৈরী একটি বিরাট অজগরকে (চিত্র ২০) শলাকাবিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ অজগর-বন্যাকে মানুষের কাছে পরাস্ত হয়ে বন্দী হতে হয়েছে।

অনেক সময় আচমকা প্রবল বর্ষণ থেকে বন্যা এসে উপস্থিত হয়। মানুষের

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কোন সুযোগ থাকে না। 1937-এ এরকম এক প্রবল বন্যা এসেছিল দক্ষিণ সিরিয়াতে। নিমেষের মধ্যে প্রবল স্রোতে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে



চিত্র ২০। ডুসেলডর্ফে রাইন নদীর বন্যা-নিরোধ প্রতীক

গিয়েছিল। অসংখ্য মৃতদেহ, প্রকাণ্ড সব শিলাখণ্ড নিয়ে স্রোত দুর্বার গতিতে ছুটেছিল। এক ভদ্রলোক বার মাইল দূরে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যা-বেলায় বাড়ী ফিরে এসেছিলেন। পরদিন ভোরে উঠে তিনি সেই বন্ধুর মৃতদেহ তাঁর উঠোনেই ভাসছে দেখতে পান। 1969-এ রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুমন্ত জলপাইগুড়িতে যে প্রবল বন্যা নেমে এসেছিল, তাতে বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছিল স্বল্পক্ষণের মধ্যে। এ স্মৃতি বাংলার অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। আমাদের দেশের দামোদর, কুশী, ত্রিস্রোতা (তিস্তা) এসব নদীতে প্রায়ই বন্যা দেখা দেয়, ক্ষয়ক্ষতিও হয় প্রচুর।

ড্যামের জলাধার শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, আরও অনেক মানব-কল্যাণকর কাজে এই জলাধার ব্যবহৃত হয়। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ান প্রয়োজন হয়েছে, প্রকৃতির ফলন যথেষ্ট নয়। এইজন্য জমির উর্বরতা কৃত্রিম সার দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সারের সঙ্গে চাই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে জল। নদীর উপকূলভাগে সহজেই জল পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু শীতকালে রবিশস্যের সময় অনেক নদীতে জল প্রায় থাকে না, তখন চাষ-আবাদ কঠিন হয়। আবার নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষতঃ যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জলের অভাবে শস্যের ফলন হওয়া মুস্কিল। কোনও শস্যেরই একটা নিম্নতম পরিমাণ জল না হলে ফলন হয় না। এই জলের চাহিদা একর-ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়। যেমন, ধানের জন্য মোটামুটি 42" ইঞ্চি, গমের জন্য, 15" ইঞ্চি, আলুর জন্য 28" ইত্যাদি জল লাগে। আবার গাছের সব সময় একই পরিমাণ জল প্রয়োজন হয় না। প্রথমে চারাগাছ পুঁতবার সময় যথেষ্ট জল লাগে, আবার যখন ফুল ধরে বা ফল পুষ্ট হয় তখন বেশী জল প্রয়োজন। আজকাল বাঁধ, ব্যারেজ ইত্যাদি থেকে প্রশস্ত সব খাল কেটে ইচ্ছামত জল নিয়ে যাওয়া যায়। এই সব খালের শাখা প্রশাখা অনেক মাইল দূরে গিয়েও আবাদী জমিতে প্রয়োজন মত জল

পেঁছে দেয়। তাই আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় বাঁধের জল এবং ক্যানেলের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাঁধে জল ধরে রাখা যায় বলেই ফসল বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের ক্যানেলশ্রেণী লক্ষ লক্ষ একর জমির চাষ-আবাদে সাহায্য করছে। পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু সেচের কাজ এখন খালের জল থেকে হচ্ছে।

বাঁধের জলের আর একটি কাজ হচ্ছে তড়িৎ-উৎপাদন। উঁচু থেকে বাঁধের জল যখন বেগে নীচে নেমে আসে তখন সেটাতে গতীয় শক্তি থাকে প্রচুর। এই স্রোতের পথে টারবাইন-যন্ত্র বসান হয়। স্রোতে এই টারবাইন ঘুরতে থাকে এবং তা থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ জলস্রোতের গতীয় শক্তির খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। এখানে বিদ্যুৎ পাবার জন্য আর কয়লা পুড়িয়ে ডায়নামো চালানো দরকার হয় না; সেজন্য খরচ পড়ে কম। দাক্ষিণাত্যে সস্তায় এই বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে—উত্তর ভারতেও অনেক যায়গায় এই রকম জল বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বড় বড় কলকারখানা এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। গ্রামে গ্রামেও এই বিদ্যুৎ পাঠান সম্ভব হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করে, চাষ-আবাদ ও শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমরা শুধু বসে থাকব, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, খাদ্য, সামগ্রিক ভাণ্ডার, আয়াসের ব্যবস্থা সব আপনা থেকে হাজির হবে, আর আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে পরম আরামে থাকব, এটা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। পরিশ্রম করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের আদায় করতে হবে সব কিছু। শস্য ফলাতে হবে, সম্পদ আহরণ করতে হবে, প্রয়োজনের সামগ্রী তৈরী করতে হ'বে—এমনি এমনিই সব হবে না। তাই মনীষী বলেছেন, "To eat bread in the sweat of his brow is the original punishment of mankind"। মানুষকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়, বাঁধ তৈরী করতে হয়, খাল কেটে ক্ষেতে জল নিয়ে যেতে হয়, টারবাইন বসিয়ে বিদ্যুৎ জোগাড় করতে হয়।

খালের জল আর একটি ব্যাপারে সাহায্য করে। নদীতে সব সময় যথেষ্ট জল থাকে না, তাই নাব্যতা কমে যায়। কিন্তু বড় বড় ক্যানাল জলপথ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খালের জলের গভীরতা এমনভাবে রাখা সম্ভব যাতে বড় বড় নৌকা সহজে চলাচল করতে পারে। জলপথে মাল সরবরাহের খরচ অনেক কম, সুতরাং ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে এটা বিশেষ কাম্য। এও সম্ভব হয়, যদি যথেষ্ট পরিমাণ নদীজল বাঁধে আটকে রাখা যায়।

ধরিত্রীর নদীগুলো যে জল সাগরে বয়ে নিয়ে আসে তার আয়তনের পরিমাণ প্রায় 39000 ঘন কিলোমিটার (km^3)। এর বেশীর ভাগটাই আসে এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। নদী ছাড়াও আনটার্কটিকা এবং গ্রীনল্যান্ডের হিমবাহ গলে প্রায়

3000 ঘন কিলোমিটার জল সাগরে যায়। মোটামুটি একটা গড় হিসাব :

নদী থেকে সমুদ্রে বার্ষিক জল বহনের পরিমাণ

উৎস	পরিমাণ ঘন কিলোমিটার (km^3)	শতাংশ
এশিয়া	13190	~ 32
দঃ আমেরিকা	10380	25
উঃ আমেরিকা	5960	14
আফ্রিকা	4225	10
ইউরোপ	3110	7.3
অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি	1965	4.7.
আনটার্কটিকা	2200	} 7.0
গ্রীনল্যাণ্ড	700	
মোট :	41730	100%

গত পাঁচ ছয় দশকের নানারকম পরিমাপ থেকে এই হিসাবটি তৈরী হয়েছে। নদীর জলের পরিবহণ ভৌগোলিক পরিবেশ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বছরের বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পরিমাণ জল নদী থেকে সাগরে উৎসারিত হয়। আবার, অনেক সময়েই একই নদীর জল-পরিবহন সর্বদা এক হয় না। তবে সমস্ত নদীর একত্রে পরিবহণের গড় পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে।

নদী স্রোতের সঙ্গে মাটি, বালুকণা এবং অন্যান্য নানা অদ্রব পদার্থ ও আবর্জনা এসে সমুদ্রে পড়ে আর সেখানে থিতিয়ে যায়। খুব সূক্ষ্মকণাগুলো কলয়ডীয় অবস্থায় থাকে এবং তার অধিকাংশই নোনাজলের সংস্পর্শে এসে আকারে বড় হ'য়ে পলিতে স্থান পায়। নদীতে এভাবে বছরে প্রায় দুশ কোটি টন অদ্রব পদার্থ পলিতে জমে।

এছাড়া প্রচুর দ্রবিত পদার্থও জলের সঙ্গে সাগরে আসে। এদের মধ্যে আছে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ঘটিত পদার্থ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর লবণ, ইত্যাদি। এইগুলো সমুদ্রের জীব জগতের পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। পরিবাহিত জৈবপদার্থের পরিমাণ বছরে অন্যূন চল্লিশ কোটি টন আর এর প্রায় পাঁচ গুণ অর্থাৎ দু'শ কোটি টন দ্রবিত অজৈব বস্তু। অর্থাৎ, স্থলভাগ থেকে অন্ততঃ চারশ' কোটি টন পদার্থ বছরে সাগরে চলে যায়। এর দশ শতাংশই আসে মাত্র দুইটি নদী আমাজোন আর কঙ্গো থেকে। পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের বর্গায়তন ধরলে এই ক্ষয়ের ফলে তার পৃষ্ঠ দেশ এক শতাব্দীতে প্রায় এক সেন্টিমিটার নীচু হচ্ছে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছে। তার একটা কারণ বনজঙ্গল কেটে জমিকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা। এতে মাটির দৃঢ় বাঁধনটা আল্‌গা হয়ে পড়ে। বৃষ্টির জলে খানিকটা জমি ধুয়ে চলে যায়। বাস্তব্য-ব্যবস্থার (ecosystem) এই পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী এবং শেষ পর্যন্ত বন কেটে আবাদ ক্ষতিই করবে।

যেসব বিভিন্ন পদার্থ সমুদ্রে পরিবাহিত হয়, তারও একটা হিসাব করা হয়েছে। কার্বনেট, সালফেট এবং সিলিকেট জাতীয় পদার্থই সর্বাধিক। তা ছাড়া যথেষ্ট ক্যালসিয়াম এবং সোডিয়াম ঘটিত পদার্থ সমুদ্রে যাচ্ছে। বছরে সমুদ্রে যাচ্ছে : *

অদ্রব পদার্থ—200 কোটি টন, আর

দ্রবিত পদার্থ :	কোটি টন		কোটি টন
জৈবপদার্থ	40.4	কার্বনেট (CO_3)	140.0
ক্যালসিয়াম	81.6	সালফেট (SO_4)	48.6
ম্যাগনেসিয়াম	13.7	সিলিকেট (SiO_2)	46.8
সোডিয়াম	23.0	ক্লোরাইড (Cl)	22.7
পটাসিয়াম	8.5	নাইট্রেট (NO_3)	3.6
আয়রন-অ্যালুমিনা অক্সাইড	11.0	ফসফেট (PO_4)	0.9

জীবজগতের অস্তিত্বের মূলে যে প্রাণবস্তু প্রোটোপ্লাজম রয়েছে, তার 95 শতাংশ পাঁচটি মৌল দিয়ে তৈরী—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস। এরা নানা যৌগরূপে সাগরে চলে যাচ্ছে। অক্সিজেন (বাতাসে) এবং হাইড্রোজেন (জলে)—এই দুইটির অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে। কার্বন ও হাইড্রোজেন সমুদ্রে চলে গেলেও প্রকৃতির চক্রীয় পরিক্রমায় আবার সেগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া হিসাবে ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যাটা ফসফরাস নিয়ে। বছরে 35 লাখ টন ফসফরাস সমুদ্রে চলে যায় আর ফিরে আসে না। শুধু গোয়ানো হিসাবে সামান্য ফসফরাস সমুদ্র থেকে পাই। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পুষ্টির জন্য ফসফরাস অপরিহার্য। যদি অনেক হাজার বছরের পরে প্রাণবস্তুর উৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়, সেটা হবে ফসফরাসের অভাবের জন্য।

নদীর দূষণ

নদীর জল সম্পর্কে আর একটি বিষয় বলা দরকার। সেটা হল নদীজলের দূষণ। শস্য-উৎপাদনের জন্য জল চাই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য জল চাই। এই প্রয়োজনে অতীত কালের মানুষ নদীর তীরে এসে বসবাস শুরু করেছিল। ক্রমে নদীর ধারে ধারে সেকালে সব নগর পত্তন হয়েছিল। আর সেখানেই প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু-সভ্যতার পত্তন হয়েছিল যেমন সিন্ধুতীরে, তেমনি গাঙ্গেয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গঙ্গা-যমুনার তীরে তীরে। মহেঞ্জোদারো, হস্তিনাপুর, কান্যকুব্জ, বারাণসী, পাটলিপুত্র, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী—সবই ছিল নদীতীরে। অন্যদেশের একই ইতিহাস। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে সুমেরীয় সভ্যতা, হুয়াং-হোর তীরে

* Sc. Am. Vol 198, P 83, 1958 (Ecosphere)

চীনসভ্যতা, নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল। আজ-ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে নদীর দান অনস্বীকার্য।

আধুনিক সভ্যতার গোড়ায় রয়েছে শিল্পবিপ্লব। জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাদের অফুরন্ত প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে তৈরী হল অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর শিল্প-নগরী। পাট, তেল, বস্ত্র, ওষুধ, রাসায়নিক, কাগজ, চিনি,...সব শিল্পেই প্রচুর জলের প্রয়োজন আর তাই নদীর সান্নিধ্য চাই। শুধু প্রয়োজনের জল পাবার সুবিধা নয়, শিল্পে উদ্ভূত আবর্জনাকে অনায়াসে ভাসিয়ে দেওয়ার সুবিধার জন্যও সন্নিকটে নদীর জলপ্রবাহ কাম্য। তাই আজও বড় বড় কলকারখানা নদীর ধারেই বেশী, বিশেষ করে যদি সেটা মোহনার কাছে হয় তাহলে সর্বোত্তম।

দেখা যাচ্ছে বর্তমান কালে বিশেষ করে গত তিন-চার দশকে উন্নতদেশগুলিতে এবং ভারতের মত উন্নতিকামী দেশগুলিতে নদীর জল ভয়াবহরকমে দূষিত হয়ে উঠেছে। নদীদূষণের কয়েকটি প্রধান কারণ ঃ

(i) কলকারখানার বর্জ্য পদার্থগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরাসরি পার্শ্ববর্তী নদীতে ফেলা। যে ধোয়ানী বা আবর্জনা নদীতে নিষ্কাশন করা হয় সেটা সবক্ষেত্রেই কম বেশী বিষাক্ত। আইনগত বাধ্যতা সত্ত্বেও এই বিষাক্ত, পদার্থগুলিকে পৃথক করে নষ্ট করে ফেলার ব্যবস্থা কোথাও প্রায় থাকে না। এই কলকাতাতেই অবস্থিত 440 টি চটকল থেকে যে কলুষ গঙ্গাতে গিয়ে মেশে প্রতিদিন, সেটা অপরিমেয়। তাছাড়াও আরও অনেক শিল্পসংস্থা সেখানে রয়েছে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিই।

আসানসোল-দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে অনেকগুলি কলকারখানা রয়েছে। এইসব কারখানা থেকে যে বিষাক্ত আবর্জনা নিষ্কাশিত হয় সেটা পরীক্ষা করা হয়েছে।[১] দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা থেকে নির্গত হয় লোহা, তেল গ্রীজ, অ্যাসিড, আর কয়লার গুড়ো। দুর্গাপুর প্রজেকট ও রসায়ন কারখানা থেকে আসে অ্যামোনিয়া, ফেনল, সায়ানাইড ও থায়োসায়ানেট, জৈব-অ্যাসিড, ক্লোরিন, সীসা, ইত্যাদি ; দুর্গাপুর সারখানা থেকে অ্যামোনিয়া, ক্রোমিয়াম ঘটিত পদার্থ, রাণীগঞ্জ কাগজের কল থেকে বের হয় লিগনিন, কষ্টিক ক্ষার, সালফার ঘটিত যৌগ, চুণ ইত্যাদি। এই সবই বিভিন্ন নালার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দামোদরের বুকে আশ্রয় নেয়। আর সেই দামোদরের জল ব্যবহার হয় সেচ ও কৃষিকাজে ; সেখান থেকে বিষ ছড়িয়ে পড়ে জীবজগতে।

(ii) সহরের জনসংখ্যা বিপুল। নগরের আবর্জনা, মলমূত্র ইত্যাদি বিভিন্ন পয়ঃ প্রণালী দিয়ে এসে নদীতে পড়ে। বৃহত্তর কলকাতার শত শত টন বর্জ্য কলুষ প্রতিদিন 137 টি নর্দমা ও নালা দিয়ে এসে গঙ্গায় স্থান পাচ্ছে। দিল্লী সহরের বিশ কোটি লিটার বিষাক্ত তরল আবর্জনা প্রত্যহ এসে যমুনায় পড়ছে। এই ময়লার সঙ্গে সর্বদাই নানাধরনের রোগ জীবাণু রয়েছে। অনেক সংক্রামক ব্যাধি এই নদীজলের মাধ্যমেই ছড়ায়। অনেকের একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে গঙ্গার জল অপবিত্র হয় না।

---

(১) জ্ঞান ও বিজ্ঞান ; 35 তম খণ্ড, 6 সংখ্যা

একটা সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, গঙ্গা পৃথিবীর ভয়াবহভাবে দূষিত নদীগুলির অন্যতম।[২]

অধিকাংশ সাধু-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শবদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে তার সদ্গতি ও পুণ্যলাভ হয়। এই কারণে শত শত সাধুর মৃতদেহ বছরে গঙ্গাতে ভাসান হয়। এ ছাড়া নদীতীরবর্তী গ্রাম ও সহরের মৃত জীবজন্তুকে নদীতে ফেলা হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং বর্জ্য বস্তুকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া আমাদের দীর্ঘ কালের অভ্যাস, এ সবও নদীজলকে অনেকখানি কলুষিত করে।

(iii) নদী দূষণের আর একটি সাম্প্রতিক কারণ নদীতীরের চাষের জমিতে প্রচুর কীটনাশক ওষুধের অবাধ ব্যবহার। এই কীটনাশক দ্রব্যগুলি সবই তীব্র বিষ। অনেক সময়েই সেচের জলে বা বৃষ্টির জলে পরিবাহিত হয়ে এই সব পদার্থ নদীতে এসে পড়ে। জলের সঙ্গে মিশে এই সব বিষ অল্পাধিক জীবজগতে প্রবেশ করে এবং নানা অনর্থের সৃষ্টি করে। এখন মনে করা হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত D. D. T. কীটনাশক যকৃতের পীড়া এমনকি কর্কট-রোগ ঘটাতে সক্ষম।

প্রাণী-এবং উদ্ভিদজগতের উপর নদীজলের দূষণের পরিণাম মারাত্মক। দূষিত জলের জন্য মাছের ডিম থেকে বাচ্চা হয় না। চারা-মাছ বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাছের বিকৃতি ঘটে, স্বাদ তো নষ্ট হয়-ই। আজকাল গঙ্গার মোহনায় আগের মত ইলিশের প্রাচুর্য নেই। তার প্রধান কারণ, আগে সমুদ্র থেকে ইলিশ নদীর মিষ্টি জলে আসত ডিম পাড়তে। এখন জলের অতিরিক্ত কলুষের জন্য সে সব মাছ আর আসে না।

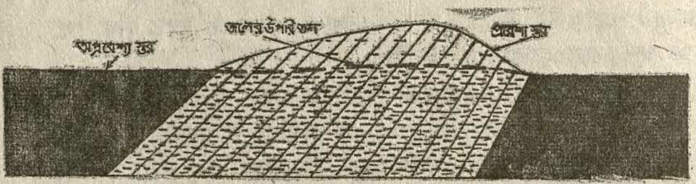
অনেকক্ষেত্রেই দৈনন্দিন গৃহকাজে বা পান করার জন্য নদীজল ব্যবহার করতে হয়। জলের কলুষ তাই সহজেই মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে এবং নানা ব্যাধির সৃষ্টি করে। কৃষিতে কলুষিত জল ব্যবহারের জন্য কৃষকের স্বাস্থ্যহানি এবং জমিদূষণ দুই-ই ঘটে। মাটির চরিত্রও ধীরে ধীরে বদলে যায়; ফলনের ক্ষতি হয়। জলজ উদ্ভিদে নদীর জলের বিষ সহজেই শোষিত হয়। যে সব পশুকে ঐ জলজ-উদ্ভিদ খাদ্যরূপে দেওয়া হয় তারাও আক্রান্ত হয় এবং তার মাধ্যমে নদীদূষণের প্রভাব এসে পড়ে মানুষের ওপরে। এই সকল দূষণের প্রতিকার যে একান্তভাবে প্রয়োজন এবিষয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের মনে এখন সচেতনতা এসেছে, এটা সুলক্ষণ।

৬। মাটির নীচে জল

পৃথিবীর ভূভাগের উপরে যে বৃষ্টিপাত হয়, সেই জলের বেশীর ভাগই নদী, নালা, পুকুরে গড়িয়ে যায়; খানিকটা অবশ্য বাষ্পীভূত হয়ে উড়েও যায়। বাকীটা মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। ভূস্তরে দুই রকমের শিলা রয়েছে। একরকম শিলার ভিতর দিয়ে জল অনায়াসে চলে যেতে পারে, এগুলোকে বলে "প্রবেশ্য" (permeable)

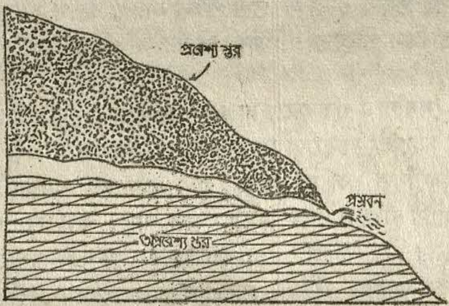
(২) সভাপতির ভাষণ : বিজ্ঞান-কংগ্রেস, 1981

শিলাস্তর আর দ্বিতীয় রকমের শিলাতে জল ঢুকতে পারে না, এগুলি "অপ্রবেশ্য" শিলাস্তর। প্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জল শেষপর্যন্ত নীচে এক অপ্রবেশ্য স্তরে পোঁছয়। তখন আর না যেতে পেরে জল সেখানে জমতে শুরু করে। এমনি করে ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চিত হয় (চিত্র ২১)। সেখানে যত বেশী জমে, সঞ্চিত জলের



চিত্র ২১। ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয়

উপরি-তল (water table) তত উচুঁ হতে থাকে। এমনি করে জল অপ্রবেশ্য স্তরের উপর জমে আর যখন নীচে যাবার পথ পায় না তখন উপরের দিকে বাইরে আসার পথ পেলে সেখান দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসে। ভূগর্ভ থেকে জলের এই স্বতঃ উৎসারণকে বলে "প্রস্রবণ" (চিত্র ২২)। অনেক প্রস্রবণ আছে যেখানে শত শত বছর ধরে



চিত্র ২২। প্রস্রবণ

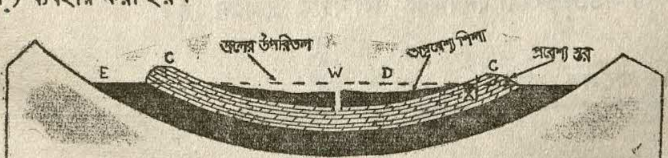
প্রস্রবণের ধারা নিয়ত উৎসারিত হয়ে আসছে। কাশ্মীরের পাহাড়ের গায়ের মনোরম উদ্যানগুলিতে রয়েছে এই রকমের বড় বড় অবিরাম প্রস্রবণ। ঐ জলধারা কেন্দ্র করেই মোগল বাদশাহেরা ঐসব অপূর্ব উদ্যান গড়ে তুলেছিলেন।

অপ্রবেশ্য শিলাস্তর মাটির নীচে যদি হেলান থেকে তবে নির্গম পথ দিয়ে প্রস্রবণের ধারা খানিকটা বেরিয়ে গেলে জলের উপরিতল নির্গমমুখের নীচে চলে যায় এবং প্রস্রবণের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আবার জল সঞ্চিত হলে তখন প্রস্রবণের উৎসারণ দেখা দেয়। এরা "সবিরাম প্রস্রবণ"; কোন কোন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এরকম প্রস্রবণ দেখা যায়। শিলাস্তরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় জল নানারকম লবণ খনিজপদার্থ ইত্যাদি দ্রবিত করে নেয়। সেই জন্য প্রস্রবণের জলে প্রায়ই নানা ধাতব পদার্থ থাকে। খুব বেশী পরিমাণে এসব পদার্থ থাকলে, এদের বলা হয় "খনিজ

প্রস্রবণ"। ইংলন্ডের বাথে, ইউরোপের কার্লসবাদে, এরকম খনিজ প্রস্রবণ রয়েছে। কোন কোন রোগ উপশমের জন্যও এর্‌প খনিজ প্রস্রবণ-জল ব্যবহার হয়।

মাটির অনেক নীচে জল চলে গেলে বা আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে মাটির তলে জল সঞ্চিত হলে, সেই জল খুব গরম হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রস্রবণের ধারা খুব উত্তপ্ত থাকে; এদের "উষ্ণ প্রস্রবণ" বলে। বীরভূমের বক্রেশ্বরে, বিহারের রাজগীরে, বাংলাদেশের চন্দ্রনাথে, মুঙ্গেরের সীতাকুন্ডে, হিমালয়ের বদরীনারায়ণে এরকম সব উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। নীচে তাপমাত্রা যদি খুবই বেশী হয় তবে উত্তপ্ত জল উপরে উঠে আসার সময় খানিকটা বাষ্প হয়ে বের হয়। সেই বাষ্প উষ্ণ জল নিয়ে প্রস্রবণের মুখ দিয়ে উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এরকম বাষ্প-মিশ্রিত প্রস্রবণকে বলে, "গীজার" (geyser)। আইসল্যান্ডে, নিউজিল্যান্ডে অনেক গীজার দেখা যায়। আমেরিকার ইয়োলো-স্টোন পার্কে ওল্ড ফেথফুল (Old Faithful) নামে এক প্রসিদ্ধ গীজার আছে; একঘন্টা পরপর অত্যুষ্ণ জল ও বাষ্প সেখান থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

ভূগর্ভস্থ জল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। নদীনালা যেখানে কম, বা শীতের সময় যখন নদীনালা শুকিয়ে যায় তখন জল পাওয়ার জন্য কূপ বা নলকূপের উপর নির্ভর করতে হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ত বটেই, কৃষিকাজেও নলকূপের জল ব্যবহার হয়। আজকাল এ রাজ্যে বহু অগভীর নলকূপ বসিয়ে সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। উন্মুক্ত কূপগুলি সাধারণতঃ আর্টেজীয় কূপ (Artesian well)। এটাকে একরকম কৃত্রিম প্রস্রবণ বলা যেতে পারে। দুটো অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে চাঁদের ফালির মত বাঁকানো যদি একটা প্রবেশ্য স্তর থাকে, আর এই প্রবেশ্য স্তরের প্রান্তভাগ যদি দূরে কোথাও ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকে, তবে দুই অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যে জল জমে (চিত্র ২৩)। জলের উপরিতল ক্রমশ উচুঁ হতে থাকে। এখন উপরের অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্য দিয়ে 'w' চিহ্নিত অংশে কুয়ো খুঁড়লে নীচের জল উপরিতলের লেভেলে আসবেই। এটাই আর্টেজীয় কূপ। এই জল তখন সংগ্রহ করে (প্রয়োজন হলে পাম্প বসিয়ে) ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ২৩। আর্টেজীয় কূপ

ভূগর্ভে সঞ্চিত সলিল-সম্পদের একটা পরিমাণ রুশবিজ্ঞানী মাকারেন্‌কো করেছেন। তাঁর হিসাব মতো মাটির নীচে 60,000000 ঘন কিলোমিটার জল আছে। এর মধ্যে মাত্র 4,000000 ঘন কিলোমিটার আছে ভূপৃষ্ঠ থেকে আটাশ মিটারের মধ্যে, বাকীটা রয়েছে অনেক গভীর তলে। আমেরিকান বিজ্ঞানী রেমন্ড নেস্ কিন্তু ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেছেন, ভূগর্ভের মোট জলের পরিমাণ 4,000000 ঘন

কিলোমিটারের বেশী নয়। স্পষ্টতঃই এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা ও উন্নত পরিমাপন-পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। ভূগর্ভের গভীর অভ্যন্তরের জলে প্রচুর পরিমাণ লবণ দ্রবিত আছে, বিশেষ করে সোডিয়াম ক্লোরাইড। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি তলের জলে লবণের পরিমাণ অনেকটা কম এবং সেজন্য আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের উপযোগী। মেরু অঞ্চলে, সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে, কোন কোন জায়গায় ভূগর্ভেও জল কঠিন বরফাকারে রয়েছে।

মরুভূমি ছাড়া, অন্যান্য ভূভাগের মৃত্তিকা সবই কমবেশী আর্দ্র বা জলসিক্ত। অর্থাৎ জমিতে সর্বদাই কিছু জল বিধৃত হয়ে থাকে। এই মৃত্তিকা-সংহত জলের (soil moisture) পরিমাণ 80,000 ঘন কিলোমিটার, এই জলের উপর শস্যের ফলন অনেক নির্ভরশীল। মাটি সর্বত্র একরকম আর্দ্র নয় এবং ঋতুর সঙ্গে আর্দ্রতারও পরিবর্তন হয়। সেই হেতু ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ-ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে।

বর্তমানে সেচের আওতায় সারা পৃথিবীতে আছে 220 মিলিয়ন হেক্টার জমি। তার মধ্যে গম চাল ইত্যাদি দানাশস্য জন্মায় 160 মিলিয়ন হেক্টারে, অন্যান্য খাদ্যশস্য শাকসবজী ইত্যাদি জন্মায় 30 মিলিয়ন হেক্টারে আর তুলা, পাট, ইত্যাদি পণ্যশস্য হয় বাকী 30 মিলিয়ন হেক্টারে। সেচ-বহির্ভূত আবাদী জমির পরিমাণ 1050 মিলিয়ন হেক্টার। সেচের জমির ফলন গড়ে সেচের বাইরের জমির ফলনের প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ প্রতি হেক্টারে। অবশ্য এ জমিতে উন্নত বীজ, উন্নত চাষ-পদ্ধতি, উপযুক্ত সার প্রভৃতিও দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজন মত জল না দিলে আশানুরূপ ফলন হবে না। বর্তমান সারা পৃথিবীতে সেচের জন্য জল ব্যবহৃত হচ্ছে 2500 ঘন কিলোমিটার, এর এক-চতুর্থাংশ অবশ্য অব্যবহৃত হয়ে নদীনালাতেই ফিরে আসে। কলকারখানা, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে, জলপথে মাল পরিবহনে এবং অন্যান্য নানা কাজে প্রভূত জল প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু জলের সর্বাধিক চাহিদা ফসল-উৎপাদনে। এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর সব মানুষকে নিম্নতম পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে হলে অন্ততঃ 500 মিলিয়ন হেক্টার জমি সেচের অধীনে আনতে হবে এবং তার জন্য সেচের জল প্রয়োজন হবে 4500 ঘন কিলোমিটার। প্রতি হেক্টারে সেচের জন্য অন্ততঃ 9000 ঘন মিটার জল বছরে প্রয়োজন হয়।

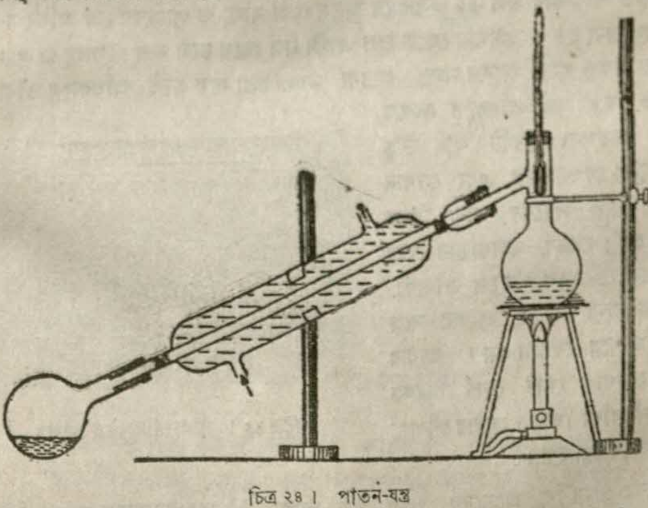
৭। জলের শোধন

নিত্যব্যবহারের জন্য জল আমরা নানা জায়গা থেকে পাই; নদী, পুকুর, খাল, বিল, কুয়ো থেকে প্রধানতঃ জল সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বৃষ্টির জল এবং তুষার-গলা জলও আছে। জলে সর্বদাই কিছু ময়লা থাকে। অবশ্য এর মধ্যে পাহাড়ের উপরের বরফ-গলা জল এবং আকাশ থেকে পাওয়া বৃষ্টির জলই সব থেকে বিশুদ্ধ, ময়লা প্রায় নেই বললেই চলে। জলের ময়লা দুই ধরনের। একটি হল যে ময়লা ভাসে বা প্রলম্বিত হয়ে থাকে, দ্রব হয় না। এ রকম ময়লা চোখেই দেখা যায়, যেমন পুকুর বা নদীর জলে দেখা যায় খানিকটা বালু বা কাদামাটি ইত্যাদি রয়েছে। ঝরনার জলে

বা প্রস্রবণের জলে এরকম ময়লা থাকে না। ফিলটার কাগজ বা ন্যাকড়া দিয়ে এরকম ময়লা সরিয়ে নেওয়া যায়। অনেকটা জল পরিশ্রুত করতে হলে সেই জলকে মিহি বালুর স্তরের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। ভাসমান ময়লাগুলো বালুর স্তরে আটকে থাকে। দ্বিতীয় রকমের ময়লাগুলো জলে দ্রবিত হয়ে থাকে, আমরা চোখে দেখতে পাই না। জল মাটি থেকে নানারকম লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে নিয়ে আসে। সামান্য বাতাসও জলে দ্রব হয়, তার মধ্যে বিশেষ করে কার্বন-ডাইঅকসাইড যুক্ত হলে মাটির খনিজ লবণ আরও বেশী দ্রব হয়। দ্রবিত ময়লা কি হবে সেটা নির্ভর করে সেখানকার জমির রাসায়নিক প্রকৃতির উপরে। বীরভূমের কোন কোন প্রস্রবণের জলে গন্ধক-যৌগ দেখা যায়, আবার উত্তরবঙ্গের কুয়োর জলে প্রচুর লোহ-যৌগিক দ্রবিত রয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই জলে খানিকটা ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট ও সালফেট লবণ থাকে। সহরাঞ্চলে, বিশেষ করে যেখানে কলকারখানা রয়েছে, সেখানকার বাতাসে সালফার-ডাইঅকসাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি থাকে, তাই সেখানে জল ঐ সকল গ্যাস শোষণ করে দূষিত হয়ে পড়ে।

জলে যে দ্রবিত মালিন্য রয়েছে তা বেশ সহজেই প্রমাণ করা যায়। খানিকটা কুয়োর জল বা পরিস্রুত নদীজল একটি পাত্রে নিয়ে ফোটাতে হয়। সমস্ত জলটা উবে গেলে পাত্রের নীচে খানিকটা সাদা গুঁড়ো পড়ে থাকে। ঐ লবণ জলে দ্রবিত ছিল, ফোটানোর সময় উদ্বায়ী জল উড়ে গেছে, অনুদ্বায়ী লবণ রয়ে গেছে।

অনেক কাজে আমাদের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল প্রয়োজন, যার মধ্যে একেবারেই ময়লা থাকবে না। ল্যাবরেটরীর নানা পরীক্ষাতে, ইনজেকসনে ও হাসপাতালের কাজে, ব্যাটারীতে, ফটোগ্রাফির কাজ ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ জল ছাড়া চলে না। প্রাকৃত জলকে পাতিত করে এই বিশুদ্ধ জল তৈরী করা হয়। পাতন যন্ত্রের একটি ছবি দেওয়া হল (চিত্র ২৪)।

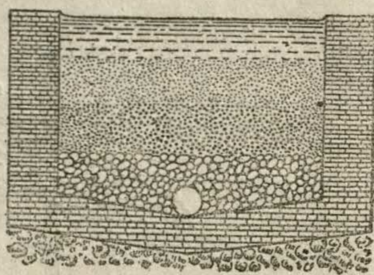


চিত্র ২৪। পাতন-যন্ত্র

একটি ফ্লাস্কে সাধারণ জল নিয়ে সামান্য পটাস পারমাঙগানেট মিলিয়ে ফোটানো হয়।

উত্তপ্ত বাষ্প ফ্ল্যাস্ক থেকে বেরিয়ে একটি ঢালু এবং সরু শীতক-নলে প্রবেশ করে। ঠাণ্ডা হয়ে বাষ্প বিশুদ্ধ তরল জলে পরিণত হয় এবং গড়িয়ে এসে নীচের একটি আধারে সঞ্চিত হয়। শীতক-নলটির চারিদিকে সর্বদা ঠান্ডা জল প্রবাহিত করতে হয়। পারমাঙ্গানেট মেশানোর ফলে জৈবজাতীয় ময়লা এবং অনেক জীবাণু দূর করা সম্ভব হয়।

দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজে অবশ্য আমাদের এত বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন নেই। মনে হতে পারে, পানীয় হিসেবে বিশুদ্ধ জলই সব চেয়ে ভাল হবে, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। পানীয় জলে অবশ্যই কোন দূষিত ময়লা থাকবে না, কিন্তু কিছু খনিজ লবণ এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে এবং স্বাদের দিক থেকে কাম্য। পাতিত না করে নদী পুকুর প্রভৃতির জলকে প্রয়োজনমত শোধন করে পানীয় রূপে ব্যবহার করা হয়। নদীতীরবর্তী সহরে সর্বদাই নদীজল ব্যবহার করা হয়। কলকাতার জল অধিকাংশই হুগলী নদী থেকে সরবরাহ করা হয়। পাম্প দিয়ে নদীর জল তুলে এনে কতকগুলো জলাশয়ে রেখে দেওয়া হয়। খাদ কেটে নদীর তীরে বড় পুষ্করিণীর মত এই জলাশয়গুলি তৈরী করে নেওয়া হয়। এখানে জলের ভাসমান ময়লাগুলি থিতিয়ে যায়। লোহার-জালির খাঁচায় করে বড় বড় ফটকিরিখণ্ড এই জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফটকিরি ভাসমান ময়লাগুলিকে অনেক সহজে থিতিয়ে দেয়। এই সময় সূর্যকিরণেও অনেক জীবাণু মরে যায়। এই জলাশয়গুলির পাশেই থাকে ইটের তৈরী চৌবাচ্চার মত কতগুলি বিরাট পরিস্রুতি-আধার। এই আধারের তলদেশ সমতল নয়। মাঝখানটা ঢালু ও নীচু হয়ে গেছে (চিত্র ২৫)। পরিস্রুতি-আধারের নীচের অংশে থাকে প্রায় দুই মিটার কাঁকর এবং পাথরের নুড়ি। তার উপরে মোটা বালুর পুরু স্তর থাকে এবং সর্বোপরি থাকে মিহিবালুর স্তর। জলাশয় থেকে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল এই জলাধারে আসে এবং বালু ও পাথরের স্তর অতিক্রম করে নীচে এসে জমা হয়। সেখান থেকে জল একটা নল বেয়ে চলে যায়। বালু ও পাথরের স্তর দিয়ে যাবার সময় জলের সমস্ত অদ্রাব্য ময়লা তো দূর হয়ই, অধিকাংশ জীবাণুও দূরীভূত হয়। এই পরিস্রুত জলকে পাম্পের সাহায্যে একটি খুব উঁচু ট্যাঙ্কে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে নল বেয়ে সহরের নানা দিকে সরবরাহ হয়; যেমন, কলকাতার টালা ট্যাঙ্ক থেকে। সম্পূর্ণরূপে জীবাণু-মুক্ত করার জন্য প্রায়ই জলের সঙ্গে ক্লোরিন মিশিয়ে দেওয়া হয়। আবার কোথাও কোথাও ছোট ছোট ট্যাঙ্কে অতিবেগনী রশ্মি দিয়েও জলের জীবাণু ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

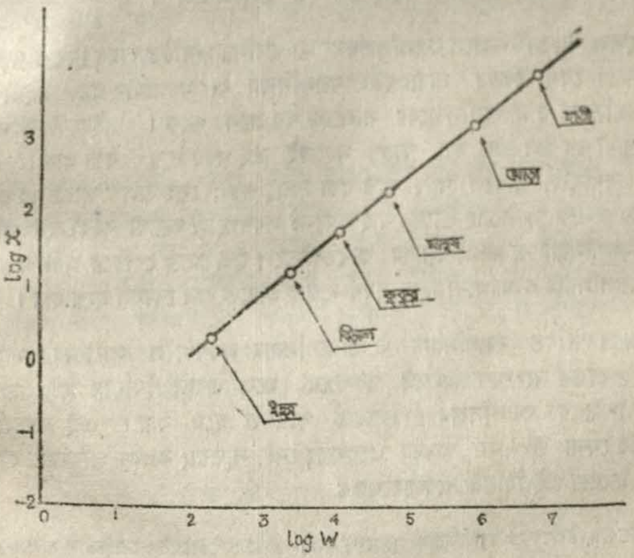


চিত্র ২৫। জল-পরিস্রুতির আধার

শরীরের জন্যে কি আমাদের প্রচুর জল দরকার? তা মানুষের দেহের বেশীর

ভাগটাই তো জল। একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহের ওজনের 60% জল, আর নবজাত শিশুর 77%। শরীরের এই জলের পরিমাণ শতকরা একভাগ কমে গেলেই আমরা তীব্র পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়ি। আরও বেশী কমলে নিদারুণ অস্বস্তিবোধ হয়। নিঃশ্বাস, প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিদিন একজন লোকের গড়ে 2750 সিসি জল [illegible]য়ে যায়, সুতরাং এই জল পূরণ করে দিতেই হয়। জলের এই লাভক্ষতির একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হল।

	জল গ্রহণ		জল অপসারণ
	সিসি		সিসি
পানীয় হিসাবে	1650	ঘামের সঙ্গে	500
খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে	750	নিঃশ্বাসের সঙ্গে	400
আভ্যন্তরিক খাদ্য-		মলের সঙ্গে	150
দ্রব্যের জারণে	350	প্রস্রাবের সঙ্গে	1700
	2750 সিসি		2750 সিসি



চিত্র ২১। বিভিন্ন প্রাণীদেহে জলের চাহিদা

শুধু মানুষ কেন, অন্য সব জীবজন্তুরও এমনি জল দেওয়া-নেওয়ার একটা সাম্য রয়েছে। কয়েকটি মরুপ্রাণী ছাড়া অন্য সব প্রাণীরই জলের চাহিদা শরীরের ওজনের অনুপাতে হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, W ওজনের কোন জন্তুর জলের

চাহিদা যদি x হয় তবে, উহাদের সম্পর্কটি হবে,

$$W = x^{0 \cdot ৪৪}$$

এখানকার লেখচিত্র থেকে সেটা সহজেই বুঝতে পারা যাবে (চিত্র ২৬)।

সাধারণ ধোয়া-মোছা বা পরিষ্কার করার কাজে কিংবা স্নানের জন্য আমরা সর্বদা অশোধিত জলই ব্যবহার করি, শোধন করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রায়ই অসুবিধা দেখা দেয় সাবান দিয়ে কাপড়-কাচার সময়। সাবানে থাকে সোডিয়াম অলিয়েট, সোডিয়াম স্টিয়ারেট প্রভৃতি জৈবজাতীয় যৌগ। এগুলি জলের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল ফেনার সৃষ্টি করে। কাপড় পরিষ্কার করার জন্য এই ফেনা প্রয়োজন, ফেনাই ময়লা টেনে নিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় কুয়োর জল, প্রস্রবণের জল, এমনকি কোন কোন নদীজলেও ফেনা হয়না। এসব জলে সাবান যেন ছানা কেটে কেটে যায়, ফেনার পরিবর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো তলানি পড়তে থাকে। সাবানের অযথা অপচয় হয়, ফেনার অভাবে কাপড় পরিষ্কার হয় না। এসব জলকে আমরা বলি "খর জল" আর যে জলে সাবানের ফেনা সহজেই হয় সেটা "মৃদু জল' বা "কোমল জল"।

"জলের খরতা"—জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম-ঘটিত লবণ দ্রবিত থাকলেই জলের খরতা দেখা দেয়। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট অথবা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট খর জলে থাকে। বাইকার্বনেট থাকলে তাকে অস্থায়ী খর জল বলা হয়, কারণ সহজেই এই খরত্ব দূর করা যায়। কিন্তু সালফেট লবণগুলি থাকলে খরত্ব দূর করা কিছু শক্ত ; সেই জল "স্থায়ী খর জল"। অস্থায়ী খর জলকে ফোটালেই তাদের বাইকার্বনেট লবণগুলি অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হয় এবং ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটরূপে জল থেকে বেরিয়ে অধঃক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ-মুক্ত হওয়াতে জল কোমল হয়ে যায়।

খর জলে দ্রবিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণগুলি সাবানের সোডিয়াম স্টিয়ারেট প্রভৃতির সংস্পর্শে এলেই পরস্পরের মধ্যে একটা বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে সোডিয়াম স্টিয়ারেট ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটে পরিণত হয়ে যায়। এই ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেটের ফেনা উৎপাদন ক্ষমতা একেবারে নেই, সুতরাং কাপড় পরিষ্কার হয় না। রসায়নের ছাত্রেরা এই বিক্রিয়াটিকে লেখেন ঃ

সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট + ক্যালসিয়াম সালফেট = ক্যালসিয়াম ষ্টিয়ারেট + সোডিয়াম সালফেট

এ তো হল সাবান দিয়ে কাপড় কাচার অসুবিধার কথা। খর জলের আরও অসুবিধা আছে। সবাই দেখেছেন, কেটলীতে কয়েকদিন জল ফোটালে, কেটলীর ভিতরের গায়ে একটা শক্ত সাদা প্রলেপ পড়ে। ক্রমশঃ সেটা পুরু হতে থাকে এবং সহজে তোলা যায় না। এই প্রলেপ বা স্তরে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট ও কার্বনেট জমে। এই জমাট কলাইটা যখন যথেষ্ট পুরু হয় তখন সেই কেটলীতে জল ফোটাতে

অনেক সময় লাগে এবং জ্বালানিও বেশী লাগে। ছোট কেটলীর জল ফোটাতে কয়লার যে অপচয় হয় সেটা হয়ত তেমন গায়ে লাগবে না। কিন্তু যখন এরকম জল বয়লারে প্রচুর ব্যবহার করা হয় তখন বয়লারের গায়েও বেশ পুরু স্তর জমে এবং তারপর সেই জল প্রচুর কয়লা পুড়িয়েও ফোটান দুষ্কর হয়ে ওঠে। তাছাড়া বয়লারের ক্ষতিও হয় এই কারণে। রেলের বা জাহাজের ইঞ্জিনে, ফ্যাক্টরীর নানা কাজে বয়লার ব্যবহার করতে হয় এবং শত শত টন জল ফোটাতে হয়। সেখানে মোটেই খরজল ব্যবহার করা চলবে না। শুধু কয়লার অপচয় নয়, দামী বয়লারের ক্ষতি করা যায় না। জল খর হলে সেটাকে কোমলায়িত করে নিয়ে বয়লারে দিতে হবে।

পানীয় জলও অতিরিক্ত খর হওয়া ঠিক নয়, কারণ বেশী খর জল ব্যবহার করলে পেটের রোগ দেখা দেয়। জলের খরতা মাপা হয় ডিগ্রিতে। প্রতি লক্ষ ভাগ জলে একভাগ ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকলে (অথবা তার তুল্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের অন্য লবণ থাকলে) তার খরতা এক ডিগ্রি ধরা হয়। 22° ডিগ্রি খরজল বললে বুঝতে হবে ঐ জলের লক্ষ কিলোগ্রামে 22 কিলোগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট রয়েছে। অনেক সহরের জল গভীর নলকূপ থেকে সরবরাহ করা হয়, আর সেইজন্য প্রায়ই বেশ খর হয়। সুতরাং জলকে কোমল করা প্রয়োজন। খরজলের কোমলায়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; দুই একটি আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রকৃতিজাত একরকম খনিজ মাটি পাওয়া যায়, যার নাম জিয়োলাইট; এরা হচ্ছে সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট [সঙ্কেত, $Na_2Al_2Si_4O_{12}$]। আজকাল এরকম পদার্থ কৃত্রিম উপায়েও তৈরী হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে, পারমুটিট (permutit); আমরা সংক্ষেপে একে লিখব, NaP। খরজলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম-জাত পদার্থগুলি আয়নিত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সেখানে Ca^{++} এবং Mg^{++} আয়ন থাকে। এই সব আয়ন NaP-এর সংস্পর্শে এলে তারা পারমুটিটের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সোডিয়ামকে প্রতিস্থাপিত করে দেয়। যে বিক্রিয়া ঘটে তাকে লেখা যায়:

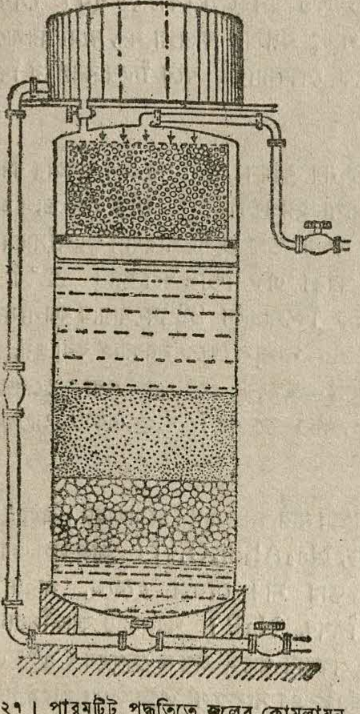
2Na-P + Ca-সালফেট = সোডিয়াম সালফেট + $Ca\text{-}P_2$

2Na-P + Mg-বাইকার্বনেট = সোডিয়াম বাইকার্বনেট + $Mg\text{-}P_2$, ইত্যাদি।

এর ফলে জলে আর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম থাকে না, সেগুলো অদ্রব পারমুটিটে চলে যায়। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দূর হয়ে যাওয়াতে জলের খরতা লোপ পায়। সাধারণতঃ উঁচু একটি টাওয়ারের মধ্যে পারমুটিট রেখে উপর থেকে নীচে খর-জল পরিচালনা করা হয় (চিত্র ২৭)। পারমুটিট স্তরের উপরে ও নীচে খানিকটা

মোটা বালু ও পাথরের নুড়ি থাকে। পারমুটিট স্তর জলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম টেনে নেয়, টাওয়ারের তলায় এসে মৃদুজল সঞ্চিত হয়।

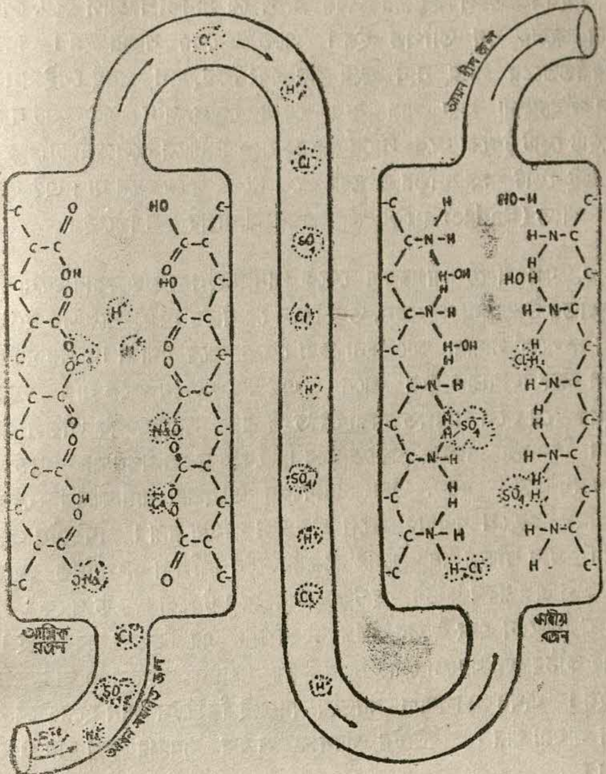
কয়েকদিন ব্যবহার করলে পারমুটিটের খরতা-দূরীকরণ ক্ষমতা লোপ পায়, কারণ তার প্রায় সবটাই CaP_2-তে পরিণত হয়ে যায়। তখন ঐ পারমুটিটকে পুনরুজ্জীবিত করে নিতে হয়। খাদ্য লবণের গাঢ় দ্রবণ উপর থেকে প্রবাহিত করলেই তাতে আবার NaP তৈরী হয়। সুতরাং সেটা দিয়েই পুনরায় জলের কোমলায়ন করা যায়। অতএব, একই পারমুটিট বহুদিন ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র ২৭। পারমুটিট পদ্ধতিতে জলের কোমলায়ন

আয়ন-সমন্বিত নানা রকমের রজন (resin) আজকাল তৈরী হয়েছে। এদের কতকগুলি অম্লজাতীয়, যাতে H^+-আয়ন আছে, আবার কতকগুলি ক্ষারীয়, যাতে OH^--আয়ন আছে। এই দুই জাতীয় রজন দুইটি প্রকোষ্ঠে পরপর রেখে খরজল পরিচালিত করলে জলের সব রকম আয়ন দূর করা যায় (চিত্র ২৮)। এতে জল শুধু মৃদু নয়, বিশুদ্ধও হয়। প্রথমে আম্লিক রজনগুলি প্রবাহিত খরজল থেকে Ca^{++}, Mg^{++}, Fe^{++}, ইত্যাদি আয়ন শোষণ করে নেয় এবং পরিবর্তে H^+-আয়ন ছেড়ে দেয়। এই জল অতঃপর ক্ষারীয় রজনের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেখানে OH^--আয়নগুলির স্থলে অপরা-আয়ন SO_4^{--}, CO_3^{--} ইত্যাদি শোষিত হয়। ফলে, জলে প্রায় কোন আয়নই থাকে না, বিশুদ্ধ কোমল জল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটির নাম "Deionisation of water"।

খরজলের অসুবিধার কথা এর আগে বলেছি। আরও নানা অসুবিধা আছে খরজল নিয়ে। চামড়া ট্যান করা যায় না খরজলে। খরজলের ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্যানিন নষ্ট হয়ে যায়। কাগজের প্রস্তুতিতে বা চিনির কলেও খরজল চলবে না! চিনির কেলাসনে ওসব থাকা সঙ্গতও নয়। ভাল দানা বাঁধে না। বস্ত্ররঞ্জনে খরজল একেবারেই অচল। এইসব কারণেই খরজল কোমলায়িত করা বিশেষ দরকার।



চিত্র ২৮। রজন সাহায্যে জলের আয়ন দূরীকরণ

সাগরজলের লবণতা অপসারণ

অনেক সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানে স্বাদু জলের খুব অভাব দেখা যায়। কাছেপিঠে কোন নদী বা জলাধার নেই বলে এসব জায়গায় সমুদ্রজলকে ব্যবহার-যোগ্য করতে পারলে খুব সুবিধা হয়। অনেকদিন থেকেই সমুদ্রের নোনাজলকে লবণমুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। বলা যেতে পারে, সমুদ্রজল পাতিত করেই ত লবণ দূর করা সম্ভব। কিন্তু এতে জ্বালানির খরচ পড়ে খুব বেশী। প্রতি পাউণ্ড জলের জন্য প্রায় 1000 BTU তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। জাহাজে এরকম পাতন করে নেওয়া জল ব্যবহার হয় বটে, তবে সেখানে ইঞ্জিনের উদ্বৃত্ত তাপ একাজের জন্য পাওয়া যায়। ধনকুবেরের দেশ কুয়াইতে অবশ্য সমুদ্রজলের "পাতন" করেই স্বাদু জল সরবরাহ করা হয়েছে। পাতন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজকাল খরচ অনেকটা কমান সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রজলকে কতকগুলি উত্তপ্ত মোটা নলের ভেতর দিয়ে পরিচালিত করলে তার খানিকটা বাষ্পীভূত

হয়। সেই বাষ্পকে অনেকগুলো সরু নলে পরিচালিত করলে সেটা তরল বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। তরল হওয়ার সময় বাষ্প যে লীনতাপ ত্যাগ করে, সেই তাপেই আবার লোনা জলের নল তাপিত হয়। এতে তাপের সাশ্রয় হয়। কিন্তু লোনা জলের নলের ভিতরের গায়ে নুন জমে যায় এবং কিছুকাল পরেই সেই নল বন্ধ হয়ে যায়। জল পরিচালনা করা যায় না। দেখা গেছে, যদি এই জমাট নুনের শল্ক (scales) ছোট ছোট টুকরো করে সমুদ্রজলের সঙ্গে মিশিয়ে নলে পরিচালিত করা হয়, তবে নুন এই ছোট শল্ক-নুড়ির উপরেই জমে, নলের গায়ে জমে না ; এই ব্যবস্থা, যার নাম ব্যাজার পদ্ধতি (Badger process), এখন আশাপ্রদ ফল দিচ্ছে।

এ ছাড়াও, কম খরচে সাগরজল থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্যে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি পদ্ধতির উদ্ভাবনা করেছেন, তার কোন কোনটির কিছু প্রয়োগও হচ্ছে। এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে এখানে। সমুদ্রজলকে খুব শীতল করলে বরফ হিমায়িত হয়ে আসে। এই বরফে লবণ থাকে না। সুতরাং এই বরফকে পৃথক করে জলে পরিণত করা যেতে পারে। সমুদ্রজলকে শীতল করার জন্য অবশ্যই কোন হিমায়ক ব্যবহার করতে হবে। কোন তরল যখন বাষ্পায়িত হয় তখন সেটি তাপশোষণ করে। ফলে, তার চারদিকের তাপমাত্রা যায় কমে। দেখা গেছে, বিউটেনকে হিমায়করূপে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিউটেন জলের সঙ্গে মিশ খায় না। খুব শীতল সমুদ্রজলের সঙ্গে বিউটেন মিলিয়ে বাষ্পায়িত করলে, তাপ অপসারণের ফলে এক রকম কঠিন ছোট ছোট বরফের টুকরো জমতে থাকে। এগুলো বাস্তবিক কিন্তু বিউটেন এবং জলের মিশ্র বরফশিলা, এর ভিতরে লবণ নেই। ঠান্ডা জলস্রোতে এই কঠিনাকার বরফগুলো ধুয়ে নিয়ে (যাতে গায়ে লবণ না লেগে থাকে) পৃথক করা হয়। এখন তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলেই বিউটেন গ্যাস হয়ে উবে যায় আর লবণমুক্ত জল পাওয়া যায়। বিউটেন গ্যাসকে আবার ব্যবহার করা যায় ও এর কোন অপচয় হয় না।

অভিসরণের কথা (osmosis) বোধ হয় অনেকেরই জানা। কোন জলীয় দ্রবণ যদি বিশুদ্ধ জল থেকে একটা "অর্ধপ্রবেশ্য ঝিল্লী বা পর্দা" (semipermeable membrane) দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে জল পর্দার ভিতর দিয়ে গিয়ে দ্রবণটিকে লঘুতর করে দেয়। এই পর্দাগুলোর বিশেষত্ব হল, জল অনায়াসে ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে চলাচল করতে পারবে, কিন্তু দ্রাব (মনে কর, লবণ) এই পর্দার ভিতর দিয়ে যেতে পারবে না। অনেকটা চাপ সহ্য করতে পারে এরকম ঝিল্লী আজকাল সেলুলোজ এসিটেট থেকে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এরকম একটা ঝিল্লীর একদিকে সমুদ্রের লোনাজল আর অপর দিকে স্বাদু জল রেখে যদি লোনাজলের দিকে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়, তবে লবণ ঝিল্লী অতিক্রম করবে না কিন্তু লবণমুক্ত জল ঝিল্লী পেরিয়ে চলে আসবে। এ পদ্ধতির প্রয়োগ খানিকটা সীমিত। কারণ, খুব বেশী চাপ দেওয়া যায় না, সেটা ঝিল্লীর সহনক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। বস্তুতঃ এটি একটি প্রতি-অভিসরণ পদ্ধতি (Reverse osmotic method)।

আর একটি পদ্ধতির কিছু কিছু প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। খরজলের কোমলায়নে যে কৃত্রিম রজন দিয়ে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন মুক্ত করা হয়, সেই উপায়টি এখানেও প্রবর্তিত হয়েছে। পরপর সাজানো সরু সরু কতকগুলি সেলে লোনাজল ভরতি করে নেওয়া হয়। এই সেলগুলির দুইপাশের দেওয়াল বিশেষ রকমের সরন্ধ্র (porous) রজনের তৈরী। একদিকের দেওয়াল আম্লিক রজনের (R-H), অপরদিকে ক্ষারীয় রজনের (R′-OH)। আম্লিক রজনের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ক্যাটায়ন (Na^+-আয়ন) সহজেই অতিক্রম করার সুযোগ পাবে, কিন্তু অ্যানায়ন (Cl^--আয়ন) বাধা পাবে। সেইরূপ ক্ষারীয় রজনের দেওয়ালে বিপরীত ব্যাপার ঘটবে। সেলগুলির শেষ দুই সীমান্ত ব্যাটারীর পরা ও অপরাপ্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। লোনাজলে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে, অর্থাৎ সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়ন আছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে Na^+ -আয়ন অপরাপ্রান্তের দিকে এবং ক্লোরাইড আয়ন পরাপ্রান্তের দিকে যেতে থাকে। সোডিয়াম আয়ন আম্লিক রজন পেরিয়ে যায় এবং সেই সময় রজনে অনেকটা শোষিতও হয়। আবার ক্লোরাইড আয়ন অপরদিকে ক্ষারীয় রজনের পর্দা অতিক্রম করে এবং অনেকটা শোষিত হয়ে যায়। এর ফলে লোনাজল ক্রমে ক্রমে আয়নমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ জলে পরিণত হয়। এইভাবে ঈষৎ লোনাজল থেকে ব্যবহারযোগ্য জল পাওয়া যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে অন্ততঃ পাঁচ কোটি গ্যালন সমুদ্রজল এই সব পদ্ধতি প্রয়োগ করে লবণতা-মুক্ত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এককালে ক্যালিফোর্নিয়ার কোয়ালিংগা জনপদে (Coalinga) পানীয় জল পাঠাতে হত ট্রাকে করে বহুদূর থেকে। প্রতি হাজার গ্যালনের জন্য খরচ পড়ত অন্ততঃ আট ডলার। এখন সেখানে দৈনিক 28000 গ্যালন স্বাদুজল তৈরী হচ্ছে সমুদ্রের জল থেকে, ব্যয় প্রতি হাজার গ্যালনে 1·45 ডলার। ফ্লোরিডার কী-ওয়েস্ট দ্বীপে নব্বুই মাইল দূর থেকে বড় পাইপে করে প্রয়োজনীয় জল পাঠাতে হত। এখন সেখানে সাগরজল শোধন করে জল সরবরাহ সম্ভব হয়েছে অনেক কম খরচায়। মনে করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রপারের জনপদে বা কোন কোন দ্বীপে যেখানেই জলকষ্ট সেইখানেই এইসব উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

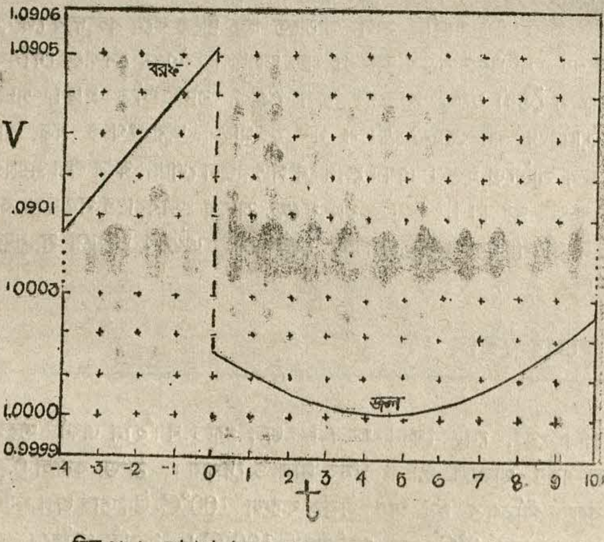
৮। জলের স্বভাব

জলের গন্ধ নেই, নেই কোন স্বাদ। জল স্বচ্ছ বর্ণহীন একটি তরল। তবে অনেকটা জল একত্র থাকলে তাকে ঈষৎ নীলাভ দেখায়। ঠাণ্ডা করলে 0°C উষ্ণতায় জল কঠিন বরফে পরিণত হয় আর উত্তপ্ত করলে 100°C উষ্ণতায় জল ফুটতে থাকে অর্থাৎ, জলের হিমাঙ্ক 0°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 100°C। কথাটা ঘুরিয়ে বললেই বোধ হয় ভাল হয়। বস্তুতঃ এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে, যে তাপমাত্রায় জল জমে যায় তাকেই 0°C বলে ধরা হয়েছে এবং যে তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকে তাকে 100°C ধরা হয়েছে। জলের এই হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ভিত্তি করেই তাপমাত্রার স্কেল স্থির করা হয়েছে।

হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু চাপের উপরে নির্ভর করে। চাপ যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। মনে কর, জলকে দুই অ্যাটমসফিয়ার চাপে রেখে উত্তপ্ত করা হল, তা হলে জল ফুটবে 120°C-এরও উপরে। অপরদিকে চাপ বৃদ্ধিতে জলের হিমাঙ্ক যায় নেমে। 100 অ্যাটমসফিয়ার চাপে যদি জলকে শীতল করতে থাক তাহলে সেই জল কঠিন বরফ হবে প্রায় -1°C উষ্ণতায়।

শুধু তাপমাত্রা নয়, বিজ্ঞানীদের নানা মাপজোক প্রায়ই জলের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন, জলের ঘনত্বকেই ঘনত্বের একক ধরে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার (1 cc) জলের ওজনকে ধরা হয়েছে "এক গ্রাম"। এখন দেখা গেছে, পারদ জলের চেয়ে 13·6 গুণ ভারী, অর্থাৎ পারদের ঘনত্ব 13·6 গ্রাম। এই হিসাবে লোহার ঘনত্ব 7·8 গ্রাম, হীরকের 3·5 গ্রাম, গ্লিসারিনের 1·3 গ্রাম, কোহলের 0·8 গ্রাম।

জলের এই ঘনত্ব স্থির হয়েছে 4°C তাপমাত্রায়। উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে অন্য সব তরলের মত জলেরও ঘনত্ব বদলায়। কিন্তু জলের এই পরিবর্তন একটু বিচিত্র রকমের। উষ্ণতা কমতে থাকলে জলের আয়তনও কমে, অর্থাৎ ঘনত্ব ঘাড়ে। এমনি করে তাপমাত্রা যখন 4°C-এ পেঁছয়, তখন জলের ঘনত্ব হয় সর্বাধিক, অর্থাৎ প্রতি সি.সি.তে এক গ্রাম। আরও ঠান্ডা করলে জলের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু তা না হয়ে ঘনত্ব কমতে শুরু করে। তারপর 0°C-এ পেঁছলে জল জমে বরফ হতে থাকে।



চিত্র ২৯। তাপমাত্রার সঙ্গে জলের আয়তনের পরিবর্তন

আরও একদিক দিয়ে জলের স্বভাবটা একটু বেয়াড়া রকমের। সাধারণতঃ কঠিন জিনিষ গলে গেলে তার আয়তনটা বেড়ে যায়, অর্থাৎ ঘনত্ব কমে, যেমন, মোম বা

সীসাতে। তরল মোম বা তরল সীসার ঘনত্ব তাদের কঠিন অবস্থার ঘনত্বের চেয়ে কম। কিন্তু জলের বেলাতে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপার ঘটে। বরফ গলে গেলে আয়তন বাড়ে না, বরং কমে যায়। অর্থাৎ, বরফ জলের চেয়ে হালকা। এইজন্যে বরফ জলের উপর ভাসতে থাকে। এক গ্রাম জল 0°C-এ যখন জমে তখন তার আয়তন 1/11 অংশ বৃদ্ধি পায় 0°C-এ বরফের ঘনত্ব 0·91 গ্রাম আর জলের ঘনত্ব 0·999 গ্রাম। এক খণ্ড বরফ সহ একটা গ্লাস জল দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করে রাখলে, বরফের একটু অংশ উঁচু হয়ে থাকবে। বরফটা গলে গেলে কিন্তু জল উপচে পড়বে না, কারণ বরফ গলে গেলে আয়তনে কমে যায়। তাপমাত্রার সঙ্গে আয়তন কিভাবে বদলায় তার একটি ধারণা চিত্র ২৯ থেকে পাওয়া যাবে।

জলের এই বিশেষ স্বভাবটা কিন্তু বিশ্বকর্মা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই করেছেন। ঠাণ্ডাতে যখন সমুদ্রের জল জমাট বাঁধতে আরম্ভ করে, তখন বরফ হালকা বলে উপরে ভাসতে থাকে, নীচের স্তরের জল তখনও 0°C-এর কাছে তরল থাকে। উপরের বেশী চাপের জন্য এবং বরফের তাপবাহিতা কম বলে নীচের জল আর বেশী জমাট বাঁধতে পারে না। তাই মাছ আর অন্যান্য জলজীব রক্ষা পেয়ে যায়। তা না হলে নীচ থেকে শুরু করে সমুদ্রের সমস্ত জল জমে গেলে শীতের দেশের সমস্ত জলপ্রাণীর অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যেত।

শীতপ্রধান দেশে অনেকসময় বেশী ঠাণ্ডা পড়লে জলবাহী নল ফেটে যায়। এর কারণ, নলের ভিতরে জল জমে গিয়ে আয়তন বাড়ে আর তার চাপে নল ফেটে যায়। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে জল প্রবেশ করে থাকে। শীতপ্রধান দেশে বা পাহাড়ের উপরের দিকে যখন তাপমাত্রা খুব কমে যায়, সেই জল জমে বরফ হয়, আয়তন বৃদ্ধি পায় সুতরাং চাপ খুব বাড়ে। সেই চাপে পাথর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। শিলাক্ষয়ে সহায়তা হয়।

কোন তরল বা কঠিন পদার্থ রেখে দিলে তার খানিকটা বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাষ্পীভবনটা খুবই কম, নগণ্য মনে করা যেতে পারে। আবার কোন কোন পদার্থের সাধারণ তাপমাত্রাতেই যথেষ্ট বাষ্পীভবন হয়। যেমন, কোহল, ইথার, কর্পূর, ন্যাপথলিন ইত্যাদির উদ্বায়িতা যথেষ্ট; কিন্তু পারদ, চিনি, কাচ, ইত্যাদির উদ্বায়িতা নেই বললেই চলে। জল কিন্তু যথেষ্ট উদ্বায়ী, সব সময়েই জল উবে যেতে চায়। তাই ভেজা কাপড়, দিদিমার ডালের বড়ি, ঠাকুমার আমসত্ত্ব সহজেই শুকিয়ে যায়। এই উদ্বায়িতা উষ্ণতা-নির্ভর, তাপমাত্রা যত বেশী হবে, বাষ্পীভবন তত বাড়বে।

বাতাস পাম্প করে বের করে দিয়ে একটা আবদ্ধ পাত্রে যদি খানিকটা জল রেখে দেওয়া হয়, তবে সেখানে কিছু বাষ্প হবেই আর সেই বাষ্পের একটা চাপও থাকবে। পাত্রের সঙ্গে সুবিধামত একটা চাপমান-যন্ত্র বা ম্যানোমিটার লাগানো থাকলে বাষ্পের চাপ সেখান থেকে জানা যায়। বিভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পচাপ মেপে দেখা গেছে উষ্ণতা বাড়তে থাকলে বাষ্পচাপও বাড়ে। 20°C উষ্ণতায় জলের বাষ্পচাপ 17·5 মিমি, 50°C-এ 92·5 মিমি, আর 100°C-এ 760 মিমি অর্থাৎ এক অ্যাটমসফিয়ার। কোন

তরল পদার্থের বাষ্পচাপ যখন তার উপরের চাপের সমান হয় তখনই তরলটি ফুটতে থাকে। 100°C-এ এলে জলের বাষ্পচাপ এক অ্যাটমসফিয়ার হয়, তাই 100°C-এ জল ফুটতে থাকে। মনে কর, খুব উঁচু কোন পাহাড়ে বায়ুচাপ 525 মিমি। সেখানে জল উত্তপ্ত করতে থাকলে যখন তাপমাত্রা 90°C হবে, তখন বাষ্পচাপ হবে 525 মিমি। অতএব 90°C তাপমাত্রাতেই জল সেখানে ফুটতে শুরু করবে। দার্জিলিংয়ে ডাল ভাল সেদ্ধ করা যায় না বলে যে অতসীমাসী গজ গজ করতে থাকেন, তার একটা কারণ হচ্ছে সেখানে বায়ুচাপ কম বলে, ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা 100°C-এর কম। উষ্ণতা কম বলে ডাল সেদ্ধ হতে অসুবিধা হয়।

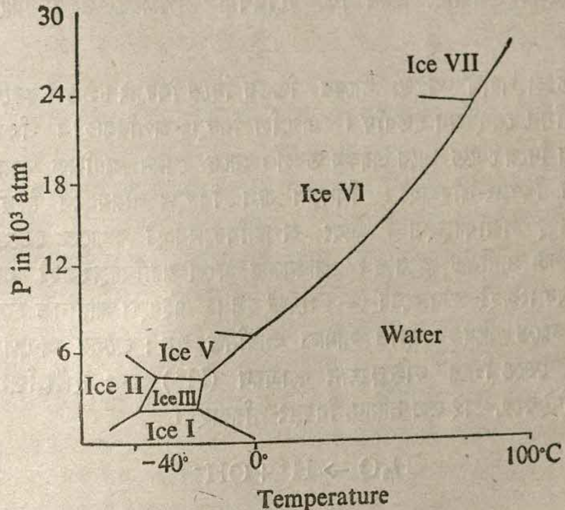
অপরদিকে, বাইরের চাপ বেশী হলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। এইজন্যই বয়লার থেকে স্টীম তৈরী করার সময় অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয়। তার ফলে জল অনেক উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটবে আর সেই স্টীমে সমধিক তাপশক্তি থাকবে। এরকম উচ্চতাপীয় স্টীম থেকে ইঞ্জিন কাজ আদায় করতে পারে অনেক বেশী।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এমনি করে উপরের চাপ যদি খুব বেশী করে দেওয়া হয় তবে জল কি যে কোন উষ্ণতায় ফুটান সম্ভব হবে? তা কিন্তু নয়, জলের তরল অবস্থার একটা ঊর্ধ্বসীমা রয়েছে। তাপমাত্রা যদি 374°C-এর উপরে হয় তাহলে জল আর তরল থাকবে না, যতই চাপ দেওয়া হোক না কেন। এই তাপমাত্রাকে বলে "ক্রান্তিক উষ্ণতা" (Critical temperature)। এই উষ্ণতার ঊর্ধ্বে জল কেবল বাষ্পাবস্থায় থাকতে পারে।

ধর, আজ এ ঘরের তাপমাত্রা 20°C। এখানে একটি পাত্রে যদি জল রেখে দেওয়া হয়, তাহলে খানিকটা জল বাষ্পীভূত হবে, যতক্ষণ না এই উষ্ণতার বাষ্পচাপ সৃষ্টি হয় (17·5 মিমি)। এই চাপে এবং উষ্ণতায় জল ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকবে। এখন যদি এই জলে একটু বরফ মিশিয়ে দিই, তাহলে দেখা যাবে বরফ আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত বরফ আর থাকবে না ; এই উষ্ণতায় বরফের বাষ্পচাপ জলের চেয়ে বেশী। বস্তু মাত্রই নিম্নচাপে যেতে চেষ্টা করে ; তাই বরফ গলে যায়, যাতে কম বাষ্পচাপ হয়। তেমনি, খুব শীতল অবস্থায়, ধর, −10°C-এ খানিকটা বরফ নেওয়া হল, তারও একটা বাষ্পচাপ থাকবে এবং বরফ ও বাষ্প একটা সাম্যাবস্থায় থাকবে। এখন এর সঙ্গে যদি খানিকটা জল মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা জমে বরফ হয়ে যাবে, কারণ এই উষ্ণতায় জলের বাষ্পচাপ বরফের চেয়ে বেশী। দেখা যাচ্ছে, উচ্চতর উষ্ণতায় জল ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকে আর নিম্নতর উষ্ণতায় বরফ ও বাষ্পের সাম্য দেখা যায়। একটি মাত্র বিশেষ চাপ ও উষ্ণতায় জল, বাষ্প ও বরফ এই তিনটিই একত্র সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে, সেই অবস্থার চাপ 4·58 মিমি আর তাপমাত্রা 0·0075°C। একে বলে বরফ-জল-বাষ্পের "ত্রৈধ বিন্দু" (triple point)।

সাধারণ অবস্থায় জল জমে গিয়ে যে বরফ হয় তাকে বলা হয় "বরফ I" (Ice I)। তার কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আরও বিভিন্ন রকমের বরফের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। তাপমাত্রা কমিয়ে কমিয়ে যদি −22°C-এ যাওয়া যায় আর তার উপরে চাপ প্রয়োগ করা হয় প্রতি বর্গ সেন্টিতে 3500 কিলোগ্রাম, তা হলে বরফ II-এর সন্ধান পাওয়া

যায়। বরফ I এবং বরফ II-এর স্ফটিকাকার এক নয়, এবং ভৌতধর্মগুলিরও কিছু পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং তাদের বিভিন্ন ধরা হয়। এইভাবে অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন তাপমাত্রায় মোট সাত রকমের বরফ পাওয়া গেছে। এগুলো সবই স্ফটিকাকার জল বটে, কিন্তু এদের ভৌতধর্ম, যেমন, তাপগ্রাহিতা, লীনতাপ, গলনাঙ্ক, প্রভৃতি বিভিন্ন। বরফ I থেকে বরফ VII—এই সাত রকমের বরফ অবশ্য উপযুক্ত



চিত্র ৩০। বিভিন্ন উষ্ণতায় নানা রকমের বরফ

চাপে বিভিন্ন তাপমাত্রার সীমাতে থাকতে পারে। এমন কি 100°C-তাপমাত্রাতেও (যেখানে এক অ্যাটমসফিয়ারে জল ফুটতে থাকে) বরফ VII পাওয়া যায়, যদি উপরের চাপটি 30,000 কিলোগ্রাম রাখা যায়। হঠাৎ শুনলে ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটা পরীক্ষিত সত্য। কি রকম চাপে কোন বরফ পাওয়া যাবে তার একটা ধারণা চিত্র ৩০ থেকে পাওয়া যাবে।

এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে আমরা এক "ক্যালোরি" উত্তাপ বলি। এটাই তাপশক্তির একক। এই তাপশক্তি নির্ণয়ের মাপকাঠিটিও জলের ভিত্তিতেই স্থির করা হয়েছে। জল যখন ফুটতে থাকে তখন তার তাপমাত্রা স্থির থাকে, কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এভাবে বাষ্পীভূত হতে নিশ্চয়ই তাপের প্রয়োজন হয়। বাষ্পীভবনের জন্য তরল যে তাপ গ্রহণ করে তাকে বলে "লীনতাপ" (latent heat)। 100°C-এ এক গ্রাম জলের বাষ্পীভবনে প্রায় 540 ক্যালোরি তাপ দরকার হয়, তাই জলের বাষ্পায়নের লীনতাপ 540 ক্যালোরি।

এই পরিমাণটা অন্যান্য সদৃশ তরলের তুলনায় খুবই বেশী। কেন বেশী সেটা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। আবার জল যখন জমে বরফ হয় তখন জল থেকে তাপ বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ হিমীভবনেরও লীনতাপ আছে। একগ্রাম জল বরফ হওয়ার সময় প্রায় 80 ক্যালোরি তাপ ছেড়ে দেয়।

জলের আর একটি স্বভাবের কথা আগেই বলেছি, জলের তাপধারণ ক্ষমতা সর্বাধিক। তাপ ধরে রাখার এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা বেশী বলেই সমুদ্রজল বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, এমন কি, পৃথিবীর তাপমাত্রাকেও অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনেক তরল পদার্থ আছে, যাদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না, যেমন, কেরোসিন, বেন্‌জিন ইত্যাদি। এগুলি বিদ্যুৎ-অপরিবাহী। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ ভিতর দিয়ে যেতে পারে এরকম তরলও আছে, যেমন, অ্যাসিড, ক্ষার বা লবণের দ্রবণ। এরা বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বিশুদ্ধ জল বিদ্যুৎ-পরিবহণে কিছুটা সক্ষম। যখন কোন অণু পরাবিদ্যুৎবাহী এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী কণাতে ভেঙে যায় তখন আমরা বলি সেটা আয়নিত হয়েছে। আয়ননের ফলে পরাবিদ্যুৎবাহী ক্যাটায়ন (+) এবং অপরাবিদ্যুৎবাহী অ্যানায়নের (−) সৃষ্টি হয়। এইরূপ আয়নিত হলেই পদার্থ বিদ্যুৎবহন করতে পারে। জলও সামান্য আয়নিত হয়; জলের অণুগুলির অতি সামান্য অংশ ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন ক্যাটায়ন (H^+) এবং হাইড্রক্সিল অ্যানায়ন (OH^-) সৃষ্টি করে, তাই জল সামান্য বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

$$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$$

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ উষ্ণতায় প্রতি এক কোটি অণুর মধ্যে একটি অণু মাত্র এভাবে বিয়োজিত হয়। এক টন জলে মোটামুটি 0·1 মিলিগ্রাম H^+ আয়ন এবং 1·7 মিলিগ্রাম OH^- আয়ন আছে। আয়ন এত কম বলেই এর তড়িদ্বাহিতা কম। আবার যে সব যৌগ তরল অবস্থায় বিদ্যুৎ বহন করে সেগুলি বিদ্যুৎ-পরিচালনার ফলে বিভাজিত হয়ে পড়ে। জলের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে জলের অণুগুলো বিভক্ত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস দেয়; $2H_2O = 2H_2 + O_2$।

জল থেকে এভাবে এক গ্রাম হাইড্রোজেন পেতে হলে যে তড়িৎ প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ হচ্ছে 96500 কুলম্ব (কুলম্ব, তড়িতের একক)।

৯। জলের রসায়ন

"ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম"—এই পাঁচটি আদি পদার্থ থেকেই সমস্ত বস্তু জগতের সৃষ্টি—এ বিশ্বাস বহুকালের। অপ্ অর্থাৎ জলকে আদি পদার্থ কয়টির অন্যতম বলে মনে করা হত। এমন কি আড়াইশ বছর আগেও মানুষের এই ধারণাই

ছিল। কিন্তু তারপর এল বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। তখন দেখা গেল, সেই বহুদিনের ধারণাটা একেবারেই ভুল। ক্ষিতি বা মাটি নানা বস্তুর মিশ্রণ; তেজ মোটে পদার্থই নয়, এক শক্তিবিশেষ; মরুৎ বা বায়ু হচ্ছে একাধিক গ্যাসের মিশ্রণ; ব্যোম হচ্ছে শূন্য বা বস্তুরহিত অবস্থা, যাকে বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে নাম দেন "ইথর"। জলও মৌলিক উপাদান নয়, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই দুটি গ্যাসের মিলনের ফলে জলের সৃষ্টি। 1766 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস হাইড্রোজেন গ্যাসের সন্ধান পান। তারপরে 1774 সালে আর এক ইংরেজ বিজ্ঞানী যোসেফ প্রিস্টলী অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। 1781 সালে প্রিস্টলী দেখতে পেলেন, একটি আবদ্ধ পাত্রে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে প্রচন্ড শব্দ করে এক বিস্ফোরণ ঘটে এবং পাত্রের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে। প্রায় একই সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের অক্সিজেনের ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাসের একটি সরু প্রবাহ প্রজ্বালিত করে জল উৎপাদন করেন। বোঝা গেল, জল মৌল পদার্থ নয়। নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন থেকে জলের সৃষ্টি। আরও প্রমাণ উপস্থিত করলেন ল্যাভয়সিয়ের। উত্তপ্ত লৌহচুরের উপর দিয়ে জলবাষ্প পরিচালনা করে দেখা গেল, হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসছে আর লৌহচুর আয়রন-অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। লোহাকে অক্সিজেনে খুব উত্তপ্ত করলেও সেই আয়রন-অক্সাইডই পাওয়া যায়। অতএব জলবাষ্পের পরীক্ষাতে, জলের অক্সিজেন লৌহের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস বিযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জলের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করেও ভোলটা, নিকল-সন, ডেভি প্রভৃতি অনেকেই জলকে বিশ্লেষিত করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করেন। এই সব পরীক্ষা থেকে নিশ্চিতভাবে জানা গেল, আয়তনের হিসাবে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগে দুইভাগ জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

জলে আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন, যেমন বাতাসে আছে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। কিন্তু এই দুইয়ের থাকার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন শুধু সাধারণভাবে মিশে রয়েছে। এই দুটি গ্যাস সেখানে নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখেছে, তাদের নিজেদের ধর্ম বা স্বভাব লোপ পায় নি। তা ছাড়া এরকম মিশ্রণে উপাদান দুটি যে কোন অনুপাতে মিশে থাকতে পারে। কিন্তু জলে যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন রয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মিশে নেই, উভয়ের মধ্যে এক রাসায়নিক মিলন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ জলে পরিণত হয়েছে। এরকম মিলনে উপাদান দুইটির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম লোপ পেয়েছে। হাইড্রোজেন একটি দাহ্য গাস; অক্সিজেনও গ্যাস, কিন্তু দাহ্য নয়, সেটি দহন-সহায়ক। জল একটি স্বচ্ছ তরল, দাহ্যও নয়, দহন-সহায়কও নয়। অর্থাৎ, মিলনের ফলে নতুন পদার্থ নতুন ধর্ম নিয়ে উৎপন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, জলে এই দুটি উপাদানের অনুপাত স্থির এবং নির্দিষ্ট, কখনও সেই অনুপাতের ব্যতিক্রম হতে পারে না। প্রায় পনের বছর ধরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুনিপুণ পরীক্ষা করে মর্লি (Morley, 1880~1895) প্রমাণ

করেছেন, ওজনের হিসাবে জলে একভাগ হাইড়োজেনের সঙ্গে প্রায় আটভাগ অক্সিজেন মিলিত হয়ে আছে।

অনুপাত	আয়তনে	ওজনে
$H_2 : O_2$	2 : 1	2·016 : 16·000

এই অনুপাতের কমবেশী হওয়া সম্ভব নয়, কোলকাতা বা কিলিমাঞ্জারো, হাভানা বা হনলুলু যেখানেই গিয়ে জল পরীক্ষা করা হোক, সেই একই অনুপাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকবে। এই উপাদান দুইটির মধ্যে অক্সিজেনের কথা বাতাসের প্রসঙ্গে* বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এখানে হাইড্রোজেনের বৈশিষ্ট্যের কিছুটা উল্লেখ করা হল।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস। হাইড্রোজেনের কথা মনে হলে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে বেলুনে যে গ্যাস ভরে আকাশে উড়িয়ে দেয়, সেই ছবিটাই চোখের সামনে ভেসে আসে। বেলুনে হাইড্রোজেন ভরতি করে ছেড়ে দিলে সেটা তরতর করে উপরে উঠে যায়, তার কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস খুবই হালকা। বস্তুতঃ পৃথিবীর লঘুতম পদার্থ এই হাইড্রোজেন। জলের ঘনত্ব ধরা হয়েছে এক, অর্থাৎ এক সিসি জলের ওজন এক গ্রাম। সেখানে এক সিসি হাইড্রোজেনে গ্যাসের ওজন মাত্র 0·000089 গ্রাম। এমন কি বাতাস, যাকে আমরা খুব হালকা মনে করি, সেটাও হাইড্রোজেনের চেয়ে সাড়ে চৌদ্দ গুণ ভারী। এক সময়ে উড়োজাহাজের ভার লাঘবের জন্য হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার হত। কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য, সহজে আগুন ধরে যায়। তাই এখন হাইড্রোজেনের বদলে অদাহ্য হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করা হয়। হিলিয়াম হাইড্রোজেন অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী, কিন্তু বাতাসের চেয়ে অনেক হালকা। আবহ বিভাগে বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের সংবাদ সংগ্রহ করে আনার জন্য প্রতিদিন বড় বড় অনেক বেলুন হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হাইড্রোজেন জ্বলার সময় অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে জল উৎপাদন করে। এই দহনের সময় প্রভূত তাপের সৃষ্টি হয়। প্রতি গ্রাম জল তৈরী হবার সময় 3800 ক্যালোরি তাপ বেরিয়ে আসে, সুতরাং জ্বলন্ত শিখার উষ্ণতা হয় খুব বেশী, 3000°C-এর উপরে। তড়িৎবাহী দুইটি টানস্টেন শলাকা কাছাকাছি নিয়ে এলে তাদের মধ্যে খুব জোরালো তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই স্ফুলিঙ্গের মধ্য দিয়ে যদি সরু নলে

* বাতাসের কথা পৃঃ ২৬

হাইড্রোজেন পাঠানো হয়, তবে সেখানে পারমাণবিক হাইড্রোজেন জ্বলতে থাকে ; তখন শিখার উষ্ণতা হয় প্রায় 4000°C-এর কাছাকাছি। এই শিখার সাহায্যে অনেক কঠিন ধাতু যেমন নিকেল, প্লাটিনাম প্রভৃতি গলানো যায়।

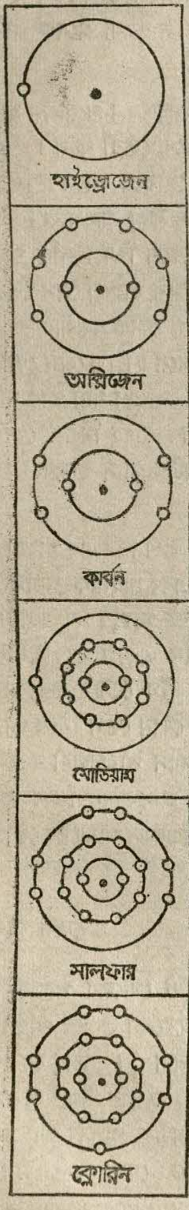
অ্যাসিড-মাত্রই হাইড্রোজেন-ঘটিত পদার্থ। অল্পস্বল্প হাইড্রোজেন প্রয়োজন হলে আমরা তা লঘু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে তৈরী করি। এই অ্যাসিডের মধ্যে দস্তা বা লোহ দিলে তৎক্ষণাৎ হাইড্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে আসে। কিন্তু যখন প্রচুর হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয় তখন আরও সস্তায় প্রস্তুত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরী করা হয়। যেসব দেশে বিদ্যুৎশক্তি প্রচুর পরিমাণে সহজে পাওয়া যায়, সেখানে জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন তৈরী হয়। বিদ্যুৎ সহজলভ্য না হলে উত্তপ্ত লোহচুর অথবা শ্বেততপ্ত কোক কয়লার উপর দিয়ে জলীয় বাষ্প পরিচালিত করা হয়। এর ফলে জল ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন দেয়। উত্তপ্ত কোকের উপর দিয়ে জলবাষ্প প্রবাহের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তার নাম "ওয়াটার গ্যাস"—এতে থাকে কার্বন-মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন। এই মিশ্রণ থেকে কার্বন-মনোক্সাইডকে সরিয়ে নিয়ে হাইড্রোজেন তৈরী হয়। ওয়াটার গ্যাস অনেক সময় গ্যাসীয় জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোজেনের প্রচুর চাহিদা নানা শিল্পে এর প্রয়োজন। প্রধানতঃ এর ব্যবহার অ্যামোনিয়া তৈরী করার জন্য। অ্যামোনিয়া দিয়েই অনেক সার এবং নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে হয়। তাই অ্যামোনিয়ার তথা হাইড্রোজেনের খুবই গুরুত্ব। এছাড়া, কৃত্রিম পেট্রোল, মিথাইল কোহল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক পদার্থ তৈরী করার জন্যও হাইড্রোজেন চাই, বনস্পতি ঘি তৈরী করতেও হাইড্রোজেন দরকার হয়। তুলাবীজের তেল এবং আরও কোন কোন তেল নিয়ে তার সঙ্গে নিকেল-চূর্ণ মিশিয়ে সামান্য গরম অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করলে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তেল ঘিতে পরিণত হয়। এরপর অনুঘটক নিকেলকে আলাদা করে নেওয়া হয়। এরকম কৃত্রিম ঘিয়ের কারখানা আজকাল আমাদের দেশে প্রচুর হয়েছে।

জলের অণু

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে জল, অর্থাৎ এই দুইটি মৌলের পরমাণুর সংযোগে জলের অণু গঠিত। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন জলের প্রতিটি অণুতে রয়েছে দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু। তাই জলের সংকেত লেখা হয়, H_2O। অণুগুলো অতি ক্ষুদ্র ; একটি জলের অণুর ওজন 3×10^{-23} গ্রাম আর তার ব্যাস মোটামুটি 2×10^{-8} সেন্টিমিটার, অর্থাৎ আয়তন প্রায় 4×10^{-24} সিসি. এত ছোট যে কোন অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীর হাতে নিস্তার নেই। বিজ্ঞানীরা যে শুধু আকার-আয়তন স্থির করেছেন তাই নয়, অণুর ভিতরের পরমাণু তিনটির প্রতিবিন্যাস পর্যন্ত বের করেছেন।

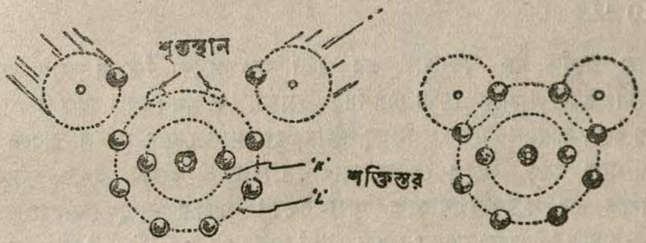
এখন প্রত্যেকেই জানেন, সমস্ত পরমাণুই তিন রকমের আদিকণা নিউট্রন, প্রোটন এবং ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। নিউট্রন ও প্রোটন কণাগুলি ওজনে সমান, কিন্তু নিউট্রনের কোন তড়িৎ-মাত্রা নেই, প্রোটনে একটি পজিটিভ বা পরাধর্মী তড়িৎমাত্রা আছে। অপরদিকে ইলেকট্রন কণাগুলির ওজন প্রোটনের তুলনায় নগণ্য। কিন্তু প্রতি ইলেকট্রনে এক মাত্রার নেগেটিভ তড়িৎ-আধান রয়েছে। ইলেকট্রনে যে পরিমাণ তড়িৎ রয়েছে তাকেই এখানে তড়িতের একক ধরা হচ্ছে। সুতরাং ইলেকট্রন ও প্রোটনের তড়িৎ-আধান সমান কিন্তু বিপরীত-ধর্মী। ইলেকট্রনের আধানের পরিমাণ বস্তুতঃ $1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ কুলম্ব।



চিত্র ৩১। পরমাণুর গঠন

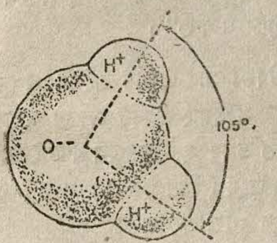
প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে তার প্রোটন ও নিউট্রনগুলি একত্র পুঞ্জিত হয়ে থাকে। আর ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রের চারদিকে বিভিন্ন চক্রাকার পথে সর্বদা খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যা এবং কেন্দ্রের বাইরের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান। কেন্দ্রটি পরাধর্মী (পজিটিভ) আর বাইরের ইলেকট্রন স্তর অপরাধর্মী (নেগেটিভ)। সম্পূর্ণ পরমাণু তড়িৎ-নিরপেক্ষ (neutral)। এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন, কার্বন, সোডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি পরমাণুর গঠন-চিত্র দেওয়া হল (চিত্র ৩১)। কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যাকে বলা হয়, "পরমাণু-ক্রমাঙ্ক"। মৌলের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব এই ক্রমাঙ্কের উপর নির্ভর করে। কিন্তু রাসায়নিক মিলনে যখন দুইটি বা ততোধিক পরমাণুর সংযোগ ঘটে তখন ঐসব পরমাণুর বাইরের শেষ স্তরে যে সব ইলেকট্রন থাকে তারাই সংযোগে অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রনগুলি হয় একত্রিত সন্নিবিষ্ট হতে চেষ্টা করে, অথবা তাদের মধ্যে ইলেকট্রনের আদান প্রদান ঘটে, এই রকম সংযোগের একটা রীতি আছে। পরমাণুগুলি সাধারণতঃ এমনভাবে ইলেকট্রন সমাবেশ করে বা দেওয়া-নেওয়া করে, যাতে মিলিত অবস্থায় পরমাণুর বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন থাকে। যেমন, অক্সিজেন পরমাণুতে বাইরের স্তরে আছে ছয়টি ইলেকট্রন। সুতরাং মিলিত হওয়ার সময় অক্সিজেন পরমাণু তার বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন পাবার জন্য অন্য অংশগ্রহণকারী পরমাণু থেকে দুইটি ইলেকট্রন সংগ্রহ করে। সচরাচর এই নিয়মেই বন্ধন ঘটে।

প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুর রয়েছে—কেন্দ্রে একটি প্রোটন আর তার বাইরে একটি ইলেকট্রন। অক্সিজেন পরমাণু যখন হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কাছ থেকে দুটি ইলেকট্রন নিজের কোলে টেনে নেয়। এর ফলে, অক্সিজেনের বাইরের স্তরে আটটি ইলেকট্রন পূর্ণ হল, আর দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে জলের অণুর সৃষ্টি হল। ইলেকট্রন হারিয়ে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রস্থ প্রোটন দুইটি অক্সিজেনের পরমাণুর বাইরে সংলগ্ন হয়ে রইল। ছবিতে ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে (চিত্র ৩২, ৩৩)।



চিত্র ৩২। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে জলের অণুর গঠন।

আরও প্রমাণিত হয়েছে, এই হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর দুই বিপরীত দিকে সোজাসুজি ঋজুরেখাতে নেই, অর্থাৎ পরমাণু তিনটির প্রতিবিন্যাস H – O – H এরকম নয়। হাইড্রোজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণুর দুইপাশে একটি কোণ সৃষ্টি করে রয়েছে। এই কোণের পরিমাণ 105° এবং অক্সিজেন কেন্দ্র থেকে প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের দূরত্ব $0{\cdot}96 \times 10^{-8}$ সেণ্টিমিটার।

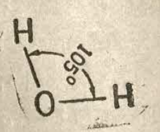


চিত্র ৩৩। জলের অণু

জলের অণুর তিনটি পরমাণুর তিনটি কেন্দ্রে তিনটি পজিটিভ বা পরাধর্মী আধান রয়েছে, আর এছাড়া দশটি ইলেকট্রন চারিদিকে প্রদক্ষিণরত রয়েছে। এই পজিটিভ আধানগুলির ক্রিয়া-কেন্দ্র (centroid) এবং নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলির ক্রিয়া-কেন্দ্র অণুর ভিতরে ঠিক একই বিন্দুতে নয়। ক্রিয়া-কেন্দ্র দুইটি পরস্পর থেকে খানিকটা দূরে। ফল কথা, অণুটির মধ্যে একটি পজিটিভ কেন্দ্র এবং একটি নেগেটিভ কেন্দ্র রয়েছে। এরকম অণুকে বলে "ধ্রুবীয় অণু" (Polar molecule)। কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) অণুতেও তিনটি পরমাণু রয়েছে, একটি কার্বনের ও দুইটি অক্সিজেনের। কিন্তু সেখানে অক্সিজেন দুটি কার্বনের দুদিকে সরল ঋজুরেখায়

সমদ্রে রয়েছে। এই জন্য এই অণুতে কেন্দ্র তিনটির এবং ইলেকট্রনগুলির ক্রিয়াকেন্দ্র একই বিন্দুতে পড়ে। জলের অণুতে তা হয় না।

$$O=C=O$$



চিত্র ৩৪

CO_2 ও H_2O অণুর সংরচনা

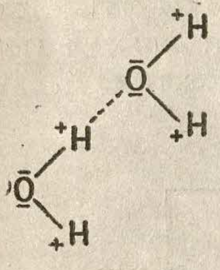
সুতরাং জল ধ্রুবীয় অণু আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড অধ্রুবীয় অণু। জলের এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ কেন্দ্র দুইটির মধ্যে একটা মোমেন্টের উদ্ভব হয়, যাকে বলে "ডাইপোল মোমেন্ট" (dipole moment)। প্রত্যেক ধ্রুবীয় অণুর ডাইপোল মোমেন্ট থাকে। জলের ডাইপোল মোমেন্ট হচ্ছে, $1{\cdot}8 \times 10^{-18}$ esu.

জলের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। এর এমন কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে যা অন্য কোন তরল পদার্থে দেখা যায় না। যেমন, জল যখন জমে বরফ হয় তখন এর ঘনত্ব যায় কমে, আয়তন বাড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ তরল থেকে কঠিন অবস্থায় গেলে পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে, জলের বেলায় তার বিপরীত। জলের অণুর গঠনের কথা মনে রাখলে এর কারণটি বুঝতে পারা যাবে। জলের অণুর বহিঃপ্রান্তে আছে ইলেকট্রন-বিমুক্ত হইড্রোজেনের নগ্ন প্রায় দু'টি ধনাত্মক (positive) প্রোটন, H^+। জলের অণুর এই দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু তাদের ইলেকট্রন অক্সিজেনকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ইলেকট্রন-তৃষ্ণা রয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যদি কাছাকাছি অন্য কোন ছোট অপরাধর্মী পরমাণুতে একজোড়া অনাবদ্ধ (free) ইলেকট্রন থাকে তাহলে জলের এই প্রোটন সেই যুগ্ম ইলেকট্রনকে টেনে আনে। বিশেষ করে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা ফ্লুরিন পরমাণুর ওইরকম যুগ্ম ইলেকট্রনের সঙ্গে এই প্রোটন স্বতঃই সংগুণিত (associated) হয়। প্রোটনের এটা একটা বিশেষ ক্ষমতা এই আকর্ষণের ফলে জলের অণুর প্রোটনের সঙ্গে অপর পরমাণুর ইলেকট্রনের একটা যোজক বা বন্ধন রচিত হয়। একে বলে "হাইড্রোজেন বণ্ড"।

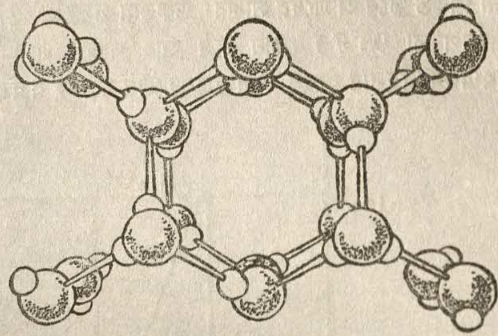
এখন জলের অণুতে প্রোটন রয়েছে আর তার নিকটবর্তী আর একটি জলের অণুর অক্সিজেন পরমাণুতে অনাবদ্ধ ইলেকট্রন-যুগল রয়েছে। সুতরাং একটি জলের অণুর প্রোটন তার পার্শ্ববর্তী অণুর অক্সিজেনের সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাইড্রোজেন বণ্ড তৈরী করবে। এর ফলে দুইটি জলের অণু সংগুণিত হয়ে পড়বে (চিত্র ৩৫)। সংগুণিত দ্ব্যণুতে প্রোটন রয়েছে, সুতরাং সেটা আরও জলের অণুর অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন বণ্ড সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ সংগুণন দু'টি অণুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

প্রত্যেকটি জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে। সেই দুইটি অপর দুইটি জলের অণুর সঙ্গে হাই ড্রাজেন বণ্ড দিয়ে জুড়ে যাবে। আবার সেই অণুগুলির হাইড্রাজেনও আরও জলের অণুর সঙ্গে একই রকমে হাইড্রোজেন বণ্ড দিয়ে জুড়ে যেতে থাকবে। এমনি বহুসংযোগের (polymerisation) ফলে অনেকগুলো করে জলের অণু একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জলের অণু সচরাচর একক থাকে না। জল

যখন জমে বরফ হয় তখনও অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন থাকে এবং এদের মাধ্যমেই বরফের কেলাস গঠিত হয় (চিত্র ৩৬)। এই পরিবিন্যাসের ফলে কেলাসের অভ্যন্তরে অনেকটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তাই জলের অণুগুলো কেলাসিত হওয়ার সময় অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে। এই কারণেই বরফের আয়তন বেশী এবং



চিত্র ৩৫। জলের দুইটি অণু হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা যুক্ত।



চিত্র ৩৬। বরফের কেলাসে হাইড্রোজেন বণ্ড

ঘনত্ব কম হয়। বরফ যখন গলতে শুরু করে 0°C তাপমাত্রায়, তখন এই কেলাস-সজ্জা লোপ পেতে থাকে, অণুগুলো তখন কাছাকাছি এসে যায়। কিন্তু 0°C-এ কেলাসের গঠনটা একেবারে সম্পূর্ণ ভেঙে যায় না। সেইজন্য 0°C-থেকে উষ্ণতা বাড়ালে আয়তন আরও কিছু সংকুচিত হতে থাকে এবং 4°C-এ পেঁছিলে কেলাসের আকৃতি আর থাকে না। এরপর আরও উষ্ণতা বাড়ালে অন্যান্য তরলের মতো জলের ঘনত্বও কমতে থাকে (চিত্র ২৯)।

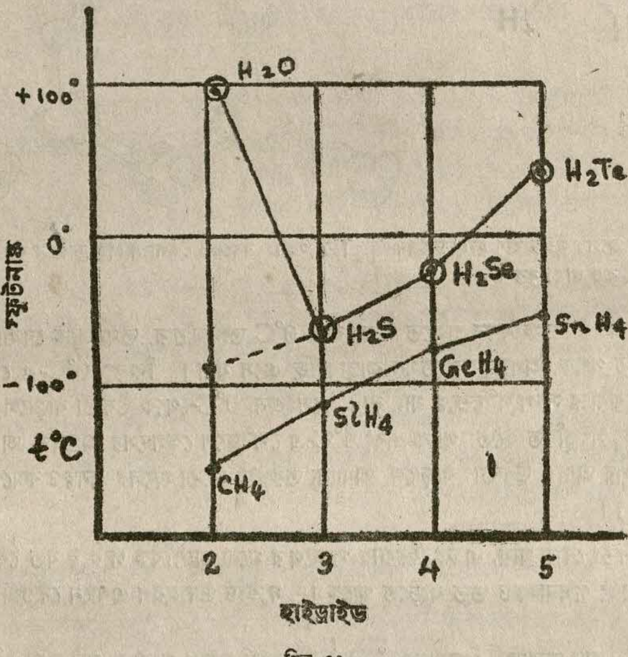
সাধারণতঃ দেখা যায়, একই ধরনের পদার্থের মধ্যে আণবিক গুরুত্ব যত বেশী হয় স্ফুটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্কও তত বাড়তে থাকে। দুইটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

পদার্থ	আঃ গুরুত্ব	গলনাঙ্ক (°K)
হিলিয়াম	4	0·9°
নিয়ন	20·18	24·43°
আরগন	40	83 9°
ক্রিপটন	83·8	104°
জিনন	131·3	133°

পদার্থ	আঃ গুরুত্ব	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
CH_4	16	−161·3°
SiH_4	32	−111·9°
GeH_4	76·6	−90°
SnH_4	122·7	−52°

এখন জল (H_2O) যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেখানে চারটি হাইড্রাইড আছেঃ H_2O (18), H_2S (34), H_2Se (160), H_2Te (257)। এখানে আপেক্ষিক গুরুত্ব যত কমবে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্কও তত কমবে। সেই হিসাবে জলের গলনাঙ্ক হওয়া উচিত

—100°C এবং স্ফুটনাঙ্ক –80°C। কিন্তু বস্তুতঃ জলের গলনাঙ্ক তার চেয়ে একশ ডিগ্রি উপরে আর স্ফুটনাঙ্ক প্রায় একশ আশি ডিগ্রি উপরে (চিত্র ৩৭)। জলের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম সেই হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা অণুগুলির সংগুণনের ফলে। অনেকগুলি অণু একত্র পুঞ্জীভূত থাকাতে লীনতাপের প্রয়োজন বেশী ; বরফ গলাতে তাপমাত্রা বেশী প্রয়োজন। স্ফুটনাঙ্কের উচ্চতাও সেই একই কারণে। যদি জলে এই হাইড্রোজেন বণ্ড না থাকত তবে আমাদের সাধারণ উষ্ণতায় সমস্ত জলই বাষ্পীভূত হয়ে যেত। শরীরেও (তাপমাত্রা 98°F) কোন জল আর থাকত না। জীবজগৎ লোপ পেয়ে যেত। বিশ্বকর্মা হিসাব করেই জলে হাইড্রোজেন বণ্ডের ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি।

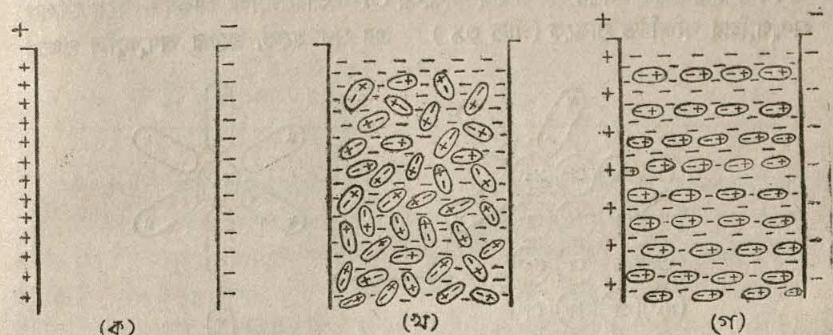


চিত্র ৩৭

জলের আর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যেটা অন্য তরলের মধ্যে বড় দেখা যায় না। জলের দ্রাবণীশক্তি খুব বেশী। পেট্রল, কেরোসিন, কোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, নারকেল তেল ইত্যাদি তরলে লবণজাতীয় পদার্থ দ্রবিত হয় না। কিন্তু জলে খাদ্যলবণ তো (NaCl) বটেই, অন্যান্য লবণও যেমন, সোরা ($NaNO_3$), তুঁতে ($CuSO_4$, $5H_2O$), নিশাদল, ফটকিরি, পটাস ক্লোরাইড ইত্যাদি, অধিকাংশ লবণই অনায়াসে দ্রব হয়। কেন এরকম হয় সেটা বুঝতে গেলে গোড়ার কথা একটু জানা দরকার।

দুইটি ধাতুর পাত সমান্তরাল করে বাতাসে রেখে যদি একটি ব্যাটারীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তা হলে একটি পাত ধনাত্মক (পজিটিভ) এবং অপরটি ঋণাত্মক (নেগেটিভ)

তড়িতাহিত হবে (চিত্র ৩৮ ক)। এই পাত দুইটির মাঝখানে অবশ্য একটা তড়িৎ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। এই তড়িৎ-ক্ষেত্রের বল নির্ভর করবে পাতদুইটির তড়িৎ-বিভবের উপরে এবং মাঝখানে যে পদার্থ রয়েছে তার উপরে। এখানে মাধ্যম রয়েছে বাতাস। এখন বাতাসের পরিবর্তে যদি মাঝখানে জল থাকে তবে দেখা যাবে তড়িৎ-ক্ষেত্রের বল অনেক কমে গেছে। জলের অণুগুলি ধ্রুবীয়, অর্থাৎ জলের অণুগুলির পজিটিভ ও নেগেটিভ ক্রিয়া-কেন্দ্র রয়েছে। যদি ধাতুর পাত দুইটিতে কোন তড়িৎ-আধান না থাকত তবে এই অণুগুলি যেমন তেমন অবস্থায় থাকতে পারত (চিত্র৩৮ খ)। কিন্তু যেহেতু ধাতুর পাত দুইটি তড়িতাহিত, সুতরাং ঐ তড়িৎ-ক্ষেত্রে জলের অণুগুলির নির্দিষ্ট অভিবিন্যাস হবেই। অণুগুলির পজিটিভ প্রান্ত ঋণাত্মক পাতের দিকে এবং নেগেটিভ প্রান্ত ধনাত্মক পাতের দিকে আকৃষ্ট হবে। এই জন্য সব অণুগুলি একটা বিশেষ ভাবে সজ্জিত হতে সচেষ্ট হবে (চিত্র ৩৮ গ)। এর ফলে জলের অণুগুলি থেকে পাত দুইটির উপর বিপরীত তড়িৎ আবিষ্ট হবে। সুতরাং পাত দুইটির কার্যকরী তড়িৎ-বিভবের হ্রাস ঘটবে এবং সেই হেতু মধ্যবর্তী মাধ্যমের ভিতরের তড়িৎ-ক্ষেত্রের বলও কমবে। অর্থাৎ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক পাতের মধ্যে আকর্ষণের পরিমাণ কমে যাবে। অন্যান্য ধ্রুবীয় মাধ্যমে রাখলেও একরকম ফলই



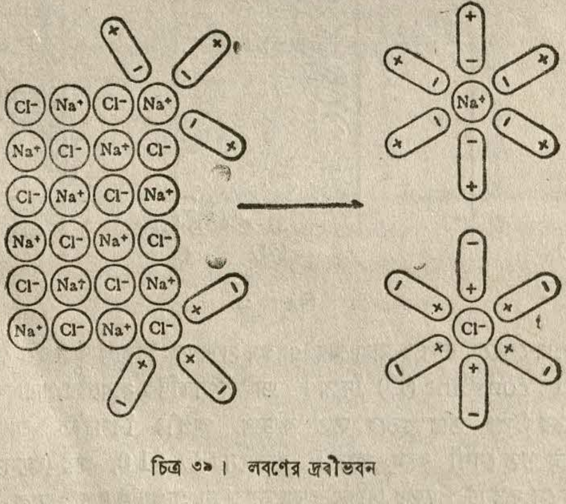
চিত্র। ৩৮

হবে। বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের উপরে মাধ্যমের এরকম প্রভাবকে প্রকাশ করা হয় বৈদ্যুত ধ্রুবক বা dielectrc constant (D) দিয়ে। ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের মাত্রা যত বেশী হবে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের উপর তার প্রভাব তত বাড়বে, অর্থাৎ বিপরীত আধানের মধ্যে যে আকর্ষণ সেটা তত বেশী কমে যাবে। বাতাসের $D=1\cdot0$, আর জলের $D=80$। অতএব বাতাসে দুইটি পাতের তড়িৎ-আধানের মধ্যে আকর্ষণ যত, জলে থাকলে সেই আকর্ষণ হবে তার 1/80 ভাগ মাত্র।

লবণের অণুগুলিতে দুইটি অংশ থাকে। একটি অংশে পজিটিভ বিদ্যুৎ-আধান এবং অপরটিতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-আধান থাকে। এই তড়িৎযুক্ত অংশগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে "আয়ন"। অতএব, লবণের অণু ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন দিয়ে গড়া। যেমন খাদ্য-লবণে (সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl) আছে পজিটিভ সোডিয়াম

আয়ন (Na^+) আর নেগেটিভ ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-)। $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$। সব লবণেই এরকম বিপরীতধর্মী আয়ন রয়েছে। বাতাসের মধ্যে লবণ যখন কঠিনাকারে থাকে তখন কেলাসের মধ্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ আয়নগুলি পরপর সুনির্দিষ্ট উপায়ে সাজান থাকে। বিপরীত আধানের জন্য তাদের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং আয়নগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এখন এই লবণকে যদি জলে দেওয়া হয়, তা হলে কেলাসের মধ্যস্থ সোডিয়াম আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে আকর্ষণ অনেক কমে যাবে, কারণ জলের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক খুব বেশী। আকর্ষণ হ্রাস পাওয়াতে দুই বিপরীত আয়ন তখন অনেক সহজে আলাদা হয়ে জলের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আমরা বলি, জলে লবণ দ্রবিত হল। জলের অণু ধ্রুবীয় না হলে এটা সম্ভব হত না। শুধু তাই নয়, ধ্রুবীয় অবস্থার জন্য জলের ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের মাত্রা বেশী। তার উপর হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা অণুগুলি সংগুণিত হওয়ার জন্য সেই ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবকের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাই অত সহজে লবণ দ্রবিত হয়।

লবণের অনায়াসে দ্রবিত হওয়ার আর একটা কারণও রয়েছে। লবণের স্ফটিকে যে Na^+ আয়নগুলি রয়েছে সেগুলো জলের ধ্রুবীয় অণুগুলির নেগেটিভ প্রান্তকে আকর্ষণ করে টেনে আনে। আবার লবণের Cl^- আয়নগুলি আকর্ষণ করে জলের অণুগুলির পজিটিভ প্রান্তকে (চিত্র ৩৯)। এর অর্থ হচ্ছে, জলের অণুগুলি প্রথমে



চিত্র ৩৯। লবণের দ্রবীভবন

কেলাসের আয়নগুলির সঙ্গে যোজিত হয় এবং তারপরে আয়নগুলিকে পৃথক করে দেয়। দ্রবিত অবস্থায় আয়নগুলি জলযোজিত (hydrated) অবস্থায় থাকে। এমনকি, অনেক সময় জলীয় দ্রবণ থেকে যখন লবণের কেলাস বেরিয়ে আসে, তখন আয়নগুলি সেই যোজিত জল নিয়েই কেলাসিত হয়। এসব কেলাসকে বলা হয় "সোদক স্ফটিক"। কোন কোন ক্ষেত্রে লবণের স্ফটিকাকার এবং স্ফটিকের বর্ণ এই যোজিত জলের জন্যেই

হয়ে থাকে। যেমন, নীলবর্ণের লবণ তুঁতের (কপার সালফেট, $CuSO_4, 5H_2O$) স্ফটিকে প্রতিটি কপার সালফেট অণুর সঙ্গে পাঁচটি জলের অণু থাকে। এই স্ফটিককে তাপিত করলে তার কেলাস-জল উবে যায়, স্ফটিকাকার লোপ পায় আর সাদা অনার্দ্র কপার সালফেট পড়ে থাকে। জলের জন্যই স্ফটিকের রঙ ও আকৃতি।

এর আগে আমরা দেখেছি জল সামান্য আয়নিত হয়ে H^+ এবং OH^- আয়নের সৃষ্টি করে ; $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$। মোটামুটি ভাবে বলা যায় পদার্থ দ্রবিত অবস্থায় H^+ – আয়ন দেয়, সেগুলো অ্যাসিড বা অম্ল। আর যে সব পদার্থ থেকে দ্রবণে OH^- আয়নের উৎপত্তি হয় সেগুলো ক্ষারক। এখন জলে H^+ আয়ন OH^- আয়ন দুই-ই আছে এবং সমপরিমাণে আছে। সেইজন্য জল অম্লও নয়, ক্ষারকও নয় ; জল একটি প্রশম (neutral) পদার্থ। আপাতদৃষ্টিতে জলকে খুব নিরীহ মনে হয়। কিন্তু কোন কোন সময় এর তীব্র সক্রিয়তা বিস্ময়কর। শুকনো চুনের সঙ্গে জল মিশালে কি প্রচণ্ড তাপ উদ্‌গীরণ হয় তা সবারই জানা। তেমনি সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সংস্পর্শে জল এলেই তৎক্ষণাৎ ধাতুগুলি আক্রান্ত হয়ে কস্টিক ক্ষারে পরিণত হয়ে যায়। কারবাইড বাতিতে যে অ্যাসিটিলীন গ্যাস জ্বালিয়ে আলো উৎপাদন করা হয় সেটাও কারবাইডের উপরে জলের আক্রমণের ফলেই। এসব জলের বৈশিষ্ট্য।

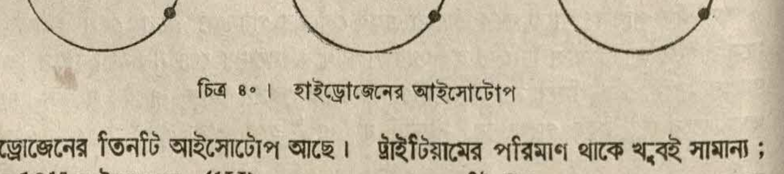
১০। ভারী জল

মৌলের ধর্ম তার পরমাণুগুলিরই ধর্ম। কোন একটি মৌলের সব পরমাণুগুলিই একই রকমের, সুতরাং তাদের ব্যবহার, গুণাগুণ একই হবে। আগে বিশ্বাস ছিল একটি মৌলের সমস্ত পরমাণুর ওজনও একই হবে। কিন্তু পরে পরীক্ষায় দেখা গেল তা নয়। অন্য দিক দিয়ে এক হলেও পরমাণুগুলির ওজন বিভিন্ন হতে পারে। পরমাণুগুলি খুব ছোট ওজনের বলে সাধারণতঃ তাকে গ্রামে মাপা হয় না। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনকে একক ধরে মোটামুটি অন্য পরমাণুর ওজন প্রকাশ করা হয়।* যেমন, একটি সালফার পরমাণুর ওজন 32, অর্থাৎ সালফারের পরমাণু মোটামুটি একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে 32 গুণ ভারী। মোটামুটি হিসাবে একটি নিউট্রন, একটি প্রোটন ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন প্রায় সমান। দেখা যায়, একই মৌলের সব পরমাণুর ওজন এক নয়। যেমন, ক্লোরিনের কতকগুলি পরমাণুর ওজন 35, অপরগুলির ওজন 37 (উপরের নির্দেশিত এককে)। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওজনে যদি পার্থক্য থাকে তবে তাদের একই মৌলের পরমাণু বলে কেন ধরা হবে। মনে রাখতে হবে, মৌল চিহ্নিত হয় তার পরমাণুর কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যা দিয়ে, অর্থাৎ ক্রমাঙ্ক দিয়ে, ওজন দিয়ে নয়। দুইটি পরমাণুর কেন্দ্রে যদি একই সংখ্যক প্রোটন থাকে তবে দুই রকম পরমাণুর স্বভাব, ধর্ম একই হবে, তারা একই মৌলের পরমাণু

* বাস্তবিক পারমাণবিক গুরুত্বের একক একটি কার্বন-পরমাণুর $\frac{1}{12}$ ওজন।

হবে। ক্লোরিনের দুইটি পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটিরই কেন্দ্রে 17টি প্রোটন রয়েছে, প্রত্যেকেরই ক্রমাঙ্ক 17। সুতরাং তারা একই মৌলের। তাদের ওজন এবং ওজন-নির্ভর ধর্ম (যেমন, ঘনত্ব) ছাড়া সব রকম গুণ ও স্বভাব সম্পূর্ণ একরকম হবে। তবে ওজনের পার্থক্য কেন? আমরা জানি, পরমাণুর ওজন হচ্ছে তার কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন (ইলেকট্রনগুলির ওজন নগণ্য)। পরমাণুগুলির কেন্দ্রের প্রোটন সংখ্যা এক হলেও, নিউট্রনের সংখ্যা আলাদা হতে পারে। ফলে, পরমাণুর ওজন বিভিন্ন হয়। একই মৌলের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুকে বলা হয় "আইসোটোপ"। কোন মৌলের আইসোটোপগুলির ওজন বিভিন্ন, কিন্তু ক্রমাঙ্ক অর্থাৎ প্রোটন-সংখ্যা একই। যেমন, অক্সিজেনের তিন রকম আইসোটোপ রয়েছে। প্রত্যেকেরই প্রোটন-সংখ্যা আট। অধিকাংশ অক্সিজেন পরমাণুরই কেন্দ্রে থাকে আটটি নিউট্রন; অল্প কিছু পরমাণুর কেন্দ্রে আবার দশটি নিউট্রন রয়েছে, আর অতি সামান্য কিছু পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নয়টি নিউট্রন। এদের আমরা লিখি, ^{16}O ^{17}O ^{18}O। বাঁদিকের উপরের সংখ্যাগুলি পরমাণুর বিভিন্ন ওজন নির্দেশক। মনে রাখা দরকার, প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন প্রায় সমান এবং তাকে ওজনের একক বলে ধরা হয়েছে।

হাইড্রোজেনেরও আইসোটোপ আছে। হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রে সচরাচর একটি মাত্র প্রোটন থাকে, কোন নিউট্রন নেই। কেন্দ্রটিকে একটি ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং এর ওজন বা পরমাণবিক গুরুত্ব 1(এক)। 1932 সনে বিজ্ঞানী উরে আবিষ্কার করলেন, যে হাইড্রোজেনের সব পরমাণু এক নয়; কিছু পরমাণু রয়েছে, যাদের কেন্দ্রে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি নিউট্রনও রয়েছে। অতএব এই শেষোক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে দ্বিগুণ ভারী, কিন্তু প্রোটন-সংখ্যা উভয়েরই এক (1)। এই ভারী হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 2। এই ভারী হাইড্রোজেনের জন্য একটি বিশেষ নাম গ্রহণ করা হয়েছে "ডয়টেরিয়াম" (Deuterium) এবং এর চিহ্ন "D"। পরবর্তীকালে আর এক রকম হাইড্রোজেনের পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে একটি প্রোটনের সঙ্গে দুইটি নিউট্রন কেন্দ্রে রয়েছে, এর গুরুত্ব হবে 3 (চিত্র ৪০)। এর নাম "ট্রাইটিয়াম" (Tritium, ^{3}T)। অর্থাৎ

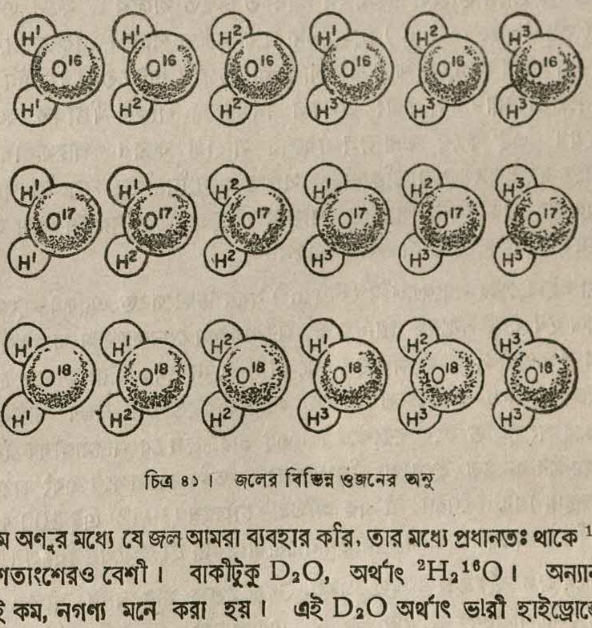


চিত্র ৪০। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ

হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ আছে। ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ থাকে খুবই সামান্য; প্রতি 10^{17} হাইড্রোজেন (^{1}H) পরমাণুর মধ্যে একটি ^{3}T পরমাণু থাকে। অপর

দুইটির অনুপাত, হাইড্রোজেন : ডয়টেরিয়াম = 99·984 : 0·016। অর্থাৎ, প্রতি সাত হাজার সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি ডয়টেরিয়াম থাকে।

হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সংযোগে জলের উৎপত্তি। একটি অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু মিলিত হয়ে জলের পরমাণু H_2O গঠিত। এখন দেখা যাচ্ছে, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়েরই তিনটি করে আইসোটোপ রয়েছে। অতএব বিভিন্ন ওজনের হাইড্রোজেন (^1H, ^2H, ^3H) পরমাণুর সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের অক্সিজেন পরমাণু মিলে নানা ওজনের জলের অণু গড়তে পারে। অন্ততঃ আঠার রকমের জলের অণু পাওয়া সম্ভব (চিত্র ৪১)। যথা,



চিত্র ৪১। জলের বিভিন্ন ওজনের অনু

এতরকম অণুর মধ্যে যে জল আমরা ব্যবহার করি, তার মধ্যে প্রধানতঃ থাকে $^1H_2{}^{16}O$, প্রায় 99·9 শতাংশেরও বেশী। বাকীটুকু D_2O, অর্থাৎ $^2H_2{}^{16}O$। অন্যান্য অণুর অস্তিত্ব খুবই কম, নগণ্য মনে করা হয়। এই D_2O অর্থাৎ ভারী হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া জলই হচ্ছে "ভারী জল"। সাধারণ জল থেকে ভারী জলকে এখন পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। দুই রকম জলের রাসায়নিক ধর্মগুলি অভিন্ন, কিন্তু গুরুত্বের পার্থক্য-হেতু ভৌত ধর্মের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

	স্ফুটনাঙ্ক, °C	গলনাঙ্ক, °C	ঘনত্ব (0°C)
সাধারণ জল, H_2O	100°	0·00	0·9982
ভারী জল, D_2O	101·42°	3·82	1·1059

যে উৎস থেকেই জল সংগ্রহ করা হোক, তার মধ্যে ভারী জলের মিশেল থাকবেই। বৃষ্টি জল, নদী জল, বরফ, দুধে মিশ্রিত জল, আমাদের দেহাভ্যন্তরের জল, সর্বত্রই দুই রকমের জল মিশে আছে। জীবকোষে নানা রকম বিক্রিয়া ঘটে এবং সেসব বিক্রিয়াতে

জল অংশ নেয়। কি ধরনের পরিবর্তন দেহাভ্যন্তরে হচ্ছে সেটা জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক সময় পানীয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভারী জল মিশিয়ে দেন। পরে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় কোথায় কোথায় ভারী হাইড্রোজেন-জাত পদার্থ রয়েছে। সেই থেকে বিক্রিয়ার পদ্ধতি অনুধাবন করা সহজ হয়।

বর্তমানে ভারীজলের চাহিদা সবচেয়ে বেশী পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে। ইউরেনিয়ামের একটি আইসোটোপ ^{235}U। এই পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এর কেন্দ্রটি ভেঙে যায়, এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় বেরিয়াম ও ক্রিপটনের। তার সঙ্গে বের হয় ২/৩ টি নিউট্রন ও প্রচুর তাপ। এই নিউট্রনগুলি যদি আবার নতুন ^{235}U-কে ভাঙে তাহলে এই ধ্বংস অবিরত চলতে থাকবে। ফলে, এক শৃংখল-অভিক্রিয়া (chain reaction) মুহূর্তের মধ্যে ঘটতে পারে। কিন্তু যে নিউট্রন-গুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো খুব শক্তিশালী বা তেজী। এই তেজী নিউট্রন ^{235}U-কে ভাঙার উপযোগী নয়। সুতরাং ঐসকল নিউট্রনের শক্তিটা স্তিমিত করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই কাজে ভারীজল বিশেষ সাহায্য করে। পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে শৃংখল-অভিক্রিয়াটিকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা অবশ্যই দরকার। ভারীজল ব্যবহার করে নিউট্রনগুলোর শক্তি মন্দীভূত করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই জন্য অ্যাটমিক-রিঅ্যাকটরে ভারী জল প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফের্মি (Fermi) যখন চিকাগোতে এরকম শৃংখলা-বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম হন, সেই সময়েই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাধ্যক্ষেরা পারমাণবিক বোমা উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এমন সময় এঁরা জানতে পেরেছিলেন জার্মানী নাজী-অধিকৃত নরওয়েতে একটি ল্যাবরেটরীতে প্রায় একশ গ্যালন ভারী জল উৎপাদন করে সংগৃহীত করে রেখেছে। এই ভারী জল যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা নিঃসন্দেহ। অতি সঙ্গোপনে এবং অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় ব্রিটিশ নৌবাহিনী এক অভিযান চালিয়ে (1942) এই 100 গ্যালন ভারী জল কেড়ে নিয়ে আসে। এরকম অভিযান নৌবাহিনীর ইতিহাসেও বিরল।

কত নামে জল পরিচিত—অপ, অম্বু, উদক, তোয়, নীর, বারি, সলিল। পৃথিবীর অসংখ্য বস্তুর মধ্যে জলের তুলনা নেই। এর প্রাচুর্য, এর ঐশ্চর্য, এর রূপান্তর, এর ক্ষমতা, এর বিচিত্র স্বভাব—সবই বিস্ময়কর। জল বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি। জলেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল, পৃথিবীতে প্রাণমণ্ডলের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে জলের উপরে। জল না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। জলই চক্রীয় পরিক্রমায় তার বাষ্পের মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনধারণের উপযোগী করে রেখেছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মূলেও জল। পত্রপুষ্প দিয়ে সাজিয়ে বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা করে রেখেছে জল। আকাশের আশ্চর্য রঙের খেলা সম্ভব হয়েছে জলজ মেঘের জন্য।

পূর্ণ পয়ঃকুম্ভ আমাদের মঙ্গলচিহ্ন, জলকে নমস্কার।

বাতাসের কথা

বাতাসের কথা

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে একটা গ্যাসের আচ্ছাদন। সেই গ্যাসের মধ্যেই সর্বদা আমরা রয়েছি। গ্যাসের এই মোড়কটাকে আমরা বলি বাতাস, সাধুভাষায় বায়ুমণ্ডল।

পার্থিব জগতে যা কিছু আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক আমাদের বাতাসের সঙ্গে। জল আর বাতাস এই দুটোর ওপরে আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। জল বাদ দিয়েও হয়ত স্বল্প কয়েকদিন বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু বাতাসের অভাবে কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে দিনে রাত্রে ঘুমে জাগরণে বাতাসের সঙ্গে প্রাণের দেওয়া-নেওয়ার হিসেব-নিকেশ চল্‌ছে। এজন্যেই বাতাস প্রাণ-স্বরূপ। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ আর যা কিছু পৃথিবীর বুকে আছে, সবই ডুবে আছে এই বাতাসের মহাসমুদ্রে। পৌরাণিক কাহিনীতে বায়ুকে অধিদেবতার মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই দেবতার প্রসাদেই প্রাণের অস্তিত্ব, অগ্নির আবির্ভাব।

জন্ম-কাহিনী

পৃথিবীর চারদিকে বাতাসের এই আবরণটা কি করে এল, এ প্রশ্ন বহুযুগের। এমনি গ্যাসের মোড়ক ত'. চাঁদে নেই, নেই বুধ গ্রহে। তাই তাদের ভেতর প্রাণের অস্তিত্বও নেই। আর যে সব গ্রহ আছে তাদের আবরণ ঠিক আমাদের গ্যাসের মত ত' নয়। বাতাসের উৎপত্তি নিয়ে অনেকদিন থেকেই নানারকমের জল্পনা-কল্পনা, নানা গবেষণা হয়েছে। এখন মোটামুটি বোঝা গেছে বাতাসের উদ্ভব পৃথিবীর জন্মের সঙ্গেই জড়িত। তাই পৃথিবীর জন্ম-কাহিনীটাও একটু জানা প্রয়োজন।

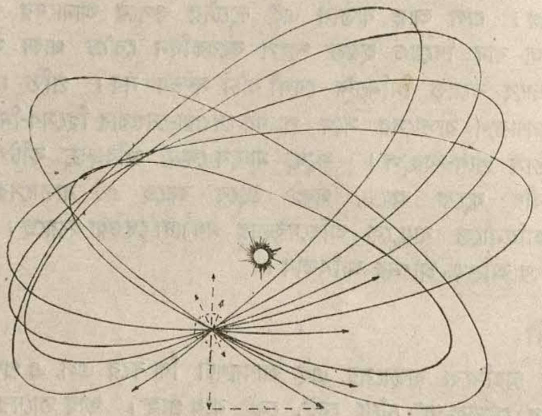
পৃথিবী সৌর পরিবারের একটি গ্রহ। সূর্য্য একটি নক্ষত্র। নক্ষত্র মানেই জ্বলন্ত গ্যাসের বিরাট অগ্নিপিন্ড। সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছে আর তাপ এবং আলো বিকিরণ করছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথে রয়েছে এমনি কয়েক হাজার কোটি তারা।* সূর্য্য তাদেরই মধ্যে একটি মাঝারি-গোছের নক্ষত্র। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে, সূর্য্যও তেমনি ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে অবিরত ভীষণ বেগে ছুট্‌ছে। এক সময় মনে করা হ'ত এমনি ছোটার সময় অন্য কোন প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র সূর্য্যের যথেষ্ট সান্নিধ্যে এসে গিয়েছিল। তার প্রবল আকর্ষণে সূর্য্যদেহের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে আসার ফলে এই গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, পৃথিবী তাদের অন্যতম। কিন্তু এখন জানা গেছে এ ধারণাটা নিতান্তই ভুল। এ রকমের ভুল হওয়াটা খুব আশ্চর্য্য নয়; একসময় ত' মানুষ বিশ্বাস করেছিল পৃথিবীটা স্থির আর তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য্য আর সব নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। সেটাও ত মস্ত ভ্রম হয়েছিল।

---

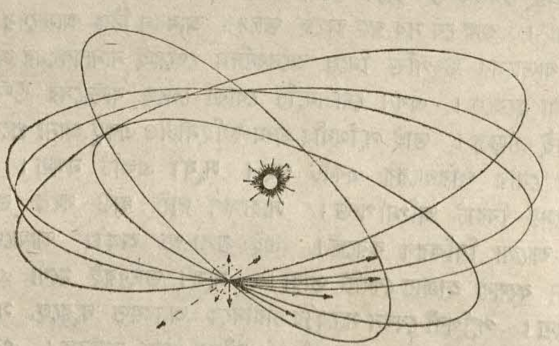
* আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় 10^{11}

ছায়াপথে কিন্তু সংখ্যাতীত নক্ষত্র ছাড়াও রয়েছে বিরাট ধুলো ও গ্যাসের উত্তাপহীন অনেক স্তূপ। এ সব ধুলো-গ্যাসের চাঙড় গুলো এত প্রকাণ্ড যে আমাদের এই সমস্ত সৌর-জগতটা অর্থাৎ সূর্য্য এবং তার বিস্তৃত গ্রহগুলো সেই বিরাট স্তূপগুলির তুলনায় নগণ্য। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্যে নানা তথ্য বের করেছেন। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আরও অনেক নূতন সূত্র ধরা পড়েছে। তাই নিশ্চিতরূপে এখন বলা সম্ভব হয়েছে, সুদূর অতীতে কোন এক সময়ে

(১)



(২)



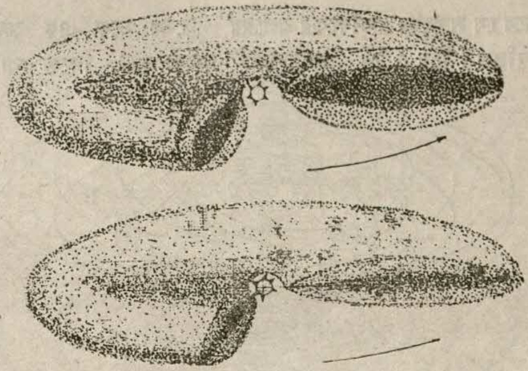
চিত্র ১। ধুলিকণার বিশৃঙ্খল গতিপথ
চিত্র ২। ধুলো-গ্যাসের অপেক্ষাকৃত সুসংযত গতিপথ

সূর্য্য ছুটতে ছুটতে চলার পথে কোন একটা ধুলো-গ্যাসের নীহারিকা থেকে একটুখানি অংশ টেনে নিয়ে এসেছিল। সেই ধুলো আর গ্যাসের চাপড়াটা সূর্য্যের আওতায় এসে ওর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল, কারণ সূর্য্য নিজেই নিজের অক্ষদন্ডের ওপর ঘুরছে।

ধুলো-গ্যাসের মেঘটি যখন প্রথম সূর্য্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল তখন নিশ্চয়ই ধুলোর কণাগুলো আর গ্যাসের অণুগুলো যেমন খুশী খামখেয়ালীভাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করেছিল। এর একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে ১ নং ছবি থেকে।

এই সব কণাগুলোর ছুটোছুটির সময় পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষও অবশ্যই ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এমনি ঘোরার ফলে মেঘের বিভিন্ন অংশের অবিন্যস্ত গতিপথগুলো ধীরে ধীরে সুসংযত হ'য়ে এল। গ্যাস আর সমস্ত কণাগুলো মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগ্‌ল (চিত্র ২)।

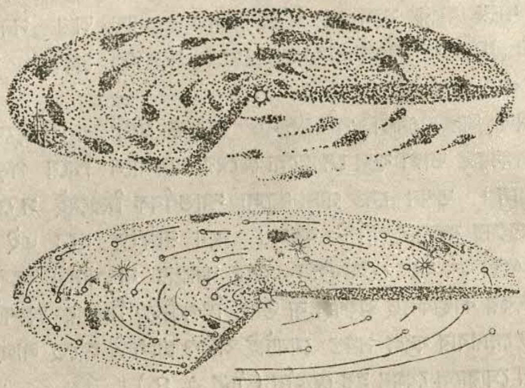
ইতিমধ্যে আর আর একটা পরিবর্তনও আরম্ভ হয়েছিল। ধুলোর কণাগুলো কঠিন আর অপেক্ষাকৃত ভারী বলে সেগুলো মেঘের মাঝখানে গিয়ে পড়ল আর তার বাইরে রইল গ্যাস। তখন সেই গ্যাস-ধুলো স্বাভাবিক নিয়মেই সূর্য্যের চারদিকে একটা চ্যাপ্‌টা ধরনের বলয়ের সৃষ্টি করল। মনে রাখ্‌তে হবে এই প্লেটের মতো বলয়টা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছিল। সেই বলয়ের মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত মোটা আর সূর্য্যের দিকের কাছাকাছি অংশটা বা তার বিপরীত দিকের অংশটা হয়ে গেল সরু। অবিরত ঘোরবার ফলে সমস্ত মেঘটাই আরও চ্যাপ্‌টা হ'তে লাগ্‌ল, কুমোরের চাকে মাটির তাল ঘোরালে যেমন হয় তেমনি (চিত্র ৩, ৪)।



চিত্র ৩

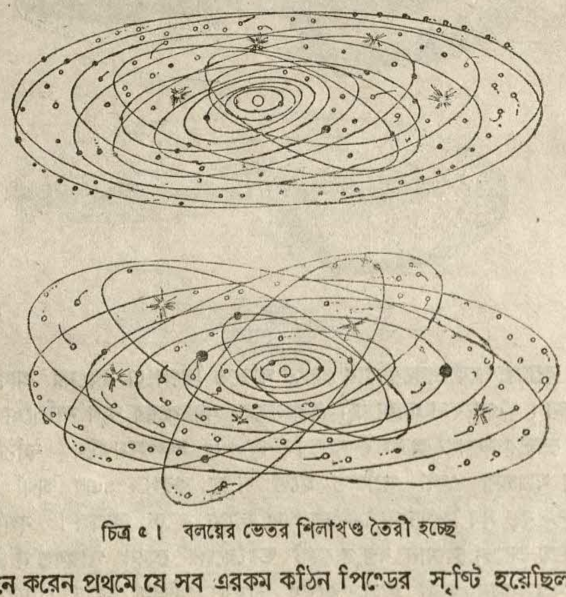
বিচ্ছিন্ন বস্তুস্তূপকে একত্রে খুব জোরে ঘুরতে দিলে এ রকমের আকার হওয়াটাই প্রকৃতির নিয়ম। এর ফল হলো ধূলিকণাগুলো পরস্পরের খুব সান্নিধ্যে এসে পড়ল এবং তাদের ভেতর যথেষ্ট আকর্ষণের সৃষ্টি হ'ল। কালক্রমে সেই কঠিন কণাগুলো মেঘের নানা যায়গায় একত্র পুঞ্জিত হতে শুরু করল। এর অর্থ ধুলোর কণা থেকে খানিকটা বড় সব পিণ্ড বা শিলাখণ্ডের সৃষ্টি হতে লাগল। বলবিদ্যার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, চলমান বস্তুর মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। বড় বড় পাথুরে বস্তু যখন তৈরী হ'ল, ওদের ভরের বৃদ্ধির জন্যে গতিবেগ খানিকটা মন্থর হ'য়ে এল। গ্যাসও ঘনতর হ'য়ে পড়ল। ধুলোর পুঞ্জীভবন কিন্তু এখানেই সীমিত ছিল না। শিলাখণ্ডগুলোও আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসে আরও বড় বড় পাথরের চাঁই তৈরী করল। এর মাঝখানে অবশ্যই রয়েছে অনেক ভাঙ্গা-চোরার

সংহতি-বিস্তৃতির ইতিহাস। অঙ্কের সেসব কূটজালের মধ্যে না গিয়েও সাধারণ ভাবে



চিত্র ৪। ধুলো-গ্যাসের মেঘটা বলয়ের আকার পেয়েছে

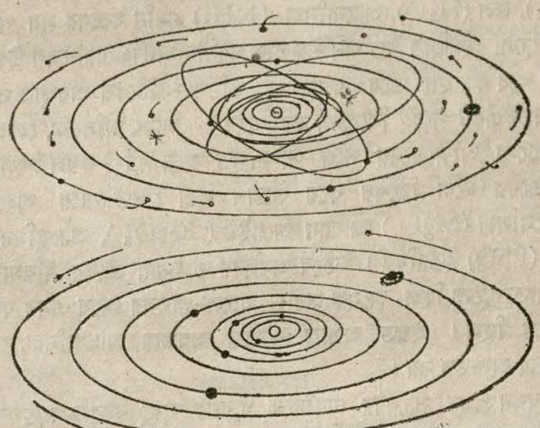
বলা যেতে পারে যে সূর্য্যের চারদিকের বলয়ের গ্যাসের মধ্যে এক ঝাড় শিলাখণ্ডও প্রদক্ষিণ করছিল (চিত্র ৫)। এগুলোকে আমরা নাম দিতে পারি 'গ্রহকণা'।



চিত্র ৫। বলয়ের ভেতর শিলাখণ্ড তৈরী হচ্ছে

বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রথমে যে সব এরকম কঠিন পিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর ব্যাস হয়ত দশ থেকে একশ মাইলের মতো হবে। এগুলো যত বড় হ'তে শুরু করল, ধুলো-গ্যাসের চাকতিটাও আরও সমতল বা চ্যাপ্টা হ'য়ে গেল। এমনি আকারের শিলাখণ্ড ত' আজও মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণুপুঞ্জে রয়েছে।

এর সঙ্গে আর একটা বিষয় ভাবতে হবে। এই কণাগুলো বা পরে ছোট ছোট শিলাখন্ডগুলো যখন পুঞ্জিত হচ্ছিল তখন তাদের গতিশক্তির খানিকটা বিলোপ হয়েছিল। এবং সেই শক্তির পরিবর্তে যথেষ্ট তাপশক্তির উদ্ভব হয়েছিল। এই তাপের কিছুটা বিচ্ছুরিত হয়ে গিয়েছে. কিন্তু বাকী তাপটা পেয়ে নূতন শিলাখণ্ডগুলি আবার তাদের নিজেদের অক্ষদণ্ডের চারদিকে আবর্তিত হ'তে শুরু করল। বড় বড় শিলাগুলি যখন নিজেদের অক্ষদণ্ডে পাক খেতে লাগ্‌ল তাদের আশে পাশে যে অজস্র ধুলার কণা আর গ্যাস ছিল সেগুলো আবার এই শিলাগুলোকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত প্রবল আকর্ষণে সেই শিলার ওপরেই এসে পড়ল। এমনি করে শিলাগুলো যে পুঞ্জীভবনের ফলেই বড় হ'ল শুধু তাই নয়, ওদের ওপরে ধুলোর উপলেপ পড়ে' পড়ে' সেগুলোকে আয়তনে প্রকান্ড করে তুলল। অর্থাৎ বহু কোটি বছর আগে যে ধুলো-গ্যাসের চাঙড়টা সূর্যের পদানত হ'য়ে এসেছিল, সেটা কালক্রমে কয়েকটি কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হ'য়ে গেল। এভাবেই ভবিষ্যতের গ্রহগুলির ভ্রূণের আবির্ভাব ঘটেছিল (চিত্র ৬)। মেঘের মাঝখানটা ছিল মোটা তাই সেখানে যে ভ্রূণের



চিত্র ৬। শিলাখণ্ডগুলি চারদিকের ধূলিকণা নিয়ে একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে গ্রহের রূপ গ্রহণ করল

সৃষ্টি হ'ল সেটা অন্যদের চেয়ে বড়, সেটা আজকের গ্রহরাজ বৃহস্পতি। এর দুদিকের গ্রহগুলি আয়তনে ক্রমশঃ ছোট।

বৈজ্ঞানিক অটো স্মিট (Otto Schmidt) অঙ্ক কষে' বুঝিয়ে দিয়েছেন এ পরিবর্তনগুলো প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বাভাবিক উপায়ে ঘটেছে এবং সেটা অবশ্যম্ভাবী। এটা কোন অবাস্তব কল্পনার কথা নয়।

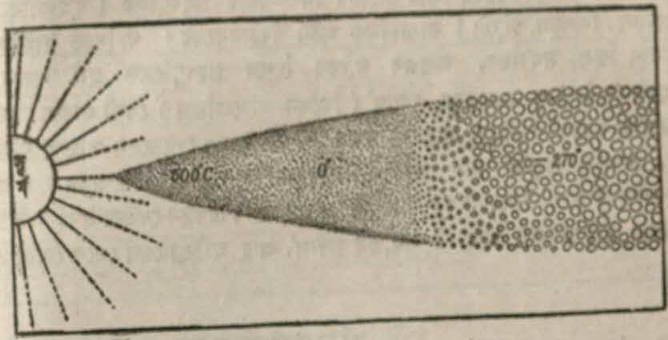
এই সৃষ্টির সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, এখন সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। ধুলো-গ্যাসের যে মেঘ থেকে গ্রহাণুপুঞ্জগুলো প্রথমে তৈরী হ'ল, সেগুলি কি ছিল ? কোন্ গ্যাস ছিল সে সব স্তূপে, যে ধুলোকণা ছিল সেগুলো কি সাধারণ

যে মাটির ধুলো আমরা দেখি তাই ? মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে দেখা যায় হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামই প্রধান উপাদান। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসম্ভারের শতকরা নব্বই ভাগ হাইড্রোজেন, প্রায় নয় ভাগ হিলিয়াম। এর পর রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর কার্বন—এই তিনটিতে মিলে শতকরা 0·3 ভাগ মাত্র। আর বাকী সব মৌল, যেমন সিলিকন, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির পরিমাণ খুবই সামান্য। দূর-দূরান্তরের নক্ষত্র, সৌরদেহ, নীহারিকা-গ্যাস, মহাশূন্যের নানা জ্যোতিষ্কের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে ঐ রকমের অনুপাতেই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি সর্বত্র রয়েছে। সেই আদিযুগে সূর্য্য যখন গ্যাসের আর ধুলোর চাঙড়টাকে টেনে নিয়ে এসেছিল তার মধ্যেও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম সেই অনুপাতেই ছিল একথা মেনে নিতে বাধা নেই।

এসব মৌলের পরমাণুগুলি আবার সুযোগ পেলে বা সুবিধামতো অবস্থায় পড়লে পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে নানারকমের পদার্থ সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নাই। হাইড্রোজেনের ছিল প্রাচুর্য্য, তাই হাইড্রোজেন অন্য যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ছিল তাদের সঙ্গে সংহত হয়েছিল। এভাবে নিশ্চয় হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) মিথেন (CH_4), জল (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3) এমনি ধরণের সব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো আমাদের বর্তমান উষ্ণতায় গ্যাসীয় অর্থাৎ এরা বেশ উদ্বায়ী। কিন্তু তাপমাত্রা যদি খুব কম হয় তবে এগুলোও কঠিন স্ফটিকের অবস্থায় থাকতে পারে। তাপমাত্রার কথাটা একটু পরেই বিবেচনা করা হবে। অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, সীসা আর অন্যান্য ধাতুগুলো অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সৃষ্টি করল শিলাজাতীয় নানা পদার্থের। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে বালু (সিলিকা, SiO_2), ম্যাগনেসিয়া (MgO), আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3), অ্যালুমিনা (Al_2O_3), লেড অক্সাইড (PbO) ইত্যাদির। তবে অন্যদের তুলনায় এদের পরিমাণ কম, কারণ শুরু থেকেই ধাতুগুলো ছিল অনেক কম। ধুলো-গ্যাসের মেঘে এসব বস্তুরই সূক্ষ্ম-কণা ধুলো হ'য়ে ছিল। হয়ত অত্যন্ত শীতল অবস্থায় অ্যামোনিয়া, জল ইত্যাদিও কঠিনাকারে থাকা অসম্ভব নয়।

ঐ মেঘটা যখন প্রথম সূর্য্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল তখন সূর্য্যকিরণ মেঘের ভেতরে প্রবেশ করে সেটাকে সর্বত্র প্রায় সমান ভাবেই উষ্ণ করে রেখেছিল, যদিও সেই উষ্ণতা খুব বেশী নয়। কিন্তু যখন সেই মেঘের মধ্যে বড় বড় শিলার সমাবেশ হ'তে শুরু করল আর ধুলো-গ্যাসের মেঘটা বলয়াকার হ'য়ে গেল, তখন সূর্য্যের তাপ এবং আলোরশ্মির পথে বাধার সৃষ্টি হ'ল। বলয়ের যে অংশটা সূর্য্যের কাছাকাছি সেটা গরম হ'য়ে উঠল। সূর্য্য থেকে দূরত্বটা যত বাড়তে লাগল, তাপমাত্রাও তত কমতে লাগল। একটা গাণিতিক অনুমানে দেখা গেছে, সূর্য্যের নিকটতম গ্যাস-ধুলোর অংশের তাপমাত্রা প্রায় 500°C ছিল। দূরত্বের সঙ্গে এই উষ্ণতা কমে কমে 0°C এবং আরও দূরে অত্যন্ত ঠান্ডা (প্রায় −270°C) পর্য্যন্ত নীচে নেমে গেল (চিত্র ৭)। এর কারণ সূর্য্যের তাপরশ্মি কঠিন শিলার পাঁজর ভেদ করে আর দূরে পৌঁছুতে পারেনি। শতকোটি মাইল দূরে, এখন যেখানে বৃহস্পতি (Jupiter) বা শনি (Saturn) রয়েছে, সেখানে উষ্ণতা নেমে গেল প্রায় পরম শূন্যের কাছাকাছি (0°K)।

এই উষ্ণতায় সমস্ত পদার্থই থাকে কঠিন অবস্থায়। তাপমাত্রার এই বৈষম্যের ফল কিন্তু বিচিত্র।



চিত্র ৭। ধুলো-গ্যাসের মেঘে তাপমাত্রার বৈষম্য

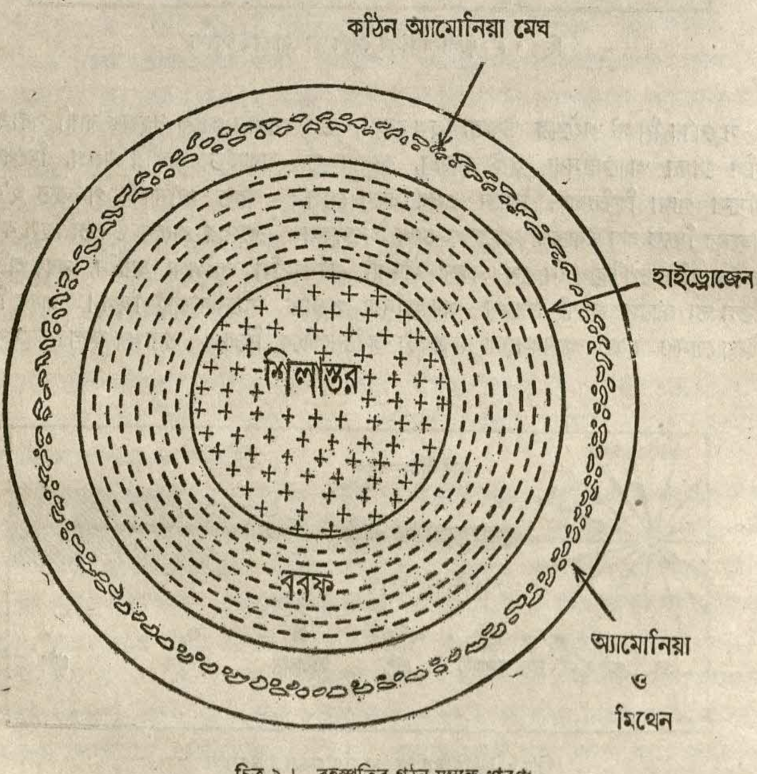
সূর্য্যের নিকট অংশের উষ্ণতা ছিল বেশী, তাই সেখান থেকে সহজ-উদ্বায়ী পদার্থ-গুলি যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন, নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম, নিয়ন এসব উবে গেল। হয়ত খানিকটা পাতিত হ'য়ে পেছনের দিকে কম উষ্ণতার রাজ্যেও চলে গিয়েছিল। দূরের অংশে উষ্ণতা ছিল কম, সূর্য্যের রশ্মি পৌঁছায় নি, সেখানকার উদ্বায়ী গ্যাসগুলি পালিয়ে যায়নি, বরং অতি শীতল তাপমাত্রার জন্যে মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি কঠিনাকারেই ছিল। এমন কি হাইড্রোজেনও হয়ত অনেকদূরে কতকটা কঠিনাকারে ছিল। তারপর কালক্রমে যখন



চিত্র ৮। বিভিন্ন তাপমাত্রায় গ্রহদের উৎপত্তি

শিলাখণ্ডগুলি পুঞ্জিত হ'য়ে গ্রহের ভ্রূণে পরিণত হ'তে শুরু করল, তখন সূর্য্যের কাছের গ্রহগুলিতে কোন গ্যাসের আবরণ রইল না (চিত্র ৮)। কিন্তু দূরান্তরের

গ্রহগুলিতে এসব উদ্বায়ী বস্তুগুলি থেকে গেল এবং তাদের বেশীর ভাগই কঠিনাকারে র'য়ে গেল. এই জন্যেই বুধ থেকে মঙ্গল [বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল] এই চারটি গ্রহের রাসায়নিক গঠন একরকমের আর দূরের বিশালাকার গ্রহগুলির [বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন, প্লুটো] রাসায়নিক গঠন ভিন্নরকমের। আদিতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক, অতএব দূরের ঠান্ডা গ্রহগুলিতে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন-উদ্ভূত নানারকম পদার্থ (মিথেন, অ্যামোনিয়া) বেশী থাকার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীরা বর্ণালী পরীক্ষার সাহায্যে এখন নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন সত্যিই বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন প্রভৃতি গ্রহে প্রচুর হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেনের স্তর রয়েছে। বৃহস্পতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণার একটা ছবি এখানে দেওয়া হ'ল (চিত্র ৯)। তা ছাড়া হাইড্রোজেন জগতের লঘুতম পদার্থ, আর হাইড্রোজেন থেকে তৈরী অন্যান্য



চিত্র ৯। বৃহস্পতির গঠন সম্বন্ধে ধারণা

পদার্থগুলিও (জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন) হাল্কা। সুতরাং গ্রহগুলি সম্পর্কে উপরে যে ধারণা করা হয়েছে, সেটা সত্য হ'লে দূরের গ্রহগুলির ঘনত্বও কম হবে। পরীক্ষাতেও

সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যদিও আয়তনে বা ওজনে দূরের গ্রহগুলি অনেক বিশালতর।

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
* ঘনত্ব	5.5	5.1	5.52	3.9	1.34	0.70	1.4	2.2	—
** দূরত্ব	0.39	0.72	1.00	1.52	5.20	9.54	19.2	30.0	39.5
*** ব্যাসার্ধ	0.38	0.96	1.00	0.53	10.95	9.14	3.9	3.5	—
**** ওজন	0.054	0.816	1.00	0.107	318.3	95.3	14.6	17.26	—

* ঘনত্বের একক, গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

** পৃথিবীর (সূর্য্য থেকে) দূরত্বের এককে।
এই দূরত্বের একক = 149·5 million km = 92·96 millon miles

*** পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এককে।
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6356·9 km = 3950 miles

**** পৃথিবীর ওজনের এককে।
পৃথিবীর ওজন = 5977×10^{24} Kg = 5883×10^{18} tons.

এ সকল তথ্য থেকে দুই পর্য্যায়ের গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। এখন আমাদের নিজেদের গ্রহ পৃথিবীর কথায় আসা যাক। পৃথিবী প্রথম পর্য্যায়ের অর্থাৎ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ চারিটির একটি। সুতরাং এর প্রথম উৎপত্তির সময়ে মার্তণ্ডের প্রতাপে এর চারিদিকের গ্যাস সব উদ্বায়িত হ'য়ে গিয়েছিল। পৃথিবী যখন জন্ম নিয়েছিল তখন সে ছিল নিরাবরণ; গ্যাসের ওড়নাটা ছিল না। জন্মকালে এর উষ্ণতাও বেশী ছিল না, মোটামুটি ঠাণ্ডাই ছিল। তাছাড়া এর রাসায়নিক গঠনের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।*

পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ তার নাইট্রোজেনের চেয়ে অন্ততঃ দশহাজার গুণ বেশী। কিন্তু সূর্য্যে বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সব নক্ষত্র বা নীহারিকায় সর্বত্রই অক্সিজেনের পরিমাণ নাইট্রোজেন অপেক্ষা তিনচার গুণের বেশী নয়। এর কারণ হ'ল, অক্সিজেনের অন্যান্য মৌলের সঙ্গে সহজে সম্মিলিত হ'য়ে নানারকমের পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা।

---

* কি করে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং তার মধ্যে সূর্য্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হ'ল, এ বিষয়ে বিজ্ঞানী গ্যামো (Gamow), হয়েল (Hoyle), কুইপার (Kuiper) এবং আফ্‌বেন (Alfven) বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। এঁদের প্রকল্পগুলির মধ্যে অবশ্যই গুরুতর মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সূর্য্যের চারদিকের গ্রহগুলো যে একটা ঘূর্ণায়মান গ্যাসের বলয় থেকে পুঞ্জীভবনের ফলে উদ্ভূত, সেটা মোটামুটি প্রত্যেক মতবাদেই স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু কিভাবে এই গ্যাস-ধুলো সূর্য্যের আয়ত্তে এল তা নিয়ে সবাই একমত ন'ন।

নাইট্রোজোনের সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত কম, তাই খুব বেশী পদার্থ সে তৈরী করে না। ফলে অক্সিজেন নানা পাথুরে ধরণের অক্সাইডে (SiO_2, Al_2O_3, MgO ইত্যাদি) পরিণত হয়ে কঠিন অবস্থায় থেকে গেছে। নাইট্রোজেন এ রকম অবস্থায় খুবই কম যেতে পেরেছে, ওর অধিকাংশই ছিল গ্যাস অবস্থায়। সৌরতাপে সেই গ্যাস উবে গেছে।

নিয়ন, ক্রুপটন, প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিমাণ পৃথিবীতে এত কম, যে নেই বললেই চলে। অন্যান্য নক্ষত্রে বা অন্যান্য গ্যাস-নীহারিকাতে যে পরিমাণ নিয়ন আছে পৃথিবীতে তার দশলক্ষ-ভাগের একভাগ মাত্র আছে। ক্রুপটন, জিনন প্রভৃতির পরিমাণ আরও কম। এর কারণ, এরা উদ্বায়ী গ্যাস এবং অন্য কোন যৌগ উৎপাদনে অক্ষম ; তাই পৃথিবী এদের ধরে রাখতে পারে নি।

আগেই বলেছি, দূরের বিশাল গ্রহগুলির তুলনায় পৃথিবীতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অনেক কম, যেটুকু আছে সেটা জল (H_2O) আর কিছু জৈব-যৌগ আকারেই আছে। হিলিয়ামের পরিমাণও পৃথিবীতে সামান্য। কেউ কেউ একটা মতবাদ পোষণ করেন, প্রথমাবস্থায় পৃথিবী (এবং অন্যান্য গ্রহেরাও) ছিল উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড, ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে কঠিনাকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর ওজন কম, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কম, তাই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এসব হাল্কা গ্যাস ধরে রাখতে পারেনি। বৃহস্পতি, শনি এসব গ্রহ বিশালকায়, প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের ফলে ওরা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর অন্যান্য গ্যাস রাখতে পেরেছে। কিন্তু এ ধারণাটা ঠিক নয়। এর বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বলা যায়। প্রথমতঃ, আদিম গ্যাস থেকে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন উবে গেলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্ভব, হিসেব করলে দেখা যায় প্রথমাবস্থায় তা হ'লে পৃথিবী ছিল বর্তমানের 120 গুণ, অর্থাৎ বর্তমান বৃহস্পতির প্রায় তিনগুণ। কাজেই বৃহস্পতি যদি হাইড্রোজেন আর অনান্য হাল্কা গ্যাস ধরে রাখতে পারে, পৃথিবীর না পারার কারণ ছিল না। তা ছাড়া সেই পরিমাণ হাইড্রোজেনকে চলে যেতে সময় প্রয়োজন অন্ততঃ ছয় হাজার কোটি বছর। কিন্তু নানারকম হিসেব থেকে জানা গেছে পৃথিবী গ্রহের বয়েস ছয় শত কোটি বছরের বেশী নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম থাকার জন্যেই হাল্কা গ্যাস উধাও হ'য়ে থাকে, তবে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যারা প্রায় সমান ভারী বা হাল্কা, সেগুলোও সমান ভাবেই উবে যেত প্রথম থেকেই। তাহ'লে, বর্তমান পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের এবং অক্সিজেনের অনুপাত অন্যান্য নক্ষত্রের মতোই হ'ত। কিন্তু তা নয়।

তৃতীয়তঃ, কিছুদিন আগে (1944) কুইপার নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন শনির উপগ্রহ টাইটানের (Titan) একটা আবহমণ্ডল আছে এবং তাতে আছে প্রচুর অ্যামোনিয়া আর মিথেন। দুইই যথেষ্ট হাল্কা গ্যাস। টাইটানের মাধ্যাকর্ষণ খুব কম, কারণ তার ওজন পৃথিবীর $\frac{1}{40}$ অংশ। অতএব, এসব হাল্কা গ্যাস সেখানে থাকার কথা নয়। সুতরাং উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঘনীভূত হ'য়ে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং হাল্কা বস্তুগুলির উদ্বায়িত হ'য়ে যাওয়ার মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পুরোনো আলোচনায় ফিরে আসি। পৃথিবী যখন আত্মপ্রকাশ করল গ্রহের আকারে, তার গ্যাসের আবরণ তখন নেই, সব গ্যাস উদ্বায়িত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেসব গ্যাসের অনেকেরই খানিকটা, সেই উষ্ণতায় যে সব পাথুরে কঠিন পদার্থ বা অক্সাইড ছিল, তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল এবং কঠিন দেহের অভ্যন্তরে স্থান নিয়েছিল। এমনি করে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন সঞ্জাত পদার্থগুলি অন্যান্য বস্তুর কঠিন অবস্থায় চলে যেতে পেরেছিল। এ ভাবেই শিলার আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁরা রসায়ন-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এসব পরিবর্তন সঙ্কেত দিয়েই প্রকাশ করেন। যেমন,

$$Al_2O_3 + xH_2O \rightarrow Al_2O_3, xH_2O \;;\; MgO + CO_2 \rightarrow MgCO_3$$

$$x\,SiO_2 + Al_2O_3 + yH_2O \rightarrow Al_2O_3\,(SiO_2)\,x, yH_2O$$

শুধু তাই নয়, ভ্রূণের পরিপুষ্টির সময় যখন দ্রুতবেগে বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি পুঞ্জিত হচ্ছিল তখন ওদের ভিতরে খানিকটা গ্যাস নিশ্চয়ই আটকে পড়েছিল। দেহায়তন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের অভ্যন্তরে চাপও খুব বেড়ে গিয়েছিল। একটা হিসেব থেকে মনে হয় ভেতরে এখন চাপ অন্ততঃ কয়েক লক্ষ অ্যাটমস্ফিয়ার হবে। এই প্রচণ্ড চাপে অবরুদ্ধ থেকে গ্যাস অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিল এবং হয়ত তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর দেহ যখন গড়ে উঠ্‌ছিল তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা সব উল্কাখণ্ডের প্রবল বর্ষণও তার ওপরে হয়েছিল। এই সব উল্কাপাতের মধ্যেও বরফ আর নানা গ্যাসীয় বস্তু কঠিন অবস্থায় এসে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল।

এ কথা ঠিক পৃথিবীটা কখনো উত্তপ্ত গ্যাস বা গরম কোন তরল বস্তু ঘনীভূত হয়ে তৈরী হয়নি। শিলাখণ্ডগুলো একত্র হয়েই এটা তৈরী এবং তখন তাপমাত্রাও বেশী ছিল না। কিন্তু যে সব শিলাগুলো এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার মধ্যে কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল, যেমন, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতিও ছিল। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি অস্থায়ী এবং নিজে থেকেই ভেঙে যায়। এদের পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থেকে আল্‌ফা, বীটা প্রভৃতি রশ্মি বেরিয়ে আসে এবং নূতন নূতন মৌলে পরিণতি লাভ করে। যেমন, ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম, পলোনিয়াম প্রভৃতির সৃষ্টি হয়; এরাও তেজস্ক্রিয় সুতরাং স্বতঃভঙ্গুর। এমনি ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি সীসাতে পরিণত হয়। সীসা স্থায়ী মৌল, তার তেজস্ক্রিয়তা নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি ক্রমাগত স্বাভাবিক নিয়মে তেজ বিকিরণ করেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। বিকিরণের সময় যে আল্‌ফা রশ্মি নির্গত হয়েছে তাই থেকে হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে উৎপত্তি হয়েছে প্রচুর উত্তাপের। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় বিভাজনেই তাপ নির্গত হয়েছে। কিছুটা তেজস্ক্রিয় পটাসিয়ামও ছিল, সেগুলো ভেঙে হয়েছে ক্যালসিয়াম আর আর্গন। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে অবিরাম তেজস্ক্রিয়ার ফলে যে প্রচন্ড তাপ উদ্ভূত হয়েছে, সেটা গ্রহের অভ্যন্তরেই জমা হয়েছে, ফলে, ভেতরের তাপমাত্রা হাজার হাজার ডিগ্রি বেড়ে

গিয়ে সেখানকার কঠিন বস্তুকে গলিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যে হিলিয়াম ও আর্গন দেখতে পাই তার উৎসও প্রধানতঃ ঐ তেজস্ক্রিয়া। শিলাখণ্ডের তাপবাহিতা কম, উৎসারিত তাপ বাইরে চলে যেতে পারেনি। অবরুদ্ধ তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্রের অঞ্চল গিয়েছে গলে, তার উপর রয়েছে প্রচণ্ড চাপ। শুধু যে শিলাগুলো গলে গিয়েছে তাই নয়, অনেক শিলাই উচ্চ তাপমাত্রায় বিযোজিত হয়ে গিয়েছে এবং সেখান থেকে উদ্বায়ী গ্যাস সব সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে জলীয় বাষ্প (সোদক শিলাখণ্ড থেকে), কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন। এদের সঙ্গে কিছু হিলিয়াম, আর্গন এবং সম্ভবতঃ সামান্য অক্সিজেন প্রভৃতিও ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সকল গ্যাসের জন্য এবং শিলার বিগলন হেতু অভ্যন্তরের চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রচণ্ড চাপের ফলে বাইরের কঠিন আবরণকে ভেদ করে গ্যাসগুলি স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। ভিতরে তখন প্রচণ্ড চাপ ও তেজের উৎপাত। ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিন আবরণের কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে। সেখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ও অন্যান্য গ্যাস বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে কোথাও গলিত শিলা। কখনও কখনও প্রচণ্ড চাপে উপরের কঠিন স্তর উঁচু হয়ে উঠে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি করেছে, কোথাও গ্যাস বেরিয়ে আসার পর, সঙ্কোচনের ফলে উপরের স্তর নীচে চলে গিয়ে বিরাট বিরাট গহ্বর ও গুহার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সেই শিশুকালে তেজস্ক্রিয়তা ছিল বেশী, তাপও উৎসারিত হয়েছিল অসম্ভব। সুতরাং অভ্যন্তরে অস্থিরতা চলেছিল অনেক যুগ ধরে, ভাঙা-গড়ার উলট-পালট দীর্ঘদিন ধরে চলার পরে একটা মোটামুটি সাম্যাবস্থায় এসে পৃথিবী পৌঁছুল। কিন্তু সেই আভ্যন্তরিক উৎপাত যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নয়। ভেতর থেকে এখনও গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের উৎসারণ চল্‌ছে। আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের সঙ্গে আজও গলিত লাভা-শিলার সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে এসে অভ্যন্তরের অস্থিরতার প্রমাণ দিচ্ছে।

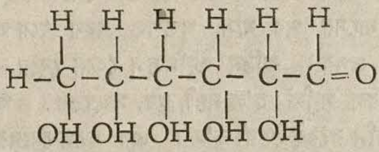
আগেই বলেছি, অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত গ্যাসের অধিকাংশই ছিল জলীয় বাষ্প এবং তার পরিমাণও ছিল প্রচুর। আর তার পরেই হ'ল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীকে আবৃত করে রইল। সুতরাং এখন যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবী ঘিরে রয়েছে, তখনকার গ্যাসের মোড়কটা এরকম ছিল না মোটেই। জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে বহু মাইল পুরু একটা মেঘের আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রইল; ঠিক এখন যেমন শুক্র গ্রহের অবস্থা। আজকের দিনেও শুক্র গ্রহের দেহটিকে আমরা দূরবীক্ষণ দিয়েও দেখতে পাই না, কারণ তার চারদিকে একটা অত্যন্ত ঘন বাষ্পের আবরণ রয়েছে। সূর্যের আলো এই আবরণ থেকে প্রতিফলিত হয় বলে, শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। সেই আদিম যুগেও পৃথিবী যখন বাষ্প-মেঘে আবৃত ছিল তখন সূর্য্যের আলোর প্রায় ৬০ শতাংশ প্রতিফলিত হ'ত, বাকী ৪০ শতাংশ মেঘ শোষণ করে নিত। সেই যুগে মঙ্গল গ্রহে দাঁড়িয়ে যদি পৃথিবীর দিকে তাকান যেতো, তবে পৃথিবীকে এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলে মনে হ'ত। চাঁদ যে এত উজ্জ্বল সেখান থেকে সূর্যের আলোর মাত্র শতকরা ৭ ভাগ প্রতিফলন হয়। সেদিনে পৃথিবীর বুকে

সূর্যের আলো এসে পেঁছুত না, ফলে সেখানে কোন দিন-রাত্রি ছিল না, সদা সর্বদা অন্ধকার।

এই ঘনমেঘ থেকে যখনই বৃষ্টি-ধারা পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে তখনই সেই জল পৃথিবীর ভিতরের থেকে উৎসারিত আগুনের হল্‌কা আর ফুটন্ত বাষ্পের তাপ প্রবাহে আবার উদ্বায়িত হয়ে গিয়েছে, কোন জল জম্‌তে পায়নি। তারপর কয়েক লক্ষ বছর ধরে অভ্যন্তরের দুর্বার অস্থিরতা চলার পর যখন স্বস্তি এলো, তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করল। এইবারে মেঘ থেকে নাম্‌ল প্রচণ্ড বৃষ্টির ধারা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শতশত বছর ধরে অবিরল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত চল্‌ল পৃথিবীর ওপর। কঠিন ভূমিতল বেয়ে বেয়ে নীচু গহ্বরে গিয়ে এই জল জম্‌তে আরম্ভ করল, সৃষ্টি হ'ল নদী, হ্রদ, সমুদ্রের। পৃথিবীর বুকে যে আজ অগাধ জলরাশি তা এমনি করেই তৈরী হ'ল। এর ফলে মেঘের আবরণ হাল্‌কা হ'য়ে স্বচ্ছ হ'য়ে গেলো। সূর্য্যকিরণ এসে তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে পেঁছুতে পারল। সৌরতাপে আবার কিছু সমুদ্রজল উদ্বায়িত হয়ে মেঘ হ'ল, তা থেকেও বৃষ্টি হ'ল। সেই আদিম যুগের সমুদ্রজলে অতি সামান্য খনিজ দ্রবিত হয়েছিল। সুতরাং সাগরের জল তখন লবণাক্ত ছিল না মোটেই। সেই জল ছিল সুপেয়। এরপরেই দীর্ঘদিন—লক্ষ লক্ষ বৎসর—ধরে মেঘের সৃষ্টি আর বর্ষণ চলল। বৃষ্টির আঘাতে আর প্রবল জলস্রোতে শিলাখণ্ড অতি ধীরে ধীরে ক্ষরিত ক্ষয়িত হয়ে জলধারার সঙ্গে এসে সমুদ্রে হাজির হল, খনিজ লবণে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয়ে গেল।

এর মধ্যে অবশ্য আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। বৃষ্টিজলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবিত হয়ে ক্রমাগত কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হ'ল এবং সেটা জলধারার সঙ্গে এসে সমুদ্রে জমা হ'ল। শুধু বৃষ্টিজলে খনিজ পাথরের যতটা দ্রবিত হয়, কার্বনিক অ্যাসিড জলে থাকলে তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রব হয়। সুতরাং সমুদ্রের জলে আরও সহজে খনিজ দ্রব্য এসে গেল। অ্যাসিড হলেও, কার্বনিক অ্যাসিডের অম্লত্ব খুবই কম এবং সঙ্গে কার্বনেট জাতীয় পদার্থ থাকাতে জলের অম্লত্ব থাকেই না। সুতরাং সমুদ্রজল তখন প্রশম (neutral) বা অতি সামান্য ক্ষারীয় হয়ে রইল। কার্বনের পরমাণু অবশ্য অতি সাধারণ, কিন্তু এর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য কোন পরমাণুতে দেখা যায় না। এর একটা প্রধান গুণ এই যে নিজেরই শত শত পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটিয়ে প্রকাণ্ড বড় বড় সব অণুর সৃষ্টি করে নিতে পারে। অর্থাৎ, কার্বন পরমাণুগুলির শৃঙ্খল বা চেন তৈরী করা সম্ভব। এর সঙ্গে জল থেকে পাওয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, কিংবা নাইট্রোজেন বা অন্যান্য পরমাণু মিলিত হয়ে বহুরকমের জটিল অণু সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলিত ধাতব কার্বাইড [Fe_3C, CaC_2 ইত্যাদি] উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে মিলে নানা হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ [কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ] সৃষ্টি করেছিল। কার্বনিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোকার্বন বা এই রকমের কার্বন-ঘটিত যে সব পদার্থ সমুদ্রজলে ছিল সেগুলিই পরবর্তীকালের জৈব পদার্থের আদি উপাদান। সূর্য্যের রশ্মিতে যে অতিবেগুনী আলো থাকে সেটা অক্সিজেন খুব দ্রুত শোষণ করতে পারে। কিন্তু সে সময়ের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন প্রায় ছিলই না, ফলে সূর্য্যরশ্মির

বেগুনীপারের আলোর অংশ শোষিত হত না। বেশ জোরালো অতিবেগুনী রশ্মি (ultraviolet rays) এসে পৃথিবীর বুকে পেঁছুত, যেটা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। এই অতিবেগুনী রশ্মির সহায়তা নিয়েই কার্বনিক অ্যাসিড থেকে দীর্ঘ এবং জটিল সব অণুর সৃষ্টি হতে লাগল। ঐসব অণুগুলো অবশ্যই অসংখ্য রকমের হয়েছিল, তাদের আকার, আয়তন, প্রকৃতি ইত্যাদিও হল অসংখ্য প্রকারের। এর মধ্যে নিশ্চিতই শর্করা জাতীয় অণুও হয়েছিল, যেমন, গ্লুকোজ,



এবং এদের সঙ্গে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যামিনো-অ্যাসিড প্রভৃতি মিশে প্রোটিনও দেখা দিয়েছিল। এসব সৃষ্টির কালে কোন কোন খনিজ প্রয়োজন হয়েছিল। সেগুলো তখন সমুদ্রে এসেই ছিল। তীব্র বেগুনীপারের আলো প্রয়োগ করে বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে এ-যুগের ল্যাবরেটরীতে নানা জটিল জৈবপদার্থ উৎপাদন করা গেছে। সুতরাং প্রকৃতিতে ঐ ধরনের প্রক্রিয়া যে হয়েছিল সেটা খুবই সম্ভব।

ঐসব বিরাট দানবীয় আকারের অণুগুলোর মধ্যে আবার নানা ধরণের সংযোগ ঘটতে লাগল; তারা আরও বড় হ'ল, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হ'ল, এবং পরস্পরে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পড়তে সুরু করল। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল প্রচুর; ক্রমাগত দানবীয় আকারের সব অণুর সৃষ্টি চলল যুগযুগ ধরে। ক্রমে সমুদ্রের জল এদের একটা গরম সুপে বা কাইতে পরিণত হয়ে গেল, আর তার মধ্যে সৌরশক্তির খানিকটা সংহত হয়ে রইল। অসম্ভব রকম বড় হয়ে যাওয়ার ফলে সেই বৃহদাকার অণুগুলোর নানা জায়গায় ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাও দেখা দিল। এই সব জটিল জড়ানো-পেঁচানো অণুগুলো কিন্তু তখন সেই ভাঙ্গাভাঙ্গিকে প্রতিরোধ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রয়াস পেল। অতিকায় অণুর ভাঙাগড়ার সময় যে তেজের আবির্ভাব হ'ল সেই তেজশক্তি দিয়েই অণুগুলো বিভাজন প্রতিহত করতে সচেষ্ট হ'ল। জড়অণুর এই যে প্রচেষ্টা, বিশেষ উদ্দেশ্যে এই যে শক্তির প্রয়োগ এটাই প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ। সৌর-শক্তির বিনিময়ে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সাহায্যে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটল। জলের প্রশম অবস্থা, সৌররশ্মি, পারিপার্শিবক তাপমাত্রা, ইত্যাদি সবকিছুই এর অনুকূল ছিল। সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হলেও এই প্রাণপদার্থ সমুদ্রময় ছড়িয়ে পড়ল। এই আদি প্রাণ-পদার্থকে আমরা নাম দিয়েছি "প্রোটোপ্লাজম"। এর তখনও কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় নি, একটা ঘন লালার মতো ভেসে আছে জলে। কিন্তু প্রয়োজনে দেহপিণ্ডের খানিকটা প্রসারিত ক'রে আহার সংগ্রহ করে, সংকুচিত হ'য়ে নিজেকে রক্ষা করে, আহার্য্যকে অভ্যন্তরে শোষণ ক'রে জীর্ণ করে। সর্বোপরি নিজেকে খণ্ডিত ক'রে বংশবৃদ্ধি করে। কালক্রমে এমনি করে অ্যামিবা, প্লাংকটন জাতীয় সব এককোষী বা কখনও বহুকোষী প্রাণপিন্ডের উদ্ভব হ'ল। এইখান থেকে সুরু হ'ল জীবজগতের ক্রম-বিকাশ।

এই আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস আর এক নতুন অধ্যায়, সেটা এখানে আলোচ্য নয়।

প্রথম যে জীবনের বিকাশ ঘটল, তাদের অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড খরচ হ'তে লাগল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এমনি সংযোজন চলার ফলে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ গেল খুব কমে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে প্রাণপিন্ডগুলি ফিরিয়ে দিল অক্সিজেন গ্যাস। আজকের বায়ুতে যে প্রচুর অক্সিজেন সেটা এই সূত্রেই পাওয়া। প্রাণশক্তির বিকাশে উদ্ভিদ ছাড়াও আর এক ধরণের কোষ তৈরী হ'ল যা থেকে আজ প্রাণিজগতের উদ্ভব হয়েছে। এদের প্রয়োজন অক্সিজেন আর এরা ফিরিয়ে দেয় কার্বন-ডাই অক্সাইড, যেটা উদ্ভিদের দরকার। তাই প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সমতা রক্ষা হচ্ছে আর বাতাসের উপাদানগুলির পরিমাণও নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

এমনি ক'রেই আজকের বায়ুমন্ডল জন্ম নিয়েছে।

পরিমাণ ও বিস্তার ঃ

পৃথিবীর এই গ্যাসের মোড়কটাতে কতখানি বাতাস রয়েছে স্বভাবতঃই সেটা জানতে ইচ্ছে হবে। বিজ্ঞানীরা নানাধরণের পরীক্ষা থেকে পৃথিবীর বায়ুর পরিমাণটা স্থির করেছেন। এর জন্যে বায়ুমণ্ডলের নানা স্তরের চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা এসব বের ক'রে নিতে হয়েছে। এখন বলা যেতে পারে বায়ুমন্ডলে গ্যাসের মোটামুটি পরিমাণ 51Gg ; ওজনের এই Gg এককটিকে বলে জিয়োগ্রাম (Geogram)। গ্রহ ইত্যাদির ওজনের পরিমাণ খুবই বেশী, তাই সেটা প্রকাশ করতে আজকাল এই এককটি ব্যবহৃত হয়। 10^{20} গ্রামের সমান হচ্ছে এক জিয়োগ্রাম।

$$1Gg = 10^{20} \text{ গ্রাম।}$$

$\therefore$ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজন $= 51 \times 10^{17}$ কিলোগ্রাম।

যদি টনের হিসেবে লেখা যায় তবে ওজনটা মোটামুটি হ'বে 5000×10^{12} টন, অর্থাৎ পাঁচ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন টন।

অঙ্কবিদেরা সংখ্যা দিয়ে সব কিছু তুলনা করতে আর মাপজোক করতে ভালবাসেন। ধরা যাক, অতিরিক্ত চাপ দিয়ে আর খুব ঠান্ডা করে সমস্ত বাতাসটাকে তরল বা কঠিনাকারে নিয়ে আসা গেল। তখন সেই বাতাসটাকে যদি প্রতিদিনে 10,000 টন করে ওয়াগনে ভর্তি করে দেয়া যায়, তাহ'লে সব বাতাসটাকে ওয়াগনে ভরে নিতে সময় লাগবে 1250,000,000 বছর।

এই ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট মানুষ। অন্যান্য জীবজন্তু আছে বটে, তবে মানুষই সমস্ত পৃথিবীটাকে ভাগ বাটোয়ারা করে অধিকার করে নিয়েছে। চারদিকের বাতাসটাও পৃথিবীর। আর এই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা (1972) অন্ততঃ 3800,000,000, আর ভূপৃষ্ঠের বর্গায়তন 197,000,000 বর্গমাইল। তার অর্থ, প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২০টি মানুষ রয়েছে। আর প্রতি বর্গমাইলের উপরের বাতাসের পরিমাণ 25,000,000

টন। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জমিদারীর পরিমাণ প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ টন বাতাস।

হঠাৎ মনে না হ'লেও বায়ুমণ্ডলের ওজন যথেষ্টই। এখন এই ওজনটাকে পৃথিবীর কঠিন দেহটার ওজনের সঙ্গে তুলনা করা যাক্। পৃথিবীর ওজন হচ্ছে, 5×10^7 Gg, অর্থাৎ $5{\cdot}8 \times 10^{21}$ টন।

দেখা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের ওজন পৃথিবীর তুলনায়,

$$\frac{51\mathrm{Gg}}{5 \times 10^7\mathrm{Gg}} \approx \frac{1}{10^6},$$

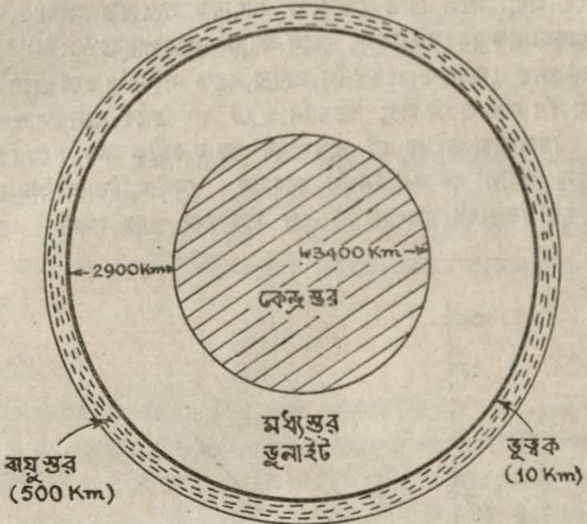
দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ওজনের দিকটা ছেড়ে এখন আয়তনের দিকটাতে আসা যাক্। মহাসাগরের তীরে দাঁড়ালে তার দিগন্ত প্রসারিত বিরাটত্ব দেখে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। যে বাতাসে আমরা সারাক্ষণ থাকি সেই বায়ুসমুদ্রের বিস্তার ও তেমনি সীমাহীন। বাতাস স্বচ্ছ, তাই বায়ুমণ্ডলের সীমানাটা বুঝে উঠ্‌তে পারা যায় না, তার বিশাল পরিধির কথা মনে জাগে না। বাতাস কিন্তু জুড়ে আছে সাগরের চেয়ে আরও অনেক বেশী স্থান। সমুদ্র ধরণীতলের অধিকার করেছে প্রায় সত্তর শতাংশ আর বাতাস রয়েছে সম্পূর্ণ ভূপৃষ্ঠের ওপরে। সমস্ত ভূতলের ওপরেই তার অবস্থান, আর উপরের দিকে কোথায় যে তার সীমানা বলা শক্ত। বায়ুমণ্ডলের ওপরের ছাত কোথায়? ধরিত্রীর বুক থেকে উপরের দিকে প্রায় দু'শ কিলোমিটার পর্যন্ত ত' মানুষ বাতাসের নানা পরীক্ষাই করেছে, বেলুন, রকেট এসবের সাহায্য নিয়ে। তারও ওপরে অন্ততঃ 500 কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, যদিও সেখানে বাতাস বড়ই হাল্‌কা ; তারও উপরে বাতাস চলে গেছে গ্রহলোকের শূন্যপ্রায় অবকাশে। এর সঙ্গে যদি মহাসাগরের তুলনা করি, প্রশান্ত মহাসাগর, যার গভীরতা সর্বাধিক, তার গভীরতম অংশ মাত্র এগারো কিলোমিটার।

কিন্তু তবু বলতে হ'বে, পৃথিবীর এই গ্যাসের ওড়নাটা তার কঠিন দেহের তুলনায় খুব বেশী কিছু নয়। যদি ধরে নেয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের সীমানা 500 কিলোমিটার পর্যন্ত, তা হ'লেও তার পরিধি কিছু অসামান্য রকমের প্রকাণ্ড নয়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় আট হাজার মাইল। তা হ'লে কিলোমিটারে হবে 12800 কিলোমিটার আর তার মধ্যে রয়েছে তিনটি স্তর ঃ ভূত্বক, ডুনাইট শিলার মধ্যস্তর আর কেন্দ্র-অঞ্চল। ভূত্বক খুবই কম, দশ-পনেরো কিলোমিটার পুরু। সেটা ঘিরে রয়েছে কঠিন শিলাময় অন্তঃস্তরকে, যেটার বেধ অন্ততঃ 2900 কিলোমিটার। এবং উত্তপ্ত অন্তরতম প্রদেশের কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ প্রায় 3400 কিলোমিটার। সুতরাং এর তুলনায় বায়ুমণ্ডলের আয়তন বেশী নয়। চিত্র ১০ থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

বাতাস কিন্তু সব জায়গাতে একরকম ঘন হয়ে নেই। উপরের দিকে যতই যাওয়া যাবে, বাতাস ক্রমশঃ হাল্‌কা দেখা যাবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে বেশীর ভাগ বাতাস রয়েছে ভূপৃষ্ঠের কাছে। এই অভিকর্ষের জন্য ভূপৃষ্ঠের

কাছের বাতাস খুব ঘন আর উঁচুতে বাতাস অনেক লঘু। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ বায়ুর অর্ধেকটাই রয়েছে মাটি থেকে প্রথম সাড়ে তিন মাইলের অর্থাৎ ছয় কিলোমিটারের



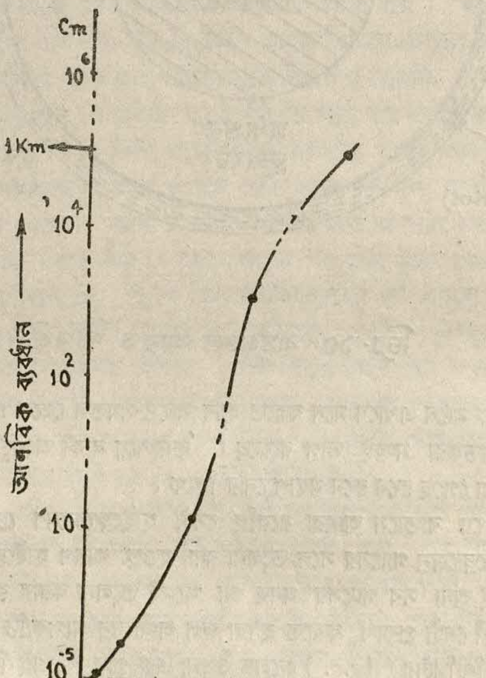
চিত্র-১০· বায়ুমণ্ডল আবৃত পৃথিবী ·

মধ্যে। মাটি থেকে মানে এখানে মনে করতে হবে সমুদ্র-সমতল থেকে। আঠার মাইলের মধ্যে বাতাসের শতকরা নব্বই ভাগ রয়েছে। তারপরে বাকী অংশটুকুই, অর্থাৎ আর দশ শতাংশ, ছড়িয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে মহাশূন্যের দিকে।

মাটির কাছের যে বাতাসে আমরা রয়েছি সেটা হাইড্রোজেনের চেয়ে প্রায় 14·4 গুণ ভারী। হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, কারণ হাইড্রোজেন পৃথিবীর লঘুতম গ্যাস, তাই অন্য সব গ্যাসের ঘনত্ব ওর সঙ্গেই তুলনা করার রীতি। অন্যান্য জিনিস কতটা ভারী সেটা প্রকাশ করতে হ'লে জল আমাদের মাপকাঠি। জলের ঘনত্ব, অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার (1c.c.) জলের ওজন, এক গ্রাম। এই হিসাবে বাতাসের ঘনত্ব হ'বে মাত্র 0·00129 গ্রাম। এই হিসাবে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব দেখা গেছে, 5·52 গ্রাম। উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব খুব দ্রুত কমে যায়, তাই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেলে হাঁপ্ ধরে যায়। এর কারণ বাতাস হাল্কা, সুতরাং অক্সিজেনের পরিমাণ কম, সেই হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। এই কারণেই পর্ব্বত-অভিযানে অক্সিজেনের বোতল নিয়ে যেতে হয়।

উপরের দিকে বাতাসের এই ঘনত্ব কমে যাওয়ার কথাটা আর একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। বাতাসের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি নানা গ্যাস।

এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি নিরন্তর ভীষণবেগে ছোটাছুটি করে আর এই ছোটাছুটির সময় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাও লাগে। মাটির কাছের বাতাসে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে থাকে অসংখ্য অণু, ফলে প্রতি সেকেণ্ডে আণবিক সংঘর্ষের সংখ্যাও খুব বেশী। সাধারণ অবস্থায় এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যা প্রায় $2{\cdot}6 \times 10^{19}$। সহজেই বোঝা যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এতগুলি অণুর মধ্যে সংঘর্ষও হবে প্রচুর। পর পর দুইটি সংঘর্ষের মধ্যে একটা অণু যতখানি ছুটে যায় তাকে বলে "মুক্তপথ" (free path)। বিজ্ঞানীরা গ্যাসের এই মুক্তপথের গড় দূরত্বটুকু অঙ্ক ক'ষে স্থির করেছেন এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকেও নির্ণয় করেছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, দুইটি অণুর ভিতরের ব্যবধান এই গড় মুক্তপথের প্রায় সমান। মাটির কাছের



চিত্র ১১। বিভিন্ন উচ্চতায় অণুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব

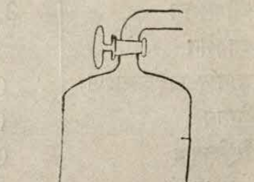
বাতাসের অণুগুলির মধ্যে ব্যবধান দেখা গেছে প্রায় 1×10^{-5} সেন্টিমিটার। কোন মুহূর্তে একটা অণু থেকে নিকটতম আর একটা অণু গড়ে 0·00001 সেন্টিমিটার

দূরে থাকবে। তাহ'লে এক সেন্টিমিটার গেলে একটি অণুর সঙ্গে এক লক্ষ অণুর দেখা হবে। এ হিসেবটা আমাদের চারদিকের মাটির কাছের বাতাসের। কিন্তু যদি দু'শো কিলোমিটার উপরে উঠে যাওয়া যায় তখন বাতাস এত হাল্কা যে দুইটি অণুর ব্যবধান হবে এক কিলোমিটার। অর্থাৎ, একটা অণু এক কিলোমিটার ছুট্লে আর একটা অণুর দেখা পাবে। এ থেকে বোঝা যায় উপরের বাতাস কত বিরল আর কত লঘু (চিত্র ১১)।

আর একটা হিসেবে দেখা গেছে, যদি সমস্তটা বায়ুমন্ডলের গ্যাস একত্র থাকত, মাটির কাছের বাতাসের ঘনত্ব নিয়ে, তা হ'লে সেই গ্যাসের মোড়কটা মাত্র আট কিলোমিটার পুরু হ'ত, তার বেশী নয়। আর যদি চাপ দিয়ে সব বাতাসটাকে জলের ঘনত্বে নিয়ে আসা যায়, তবে সেটা মাত্র দশ মিটারের একটা আবরণ হ'য়ে পৃথিবীকে ঘিরে থাকবে।

উপাদান

এখন অবশ্য সবাই জানে বাতাস একটা গ্যাসের মিশ্রণ। নানা রকম গ্যাস মিশে বাতাস তৈরী, তার মধ্যে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনই প্রধান। সেই হিন্দু সভ্যতার যুগ থেকে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর সব কিছু পাঁচটি আদি পদার্থ থেকে উদ্ভূত —ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম্। মরুৎ অর্থাৎ বাতাস তাই একটা মৌলিক পদার্থ বলে গণ্য হত। মাত্র দু'শ বছর আগে ল্যাভয়সিয়ার, প্রিষ্টলী, শীলে, এসব বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা থেকে দেখা গেল, বাতাসে অন্ততঃ দু'রকম গ্যাস রয়েছে। এর একটা ভাগ—আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ—সব কিছুর দহনে অংশ নেয়। বাকী গ্যাসটুকুর সে ক্ষমতা নেই। দহন-সহায়ক প্রথম ভাগটাকে বলি অক্সিজেন, আর যেটা দহন সমর্থন করে না, সেটা নাইট্রোজেন।


চিত্র ১২। অক্সিজেনে মোমবাতির দহন

এ ব্যাপারটা একটা খুব সহজ পরীক্ষা করেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। একটা বড় খোলা পাত্রে বা গামলায় জল নিতে হবে। এই জলের উপরে একটা কর্কে মোমবাতি বসিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর সেই বাতিটি একটি সিলিন্ডার বা বড় মুখের বোতল দিয়ে চাপা দিতে হবে (চিত্র ১২)। সিলিন্ডারটি যদি ওষুধের শিশির মত কাগজ দিয়ে পাঁচ ভাগে দাগ কেটে নেয়া যায় তাহ'লে আরও সুবিধা হবে। দেখা যাবে মোমটা যখন জ্বলতে থাকবে ধীরে ধীরে সিলিন্ডারের ভেতরে জলের তলটা উঠ্তে থাকবে। খানিকক্ষণ পরে মোমবাতিটা নিভে যাবে। এর কারণ অক্সিজেন আর নেই, বাতি জ্বলবার সময় শুষে নিয়েছে। তখন সিলিন্ডারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জলে ভরতি হয়ে গেছে। বাকী 4/5-অংশে গ্যাসটাতে কিছু পুড়তে পারে না।

এমনকি একটা ছোট ইঁদুর বা ফড়িং এতে রেখে দিলে সেটাও মরে যাবে, অক্সিজেন অভাবে। এই অবশিষ্ট চারভাগ গ্যাস হচ্ছে নাইট্রোজেন।

অক্সিজেন নাইট্রোজেন ছাড়া আরও কতকগুলি গ্যাস খুব কম পরিমাণে বাতাসে রয়েছে। এরা হচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প আর নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যথা, আরগন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্টন, জিনন। এদের কতকগুলি গ্যাস আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, এরা আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। আবার কোন কোন গ্যাসকে আমরা নিজেদের কাজে লাগিয়েছি। এ ছাড়াও অতি সামান্য পরিমাণে রয়েছে মিথেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড।

আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। গ্যাস ছাড়াও বাতাসে মিশেল হয়ে রয়েছে প্রচুর ধূলিকণা এবং কিছু তরল বস্তুকণা, যেমন তেলের কণা, জলের কণা ইত্যাদি। এসব কঠিন এবং তরল বস্তুকণাকে বায়ুর অপদ্রব্য বা মালিন্য বলা যেতে পারে, কিন্তু এদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বাতাসের উপাদানগুলির অনুপাত

উপাদান	ওজন-অনুপাত (শতাংশ)	আয়তন-অনুপাত (শতাংশ)	আয়তন-অনুপাত (দশ লক্ষ ভাগে)
নাইট্রোজেন	75.51	78.09	
অক্সিজেন	23.15	20.95	
আরগন	1.28	0.93	
কার্বন-ডাইঅক্সাইড	0.046	0.03	
নিয়ন	0.00125		18.1
হিলিয়াম	0.000072		5.2
মিথেন	0.000094		1.5
ক্রিপ্টন	0.00029		1.0
হাইড্রোজেন	0.0000035		0.5
নাইট্রাস অক্সাইড	0.00008		0.5
জিনন	0.000036		0.08

বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করার আগে এরা কি অনুপাতে আছে সেটা দেখা প্রয়োজন। উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়, বাতাস হাল্‌কা হয়ে পড়ে, সেটা ঠিক। কিন্তু মাটি থেকে প্রায় 40 মাইল পর্য্যন্ত যে কোন উচ্চতায় বাতাস পরীক্ষা করলে দেখা যায় বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাতটি মোটামুটি একই রয়েছে। এই চল্লিশ মাইলের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই রয়েছে; আঠার মাইলের উচ্চতার মধ্যেই রয়েছে শতকরা 90 ভাগ। অনেক উঁচুতে 70/80 মাইল বা তারও উপরের বাতাসটা ঠিক আমাদের এই ভূতলের বাতাস নয়। সেখানে

বাতাস আছেও খুব কম, যা আছে তাও প্রধানতঃ আয়নিত অবস্থায় থাকে। তাদের ভৌতিক অবস্থাটাই অন্যরকমের, বায়ুমণ্ডলের অংশ হ'লেও সেগুলো ঠিক আমাদের চারদিকের বাতাসের মতো নয়। এখানকার বাতাসের গ্যাসীয় উপাদানগুলির অনুপাতের একটা তালিকা (পৃঃ ২০) দেওয়া হ'ল। তালিকাতে উপর থেকে প্রথম চারটি গ্যাসই বেশী পরিমাণে আছে। অপর গ্যাসগুলির পরিমাণ তুলনায় অতি সামান্য। বাতাসে জলীয় বাষ্প ত' রয়েছেই, কিন্তু সেটা এখানে ধরা হয়নি, কারণ স্থানবিশেষে এবং উষ্ণতার সঙ্গে ত' বটেই, এর পরিমাণটা বিভিন্ন হয়ে থাকে। জলীয় বাষ্পের কথা পরে আমরা আলাদা আলোচনা করব। অনুপাতের যে তালিকাটি এখানে দেওয়া হ'ল সেটা অনার্দ্র বাতাসের ধরতে হবে।

বাতাসের মধ্যে এই গ্যাসগুলি শুধু মিশে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক সংযোগ নেই। অর্থাৎ নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে আছে মাত্র, নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইড হ'য়ে নেই। যদি গ্যাসগুলির মধ্যে রাসায়নিক সংযুতি থাকত তবে যৌগ পদার্থ হ'ত। যৌগ পদার্থের উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত সুনির্দিষ্ট এবং তার ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না। যেমন লবণে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন 23 : 35·5 এই অনুপাতে আছে, যে অবস্থাতেই লবণ থাকুক এই অনুপাতটি স্থির থাকবেই। কিন্তু বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত সর্ব্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। বাতাসে এই দুইটি গ্যাসের মোটামুটি ওজন-অনুপাতে 75 : 23। কিন্তু যখন বাতাস জলে দ্রব হয়ে থাকে, তখন নাইট্রোজেন-অক্সিজেনের অনুপাত দেখা যায় মোটামুটি 66 : 33। বাতাস জলে অবশ্য কিছু দ্রব হয়ে থাকে ; তা না হলে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর শ্বাসকার্য্য অসম্ভব হ'ত এবং তাদের অস্তিত্ব লোপ পেত। গ্যাসীয় বাতাস এবং জলে দ্রব বাতাসের উপাদানগুলির অনুপাতের বৈষম্য থেকেই বোঝা যায় বাতাস যৌগ পদার্থ নয়, একটি গ্যাস-মিশ্রণ মাত্র। এবারে আলাদা ক'রে উপাদান-গুলোর পরিচয় এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা যাক।

নাইট্রোজেন

বাতাসের উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের মোট পরিমাণ 38·6 Gg বা $3{\cdot}86 \times 10^{18}$ কিলোগ্রাম। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী (প্রায় চল্লিশগুণ) নাইট্রোজেন রয়েছে কঠিন শিলা আর মাটির সঙ্গে নানারকম যৌগের আকারে। একটা উদাহরণ দিলেই হবে। শোরা একটি নাইট্রোজেনের যৌগ, সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)। কেবলমাত্র চিলির উপত্যকায় খনিজ শোরাতেই নাইট্রোজেন রয়েছে 5×10^9 কিলোগ্রাম।

নাইট্রোজেন মৌলটির রাসায়নিক সক্রিয়তা একটু কম, খুব সহজে অক্সিজেনের মতো এটা সরাসরি অন্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হ'তে চায় না। কিন্তু তাহ'লেও জীবজগতের বিকাশ আর বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন এক গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করে। জীবদেহ গঠিত নানারকমের কোষ দিয়ে, তার মধ্যে রয়েছে প্রাণের উৎস প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম আবার তৈরী হয়েছে অত্যন্ত জটিল কতগুলো জিনিস দিয়ে, যার অন্যতম হচ্ছে প্রোটিন।

এই প্রোটিনে আছে নানা ধরণের অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং এরা সবাই নাইট্রোজেন-সঞ্জাত যৌগ পদার্থ। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ—প্রত্যেকেরই প্রোটিন, অতএব অ্যামিনো-অ্যাসিড, প্রয়োজন। উদ্ভিদেরা সচরাচর মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে অ্যামোনিয়াম-যৌগ টেনে নেয় এবং পরে সেটাকে অ্যামিনো-অ্যাসিড ও প্রোটিনে পরিণত করে। কয়েকটি উদ্ভিদ আছে, যেগুলো সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে এবং তা থেকে প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। পরে এদের কথায় আসছি।

দেখা যাচ্ছে, প্রোটিনের জন্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়েরই নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় বলে বাতাসের নাইট্রোজেনকে সরাসরি কাজে লাগান বা প্রাণীদেহে তার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতিই এর সমাধানের ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতির কতকগুলি ঘটনা এমনভাবে সংঘটিত হয়, যাতে বাতাসের নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত হ'য়ে জীবজগতের পক্ষে সহজলভ্য হ'য়ে পড়ে। প্রধানতঃ এটা হয় দুই রকমে।

(১) বায়ুমণ্ডলে উপরের স্তরে সর্ব্বদাই ছোট বড় বিদ্যুৎক্ষরণ চলছে। এর ফলে সেখানকার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মিলন ঘটে, নাইট্রিক অক্সাইডের (NO) সৃষ্টি হয়। নাইট্রিক অক্সাইড আবার আরও খানিকটা অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে (NO_2) পরিণত হয়। এই গ্যাস তারপর বৃষ্টির জলে দ্রব হয় এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে। বৃষ্টির সঙ্গে এই অ্যাসিড এসে যখন মাটিতে পড়ে তখন জমির ক্ষারীয় উপাদানের দ্বারা প্রশমিত হ'য়ে বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের সৃষ্টি হয়। এই নাইট্রেট কতগুলি জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রথমে অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। উদ্ভিদ তা থেকে অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং প্রোটিন তৈরী করে নেয়।

বাতাস ($N_2 + O_2$)

└——→ নাইট্রিক অক্সাইড (NO)

  O_2 └——→ নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড (NO_2)

  H_2O └——→ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3)

  OH^- └——→ নাইট্রেট (NO_3')

(জমির ক্ষার)

এমনি ক'রেই বাতাসের নাইট্রোজেন নিরন্তর নাইট্রেটের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রোটিনে চলে যাচ্ছে। একটা মোটা হিসেবে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ষোল লক্ষ কুইন্টাল নাইট্রোজেন এভাবে জমিতে চলে যায়।

(২) দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে লিগ্‌ুইমিনাস জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে। সিম্‌, মটর ইত্যাদি উদ্ভিদ এই জাতের। এসব গাছের শিকড়ের উপরে এক ধরণের অঙ্কুর জন্মায়, এদের বলা হয় নডিউল (nodules)। হেল্‌রাইগেল (Hellreigel, 1887) সর্বপ্রথমে দেখান, এ জাতীয় উদ্ভিদ এই নডিউলের ভেতর দিয়ে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করে। এই নডিউলের মধ্যে থাকে অ্যাজোটোব্যাক্‌টার (azotobacter) জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া। বাইজারিঙ্ক (Beijerinck, 1901) প্রমাণ ক'রে দেন এই ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যেই বাতাসের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হ'য়ে যায়। কি ক'রে এই রাসায়নিক পরিবর্তনটি ঘটে সেটা খুব পরিস্কার ভাবে আজও বোঝা যায়নি। তবে রাইজোবিয়াম (Rhizobium), ক্লষ্ট্রিডিয়াম বুটিরিকাম (Chlostridium Butyricum) প্রভৃতি ব্যাক্‌টিরিয়া যে নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করতে সাহায্য করছে সেটা নিঃসন্দেহ।

লিগ্‌ুইমিনাস জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও অনেক রকম সবুজ সমুদ্র-শৈবাল বা অ্যালজী (algae) সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে টেনে নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যে পরিণত করতে পারে। বাঙালী বিজ্ঞানী ডঃ প্রাণকুমার দে (1939) প্রথম প্রমাণ করেন অ্যানাবেনা শৈবাল কোষেও নাইট্রোজেন শোষিত হয়ে সরাসরি যৌগে পরিণত হয়। এ ছাড়াও নসটক (Burris, 1943), সিলিন্ডোস্পারমাম (Bortels, 1940) প্রজাতির অ্যালজীরা যে এমনি করে নাইট্রোজেন থেকে সরাসরি খাদ্য তৈরী ক'রে নেয় তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

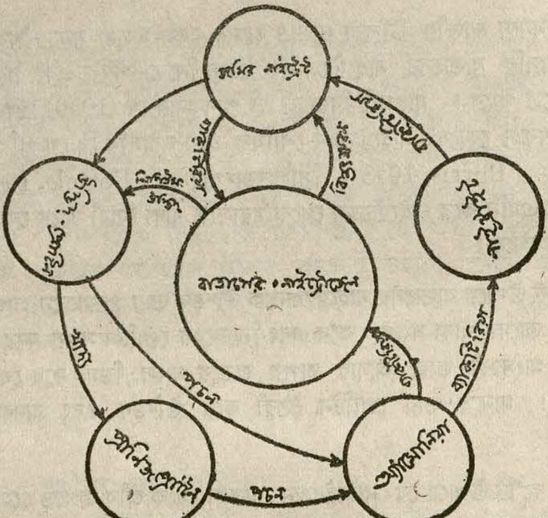
এই দুইটি উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে লাগায়। জন্তুরা উদ্ভিদ থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নিজেদের প্রোটিন সঞ্চয় করে। জন্তুদের ভিতর যারা মাংসাশী তারা আবার অপর জন্তুর মাংস, ডিম, দুধ থেকে নিজেদের প্রোটিন পায়। মানুষ তার প্রোটিন তৈরী করে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য থেকে।

প্রাকৃতিক দু'টি উপায়ে যে নাইট্রোজেন বাতাস থেকে জীব জগতে চলে আসে তার পরিমাণ খুব কম নয়—বছরে গড়ে প্রায় 5×10^{10} কিলোগ্রাম। এর ফলে মনে হবে কালক্রমে বাতাসের নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ মোটামুটি স্থির রয়েছে। এর কারণ, কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াও প্রকৃতিতে সর্ব্বদা ঘটছে এবং তার ফলে নাইট্রোজেন মৌলের উৎপাদন হচ্ছে। উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর ধ্বংসের পর তাদের পচন শুরু হয়। এতে ওদের প্রোটিনগুলো অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণতি লাভ করে। প্রাণিদেহের নিঃসৃত মলমূত্র ইত্যাদি থেকেও প্রচুর অ্যামোনিয়া নিরন্তর তৈরী হচ্ছে। জমিতে যখন এই সব পচনশীল পদার্থ থাকে তখন নানারকম ব্যাকটিরিয়া তাদের আক্রমণ করে। নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) প্রথমে অ্যামোনিয়াকে জারিত করে দেয় নাইট্রাইটে। তারপর নাইট্রোব্যাকটার (Nitrobacter) নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ জীবজগৎ থেকে আবার নাইট্রেট জমিতে ফিরে এল। এই

নাইট্রেটকে উদ্ভিদ আবার খাদ্যে পরিণত করে। এ কথাটাই কবিগুরু সুন্দর করে বলেছেন ঃ

> "Dead leaves when they lose themselves in soil
> take part in the life of the forest."
> (Fireflies. 265)

খানিকটা নাইট্রেট আবার জমির কোন কোন ব্যাকটিরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে নাইট্রোজেন গ্যাস হ'য়ে বাতাসে ফিরে আসে। এভাবেই নাইট্রোজেন বায়ু থেকে অপসারিত হ'য়ে জীবজগতে প্রবেশ ক'রে আবার জীবজগতের ধ্বংস আর পচনের ফলে বায়ুতে ফিরে আসে। এটাকে বলা হয় নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বিবর্তন-চক্র। প্রকৃতিতে এই বিপরীত ঘটনাগুলির মধ্যে এমন একটা সঙ্গতি রয়েছে, যে বায়ুতে নাইট্রোজেনের অনুপাতের কোনই ব্যতিক্রম হয় না। চিত্র ১৩ থেকে এই বিবর্তন-চক্রের একটা ধারণা হবে।



চিত্র ১৩। নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র

কিন্তু আজকের দিনে মানুষের নাইট্রোজেন-সঞ্জাত যৌগের প্রয়োজন অনেক। এর কয়েকটি কারণও আছে। (১) লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে, তাই খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ান দরকার। এর জন্যে কৃত্রিম সার, বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন, সুতরাং অ্যামোনিয়াম লবণের বিস্তর চাহিদা এবং সেটা বাতাসের নাইট্রোজেন থেকেই তৈরী হচ্ছে। (২) বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ তৈরী করতে নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রয়োজন। (৩) আধুনিক সমরোপকরণের একটি প্রধান প্রয়োজন বিস্ফোরক আর অধিকাংশ বিস্ফোরকই নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে তৈরী করা হয়।

অ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক অ্যাসিডের এই চাহিদা প্রকৃতির স্বাভাবিক দানে সঙ্কুলান

হয় না এবং সেটা সহজে পাওয়াও যায় না। সেই জন্যে বাতাসের অফুরন্ত নাইট্রোজেনের সামান্য খানিকটা যৌগে পরিণত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপায়ে বায়ুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত ক'রে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় নাইট্রোজেন-বন্ধন।

এ শতাব্দীর গোড়াতে বার্কল্যান্ড এবং আইড নাইট্রোজেন-বন্ধনের প্রথম উপায়টি উদ্ভাবন করেন; প্রকৃতিকে অনুকরণ ক'রে খুব জোরালো বিদ্যুৎ-শিখার মধ্য দিয়ে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটা মিশ্রণ চালনা করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী করেন। এটা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড সহজেই পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ব্যয় এবং অনেক বেশী বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় বলে এখন আর কোথাও এ পদ্ধতিটির প্রচলন নেই।

আজকাল বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া সর্ব্বত্র প্রস্তুত হয় হেভার পদ্ধতিতে। অতিরিক্ত চাপ এবং তাপমাত্রাতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ লৌহচুর প্রভাবকের (catalyst) উপর দিয়ে পরিচালনা করলে সহজেই অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। এই-ই হেভার পদ্ধতি। অ্যামোনিয়ার নানারকমের লবণ জমিতে সার হিসেবে দেওয়া হয়; বিশেষ ক'রে অ্যামোন-সাল্‌ফ $(NH_4)_2SO_4$। সিন্ধ্রিতে এর কারখানা রয়েছে। ইউরিয়া নামক প্রধান নাইট্রোজেন-সারও এই অ্যামোনিয়া থেকেই তৈরী করা-হয়। অ্যামোনিয়া থেকে আবার অল্প-আয়াসেই নাইট্রিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়।

বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করার আরও উপায় রয়েছে। সেগুলিরও অল্পাধিক প্রয়োগ হয়। সারপেক্ প্রণালীতে বিচূর্ণ বক্সাইট খনিজ এবং কোকের মিশ্রণ নাইট্রোজেন গ্যাসে প্রায় 1800°C-এ উত্তপ্ত করলে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড হয় এবং তা থেকে জলের সাহায্যে অ্যামোনিয়া তৈরী হয়। বক্সাইট ত' আমাদের দেশে প্রচুর। এ ছাড়া, সায়নামাইড-প্রণালীতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাইট্রোজেন গ্যাসে তাপিত করলে ক্যালসিয়াম সায়নামাইড ও কার্বন মিশ্রণ পাওয়া যায়। একে বলে নাইট্রোলিম। (চুন আর কয়লা থেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরী ক'রে নিতে হয়।) নাইট্রোলিম সরাসরি জমিতে সার হিসেবে দেয়া যায়। নাইট্রোলিম থেকে আবার খুব সহজে অ্যামোনিয়াম লবণও পাওয়া সম্ভব। বাতাসের নাইট্রোজেন কিভাবে আমাদের প্রয়োজনে আস্‌ছে সেটা বুঝবার জন্যেই এসব উল্লেখ করা। রাসায়নিক সংকেতে এ পদ্ধতিগুলি আরও সহজে বলা যায়।

রাসায়নিক ক্রিয়া	পদ্ধতি
a) $N_2 + O_2 = 2NO - 43200$ cal	[বার্কল্যান্ড-আইড]
b) $N_2 + 3H_2 = 2NH_3 + 24000$ cal	[হেভার]
c) $Al_2O_3 + 3C + N_2 = 2AlN + 3CO$	[সারপেক]
d) $CaC_2 + N_2 = CaCN_2 + C$	[নাইট্রোলিম]

আর একটি কথা। এর আগেই আমরা দেখেছি. বাতাসে সামান্য পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) আছে এবং এর অনুপাতটিও নির্দিষ্ট। এখন জানা গেছে, বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড আস্‌ছে, জমিতে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়া যখন নাইট্রাইটে

পরিণত হয়, সেখান থেকে। নাইট্রাইট তৈরী হওয়ার সময় খানিকটা হাইপো-নাইট্রাস্ অ্যাসিড ($H_2N_2O_2$) হয় এবং সেটা ভেঙে গিয়ে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস বাতাসে চলে আসে।

$$H_2N_2O_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$$

হাইপো-নাইট্রাস অ্যাসিড   নাইট্রাস অক্সাইড

নাইট্রাস অক্সাইড এমনি বেশ স্থায়ী, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে এসে যখন এটা অতি-বেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আসে, তখন সেটা ভেঙে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণতি লাভ করে।

$$N_2O + h\nu = N_2 + O$$
$$N_2O + O = N_2 + O_2$$

জমির অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রাস অক্সাইডের উৎপাদন-হার এবং বায়ুর উপরের স্তরে ওর আলোক-রাসায়নিক বিভাজনের হার (Photochemical decomposition), এই দুইটির ভিতর একটা সমতা রয়েছে, যার জন্যে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের অনুপাতটিও স্থির।

নাইট্রোজেনের অপর আর একটি উপকারের কথা সহসা মনে আসে না, কিন্তু তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বাতাসে যদি নাইট্রোজেন না থাকত, সবটাই অক্সিজেন হ'ত, তা হ'লে সেই অক্সিজেনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে দেহের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার খুবই প্রাবল্য ঘটত। তার ফলে জীবন ধারণের স্বাভাবিক অবস্থা রাখা সম্ভব হ'ত না এবং শরীরের তাপমাত্রাকেও সংযত রাখা যেত না। নাইট্রোজেন থাকাতে অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব গেছে কমে। ফলে শরীরের ভেতরের জারণ-ক্রিয়াগুলো সংযত এবং সহজ হয়েছে। পরোক্ষে এটা নাইট্রোজেনের একটা বিশেষ অবদান।

অক্সিজেন

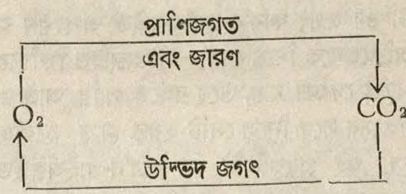
পরিমাণের দিক দিয়ে অবশ্য অক্সিজেনের স্থান নাইট্রোজেনের পরে। কিন্তু গুরুত্বের হিসাবে বিচার করলে অক্সিজেনকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। অক্সিজেন না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্বই থাকত না। মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, যেখানেই প্রাণের বিকাশ সেখানেই অক্সিজেনের প্রয়োজন। সমস্ত জীবজগত অক্সিজেন-নির্ভর। শ্বাস-প্রশ্বাসেই প্রাণ স্পন্দিত, অক্সিজেন না থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অভাবে সেই প্রাণের স্পন্দন লোপ পাবে মৃত্যুর অন্ধকারে। অহোরাত্র প্রতিমুহূর্তে সমস্ত জীবজগত বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে। সেই অক্সিজেনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোষের অভ্যন্তরে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া, আর তারই ফলে পুষ্টি ও বিস্তার হচ্ছে জীবের। অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে জীবজগত বাতাসকে ফিরিয়ে দিচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস। অন্য সব গ্রহ, উপগ্রহে নেই অক্সিজেন, তাই সেখানে প্রাণের বিকাশও ঘটেনি।

তা ছাড়াও একটু ভাবলেই দেখা যাবে, যে কয়টি জিনিসের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের উন্নত জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আগুন। কয়লা জ্বলছে, কাঠ পুড়ছে, তেল পুড়ছে, তাই থেকে আগুন পাচ্ছি, পাচ্ছি শক্তি। কিন্তু

অক্সিজেন না থাক্‌লে কোন আগুনই পাওয়া যেত না। কাঠ, তেল, কয়লা এসব জারিত ক'রে অক্সিজেন অনলের সৃষ্টি করছে। প্রধানতঃ অনলের শক্তি দিয়েই আমাদের রান্নাঘর থেকে টাটার কারখানা পর্য্যন্ত সব কাজ চল্‌ছে, এই সব জ্বালানি পুড়ে আবার সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসই হচ্ছে।

কথা উঠ্‌বে, এমনি ক'রে যদি অনবরত অক্সিজেন ক্ষয়ে যায় তাহ'লে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাবেই। কিন্তু তা নয়; অক্সিজেনের অনুপাত বাতাসে স্থির রয়েছে যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীর অতি শৈশবে আজ যে বাতাসে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন দেখছি তা ছিল না। প্রথমে মহাসাগরে যখন ছোট্ট ছোট্ট কোষের শৈবালে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল তখনই কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে তার খাদ্য উৎপাদন শুরু হ'ল আর তার বদলে বাতাসে অক্সিজেন জমতে শুরু করল। এর পরে কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছে আর একসময়ে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের আর প্রাণি-জগতের একটা সমতা এসে গেল। আজ বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ এত সুস্থির যে, এমনকি অক্সিজেনের অনুপাত যদি 0·107 শতাংশও কমে যায় তৎক্ষণাৎ আমরা সেটা টের পাই, আমাদের দেহযন্ত্রটি এমনি সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল।

বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার কারণ হ'ল, দুইটি পরস্পর-বিরোধী কান্ড ঘট্‌ছে প্রকৃতিতে সব সময়। প্রাণ ধারণের জন্য যেমন অক্সিজেন বাতাস থেকে চলে যাচ্ছে, তেমনি সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎ আবার কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করছে। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদ তার কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করছে এবং অক্সিজেনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। এমন নিপুণতার সঙ্গে প্রকৃতি এই কাজ করে যাচ্ছে যে যতটা অক্সিজেন খরচ হচ্ছে ততটাই আবার ফিরে আসছে প্রতি মুহূর্তে।



সমস্ত উদ্ভিদই কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংহত ক'রে নিয়ে অক্সিজেন সৃষ্টি করছে। এমনকি সমুদ্রে চোখে দেখা যায় না অতি ক্ষুদ্র যে শৈবাল ফাইটো-প্লাংকটন (Phyto-plankton) রয়েছে, যার পরিমাণ অফুরন্ত, তারাও এমনি ক'রেই অক্সিজেন তৈরী করছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে। অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এই বিবর্তন-চক্রের জন্যেই প্রাণিজগৎ তথা জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের পাতার কোষে সবুজ কণা ক্লোরোফিল থাকে। সূর্য্যের আলোর উপস্থিতিতে এই ক্লোরোফিল কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের মিলন ঘটিয়ে দেয়। ক্লোরোফিল বস্তুতঃ প্রভাবক মাত্র, এর পরিবর্তন হয় না। এই বিক্রিয়ার জন্য বেশ খানিকটা শক্তির প্রয়োজন। ক্লোরোফিল খানিকটা সৌরশক্তি শোষণ করে এই বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। বিক্রিয়ার

ফলে পাওয়া যায় ফরম্যালডিহাইড এবং শেষ পর্য্যন্ত গ্লুকোজ-জাতীয় শর্করা আর অক্সিজেন তার উপজাত দ্রব্য। লিখতে পারি,

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{সূর্য্যালোক}]{\text{ক্লোরোফিল} +} HCHO + O_2$$

$$\longrightarrow C_6H_{12}O_6 \text{ (শর্করা)}$$

সূর্য্যালোকে ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদের এরূপ খাদ্য তৈরী করার পদ্ধতিটিকে বলে সালোকসংশ্লেষ বা Photosynthesis।

আবার প্রাণিদেহে এর বিপরীত কাণ্ড ঘটছে। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় দ্রব্য জারিত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপাদন করে। মানুষের কথাই ধরা যাক। প্রশ্বাসের সময় মানুষ যে অক্সিজেন নেয়, সেটা রক্তের হেমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিলে গিয়ে অক্সি-হেমোগ্লোবিন তৈরী হয়। এটা আবার নানারকম এনজাইম ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে কোষের ভিতরের গ্লুকোজকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আর জলে পরিণত করে দেয়। নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ফিরে আসে। যদি এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ না নিয়ে যেত আর পরিবর্তে অক্সিজেন না দিত তবে আর আমাদের বাঁচতে হ'ত না। এই বিক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিকেরা লেখেন,

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি তাতে 0.03% CO_2 থাকে আর যে বাতাস ফিরিয়ে দেই তার CO_2-এর পরিমাণ 4.0%।

এ রকম করেই অক্সিজেন আর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বিলোপ এবং সৃষ্টির চক্রীয় পরিক্রমণ চল্‌ছে। উদ্ভিদ-জগৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড অপহরণ ক'রে অক্সিজেন দিচ্ছে আর সমস্ত জীবজগত অক্সিজেনকে নিয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ফিরিয়ে দিচ্ছে। কল্পনার দৌড়টা যদি একটু খুলে দেওয়া যায়, তবে বলতে পারি, আজ এই মুহূর্ত্তে তুমি যে অক্সিজেনের অণুটি প্রশ্বাসের সঙ্গে নিলে সেটি হয়ত মুক্ত হয়েছিল দশ বছর আগে একটা প্লাংকটন থেকে। ওই প্লাংকটনটি যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুটি পেয়েছিল সেটা সম্ভবতঃ অ্যাডিস-আবাবার একজন চাষীর নিশ্বাসে সৃষ্টি হয়েছিল আরও পঁচিশ বছর আগে। কিংবা তারও আগে সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুটি জন্ম নিয়েছিল রাণী ভিক্টোরিয়া বা বাহাদুর শাহের নিশ্বাসে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়াও আমরা নানা দরকারে ও শিল্পে বাতাসের অক্সিজেনকে কাজে লাগাই। সালফারকে বাতাসের অক্সিজেনে পুড়িয়ে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করি ; সালফিউরিক অ্যাসিড বর্ত্তমান উন্নত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নানারকম শিল্পের প্রধান এবং আদি উপকরণ। আবার, বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে পাই অ্যামোনিয়া, পূর্ব্বেই দেখেছি ! এই অ্যামোনিয়াকে বাতাসের অক্সিজেন দিয়ে জারিত ক'রে তৈরী হয় নাইট্রিক অ্যাসিড। এটিও আধুনিক নানা শিল্পে ও বিস্ফোরক তৈরী করতে একান্ত প্রয়োজন। এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড

বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুবই কম, 0.03%। দশ হাজার লিটার বাতাসে মাত্র তিন লিটার কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকে। পরিমাণে সামান্য হলেও এর অবদান যে অসামান্য তা' আগেই দেখেছি। কার্বন-ডাইঅক্সাইড না হ'লে উদ্ভিদজগত লোপ পাবে আর তার সঙ্গে প্রাণিজগতও। বাতাসে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে সেটা সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটু স্বচ্ছ পরিষ্কার চুনের জল বাতাসে রেখে দিলে সেটা খানিকক্ষণ পরে ঘোলাটে হয়ে যায়। বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে বলেই এরকম হয়, চুনের জলকে ঘোলাটে করা ওর ধর্ম। আমাদের নিশ্বাসের ফলে যে গ্যাস বাইরে আসে সেটাকেও চুনের জলের ভিতর পরিচালনা করলে চুনের জল ঘোলাটে হয়। সুতরাং নিশ্বাস-বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের যে পরিমাণটা উল্লেখ করা হ'ল সেটা গড় হিসেবের। মাটির কাছের বাতাসে গড়ে এই পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড দেখা যায়। কয়েক মাইল উপরে উঠে গেলে এর অনুপাত অনেকটা কমে যায়।

সালোকসংশ্লেষণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ-জগতে প্রবেশ করে এবং জৈব পদার্থে পরিণত হয়—এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ মনে হ'তে পারে জমির উপরে, বন জঙ্গল যেখানে বেশী, যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চলে, সেখানেই সালোকসংশ্লেষণ বেশী হবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে মহাসাগরের উপরেই এই প্রক্রিয়ার অত্যধিক প্রাচুর্য্য। সমুদ্র-শৈবালের পরিমাণ যেমন বেশী, আলোর বর্তমানে কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণও তেমনি দ্রুত। সংখ্যা দিয়ে পরিমাণটা প্রকাশ করলে আরও সহজে বোঝা যাবে।

সারাবছরে সালোক-সংশ্লেষে শোষিত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ

সমুদ্রপৃষ্ঠে = 462×10^{15} গ্রাম

জমির উপরে = 73×10^{15} গ্রাম

পৃথিবী পৃষ্ঠে মোট = 535×10^{15} গ্রাম

উদ্ভিদের কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ ছাড়াও প্রকৃতিতে আর একটি ব্যাপারে বাতাসের এই উপাদানটি অংশ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হ্যারল্ড ক্লেটন উরে (H. C. Urey, 1952), যিনি ভারী হাইড্রোজেন বের ক'রে যশস্বী হয়েছেন। কঠিন ভূত্বকের ওপরে রয়েছে প্রচুর সিলিকেট-জাতীয় শিলা, বিশেষ ক'রে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। এগুলো জলে একেবারেই দ্রবীভূত হয় না। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড এদের আক্রমণ ক'রে কার্বনেটে পরিণত ক'রে দেয়। বিজ্ঞানীরা সংকেত দিয়ে লেখেন,

$$CaSiO_3 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + SiO_2$$

$$MgSiO_3 + CO_2 \rightarrow MgCO_3 + SiO_2$$

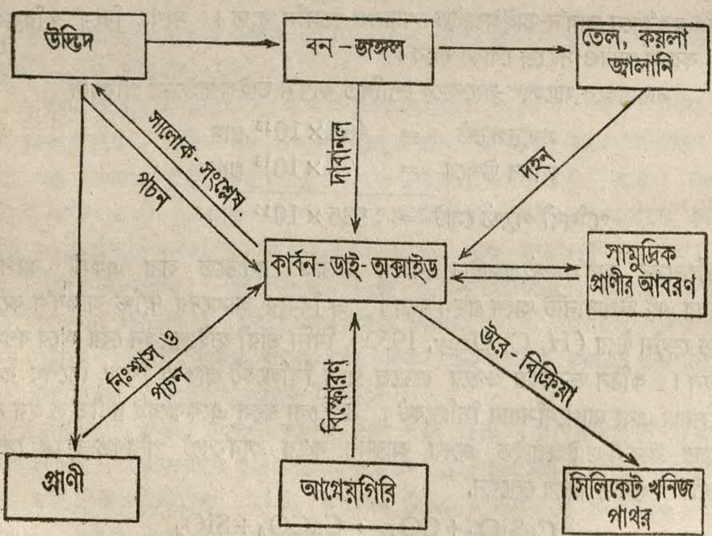
এই পরিবর্তন জলস্রোতের সান্নিধ্যে খুবই ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। কার্বনেটগুলি অনুকূল অবস্থা পেলে বাইকার্বনেট হ'য়ে জলে দ্রবীভূতও হ'য়ে যায়। এই প্রাকৃতিক

ক্রিয়াকে আজকাল "উরে বিক্রিয়া" বলে উল্লেখ করা হয়। ভূত্বকের রাসায়নিক পরিবর্তনে ও শিলাক্ষয়ে আর ভূমির উর্ব্বরতা সৃষ্টিতে এই বিক্রিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সমুদ্রে অনেক ছোট বড় জলচর প্রাণী রয়েছে যাদের দেহ একটা শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা। এই বহিরাবরণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে প্রধানতঃ তৈরী। ধ্বংসের পরে এই সব খোলা গিয়ে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয় এবং চুনাপাথরের শিলাস্তরে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট কিন্তু সৃষ্টি হয় বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকেই। অর্থাৎ সামুদ্রিক প্রাণীও বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরোক্ষ ভাবে ব্যবহার করছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে অপসারিত হয়ঃ (১) উদ্ভিদ-জগতের সালোকসংশ্লেষে (২) উরে প্রক্রিয়ায় সিলিকেট শিলার দ্বারা (৩) চুনাপাথরের স্তরে।

অপর দিকে বিভিন্ন উপায়ে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমতঃ সমস্ত জীবজগতে নিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিক্ষণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎসারিত হচ্ছে একথা আগেই বলা হয়েছে। জীবজন্তুর, গাছপালার ধ্বংসের ফলেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ফিরে আসছে। দ্বিতীয়তঃ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে নানা গলিত লাভার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ধরিত্রীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে বায়ুতে এসে যায়। তৃতীয়তঃ, নানা রকমের জ্বালানি সর্ব্বদা পুড়ছে ; তেল, পেট্রোল, কয়লা, কাঠ, বাড়ীতে, ফ্যাক্টরীতে, কল-কারখানায়, রেলে, মোটর-কারে সর্ব্বদা পোড়ান



চিত্র ১৪। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন ও অপসারণ

হচ্ছে। তাছাড়া, পাহাড়ে-জঙ্গলে মাঝে মাঝে বিরাট সব দাবানল জ্বলছে—এ সবই প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করছে। একটা আনুমানিক হিসেবে দেখা যায় (Kalle,

1945) প্রতি বছরে কেবলমাত্র এই জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসছে 6×10^{15} গ্রাম ; নেহাৎ কম নয়।

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অপসারণ এবং উদ্ভবের ভিতর সামঞ্জস্য থাকার জন্যেই বাতাসে ওর পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট। গত একশ বছর ধরে মাটির উপরের বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড সযত্নে মেপে দেখা গেছে, এ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত প্রায় 0·0026% বেড়ে গেছে। পরিমাণগুলো দেখা যাক,

সময়	কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত (%)
1901—1910	0·0293
1911—1920	0·0298
1921—1930	0·0303
1931—1940	0·0310
1941—1950	0·0316

কেন কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। অনেকেই মনে করেন, এই শতাব্দীর দ্রুত কলকারখানার প্রসার আর বনজঙ্গলের আবাদী জমিতে পরিণত হওয়াই এই বৃদ্ধির কারণ।

তাপ, আলো, অতি-বেগুনী রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি এগুলো সবই তরঙ্গ-শক্তি। এই বিভিন্ন তরঙ্গের গতির বেগ একই, পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা তাদের কম্পন-সংখ্যার। তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তার চেয়ে কম। লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নীল আলোর চেয়ে বেশী। অতি-বেগুনী রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক কম। পদার্থের ভিতর দিয়ে যখন এ সব তরঙ্গ যায়, তখন পদার্থ সব রকমের তরঙ্গ শোষণ ক'রে নিতে পারে না। প্রত্যেকটি পদার্থের কতকগুলি স্ব স্ব নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। সূর্য্য থেকে যে সব রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, সেই আলোকরশ্মি কার্বন-ডাইঅক্সাইড হজম করতে পারে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভিতর দিয়ে সেগুলো অনায়াসে চলে আসে। অথচ রাত্রিতে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সময় যে তাপ বিকীর্ণ হ'তে থাকে সেই তাপের বেশ খানিকটা কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ধরে রাখে। এর ফলে পৃথিবী তার সবটা তাপশক্তি হারায় না। এটা কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এক অযাচিত করুণা বলতে হবে।

আণবিক ঘড়ি

বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড বিজ্ঞানীদের আর একটা অভিনব ব্যাপারে সহায়তা করেছে। এর সাহায্যে আজ অতি পুরানো জৈব পদার্থ বা হাজার হাজার বছরের পুরানো জীবাশ্ম, যেগুলো মাটির নীচে প্রস্তরীভূত হয়ে রয়েছে তাদের বয়স নির্ভুলভাবে স্থির করা সম্ভব হয়েছে। এর কৃতিত্ব মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক লিব্বির (Libby)।

মহাশূন্যের কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে সর্বদা মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) পৃথিবীতে আস্‌ছে। এই রশ্মি যখন বায়ুর উপরের স্তরে এসে আঘাত করে তখন

বহু নিউট্রন-কণার উদ্ভব হয়। যখন এই নিউট্রনের কোন একটি এসে নাইট্রোজেনের কোন পরমাণুকে ধাক্কা দেয়, তখন তার কেন্দ্র থেকে একটা প্রোটন বেরিয়ে যায় আর নাইট্রোজেন পরমাণুটি কার্বন পরমাণুতে [$^{14}_{6}C$] পরিণত হয়। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা সংকেত দিয়ে এটা প্রকাশ করেন,

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}p$$

এই নাইট্রোজেন-উদ্ভূত কার্বনের পরমাণুটি সর্বদিক দিয়েই সাধারণ কার্বনের মতো, কিন্তু তেজস্ক্রিয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন বিকিরণ ক'রে আবার পূর্বের নাইট্রোজেনে ফিরে যায় ঃ

$$^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + _{-1}^{0}e$$

অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুর মতো এই তেজস্ক্রিয় কার্বনও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ভাঙতে থাকে।

সাধারণ কার্বনের পরমাণুতে থাকে ছয়টি প্রোটন আর ছয়টি নিউট্রন। কিন্তু এই তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরমাণুতে থাকে ছয়টি প্রোটন আর আটটি নিউট্রন। প্রোটন-সংখ্যা এক হলেই রাসায়নিক বিচারে পরমাণুদের অভিন্ন মনে করা যায়; তাদের সমস্ত রাসায়নিক ধর্ম একই হবে। এদের বলে 'আইসোটোপ'। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন, উপরের বায়ুস্তরে যার সৃষ্টি, সেগুলো অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড অবশ্যই তেজস্ক্রিয়; কিন্তু অপর যে কোন ধর্মে সাধারণ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মতোই ব্যবহার করে। তেজস্ক্রিয়তা মাপার জন্যে খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্র আজকাল তৈরী হয়েছে। তাই দিয়ে বাতাসের মধ্যে সাধারণ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে কি অনুপাতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড মিশে আছে তা মাপা গেছে। দেখা গেছে, প্রতি লক্ষ কোটি কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুর মধ্যে একটি মাত্র তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণু আছে। যে সামান্য তেজস্ক্রিয়তা মাটির কাছের বাতাসে দেখা যায় তা এই কার্বন-ডাইঅক্সাইডের জন্যেই। গত লক্ষ বছরে বাতাসে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এই অনুপাতের কোন ব্যতিক্রম হয়নি, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সবগুলো অণু একরকম নয়, তার সামান্য কয়েকটি তেজস্ক্রিয়। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ক'রে জৈব পদার্থের সৃজন করে। সুতরাং উদ্ভিদ-জগতে যে সব জৈব পদার্থ অর্থাৎ কার্বন-ঘটিত পদার্থ থাকবে তার মধ্যে সেই উপরের অনুপাতেই তেজস্ক্রিয় ($^{14}_{6}C$) কার্বন-ঘটিত অণুও থাকবে। আর আগে পরে যে সময়েই হোক, প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর দেহেও তা প্রবেশ করবে। এই তেজস্ক্রিয় ($^{14}_{6}C$) কার্বন যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক, মন্থর গতিতে তা ভাঙতে থাকবে। দেখা গেছে $^{14}_{6}C$-কার্বন আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা 5568 বছরে অর্ধেকটা হ্রাস পায়।

অঙ্ক দিয়ে যদি বুঝতে চাই, তা হ'লে যে সূত্র অনুসারে সময়ের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পায়, সেটা জানতে হবে। সূত্রটি হ'ল,

$$t = \frac{2{\cdot}303}{\lambda} \log (I_0/I) \approx 18490 \log (I_0/I) \; ; \quad (\lambda = 0{\cdot}639/5568)$$

I_0 এবং I যথাক্রমে আদি তেজস্ক্রিয়তা এবং t বছর পরের তেজস্ক্রিয়তা। কোন একটি পুরাতন জৈবজাত বস্তু বা কোন জীবাশ্মের বয়স স্থির করতে হ'লে সেই নমুনাটির বর্তমান তেজস্ক্রিয়তা (I) মাপতে হবে। আর সদ্যোজাত উদ্ভিদ পরীক্ষা করে তার তেজস্ক্রিয়তা (I_0) নির্ণয় করতে হবে। I এবং I_0 মাপা হ'ল, এখন উপরের সমীকরণ দিয়ে নমুনাটির বয়স (t) নির্ধারণ করা যাবে। এই উপায়ে 25000 বছরের পুরানো নমুনার বয়সও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বাতাসের এই $^{14}_{6}C$-সমন্বিত কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে "আণবিক ঘড়ি" মনে করা যেতে পারে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে আজকাল নানা কাজে লাগান হয়, যেমন সোডা তৈরী করতে, শুকনো বরফ তৈরী করতে। কিন্তু তার জন্যে চুনাপাথর পুড়িয়েই সেই গ্যাস তৈরী করা হয়, বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মিথেন আর কার্বন-মনোক্সাইড

কার্বন-উদ্ভূত আরও দু'টি গ্যাস বাতাসে রয়েছে, যদিও অতি সামান্য পরিমাণে ; এরা হচ্ছে মিথেন আর কার্বন-মনোক্সাইড। এদের পরিমাণ ঃ মিথেন = 0·0001% আর কার্বন-মনোক্সাইড = 0.00001%। পুকুর বা ডোবার পচা পানা থেকে বাতাসে মিথেন গ্যাস আসে ; মাটিতে পড়ে থেকে স্যাঁতসেতে জমিতে লতাপাতা যখন পচ্‌তে থাকে তখনও এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, জীবজন্তুর আন্ত্রিক গ্যাসের সঙ্গেও প্রচুর মিথেন গ্যাস উৎসারিত হয়। শুধু শেষের উপায়েই প্রায় পাঁচ কোটি টন মিথেন বছরে বাতাসে আসে। আর কার্বন-মনোক্সাইডের উৎস হচ্ছে ইঞ্জিনের কয়লা বা তেল। এই জ্বালানি পুড়বার সময় কার্বন-মনোক্সাইড খানিকটা হয়ই। বছরে গড়ে প্রায় বিশ কোটি টন কার্বন-মনোক্সাইড এভাবে বায়ুতে প্রবেশ করে। এই দু'টি গ্যাসেরই অপসরণ ঘটে মাটির উপরে রয়েছে এমনি কয়েকটি ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে। তাই বাতাসে এদের পরিমাণ বাড়তে পারে না।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঃ হিলিয়াম, আরগন ইত্যাদি

বাতাসে পাঁচটি গ্যাস আছে স্বল্প-পরিমাণে. যাদের কোন রকম রাসায়নিক সক্রিয়তা আদৌ দেখা যায় না। এজন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে—"নিষ্ক্রিয় গ্যাস"। এই পাঁচটি গ্যাস হচ্ছে—হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন এবং জিনন। এদের মধ্যে আরগনের পরিমাণ তবু একটু বেশী আর অপরগুলি অত্যন্তই কম। এই কারণেই এদের আর একটি নাম হচ্ছে "বিরল গ্যাস"। বাতাসে জিননের পরিমাণ হচ্ছে এক কোটি ভাগে এক ভাগের চেয়েও কম। আর এরা নিষ্ক্রিয় বলে এদের অস্তিত্ব ধরাও বেশ শক্ত। কিছুদিন আগেও নিষ্ক্রিয় গ্যাস যে রয়েছে বাতাসে, তা জানা ছিল না। এদের আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh,

1887) এক সময়ে গ্যাসের ঘনত্ব নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন পৃথক ক'রে নিয়েছিলেন, আবার, শোরা এবং অন্যান্য রাসায়নিক থেকেও নাইট্রোজেন তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন। নাইট্রোজেনের ঘনত্ব যখন নির্ণয় করলেন তখন দেখতে পেলেন যে বাতাসের নাইট্রোজেনের ঘনত্ব অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের ঘনত্বের চেয়ে সামান্য বেশী। প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দেখা গেল :

	ঘনত্ব
বাতাসের N_2	→ 0·0012572 গ্রাম
বিভিন্ন রাসায়নিক থেকে উদ্ভূত N_2	→ 0·0012506 গ্রাম

পার্থক্যটুকু অতি সামান্য, তবু বারে বারে একই ফল পাওয়াতে সিদ্ধান্ত করতে হ'ল, যে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে আরও কোন অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাস মিশে আছে। এরপরে র‍্যালে এবং স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে মিলে সেই ভারী গ্যাসের সন্ধান শুরু করলেন। খুব উত্তপ্ত কপার এবং তারপর উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে ক্রমাগত বাতাসকে পরিচালিত করে বাতাসের সব অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন শোষণ করিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল, যে একটুখানি গ্যাস থেকে গেছে। এই গ্যাসটুকুকে কিছুতেই শুষে নেওয়া যায় না, আর এটা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। কোন রকম বিক্রিয়াতে এই গ্যাসের উৎসাহ নেই বলে এর নাম দেওয়া হল "অলস" বা আরগন (1894)। পরে আরও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে এর মধ্যে আরও চারটি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল। আজকাল অবশ্য বাতাসকে খুব ঠাণ্ডা করে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে তরল করে নেওয়া হয়। যখন নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন তরল হয়ে যায় তখনও আরগন গ্যাস অবস্থায় থাকে এবং সেটা সহজেই আলাদা করে নেওয়া হয়। এই আরগন ইলেকট্রিক বাল্‌বে বর্তমানে প্রচুর ব্যবহার হয়। আজকাল প্রচার বিজ্ঞপ্তিতে আর সাইনবোর্ডে যে লাল্‌চে টিউব ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে থাকে আর একটি বিরল গ্যাস, নিয়ন। এই নিয়নও বাতাস থেকেই পৃথক করে নেওয়া হয়।

বাতাসে যে হিলিয়াম গ্যাস আছে সেটা পৃথিবীর ভিতরের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির বিভাজনের ফল, একথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুগুলি ভেঙে যাবার সময় পরাবিদ্যুৎযুক্ত আল্‌ফা-কণা (α-particles) বেরিয়ে আসে। পরে এই কণাগুলি ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তখন ওদের বিদ্যুৎভার প্রশমিত হয়ে যায় এবং সেগুলি হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়।

পেট্রোলিয়াম কূপগুলি থেকে যে প্রাকৃতিক গ্যাস সর্ব্বদা বেরিয়ে আস্‌ছে, তার মধ্যে বেশ কিছুটা হিলিয়াম মিশ্রিত থাকে। যুগ যুগ ধরে ভূত্বকে বা অভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয়া চল্‌ছে এবং আজও অব্যাহত রয়েছে এবং হিলিয়ামের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মনে হতে পারে সময়ের সঙ্গে হিলিয়ামের পরিমাণটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু বাতাসে হিলিয়ামের পরিমাণ সামান্য এবং স্থির। তাহ'লে কোন না কোন উপায়ে বাতাস থেকে হিলিয়াম অপসারিত হচ্ছে। হিলিয়াম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং কোন রাসায়নিক উপায়ে হ্রাস পেতে পারে না। হিলিয়াম খুব হাল্‌কা, হাইড্রোজেন ছাড়া

এর চেয়ে লঘুতর কোন পদার্থ নেই। খুব উপরের বায়ুস্তরে উষ্ণতা খুব বেশী এবং যে সামান্য বাতাসটুকু সেখানে রয়েছে সেটা আবার টগ্‌বগ্ করে ফোয়ারার মত সর্ব্বদা আলোড়িত হচ্ছে। হিলিয়াম হাল্‌কা বলে সহজেই উপরের স্তরে পেঁছে যায় এবং উষ্ণতা বেশী বলে এই হাল্‌কা হিলিয়াম অণুগুলির গতিবেগও হয় খুব বেশী। এর যে সকল অণুর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 11 কিলোমিটারের বেশী হয় সেগুলো পৃথিবীর আকর্ষণ প্রতিহত ক'রে শূন্যের দিকে ছুটে বেরিয়ে যায়। এমনি করেই হিলিয়াম বায়ুস্তর থেকে অপসারিত হচ্ছে। বর্তমানে যে হারে হিলিয়াম বাতাসে আসছে সেই হারেই উপরের স্তর থেকে সেটা পালিয়ে যাচ্ছে, তাই এর পরিমাণটা স্থির হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন উপরের স্তরে গিয়ে হিলিয়ামের এই প্রতি সেকেণ্ডে এগারো কিলোমিটার গতিবেগ পেতে হ'লে সেখানকার উষ্ণতা অন্ততঃ 1500°K হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং রাশিয়াতে এখন প্রচুর হিলিয়াম তৈরী করা হয়, প্রধানতঃ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পৃথক ক'রে। উড়োজাহাজে এর ব্যবহারের কথা অবশ্য সবারই জানা।

বাতাসে সামান্য একটু হাইড্রোজেনও আছে। সূর্য্য থেকে যে অতি-বেগুনী আলো পৃথিবীর কাছে এসে পেঁছয় তার সংস্পর্শে জলীয় বাষ্পের বিশ্লেষণ হয় এবং হাইড্রোজেন তৈরী হয়। হিলিয়ামের মত এই হাইড্রোজেনও হাল্‌কা বলে বায়ুস্তরের উপরের দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে মহাশূন্যে অপসারিত হয়। পরে আমরা দেখব, বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে অনেক বিদ্যুৎযুক্ত কণার বা আয়নের সমাবেশ আছে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটিকে বলে আয়নোস্ফিয়ার, এবং তাতে হাইড্রোজেনের আয়ন বা প্রোটন আছে যথেষ্ট। এই প্রোটনগুলি হাইড্রোজেন থেকেই আয়নিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

ওজোন

বাতাসে আর একটি গ্যাস অল্প পরিমাণে আছে, তার নাম ওজোন (ozone)। পূর্ব্বে যে উপাদানগুলির তালিকা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একে ধরা হয় নি, তার কারণ মাটির কাছের বাতাসে অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ারে এর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই হয়। মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার বা কুড়ি মাইল উপরের এক সঙ্কীর্ণ বায়ুস্তরে খানিকটা ওজোন রয়েছে। তার পরিমাণ হবে লক্ষ ভাগ বাতাসে এক থেকে দুই ভাগ। তারও অনেকটা উপরে উঠে গেলে আরও খুব সামান্য ওজোনের অস্তিত্ব দেখা যায়। বায়ুর যে স্তরটাতে ওজোনের পরিমাণ বেশী তাকে ওজোন স্তর বা ওজোনোস্ফিয়ার (ozonosphere) বলে উল্লেখ করা হয়। যদিও অনেক উঁচুতে রয়েছে এবং পরিমাণেও কম তবুও পৃথিবীর কাছে এর প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য্য ; সে কথায় পরে আসছি।

কি উপায়ে উঁচুস্তরের বাতাসে ওজোন এল তার একটা উত্তর পাওয়া গেছে। সূর্য্য থেকে আলো, তাপ ইত্যাদি নানারকম শক্তি-তরঙ্গের সঙ্গে অতি-বেগুনী রশ্মিও পৃথিবীর দিকে আসছে। এই অতি-বেগুনী রশ্মির মধ্যে যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 2400A°-এরও

[$1A^{\circ}=10^{-8}$ সেন্টিমিটার] কম, সেগুলো অক্সিজেন অণুকে ভেঙে পরমাণুতে পরিণত করে দেয়। এই জায়মান অক্সিজেন পরমাণু অপর আর একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করে ওজোনের। ওজোন বস্তুতঃ অক্সিজেনেরই আর একটি রূপভেদ ; তিনটি অক্সিজেন পরমাণু একত্র মিলে ওজোনের অণু (O_3), আর দুইটি পরমাণু মিলে সাধারণ অক্সিজেনের অণু (O_2)। ওজোনের সক্রিয়তা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রাবল্য সাধারণ অক্সিজেনের চেয়ে অনেক বেশী। রসায়নবিদরা সঙ্কেতের সাহায্যে এ রকম পরিবর্তনকে প্রকাশ করেন ঃ

(ক) $O_2 + h\nu \rightarrow O + O$ [$h\nu$ হচ্ছে আলোকশক্তির

$O + O_2 \rightarrow O_3$ (ওজোন) কোয়াণ্টাম।]

আবার 2500 A°-এর চেয়ে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অতি-বেগুনী রশ্মি কিন্তু ওজোনকে ভেঙে দেয় এবং অক্সিজেন অণু ও পরমাণু সৃষ্টি করে। অক্সিজেন পরমাণু যদি ওজোনের সংস্পর্শে অধিকক্ষণ থাকে তাহ'লেও ওজোন ভেঙে অক্সিজেন তৈরী হয়।

(খ) $O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$

$O_3 + O \rightarrow O_2 + O_2$

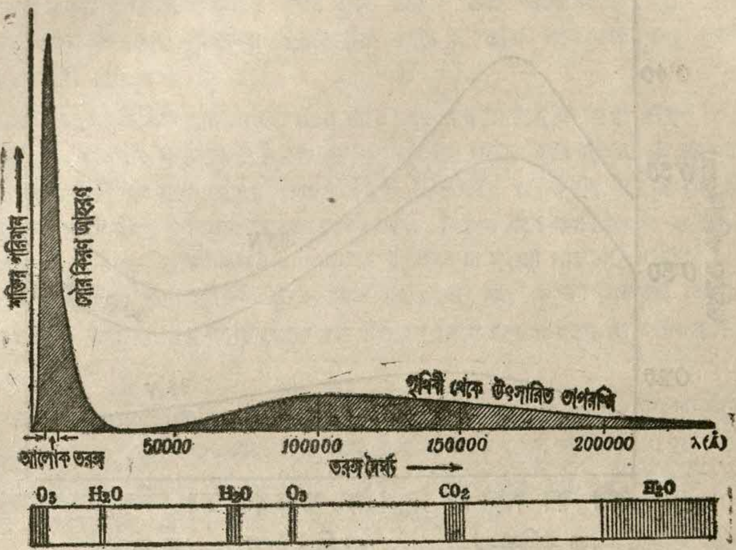
দেখা যাচ্ছে (ক) প্রক্রিয়াতে ওজোন তৈরী হচ্ছে, আর (খ) প্রক্রিয়াতে ওজোন লয় পাচ্ছে। এই বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা আছে, যার ফলে সামান্য কিছু ওজোন সর্বদা বাতাসে থেকে যায়।

উপরের বায়ুস্তরে সর্বদাই আবার প্রচণ্ড সব বজ্রপাত আর বিদ্যুৎক্ষরণ চলছে ; তার জন্যেও অক্সিজেন থেকে কিছু ওজোন তৈরী হয়।

বাতাস স্থির থাকে না, বায়ুপ্রবাহ চলছেই। উপর থেকে ওজোনপুষ্ট বাতাস ত' নীচের দিকেও আসে। সুতরাং খানিকটা ওজোন ট্রোপোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে। কিন্তু ধূলিকণা আর বিশেষ করে গাছপালার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওজোন খুব দ্রুত বিনষ্ট হয়ে অক্সিজেনে পরিণত হয়। এই জন্য মাটির খুব কাছাকাছি কয়েক মিটারের মধ্যে ওজোনের কোন চিহ্ন থাকে না।

সৌরকিরণের সঙ্গে প্রচুর অতি-বেগুনী রশ্মি থাকে। 3000A°-এর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমস্ত অতি-বেগুনী রশ্মির অধিকাংশ ওজোনই শোষণ করে নেয়। সেই রশ্মির সামান্য একটুখানি আমাদের কাছে এসে পেঁছুতে পারে। তা না হলে সবটা অতি-বেগুনী কিরণ যদি পৃথিবীর বুকে এসে পেঁছুত তবে শুধু যে অতিরিক্ত ওজোনের জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হ'ত তাই নয়, ঐ রশ্মির তীব্রদাহে জীবজগতের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হত। সেই মারাত্মক অবস্থা থেকে ওজোনের স্তরই আমাদের রক্ষা করেছে। 30-40 কিলোমিটারের উপরে খানিকটা স্তরে যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটা ওই ওজোনের অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণের ফলে। অপর দিকে ধরিত্রী থেকে যে তাপরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তারও খানিকটা ওজোন গ্রহণ করে 90000A°-এর কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। এর

ফলে কিছুটা তাপ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়। ওজোনের এরূপ শোষণের বিষয়টি চিত্র ১৪ থেকে বোঝা যাবে।

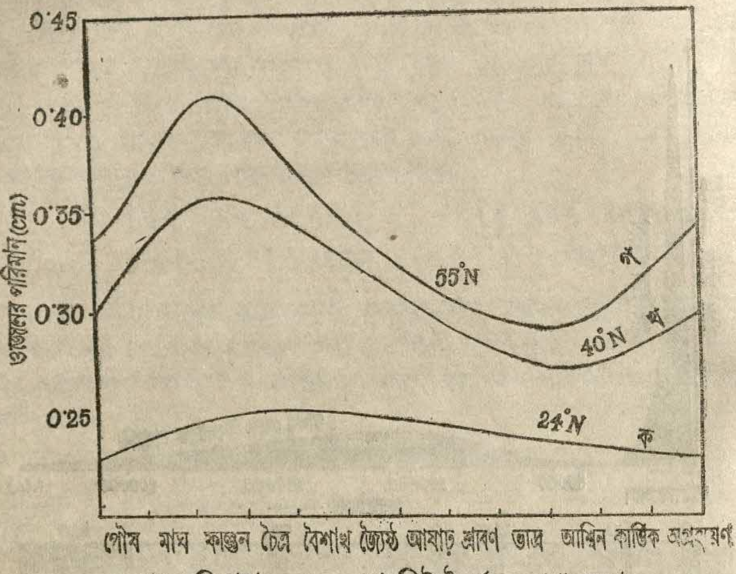


চিত্র ১৪। সৌরকিরণের আহরণ এবং পৃথিবী থেকে উৎসারিত তাপরশ্মি

ওজোন সম্বন্ধে আর একটা বিষয় জানা গেছে। অক্ষাংশের সঙ্গে ওজোনের পরিমাণ অনেকটা পরিবর্তিত হয়। কলকাতার উপরের বায়ুস্তরে যে পরিমাণ ওজোন রয়েছে লণ্ডনের উপরের বায়ুস্তরে তার চেয়ে বেশী ওজোন আছে। তা ছাড়া, কোন জায়গার ওজোনের পরিমাণটা আবার বছরের ঋতুর সঙ্গেও বদলায়, বিশেষ করে নিরক্ষ-রেখা থেকে দূরের অক্ষাংশে এটা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। 1957-58 সনে IGY-এ (ইন্টারন্যাশনাল জিয়োফিজিক্যাল ইয়ারে) পৃথিবীব্যাপী যে নানা অনুসন্ধান চালান হয়েছিল তা থেকে এ বিষয়েও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ওজোনের পরিমাণ কিভাবে বদলাতে থাকে তার ধারণা ১৫নং চিত্র থেকে সহজে পাওয়া যাবে। নিরক্ষরেখার কাছে ওজোনের পরিমাণ কম এবং মোটামুটি সমানই থাকে। কিন্তু উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ওজোনের পরিমাণও অধিক এবং সেটা গরমের সময় খুব বেড়ে যায় এবং শীতের সময় যথেষ্ট কমে যায়।

এখানে ওজোনের পরিমাণকে সেন্টিমিটারে দেওয়া হয়েছে। কোন জায়গার উপরে মোট যতটা ওজোন রয়েছে তার সবটুকু একত্র সংবদ্ধ ক'রে যদি পৃথিবীর ওপরে প্রমাণ চাপ এবং প্রমাণ তাপমাত্রায় (1 atm, 0°C) রাখা যেত তাহ'লে সেটা যত সেন্টিমিটার পুরু হ'ত তাই ওজোনের পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এখন আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যে ওজোনের পরিমাণ এবং বিস্তারের উপরে



চিত্র ১৫। বছরের বিভিন্ন সময়ে অক্ষাংশের সঙ্গে ওজোনের পরিমাণের পরিবর্তন

পৃথিবীর আবহাওয়া অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু কেন বা কিভাবে এটা ঘটে তা খুব ভাল করে আজও বোঝা যায়নি, এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা চলছে এখন।

বাতাসের ধূলিকণা

গ্যাস ছাড়াও বাতাসে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কঠিন বস্তুকণা বা ধূলিকণা। ধুলোর এই কণাগুলি খুব ছোট, এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না। আর অনায়াসে এগুলি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে, যদিও এদের ঘনত্ব যথেষ্ট বেশী। একটা তুলনা করা যেতে পারে। নদীর ঘোলা জল নিয়ে একটা কাচের গ্লাসে রেখে দিলে মাটির ভারী কণাগুলি নীচে থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন এভাবে রেখে দিলেও সেই জল একেবারে স্বচ্ছ হয় না, সামান্য ঘোলাটে অস্বচ্ছতা থেকেই যায়। এর কারণ, যে কণিকাগুলি খুব সূক্ষ্ম সেগুলি জলের অণুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করে, থিতিয়ে যেতে পারে না। কোন একটা বস্তু যদি অন্য কোন মাধ্যমে এমনি অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রলম্বিত হ'য়ে থাকে বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন, "কলয়েড"। বাতাসে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি ভেসে আছে গ্যাসের মধ্যে, এটাকেও কলয়েড অবস্থা বলা যেতে পারে।

বাতাসে ধুলোর এ রকম ছোট ছোট কণার অবস্থিতি কিন্তু সহজেই দেখান সম্ভব। এজন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঘরে একটি খুব ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করানো

হয়। দিনের বেলায় কুড়েঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে সরু সরু রন্ধ্র দিয়ে এরকম সূর্যকিরণ ভিতরে যায়। সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আলোর দিকে তাকালে একটি উজ্জ্বল রশ্মিপথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই আলোকরশ্মির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে অসংখ্য ধূলিকণা ছুটোছুটি করছে। একে বলে "টিণ্ডেল প্রভাব" (Tyndall effect)।

সব জায়গায় ধূলিকণার সংখ্যা সমান নয়। গণনায় মোটামুটি দেখা গেছে ভারত মহাসাগরের উপরের বাতাসে প্রতিলিটারে ধূলিকণার সংখ্যা হবে 436000, আর সেই সংখ্যাটা আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে হ'চ্ছে 1830000। জমির উপরের বায়ুস্তরে স্বভাবতই ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশী হবে, বিশেষ করে কলকারখানা বা বড় বড় শহরাঞ্চলে। গড়ে প্রতিলিটারে এখানকার ধূলিকণার সংখ্যা প্রায় 40,00,000। এ সত্ত্বেও বাতাস ত' মোটামুটি স্বচ্ছ, তাহ'লে কণাগুলো কত সূক্ষ্ম সহজেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য, মাটি থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে, ধূলিকণার সংখ্যা কমতে থাকবে।

পৃথিবীর মাটিতে পাথর, শিলা, বালু সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, তাদের সূক্ষ্ম কণাগুলো ওড়ে আকাশে। কল-কারখানার লক্ষ লক্ষ চিমনি থেকে আসে নানারকমের ছোট ছোট কণার ছাই আর ধুলো। আগ্নেয়গিরি থেকেও প্রচুর ধুলো গিয়ে বায়ুস্তরে উপস্থিত হয়। সিগারেটের ধোঁয়া থেকেই কি কম ছাই বাতাসে যায়।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উল্কা ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে এসে ঘর্ষণের ফলে সেগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যায়। এই উল্কা-ভস্ম থেকেও প্রচুর পরিমাণ ধূলিকণা বাতাসে আসে। ধূলিকণা ছাড়াও বাতাসে ভেসে থাকে সূক্ষ্ম আরও অন্যান্য জিনিস। ফুলের পরাগ এদের অন্যতম। সূক্ষ্ম পরাগরেণু বাতাসে ভেসে ভেসে কয়েক শত মাইল পর্যন্তও চলে যায়। আবার বাতাসে নানা ধরণের জীবাণু, ব্যাক্টীরিয়া, ঈস্ট, ইত্যাদি রয়েছে অসংখ্য। ওদের কতকগুলো আমাদের উপকারে আসে। আবার অনেক রোগের জীবাণুকে বাতাসই বয়ে নিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়।

বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ভাসমান ধূলিকণাগুলিও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। এমনও দেখা গেছে, প্রচণ্ড আঁধিতে আফ্রিকার সাহারা মরুর হাজার হাজার টন বালুকণা উড়ে গেছে আর সেগুলো গিয়ে পড়েছে বারশ' মাইল দূরে আটলান্টিকের বুকে জাহাজের উপরে। 1883 সনে সুমাত্রার কাছে ক্রাকাতোয়া দ্বীপে এ যুগের আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বিস্ফোরণে দ্বীপটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছে। এত অপর্যাপ্ত ধুলোয় চারদিক এমন করে ঢেকে গিয়েছিল যে সেই দ্বীপ থেকে একশ মাইল দূরেও দিনরাত্রির কোন ভেদ বোঝা যেত না। বিস্ফোরণে যে বিশাল ধূলিকণার স্তূপ উপরের দিকে উঠেছিল তার খানিকটা ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুর বায়ুস্তর পর্যন্ত গিয়েছিল। সেখানকার বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে এই বিরাট ধুলো প্রায় তের দিন ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে, তার পরে ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়েছে মাটিতে। এই

ধূলিকণার সামান্য কিছুটা প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বায়ুতে ছিল। এই ধুলোর প্রদক্ষিণ কালে নানা রকমের অদ্ভুত সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা যেত। এই ধুলোতে আলোর বিচ্ছুরণের জন্যে কখনও সূর্যকে নীল, চাঁদকে সবুজ রংয়ের বলে মনে হ'ত।

বায়ুজগতের ধুলোর এই মালিন্যটুকুর কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে। মাথার উপরে নীল আকাশ সীমাহীন বিস্তৃত। এই আকাশের বুকে সারাক্ষণ চল্‌ছে কত অপরূপ বৈচিত্র্য আর বর্ণাঢ্য আলোর খেলা। সূর্যোদয়ে রক্তিম জটাজাল, সূর্যাস্তে বেলা শেষের হালকা মেঘ-ছাওয়া আবীর মাখা আকাশ, সন্ধ্যায় মায়াভরা গোধূলির মোহময় আলো—বর্ণ-বৈচিত্র্যের এই মেলা দেখি আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। বৈশাখের আকাশে তাপসের গৈরিক উত্তরীয়, শ্রাবণের অশ্রুপ্লুত বসুন্ধরার উপরের আকাশে সজল সিক্ত বসন, আশ্বিনের আনন্দোজ্জ্বল আকাশের নীল শাড়ীতে রূপালী চুম্‌কী, পৌষের বিষণ্ণ নীরব আকাশের শ্বেত বসন, ফাল্গুনের লাস্যময়ী আকাশের নীলাঞ্চল—তুলনা নেই এই সমারোহের—আশ্চর্য্য, সুন্দর। উপরের আকাশ এত সুন্দর, তাই বসুন্ধরাও এমনি সুন্দর, সেই জন্যেই পৃথিবীকে এত ভালবাসি।

একথা সহসা মনে আসেনা যে মহাশূন্যের এই বর্ণচ্ছটার মূলে কিন্তু রয়েছে বাতাসেরই অসংখ্য ধূলিকণা। "আকাশবীণার রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি" থেকে আলোর তরঙ্গ এসে পড়ে ধূলিকণার উপরে। ধূলিকণার সঙ্গে এই সংঘাতের ফলে সেই আলো বিচ্ছুরিত ও প্রতিসরিত হ'য়ে নানা বর্ণের তরঙ্গের মূর্চ্ছনায় ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সৃষ্টি হয় নানা রঙের আলোকের। এই বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে নীলাভ আলোরশ্মির প্রাধান্যই বেশী, তাই আকাশ নীল। বাতাসে যদি ধূলিকণা না থাকত, সূর্যালোকের এই বিচ্ছুরণ যদি না হ'ত তা হ'লে দিনের আকাশও হ'ত গভীর অন্ধকার। আর দিনের বেলাতেও সেই অন্ধকার আকাশে রাতের মত সংখ্যাতীত নক্ষত্র মিট্‌মিট্‌ করছে দেখা যেত। আকাশে থাকত না কোন বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা, হ'ত না ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রকাশ। সে পৃথিবী হ'ত নিতান্তই একঘেয়ে। নগণ্য ধুলোর সূক্ষ্মকণাই দিয়েছে পৃথিবীকে তার অনুপম সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য।

ধূলিকণার আর এক অবদান রয়েছে মেঘ থেকে বৃষ্টির রূপায়ণে। মেঘের বাষ্প প্রথমে এই ধূলিকণাকে কেন্দ্র ক'রেই ছোট্ট ছোট্ট জলবিন্দুতে পরিণত হয়। তার পর আস্তে আস্তে এই জলবিন্দুগুলির উপর আরও বাষ্প ঘন হ'য়ে জমে আর বিন্দুগুলি বড় ও ভারী হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট বড় হ'লে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে এসে মাটিতে পড়ে। ধরণী হ'য়ে ওঠে শস্যশ্যামলা। ধূলিকণা না থাকলে বাষ্প থেকে জলকণা হওয়া দুঃসাধ্য হ'ত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা যেত কমে। বনানীলাঞ্ছিত ধরিত্রীর রূপ যেত বদ্‌লে।

বাতাসে ভাসমান কঠিন বস্তুকণার মধ্যে কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সব তুষারকণা বা বরফের কুচিও রয়েছে। জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন থেকেই এগুলো মেঘের মধ্যে তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে লবণের খুব ছোট্ট ছোট্ট কণা। সমুদ্র থেকে জল যখন বাষ্পীভূত হয়ে আসে তার সঙ্গে সামান্য লবণও বাতাসে চলে আসে এবং অনেক উপরেও

চলে যায় আর বাতাসে ভাসতে থাকে অতিসূক্ষ্ম কণা হ'য়ে। জলীয় বাষ্পের জলবিন্দুতে পরিণত হওয়ার সময় এই কণাগুলো কেন্দ্র হিসেবে খুবই সাহায্য করে।

দেহ-পরিচিতি ঃ

সবটা বায়ুমণ্ডল ঠিক একরকম নয়। এর আগেই আমরা দেখেছি যতই উপরের দিকে যাওয়া যায়, বাতাসের ঘনত্ব ততই কমে আসে। এ ছাড়াও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন অংশের আচরণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, গতি-চাঞ্চল্য প্রভৃতি আলাদা। পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখা গেছে, বায়ুমণ্ডলে রয়েছে মোটামুটি চারটি বিভিন্ন স্তর। বিশেষ করে তাপমাত্রা বিচার করেই বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য স্তরগুলির আরও কোন কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঠিক মাটির সঙ্গেই বাতাসের যে স্তরটি রয়েছে, তাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere)। মাটি থেকে উপরের দিকে প্রায় ষোল কিলোমিটার পর্য্যন্ত ট্রোপোস্ফিয়ারের সীমানা। অবশ্য সর্বত্র এটা সমান পুরু নয়। বিষুব-রেখা অঞ্চলে ট্রোপোস্ফিয়ার প্রায় ষোল কিলোমিটার (দশ মাইল) গভীর, আবার মেরু-অঞ্চলে এর গভীরতা মোটামুটি ছয় থেকে আট কিলোমিটার মাত্র। ট্রোপোস্ফিয়ারের প্রধান বিশেষত্ব হল, যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে উষ্ণতা তত কমতে থাকবে। কলকাতার উষ্ণতা গড়ে 20°C আর কলকাতার উপরের ট্রোপোস্ফিয়ারের শেষ সীমানায় তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস্ পঞ্চান্ন ডিগ্রি (−55°C)।

ট্রোপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরেই বায়ুর দ্বিতীয় স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরটির গভীরতা প্রায় 50∼60 কিলোমিটার। কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা সর্বত্র প্রায় একরকম এবং তাপমাত্রাটা বেশ নীচু, মোটামুটি −55°∼−65°C। কেবল ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখানে 35∼40 কিলোমিটার উচ্চতায় খানিক অংশে তাপমাত্রাটা একটু বেশী। তার কারণ, এখানে সূর্য্যের অতি-বেগুনী আলোকরশ্মির শোষণ হ'তে থাকে আর ওজোন তৈরী হয়। রশ্মির শোষণের ফলে এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ওজোনের স্তর অবশ্য তীব্র রশ্মির দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করছে, তাই জীবজগত রক্ষা পাচ্ছে। একথা আগেই বলা হয়েছে। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অপর নাম, "সমতাপ-মণ্ডল"। আর ট্রোপোস্ফারকে বলে "পরিবর্তী-মণ্ডল"। কিন্তু ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ার নামেই এই স্তর দুইটি নানাদেশে সুপরিচিত ; সুতরাং সেই নামই এখানে ব্যবহার করা হবে। কেউ কেউ ট্রোপোস্ফিয়ারকে ক্ষুব্ধস্তর আর স্ট্রাটোস্ফিয়ারকে শান্তস্তর বলেন।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে গেলেই দেখা পাওয়া যায় আয়নোস্ফিয়ারের বা আয়ন-মণ্ডলের (Ionosphere)। বাতাস এখানে খুব হাল্‌কা বটে তবে অত্যন্ত প্রখর সৌরকিরণের জন্যে সেই বাতাসটুকু আয়নিত হয়ে থাকে। অসংখ্য বিদ্যুৎযুক্ত কণায়—আয়ন আর ইলেকট্রনে—পরিপূর্ণ এই অঞ্চল। তার ফলে এই স্তরটি যেমন বিদ্যুৎবাহী তেমনই এখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী তড়িৎ-ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে। 70-80 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় 800 কিলোমিটার উচ্চতা পর্য্যন্ত এই আয়নোস্ফিয়ার স্তর পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে (চিত্র ১৬)।

আয়নোস্ফিয়ারের পরেও যে সামান্য বাতাস রয়েছে সেটাকে বলে বহিঃস্তর বা এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)। কোথায় এর সমাপ্তি হয়েছে বলা শক্ত ; মহাজাগতিক শূন্যের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে বলে ধরা হয়।

বিজ্ঞানীরা এভাবে বায়ু মন্ডলকে মোট চারটি স্তরে ভাগ করে দেখছেন। উচ্চতার হিসাবে এই স্তরগুলির বিস্তৃতি এবং তাপমাত্রা মোটামুটি ঃ—

স্তর	উপরের দিকে বিস্তৃতি (কিলোমিটার)	তাপমাত্রা (°C)
১। ট্রোপোস্ফিয়ার	0~16	+55°C~−55°C
২। স্ট্রাটোস্ফিয়ার	16~80	−55°C~−70°C
৩। আয়নোস্ফিয়ার	80~800	উচ্চ উষ্ণতা
৪। এক্সোস্ফিয়ার	800~মহাশূন্য	—

এই স্তরগুলোর সীমারেখা অবশ্য একেবারে স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। স্থান বা সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ট্রোপোস্ফিয়ারের গভীরতা শীতকালের চেয়ে খানিকটা বেশী। একটি স্তর অপর স্তরে কিছু অনুপ্রবেশ করেই। উপরে যে বিস্তৃতির সীমা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা একটা মোটামুটি পরিমাণ মাত্র।

ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখানের সংযোগ-সীমাকে বলে ট্রোপো-পজ (Tropopause)। 2-3 কিলোমিটার পুরু এই খুব ঠান্ডা ট্রোপো-পজ স্তরটি ট্রোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমা নির্দেশ করছে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শেষ সীমানাতেও তেমনি রয়েছে আর একটি খুব শীতল সীমারেখা, স্ট্রাটো-পজ (Stratopause)।

বায়ুর বিভিন্ন স্তরের সন্ধানের ইতিহাসও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। প্রারম্ভেই ডঃ উইলসনের নাম করা উচিত হবে। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম (1749) ঘুড়ির সঙ্গে থার্মোমিটার বেঁধে দিয়ে উপরের বায়ুস্তরে পাঠিয়ে দেন। এমনি করে তিনি ট্রোপোস্ফিয়ারের বেশ খানিকটা উচ্চতার তাপমাত্রা জানতে পেরেছিলেন এবং উচ্চতার সঙ্গে যে বাতাসের উষ্ণতা কমে যায় সেটা তাঁর পরীক্ষা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। এরপর এল বেলুনের যুগ। ছোট বড় নানা ধরনের বেলুনের সঙ্গে থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার প্রভৃতি পরিমাপক-যন্ত্র জুড়ে দিয়ে উপরের বায়ুস্তরের তথ্য আহরণ হ'তে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আরম্ভ হ'ল উপরের স্তরে মানুষের অভিযান। খুব বড় বড় বেলুনের সঙ্গে বেশ বড়সড় বাক্স বা গ্লোব লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এদের বলা হয় বেলুনের গন্ডোলা। এই গন্ডোলাতে অভিযাত্রীরা যেতেন আর তাঁদের সঙ্গে থাকত নানা পরিমাপক যন্ত্রপাতি। বেলুন-অভিযাত্রীরা বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা, চাপ, বৈদ্যুতিক অবস্থা, অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এ সকল অভিযান অবশ্য খুবই বিপদসঙ্কুল ছিল, কিন্তু সেই বিপদের সম্ভাবনা মানুষের দুর্জ্ঞেয়কে জানার ঐকান্তিক বাসনাকে প্রতিহত ক'রতে পারে নি।

যতদূর মনে হয়, বেলুন নিয়ে গত শতাব্দীতে সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন গ্ল্যাসিয়ার এবং তাঁর সহকর্মী কক্সওয়েল। এঁদের গন্ডোলা অন্ততঃ 30,000 হাজার

ফিটেরও উপরে উঠেছিল। 1862-66'র মধ্যে এ'রা প'চিশবারেরও বেশী এরকম অভিযান চালিয়েছিলেন। এ'রা যে সমস্ত তথ্য এনেছিলেন পরবর্তীকালের আবহতত্ত্বের গবেষণায় সেগুলো খুবই সাহায্য করেছে।

আবার এ সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী লিওঁ তিসারে দা বোর্ট (Leon Tisserence de Bort) কয়েকবছর ধরে অভিযাত্রী-হীন বহু বেলুন নানা যন্ত্রযুক্ত করে উপরে পাঠাতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল, প্রায় 7-8 মাইল উপরে চলে গেলে বাতাসের-উষ্ণতার আর বেশী পরিবর্তন দেখা যায় না; তাপমাত্রা প্রায় সমান থাকে। এভাবেই ষ্ট্রাটো-স্ফিয়ারের অস্তিত্ব জানা গেল। এত উঁচুতে বায়ুস্তর যেমন ঠাণ্ডা তেমনি হাল্‌কা। প্রথমে তাই মনে হয়েছিল সেখানে আর বেলুন নিয়ে মানুষের যাওয়া চলবে না। কিন্তু সে বাধাও অপসারিত হ'ল।

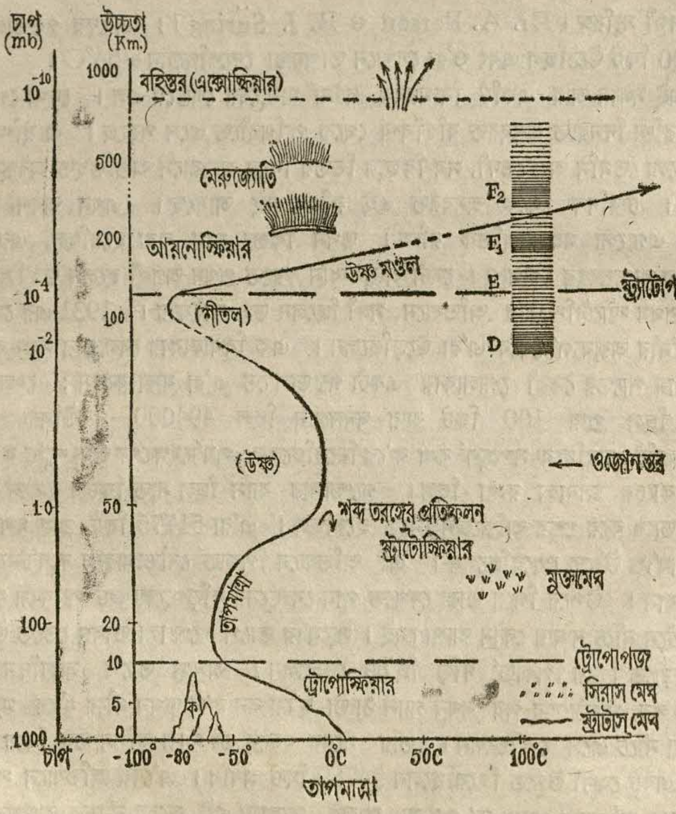
এ শতাব্দীর প্রথম এবং সার্থক বেলুন-অভিযান করেন ডঃ বারসন এবং তাঁর সহযোগী সুরিঙ্গ [Dr. A. Berson ও R. J. Süring]। এ'দের গণ্ডোলা প্রায় 36000 ফিট উঠেছিল এবং ও'রা সেখানে তাপমাত্রা দেখেছিলেন −54°C।

এই সময়ে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা মানুষের গোচরে এল। দেখা গেল এক রকম রশ্মি দিনরাত অনবরত বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ছে। এ রশ্মি যেমন জোরালো তেমনি অন্তর্ভেদী, সব কিছুর ভিতর দিয়ে অনায়াসে অপ্রতিহত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। চারদিক থেকে অনবরত এই রশ্মিপ্রবাহ আসছে। এখন অবশ্য আমরা জানি এগুলো মহাজাগতিক রশ্মি। তখন কিন্তু মনে করা হয়েছিল, এর উৎস উপরের বায়ুস্তরের কোথাও। সেটা অনুসন্ধান করতে প্রথম অগ্রণী হলেন ডঃ পিকার্ড। তাঁর প্রথম স্ট্রাটোস্ফিয়ার অভিযানে সঙ্গী ছিলেন ডঃ ফাইফার। 1931-এর মে মাসে জার্মেনীর অক্সবুর্গ থেকে এ'রা উড়েছিলেন। এক বিশালাকার বেলুনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম পাতের তৈরী গোলাকার একটা গণ্ডোলাতে এ'রা যাত্রা করেন; বেলুনটির ব্যাস ছিল প্রায় 100 ফিট আর ঘনায়তন ছিল 494000 কিউবিক ফিট। গণ্ডোলাটি চারদিকে সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে নিয়েছিলেন, পর্যবেক্ষণের জন্য শুধু কয়েকটি পুরু কাচের জানালা রাখা ছিল। গণ্ডোলার ব্যাস ছিল সাত ফিট। সঙ্গে অবশ্য সিলিণ্ডারে করে প্রচুর অক্সিজেন নিতে হয়েছিল। এ'রা 51775 ফিট, প্রায় দশ মাইল উঁচু পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। এই অভিযানে পিকার্ড সৌভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান। উপরে গিয়ে তারা দেখতে পান বেলুনের দড়িগুলো জট পাকিয়ে গেছে। দড়ি টেনে নীচে নামার কোন আশা নেই। সূর্যের তাপে গণ্ডোলা ভীষণ তেতে উঠ্‌ল। জট ছাড়াতে গিয়ে পিকার্ড দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। অসহ্য তাপে সারাদিন বন্দী থাকার পর, সূর্যাস্তের পর যখন গ্যাস ঠান্ডা হ'য়ে ঘন হ'ল তখন ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় অবস্থায় নীচে এসে পৌঁছলেন। তার পরের বছরে ডঃ ম্যাক্স কসিনসকে নিয়ে তিনি আরও একটু বেশী উচুতে গিয়েছিলেন 54789 ফিট অবধি। এ'দের অভিযানে স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের অস্তিত্বের প্রমাণ ত' পাওয়া গেলই, তাছাড়া এই স্তরের নীচের অংশের নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগৃহীত করা গেল।

কিন্তু বেলুনের গন্ডোলা ক'রে আরও উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন একদল রুশ

বৈজ্ঞানিক [P. F. Fedoseyenko, A. B. Vassenko এবং I. Usiskyn, 1934]। বিখ্যাত 'অসোয়াভিয়াখিম' বেলুনের সঙ্গে গণ্ডোলায় করে এঁরা 72000 ফিটের উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় বেলুন থেকে গন্ডোলাটি ছিঁড়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায় এবং অভিযাত্রীরা প্রাণ হারান। 1935-এর নভেম্বরে "এক্সপ্লোরার 2" (Explorer II) বেলুন নিয়ে এক আমেরিকান দল [Kepner, Stevens and Anderson] 74000 ফিট পর্যন্ত ছুঁয়ে এসেছিলেন। ঝড়ে পড়ে এঁদের গণ্ডোলাও ভেঙে যায়, তবে অভিযাত্রীরা প্যারাসুট দিয়ে নেমে আসতে পেরেছিলেন। এমনি করে মানুষ বেলুন নিয়েই স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অনেকটা অধিকার করে ফেলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই। যুদ্ধোত্তর যুগে আরও অনেক বেলুন অভিযান হয়েছে। 1961-তে কমান্ডার রস এবং প্র্যাথার 113740 ফিট উপরে উঠতে পেরেছিলেন।

এখানে মাত্র কয়েকটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রীবিহীন



চিত্র ১৬। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

অসংখ্য বেলুনের অভিযান এবং অভিযাত্রী নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা এ শতাব্দীতে

হয়েছে ; তার ফলে নানা তথ্য জানা গিয়েছে। এর পরেই এরোপ্লেন আর রকেটের যুগ এসে গেল। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপযোগী জেট প্লেন নিয়ে এই মণ্ডলের সম্পূর্ণ তথ্য এখন আমাদের জানা হ'য়ে গেছে। রকেট দিয়ে আরও উপরের আয়নোস্ফিয়ারের সংবাদও এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। আজকের চন্দ্র অভিযানের যুগে খুব উচ্চস্তরের সব তথ্যই রকেট মারফত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবু অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরগুলোর (20 মাইল পর্য্যন্ত) কোন কোন প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য আজও আধুনিক প্লাস্টিকের তৈয়ারী বেলুনের ব্যবহার রয়েছে। রকেট বা বেলুনের থেকে আজকাল রেডিয়ো বা টেলিমিটার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে অতিসহজে তথ্যগুলি পাওয়া যায়। স্বতঃ-নির্দ্দেশক যন্ত্রও কখন কখন রকেটে দেওয়া হয়। রকেটগুলোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা এ রকম যে ফিরে আসার সময় সেগুলো খুলে গিয়ে এমন আকার নেয় যাতে গতি যায় কমে এবং মাটিতে এসে পড়লে ভেঙ্গে যায় না। আধুনিক রকেট যথেষ্ট ভার নিয়ে অনেক উঁচুতে যেতে পারে এবং অক্ষত ফিরে আসতে পারে। Viking (M-7) চারশ' পাউণ্ড নিয়ে প্রায় 135 মাইল পর্য্যন্ত উঁচুতে যায় ; Skylark রকেট দেড়শ' পাউণ্ড নিয়ে একশ মাইল উচ্চতায় উড়তে পারে। এসব সত্ত্বেও বেশী উঁচু স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। কারণ উপরের বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম এবং ঐ উচ্চতায় রকেটের স্থিতিকাল স্বল্প, তথ্য সংগ্রহ বড় জোর পাঁচ মিনিট। তাছাড়া রকেটের নিজের উৎসারিত গ্যাসের জন্যে সংগৃহীত তথ্য নির্ভুল নাও হ'তে পারে।

ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ার

আগেই বলেছি, ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তরটি হচ্ছে ট্রোপোস্ফিয়ার আর সেটা প্রায় ষোল কিলোমিটার পুরু। সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের প্রায় 80 শতাংশই রয়েছে এই বায়ুস্তরের মধ্যে। তাই এখানকার বাতাস সবচেয়ে ঘন। মাটি থেকে যত উঁচুতে যাওয়া যাবে ঘনত্ব আসবে কমে, সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও। এই ট্রোপোস্ফিয়ারেই রয়েছে জলীয় বাষ্প আর নানা রকমের মেঘ। বাতাসের উদ্দামতা, ঝড়-জল, বজ্রপাত আর বৃষ্টি এ সবের সৃষ্টি এই স্তরে। পৃথিবীর আবহাওয়ার সব কিছু প্রক্রিয়াই এই ট্রোপোস্ফিয়ারে সীমাবদ্ধ। ট্রোপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের অন্দর-মহল। এর উপরের স্তরগুলিতে জলীয় বাষ্প বা মেঘ নেই বললেই চলে। কিন্তু ওজোন গ্যাসের পরিমাণ ট্রোপোস্ফিয়ারে অতি সামান্য। অপর দিকে ধূলিকণার প্রাচুর্য্য সর্ব্বাধিক এই স্তরেই।

ট্রোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে ট্রোপো-পজ বা শান্তমণ্ডল। সেখানে উষ্ণতা নেমে গেছে −50°C-এরও নীচে। এর পরেই প্রায় ষাট কিলোমিটার উপরের দিকে বিস্তৃত রয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এখানে মেঘ নেই, নেই ঝড় বৃষ্টি, বাতাসের ঘনত্বও বেশ কম। বায়ু প্রবাহ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে আথালি-পাথালি ঘূর্ণী নেই। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই স্তরের নীচের অংশের তাপমাত্রা স্থির। আর সেই তাপমাত্রাটা −50°∼ −55°C। পৃথিবী থেকে প্রায় 40∼45 কিলোমিটার উপরে একটু অংশে আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে আর উষ্ণতা উঠতে উঠতে প্রায় 0°C-এ এসে পেঁছয়। এর পর আবার যতই উপরে উঠব

তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাবে এবং স্ট্রটোস্ফিয়ারের শেষ সীমায় এসে উষ্ণতা প্রায় – 40°C-এ নেমে যায় (চিত্র ১৬)। আগেই বলা হয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় অক্সিজেন অতি-বেগুনী রশ্মি প্রচুর পরিমাণে শোষণ করে নেয় সৌরকিরণ থেকে, তাই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন ওজোনও অনেকটা সৌররশ্মি শোষণ করে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, অক্সিজেন ত' সর্বত্রই রয়েছে, তবে শুধু স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন হ'ল কেন। ওজোন বেশী তাপমাত্রায় টিকতে পারে না, ভেঙে যায়। তাই ট্রোপোস্ফিয়ারে যদি কোন ওজোন তৈরীও হয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বিনষ্ট হয়ে যায়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা অনেক কম বলে সেখানে ওজোন অনেকটা স্থায়িত্ব লাভ করে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাস হাল্কা, মেঘমুক্ত সুতরাং সহজে এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তি ব্যয়েই উড়োজাহাজ এখানে দূর পাল্লায় ছুটতে পারে। ঝড়ঝঞ্ঝার বিপদ নেই। এই কারণেই বিশেষ করে স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে গবেষণা ও খোঁজ খবরের খুব গুরুত্ব। যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং দ্রুত পাড়ি দেওয়ার জন্য স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চলাচল এখন অপরিহার্য।

কোন কোন সময়ে অনেক উঁচুতে খুব উজ্জ্বল নানা রঙের ছোট ছোট মেঘের টুকরো দেখা যায়। এগুলো দিনের বেলার প্রখর আলোতে দেখা সম্ভব নয়। সূর্যাস্তের পরে অথবা সূর্যোদয়ের আগে নির্মল আকাশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা রয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশে 20～25 কিলোমিটার উচ্চতায়। ছোট ছোট ব'লে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ব'লে এদের নাম দেওয়া হয়েছে, "মুক্তা মেঘ" (mother of pearl clouds)। ঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য অনেকেই মনে করেন এগুলো তুষারের স্তূপ। বায়ুপ্রবাহের জন্য খানিকটা আর্দ্র বাতাস কখনও ট্রোপো-পজ অতিক্রম করে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অনুপ্রবেশ করা সম্ভব। সেখানকার অতিশীতল উষ্ণতায় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তুষারস্তূপে পরিণতি লাভ করে। সেখানে আট্‌কে থাকা তুষারের স্তূপই মুক্তা-মেঘ।

আরও অনেক উঁচুতে 80 কিলোমিটারেরও উপরে এক রকম অতি পাত্‌লা মেঘ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সেগুল খুব হাল্কা কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল—মনে হয় সেখান থেকে আলোর বিকিরণ হচ্ছে। এদের নাম "রূপালী-মেঘ" (noctilucent clouds)। কিভাবে এদের সৃষ্টি হয়েছে এখনও বোঝা যায় নি। অত উঁচুতে তুষারের অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। হয়ত বা অতি পাতলা উল্কাভস্ম বা ধুলোর জমাট পাঁজা হ'তে পারে।

তাপমাত্রা : তাপের বাজেট

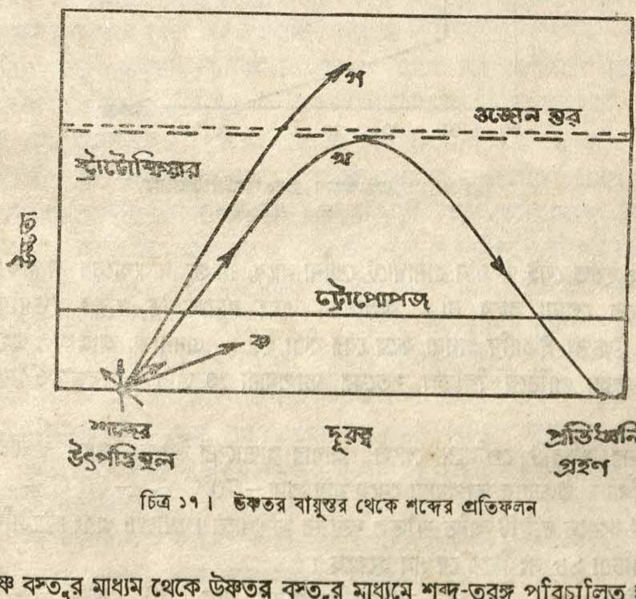
দেখা যাচ্ছে, বায়ুমন্ডলের নানা জায়গার উষ্ণতা বিভিন্ন—কোথাও বেশী কোথাও কম। মোটামুটি উষ্ণতার পরিপেক্ষিতেই বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাগ করা হয়েছে। উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের একটা ধারণা পাওয়া যাবে চিত্র ১৬ থেকে।

ট্রোপোস্ফিয়ারে মাটি থেকে যত উপরে ওঠা যাবে উষ্ণতা তত কম্‌তে থাকবে। ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের সীমানা ট্রোপো-পজ, সেটা প্রায় 16-18 কিলোমিটার উঁচুতে,

অবশ্য মেরু অঞ্চলে মাত্র 8-10 কিলোমিটার উঁচুতে। মাটি থেকে ট্রোপোপজ পর্যন্ত তাপমাত্রা একইভাবে কম্‌তে কম্‌তে গিয়ে প্রায় $-55°C$-এ পোঁছয়। সব চেয়ে উঁচু পর্ব্বতশৃঙ্গ মাত্র 8·8 কিলোমিটার উঁচু (এভারেষ্ট)—অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়েছে। পর্ব্বতশৃঙ্গটি চিরতুষারে আবৃত। এরকম উচ্চতায় তাপমাত্রা থাকে মোটামুটি $-45° \sim -50°C$। ভূপৃষ্ঠের কাছে ট্রোপোস্ফিয়ারের প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা গড়ে 5°-6° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমে যায়। আর একটু উপরে প্রতি কিলোমিটারে উষ্ণতা 10°C করে কমতে থাকে।

ট্রোপো-পজ থেকে উপরের দিকে প্রায় 35-40 কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু উষ্ণতার পরিবর্তন অতি সামান্য দেখা যায়। অর্থাৎ ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার মণ্ডলের নীচের অংশে তাপমাত্রা প্রায় স্থির, $-55°C$ এর কাছাকাছি থাকে। এটাই স্ট্রাটোস্ফিয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর পরেই উচ্চতার সাথে আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং পঞ্চাশ কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুস্তরের তাপমাত্রা দেখা যায় শূন্য ডিগ্রি (0°C) অথবা তারও বেশী। এটা ওজোন স্তর।

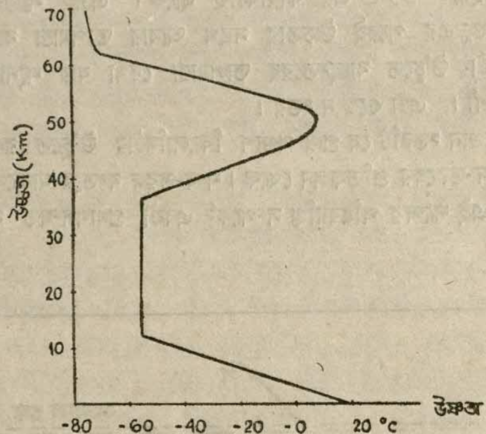
এই উষ্ণ ওজোন স্তরটি যে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলন থেকে। শব্দ-তরঙ্গ বস্তুর মাধ্যমেই শুধু প্রসারিত হতে পারে। এই শব্দের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে একটা প্রমাণসম্মত মতবাদ রয়েছে যে



চিত্র ১৭। উষ্ণতর বায়ুস্তর থেকে শব্দের প্রতিফলন

কম উষ্ণ বস্তুর মাধ্যম থেকে উষ্ণতর বস্তুর মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ পরিচালিত হ'লে, তরঙ্গ বেঁকে যায় তার পুরানো পথ থেকে। যেমন আলোর তরঙ্গ বাতাস থেকে কাচ বা জলের মধ্যে প্রবেশ করলে বেঁকে যায় বা প্রতিসরিত হয়। এমনকি, উপযুক্ত কোণ থেকে যদি

শব্দ-তরঙ্গ উষ্ণতর বায়ুস্তরে এসে প্রবেশ করতে চায় তা হ'লে সেই তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়ে মাটিতে ফিরে আসতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে শব্দতরঙ্গ উঠে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে এবং উপরের দিকে উঠতে থাকে। পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতার কাছে এলে যখন উষ্ণতর ওজোন স্তরের সংস্পর্শে আসে তখন তরঙ্গের গতিপথ বেঁকে যায় এবং প্রতিফলন হয়। শব্দ-তরঙ্গ তখন ভূপৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে (চিত্র ১৭)। প্রতিফলিত তরঙ্গ যেখানে ফিরে এসে পেঁছয় সেখানে শব্দ শোনা যায়। যেমন, কল্পনা করা যাক্, কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কামান ছোঁড়া হল। কামান-গর্জনের খানিকটা শব্দ-তরঙ্গ উপরে উঠে গিয়ে উষ্ণতর বায়ুস্তরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে



চিত্র ১৮। ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উষ্ণতার পরিবর্তন

আসবে এবং হয়ত সেই গর্জন রানাঘাটে শোনা যাবে, কিন্তু মাঝখানের বারাকপুর বা কাঁচড়াপাড়াতে শোনা যাবে না। কলকাতা এবং রানাঘাটের দূরত্ব ইত্যাদি থেকে উষ্ণস্তরের উচ্চতা ইত্যাদি গণনা করে বের করা হয়। এমনকি, আজকাল এই ধরনের নানা শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও তাঁর পরিবর্তনও নির্ণয় করা হচ্ছে।

ওজোনের স্তরটি পেরিয়ে গেলে আবার বাতাসের উষ্ণতা সমানে কমতে থাকে। 80 কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা নেমে যায় প্রায় $-70^\circ C \sim -80^\circ C$ এ। অর্থাৎ উষ্ণ স্তরটি রয়েছে দুইটি অতি শীতল স্তরের মাঝখানে। ট্রোপো এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উষ্ণতার বৈচিত্র্য ১৮ নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরেই আয়নোস্ফিয়ারের শুরু 80 থেকে অন্ততঃ 800 কিলোমিটার পর্যন্ত। এখানে গ্যাসের অর্থাৎ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিতান্তই কম। আয়নোস্ফিয়ারের শুরু থেকেই তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত

বেড়ে যায়। এখানে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ধারণাটা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

উচ্চতা (কিলোমিটার)	উষ্ণতা (°C)
80	−80°
200	+500°
500	+1000°

এর কারণ সৌরকিরণের . শক্তিশালী ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ দ্বারা অক্সিজেনের অণুগুলি (এবং নাইট্রোজেনেরও খানিকটা) প্রথমে পরমাণুতে বিযোজিত হ'য়ে পড়ে। তারপর পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হ'য়ে সেগুলো আয়নে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের সংকেতে,

$$O_2 \rightarrow O+O \; ; \quad O \rightarrow O^{++}+2e$$

এই প্রক্রিয়াতে প্রচুর সৌরশক্তির শোষণ হতে থাকে এবং তারই ফলে তাপমাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে অনেক উপরেও— বহিঃস্তরেও। তারপর বায়ুস্তরের শেষে মহাশূন্যে নিশ্চয়ই অতিশীতলতা বিরাজমান।

বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা জানার জন্যে নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। নীচের দিকে, বিশেষ করে ট্রোপোস্ফিয়ারে এবং প্রায় 25 কিলোমিটার পর্য্যন্ত উচ্চতায় বেলুনের সঙ্গে থার্মোমিটার জুড়ে দিয়ে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজে মাপা যাচ্ছে। এখন বেলুনের স্থান ছোট ছোট রকেট নিয়েছে। শুধু যে তাপমাত্রা মাপছে তা নয়। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রেডিয়ো তরঙ্গের সাহায্যে সেই তাপমাত্রার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে এসে ল্যাবরেটরীতে পৌঁছুচ্ছে। আরও উপরে রকেট পাঠান যায় বটে, তবে তাপমাত্রা মাপার অসুবিধা আছে। কারণ রকেটের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণে এত তাপ উদ্ভূত হয় যে সঠিক তাপমাত্রা পাওয়া যায় না। ওজোন স্তরের কাছাকাছি বায়ুর উষ্ণতা শব্দ প্রতিফলনের সাহায্যে নির্ণীত হয়। রকেটে করে ছোট ছোট বোমা নিয়ে গিয়ে উঁচু স্তরে ফাটিয়ে আরও উঁচু এবং উত্তপ্ত বায়ুস্তরের উষ্ণতা মাপার চেষ্টাও হয়েছে। এভাবে 80-90 কিলোমিটার পর্য্যন্ত বায়ুস্তরের উষ্ণতা জানা যায়। রকেটের মধ্যে চাপ বা ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্রও সন্নিবিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন স্তরের চাপ এবং ঘনত্ব এভাবে জানতে পারা যায়। এবং সেই ঘনত্ব থেকে উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। খুব উঁচু স্তরের তাপমাত্রা আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে জানা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তখন তার গতিবেগের তারতম্য ঘটে। বাতাসের বাধার জন্যই এটা হয়। এই গতিবেগের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সেই স্তরের বাতাসের ঘনত্ব এবং পরোক্ষ-ভাবে উষ্ণতা জানা সম্ভব।

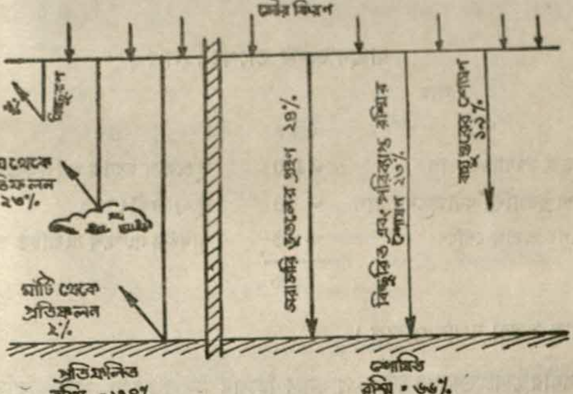
পৃথিবী তার শক্তি আহরণ করছে দু'টি উৎস থেকে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি, রয়েছে তাদের বিভাজনের ফলে সর্ব্বদা প্রচুর তাপশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই তাপশক্তি প্রধানতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরে, বিশেষ করে কেন্দ্রেই থেকে যায়। বায়ুমণ্ডলীতে এখন তার প্রায় কিছুই আসে না। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সৌররশ্মি। সর্ব্বক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে সূর্য্য থেকে প্রচুর

রশ্মি এসে পৃথিবীতে পড়ছে। এই রশ্মি নানা রকমের তরঙ্গাকারে আসছে—কোনটা অতি-বেগুনী, কোনটা আলোক-রশ্মি, আবার কোনটা তাপ-তরঙ্গ। এই সব রশ্মি থেকে পৃথিবী পাচ্ছে অপরিসীম শক্তি। নিরন্তর এই শক্তি না পেলে আমাদের রোজকার কাজকর্ম ত চলতই না, এমন কি তাপমাত্রা এত বেশী নেমে যেত যে জীবজগত লোপ পেয়ে যেত। বলতে পার, কয়লা বা পেট্রোল পুড়িয়ে শক্তির যোগান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কয়লা পুড়ে যে শক্তির উৎপাদন হচ্ছে তার মূলেও রয়েছে সৌরশক্তি। বহু বহু যুগ আগে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে সেই বনজঙ্গল মাটির নীচে চাপা পড়ে আজ কয়লায় পরিণতি লাভ করেছে—কয়লাতে সেই সৌরশক্তিই আবদ্ধ হ'য়ে আছে। কাঠ বা পেট্রোলেরও সেই একই ইতিহাস।

সূর্য্য থেকে যে রশ্মি এসে আমাদের বায়ুমণ্ডলে পৌঁছয় তার শক্তির পরিমাণ গড়ে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে 1·94 ক্যালোরি। এটাকে আমরা বলি সৌররশ্মি-ধ্রুবক বা Solar constant। [এক ক্যালোরি তাপ দিয়ে এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বাড়ান যায়।] এই প্রচুর সৌরশক্তির খানিকটা টেনে নেয় বায়ুস্তরগুলি, আর বাকীটা ভূতলে এসে হাজির হয়। এই শক্তির সাহায্যেই ভূতল এবং বায়ুমণ্ডল তাদের তাপমাত্রা রাখতে পারছে। শতশত বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবী-পৃষ্ঠের বা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা একই রয়েছে, কোন বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু প্রতিনিয়ত সূর্য্যকিরণ গ্রহণের ফলে উষ্ণতা অনেক বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাপমাত্রা না বাড়বার কারণ, পৃথিবীও উত্তপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করছে সর্বদা। এমন একটা সাম্যাবস্থা পেঁাছে গেছে এখন, যে গড়ে সূর্য্য থেকে যতটা শক্তি আসছে ততটাই আবার পৃথিবী থেকে নানা উপায়ে চ'লে যাচ্ছে। ফলে তাপমাত্রার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে উৎস থেকে রশ্মির বিকিরণ হয় তার উষ্ণতার উপরে কি ধরনের কিরণ বিকীর্ণ হবে সেটা নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে 10°C আর সূর্য্যের বহির্মণ্ডল, যেখান থেকে কিরণ বেরিয়ে আসে তার তাপমাত্রা 6000°C। সুতরাং পৃথবী যে সকল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরণ করে আর সূর্য্য যে সব রশ্মি আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে সেগুলো এক রকমের নয়। সৌর-কিরীট থেকে যে কিরণচ্ছটা আস্ছে তার বেশীর ভাগই আলোর তরঙ্গ—যার সাহায্যে আমরা সব কিছু দেখতে পাই। আলোকরশ্মি ছাড়াও তার সঙ্গে থাকে তাপরশ্মি এবং খানিকটা অতি-বেগুনী ও এক্সরে-জাতীয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের রশ্মি। অপর দিকে পৃথিবী থেকে যে রশ্মি বেরিয়ে যায় তার সবটাই তাপরশ্মি — অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। সূর্য্য থেকে পাওয়া এবং পৃথিবী থেকে হারানো নানা রকমের রশ্মির একটা ধারণা ১৪নং চিত্র থেকেই সহজে বোঝা যাবে। দেখা যাচ্ছে সূর্য্য থেকে এক শ্রেণীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি আসছে আর পৃথিবী থেকে অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত রশ্মিই তাড়িত-চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের জন্য ওদের প্রকৃতি ও ধর্ম বিভিন্ন। যেমন, অক্সিজেন এবং ওজোন অনেক অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ ক'রে নিতে পারে। জলীয় বাষ্প বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড সেটা পারে না। আবার দীর্ঘ তরঙ্গের তাপরশ্মিকে জলীয় বাষ্প প্রচুর শোষণ করে, কিন্তু ওজোন বা অক্সিজেনের

পক্ষে সেটা সামান্য সম্ভব। চিত্রটির নীচে কোন গ্যাস কি রকম তরঙ্গ শোষণ করতে পারে সেটাও দেখান হয়েছে।

সৌররশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের ভিতরে আসে, বহিস্তর আর আয়নোস্ফিয়ারে যে সামান্য অক্সিজেন আছে সেটা ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলি শুষে নেয়। 1800A° পর্যন্ত সব রকম দৈর্ঘ্যের রশ্মি অক্সিজেন গ্রহণ করে আর এই তরঙ্গগুলির শক্তি প্রচুর। ফলে এই সকল স্তরের বাতাসের উষ্ণতা অত্যন্ত বেড়ে যায় আর অণুগুলি বিযোজিত হয়ে আয়নে পরিণত হয়। এরপর সৌরকিরণ যখন 70-80 কিলোমিটার উচ্চতার বায়ুস্তরে এসে উপস্থিত হয় তখন সেখানকার হাল্‌কা বাতাসে বিশোষণ সামগ্রিকভাবে খুব কমে যায়। তাই এখানকার বায়ুস্তর অত্যন্ত শীতল। আর একটু নীচে এলে, 50-55 কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব খানিকটা বাড়ে এবং সেখানকার অক্সিজেন তখন অতি-বেগুনী তরঙ্গগুলিকে শোষণ করে নিয়ে ওজোনে পরিণত হয়। ওজোনের নিজেরও আবার অতি-বেগুনী আলোক শোষণ করার ক্ষমতা আছে। তাই ওখানে যে ওজোন তৈরী হ'ল সেটাও অবশিষ্ট অতি-বেগুনী রশ্মির প্রায় সবটাই শুষে নেয়। ওজোন স্তরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার এটাই হেতু। এই পঞ্চাশ কিলোমিটারের উপরেই 3000A° পর্যন্ত ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি সমস্ত অপসারিত হ'য়ে যায়। ওজোন স্তর পেরিয়ে 50 কিলোমিটারের নীচে যে সূর্যরশ্মি আসে তাতে কেবলমাত্র আলোক আর তাপরশ্মিই থাকে। এরপর এ সকল রশ্মি প্রবেশ করে ট্রোপোস্ফিয়ারে।



চিত্র ১৯। বায়ুস্তরে সৌরকিরণের বিলিবণ্টন

এখানে রয়েছে প্রচুর ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, মেঘ। এরা খানিকটা তাপ এবং কিছুটা আলোকরশ্মি শোষণ করে। আবার রশ্মির কিছু অংশ বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে যায়। বাকী রশ্মি এসে ভূতলে উপস্থিত হয় এবং তাকে উত্তপ্ত ক'রে তোলে। ভূতল থেকেও খানিকটা রশ্মি ঠিকরে উপরের দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়। চিত্র ১৯-এ আমাদের পৃথিবীতে আসা সৌররশ্মির কতটা কোথায়

যায় তার একটা হিসেব রয়েছে। এই সৌরশক্তির অবিরাম প্রবাহ আছে বলেই ভূতল ও বায়ুমন্ডল তাদের তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারছে। আবার এই শক্তির পরোক্ষ সাহায্যেই বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি চলছে। সেটা পরে আলোচনা করা যাবে।

যে সৌরতাপ পৃথিবী পায়, তার বেশীর ভাগটাই সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হ'তে ব্যয় হয়। তাছাড়া, উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপরশ্মি বিকিরণ হ'তে থাকে। এই তাপরশ্মি সবই দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং সামান্য একটু উপরে উঠলেই জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড সেই রশ্মি শোষণ ক'রে তাপিত হ'য়ে পড়ে। এদের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়াতে এদের মধ্য থেকে আবার তাপ নির্গত হ'য়ে খানিকটা উপরের দিকে এবং খানিকটা নীচের দিকে আসে। ঊর্ধ্বমুখী রশ্মিকে আবার উপরের জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর মোট ফল হ'ল, নীচের দিকের উষ্ণতা যায় বেড়ে এবং যত উপরে যাবে উষ্ণতা কমবে। ট্রোপোস্ফিয়ারে তাই হয়। কিন্তু ট্রোপো-পজের কাছে গেলে আর মেঘ বা বাষ্প থাকে না। তাই তাপরশ্মি সোজা উপরে চলে যায়। সেখানে তাপের কোন শোষণ হয় না, তাই সেখানে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ে না, অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ার সৃষ্টি হয়।

আমাদের এ আলোচনা বায়ুমন্ডলকে নিয়ে। শুধু বায়ুস্তরগুলোর তাপ দেওয়া-নেওয়ার বাজেট যদি বিবেচনা করি, তাহ'লে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে একটা সাম্যাবস্থা রয়েছে। তাপের আয় আর ব্যয় মোটামুটি সমান।

বায়ুমণ্ডলের তাপের হিসাব

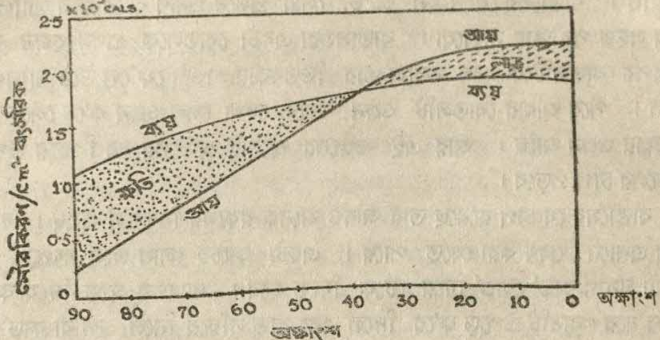
আয়	একক	ব্যয়	একক
পৃথিবী থেকে উৎসারিত তাপ	=120	ভূতলে পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত তাপ	=106
জলীয় বাষ্প ইত্যাদির ঘনীভবনের তাপ	= 23	শূন্যে বিকীর্ণ তাপ	= 47
সৌর তাপের প্রত্যক্ষ শোষণ	= 13	পৃথিবীর সংস্পর্শে সংবাহিত তাপ	= 3
	156		156

এভাবে সমতা বজায় থাকছে।

পৃথিবীর মোট তাপের দেনা-পাওনার হিসাব নিলে দেখা যায়, বিভিন্ন অক্ষাংশে তাপের দেনা-পাওনা এক নয়। 38°N থেকে 38°S অক্ষাংশের মধ্যের পৃথিবী যতটা সৌরতাপ পায়, দেয় তার চেয়ে কম, অর্থাৎ এই অংশে তাপের উদ্বৃত্ত বাজেট রয়েছে। কিন্তু 38° ডিগ্রি থেকে মেরু পর্যন্ত পৃথিবীর অংশে যতটা সৌরতাপ পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেকটা বেশী তাপ উৎসারিত হ'য়ে চলে যায়। চিত্র ২০ থেকে সেটা অনায়াসে বোঝা যাবে।

ভূতলের সব জায়গা সমান সৌরকিরণ পায় না। নিরক্ষরেখা অঞ্চলে কিরণ খাড়াভাবে এসে পড়ে, কিন্তু সেই একই পরিমাণ কিরণ উচ্চ অক্ষাংশে বা মেরুর কাছে

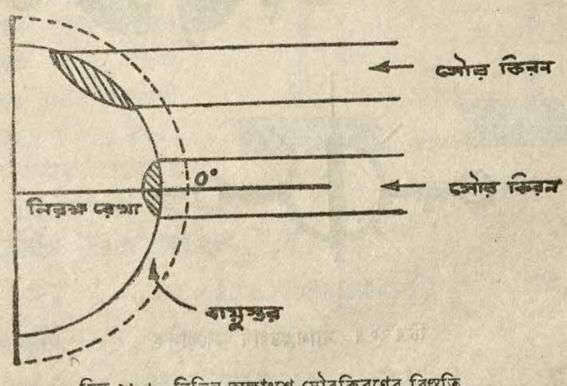
তির্য্যকভাবে এসে অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই উচ্চতর অক্ষাংশের তুলনায় বিষুব-রেখা অঞ্চলে সময়াতন ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণ রশ্মি পাওয়া



চিত্র ২০। বিভিন্ন অক্ষাংশে তাপের বাজেট

যায় (চিত্র ২১)। তাছাড়া উচ্চ অক্ষাংশে রশ্মিকে বায়ুস্তর ভেদ করে অপেক্ষাকৃত বেশী পথ যেতে হয় বলেও তীব্রতা খানিকটা কমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা বিভিন্ন হওয়ার এসব বড় কারণ। দিবালোক কতক্ষণ পাওয়া যাবে তার উপরেও সৌর রশ্মির পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। দিবালোকের সর্বাধিক সময়ের হিসেব বিভিন্ন অক্ষাংশে নিম্নরূপ ঃ

অক্ষাংশ	0°	17°	49°	$66\frac{1}{2}$°	67·2°	90°
দিবালোকের সময় (সর্বাধিক)	12 ঘণ্টা	13 ঘণ্টা	16 ঘণ্টা	24 ঘণ্টা	1 মাস	6 মাস



চিত্র ২১। বিভিন্ন অক্ষাংশে সৌরকিরণের বিস্তৃতি

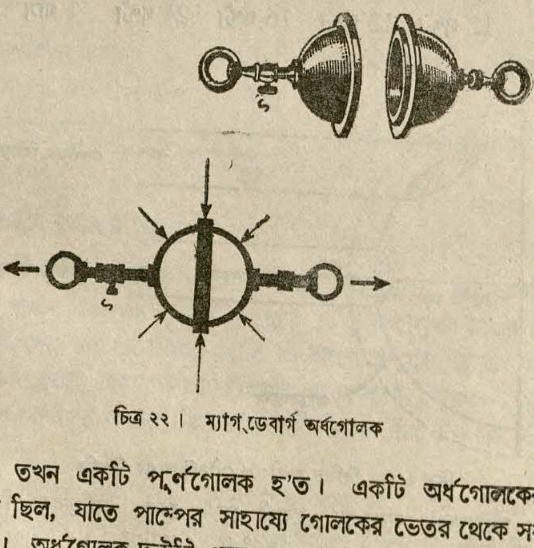
পৃথিবীর তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী দেখা গেছে আফ্রিকার লিবিয়া দেশের আজিজিয়াতে। সেখানকার উষ্ণতা 136° F (57·7°C)। আর সবচেয়ে কম তাপমাত্রা পাওয়া গেছে সোভিয়েটের ভোস্টক ষ্টেশনে, উষ্ণতা – 127° F (—88·3°C)।

বায়ুচাপ

বাতাস হালকা বটে, তবে তারও ওজন রয়েছে ; সেই ওজনের কথা আগেই আলোচনা করেছি। বাতাসের যে ওজন আছে, সেটা প্রথমে প্রমাণ ক'রে দেন গ্যালিলীও একটা খুব সহজ পরীক্ষার সাহায্যে। বাতাসভরা একটা বোতলকে প্রথম ওজন করা হ'ল। তারপর বোতলটিকে গরম করলে তার ভিতরকার হাওয়া ফেঁপে উঠে খানিকটা বেরিয়ে গেল। পরে আবার বোতলটি ওজন করলে দেখা গেল ওজন ক'মে গেছে। অতএব হাওয়ার ওজন আছে। আর এই ওজনের জন্যেই ভূতলের সব কিছুর উপরেই বায়ু-মণ্ডলের চাপ পড়বে।

বাতাসের যে চাপ রয়েছে তার আরও অনেক রকমের নিদর্শন আছে। দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা কাচের গ্লাস জলে সম্পূর্ণ ভর্তি ক'রে একটা মসৃণ কার্ড বোর্ড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে কার্ডবোর্ডটি চেপে ধরে গ্লাসটি উপুড় ক'রে দিলে এবং হাত সরিয়ে নিলে জল বা কার্ডবোর্ড পড়ে যাবে না। কার্ডবোর্ডটি গ্লাসের সঙ্গেই সেঁটে থাকবে। এর কারণ কার্ডবোর্ডের একদিকে জলের চাপ, অপরদিকে বাতাসের চাপ রয়েছে। হাওয়ার চাপ বেশী বলেই কার্ডবোর্ড পড়ে যাচ্ছে না। বাতাসের যদি চাপ না থাকত তবে কার্ডবোর্ডটি পড়ে যেত আর জলও বেরিয়ে যেত।

জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ শহরের বৈজ্ঞানিক গেরিক একটা সুন্দর পরীক্ষা করেছিলেন এবং তখনকার জার্মান সম্রাট ও অন্যান্যকে দেখিয়ে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি দু'টি তামার অর্ধগোলক তৈরী করেছিলেন। এই অর্ধগোলক দু'টি ঠিক খাপে খাপে



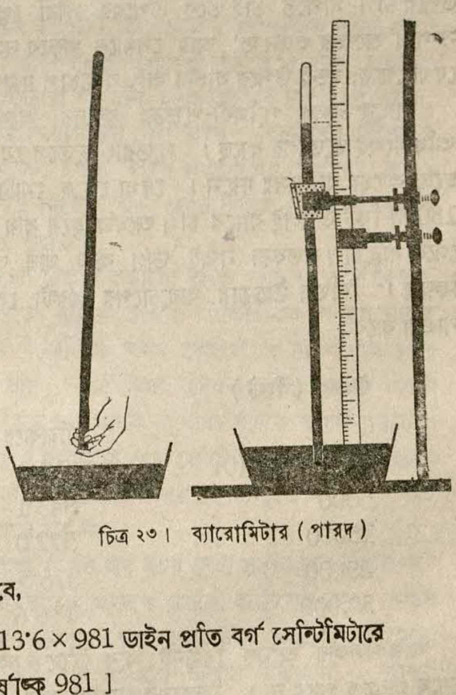
চিত্র ২২। ম্যাগ্‌ডেবার্গ অর্ধগোলক

লাগান যেত। তখন একটি পূর্ণগোলক হ'ত। একটি অর্ধগোলকের সঙ্গে একটা স্টপকক লাগান ছিল, যাতে পাম্পের সাহায্যে গোলকের ভেতর থেকে সব বাতাস বের করে নেয়া যায়। অর্ধগোলক দুইটি একত্র জুড়ে, গোলকের ভেতরের বাতাস বের ক'রে দিয়ে ভেতরটা বায়ুশূন্য করা হ'ল। এখন দু'দিকের আংটা ধরে দু'জন খুব বলবান

লোক সজোরে টেনেও অর্ধগোলক দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারল না। তখন এক একদিকে আটটা ক'রে ঘোড়া লাগিয়ে ষোলটা ঘোড়ার শক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত দু'টি অর্ধগোলক আলাদা করতে পারা গেল। কিন্তু স্টপককের ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে অনায়াসেই দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বায়ুশূন্য অবস্থায় ভিতরে কোন চাপ ছিল না, কিন্তু বাইরে থেকে বাতাসের প্রচন্ড চাপ ছিল, তাই দু'টিকে পৃথক করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। এই পরীক্ষা থেকে বায়ুর চাপের অস্তিত্ব এবং তার প্রচণ্ড শক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল (চিত্র ২২)।

ভূতলের এক বর্গসেন্টিমিটারের উপর বায়ুমন্ডলের উপরের সীমা থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বাতাসের স্তম্ভের যে ওজন সেটাই সেখানকার বায়ুর চাপ। এই ওজনের পরিমাণটা জানার পদ্ধতি প্রথমে বের করেন গ্যালিলীওর শিষ্য টরিসেলী।

এক মুখ বন্ধ করা প্রায় এক মিটার লম্বা একটি কাচের নল টরিসেলী পারদ দিয়ে সম্পূর্ণ ভর্তি ক'রে নিলেন। সেই নলটিকে তারপর উলটে দিয়ে খোলামুখটিকে একটা পারদপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে দিলেন (চিত্র ২৩)। দেখা গেল, খানিকটা পারদ নল থেকে বেরিয়ে এল। সম্পূর্ণ পারদ কিন্তু নল থেকে বের হ'ল না। প্রায় 76 সেণ্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পারদ নলেই থেকে গেল। ভারী হওয়া সত্ত্বেও পারদ বেরিয়ে আসে না হাওয়ার চাপের জন্যে। পাত্রের পারদের ওপর হাওয়া চাপ দিচ্ছে, তার ফলে পারদ নলের মধ্যে উপরে উঠে রয়েছে। অতএব, নলের মধ্যের পারদের ওজন বাইরের বায়ুর চাপের সমান, অর্থাৎ নলের পারদের ওজন জানলেই সেখানকার বায়ুচাপ জানা যাবে।


চিত্র ২৩। ব্যারোমিটার (পারদ)

নলের ভিতরে পারদের উচ্চতা যদি h সেন্টিমিটার হয়, তা হ'লে বায়ুচাপের (P) পরিমাণ হবে,

$$P = h \times 1 \times 13{\cdot}6 \times 981$$ ডাইন প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে

[পারদের ঘনত্ব, 13·6 ; অভিকর্ষাঙ্ক 981]

ল্যাবরেটরীতে যে সব পারদের চাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার সাধারণতঃ দেখা যায় সেগুলো এভাবেই তৈরী। এ ছাড়াও অন্য রকমের চাপমানযন্ত্র আছে, যেমন অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার, সেখানে কোন তরল পদার্থের প্রয়োজন হয় না।

সমুদ্র সমতলে শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতায় বায়ুর চাপ মেপে দেখা গেছে 76 সেন্টিমিটার

(বা 29·92 ইঞ্চি) উচ্চতার পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান। এই ওজনটা হচ্ছে 1·033 কিলোগ্রাম প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে অথবা 14·7 পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। এই বায়ুচাপের পরিমাণকে পদার্থবিদেরা চাপের একক বলে ধরেছেন এবং নাম দিয়েছেন এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার।

∴ 1 অ্যাটমস্‌ফিয়ার = 76 সেন্টিমিটার উচ্চতার পারদ স্তম্ভ

কিন্তু আজকাল আবহতত্ত্বে চাপের আর একটি একক প্রচলিত হয়েছে। সেই এককটিকে বলা হয় "মিলিবার"। এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপ 1013·2 মিলিবারের সমান।

এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার = 1013·2 মিলিবার = 76 সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভ
অথবা এক মিলিবার = 0·075 সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভ
কিংবা এক মিলিবার = 0·0295 ইঞ্চি পারদ স্তম্ভ

সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার। কিন্তু যদি একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে চাপ মাপতে চাই তবে উপরের সীমা থেকে সমুদ্র সমতল পর্যন্ত বাতাসের সম্পূর্ণ স্তম্ভের ওজন ত' আর সেখানে পড়বে না, সুতরাং চাপ কম হবে। বস্তুতঃ দেখা গেছে, যতই উপরে যাওয়া যায়, বায়ুচাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

বায়ুমণ্ডলের পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছের অংশটা বেশী ভারী। বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই ভূতলের কাছে। সুতরাং ভূতলে যে বায়ুচাপ পড়ে তার বেশীর ভাগটাই হচ্ছে কাছের বাতাসের দরুন। দেখা গেছে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার বা প্রায় 18000 ফিট উঠলেই বায়ুর চাপ অর্ধেক হয়ে যায়। আর পনেরো কিলোমিটার উপরে গেলে বায়ুচাপ শতকরা নব্বই ভাগ কমে যায়, অর্থাৎ সেখানকার চাপ 0·1 অ্যাটমস্‌ফিয়ার। বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুচাপের একটা মোটামুটি ধারণা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

উচ্চতা (ফিট)	চাপ	
	মিলিবারে	পারদ-স্তম্ভ (ইঞ্চিতে)
সমুদ্র সমতল (0)	1013·2	29·92
5000	843·1	24·9
15000	572·0	16·9
25000	376·5	11·1
50,000	116·6	3·4

আজকালকার অনেক বিমানই খুব উঁচুতে চলাফেরা করে কিন্তু এত স্বল্প চাপে মানুষ থাকতে পারে না। ভিতরের চাপের জন্য চামড়া ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হবে। এই জন্য বিমানের অভ্যন্তরে কৃত্রিম উপায়ে ভূতলের মতো বায়ুচাপ রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

যে কোন তরল পদার্থকে ক্রমশঃ গরম করলে, উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তার বাষ্পের চাপ বাড়তে থাকে এবং যে উষ্ণতায় গিয়ে পদার্থটির বাষ্পচাপ ঠিক তার উপরের

বায়ুচাপের সমান হবে, সেই উষ্ণতায় তরলটি ফুটতে থাকবে। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় সেই পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক। যেমন, জলের কথা ধরা যাক। সাধারণ উষ্ণতায় (20°C) জলের উপরের বাষ্পচাপ মাত্র 1·75 সেন্টিমিটার। এখন উষ্ণতা বাড়িয়ে দিলে বাষ্পচাপ বাড়বে আর (সমুদ্র সমতলে) 100°C তাপমাত্রায় পেঁছুলে জলের বাষ্পচাপ হবে ঠিক 76 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ উপরের বায়ুচাপের সমান। তাই 100°C তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকবে। অর্থাৎ এক অ্যাট্‌মসফিয়ার চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C। দার্জিলিং কলকাতা থেকে অনেক উঁচুতে, সুতরাং দার্জিলিঙের বায়ুচাপ কলকাতার চেয়ে কম। অতএব কলকাতায় জল যদি 100°C এ ফুটতে থাকে, তবে দার্জিলিঙে জল আরও কম উষ্ণতায় ফুটবে। এর ফল হচ্ছে যে ডাল কলকাতার জলে সহজে সেদ্ধ হয়ে যায়, সেটাকে দার্জিলিঙে সেদ্ধ করতে অসুবিধা হয়, কারণ সেখানে ফুটন্ত জলের উষ্ণতা কম।

এক বর্গ সেন্টিমিটারের উপর বায়ুচাপ আমরা দেখেছি এক কিলোগ্রামেরও উপরে। একটি মানুষের গায়ের বর্গায়তন হবে প্রায় 14000 বর্গ সেন্টিমিটার। অতএব, তার দেহের উপরে বায়ুর চাপ পড়বে প্রায় 15500 কিলোগ্রাম বা অল্পাধিক পনের টন। এ রকম প্রচণ্ড চাপ আমরা সইতে পারি, কারণ ভেতর থেকেও অনুরূপ চাপ রয়েছে। সমস্ত প্রাণীই এরকম চাপ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। যদি হঠাৎ বাইরের চাপটা চলে যায়, তাহ'লে ভেতরের চাপের জন্য আমাদের শিরাগুলো ফেটে যাবে। আমাদের ভেতরের কলকব্জা যাবে বিকল হয়ে। একটা তুলনা হ'তে পারে সাইকেলের টায়ারের সঙ্গে। আমরা টায়ারের ভেতর পাম্প করে ফুলিয়ে দিলেও সেটা ফেটে যায় না। কারণ বাইরে থেকে বায়ুচাপ ভেতরের চাপকে প্রতিহত করছে।

ঘরের কড়িকাঠে বা খাড়া দেওয়ালে টিকটিকিগুলো অতি স্বচ্ছন্দে চলে বেড়ায়, নীচে পড়ে যায় না। এর পেছনে রয়েছে বায়ুর চাপ। টিকটিকির পায়ের থাবার তলায় একটা খুব পাতলা পর্দা আছে। টিকটিকি যখন দেয়ালে পা চেপে ধরে তখন পর্দার মাঝখানটায় একটা গর্ত হ'য়ে যায়। পর্দা আর দেয়ালের মধ্যে তখন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সেখানে কোন চাপ থাকে না অথচ বাইরে যথেষ্ট বায়ুচাপ রয়েছে। সুতরাং এই বায়ুচাপে তার পা দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকে। এমনি ভাবে একটা একটা ক'রে পা আটকে রেখে, অন্য পাগুলো চালিয়ে সে এগুতে থাকে। তাই খাড়া দেওয়াল বা কড়িকাঠ থেকে ওরা পড়ে যায় না।

নানা কাজেই বায়ুর চাপ ব্যবহার হচ্ছে, যদিও সব সময় সেটা সহসা মনে আসে না। যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে আমরা বেঁচে আছি তার মূলেও রয়েছে, বাতাসের চাপ। শ্বাস গ্রহণের সময় আমাদের বুকের ভেতরের আয়তন বেড়ে যায় অর্থাৎ ভেতরের চাপ কমে, বাইরে থেকে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুচাপ না থাকলে বাতাস ঢুকত না। আবার নিশ্বাস ফেলার সময় বুকের গহ্বরের আয়তন সঙ্কুচিত হ'য়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বের ক'রে দেয়। পাহাড়ে বা খুব উঁচু যায়গায় গেলে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কারণ সেখানে বায়ুর চাপ কম।

সাইফন, নানাধরনের বায়ু-পাম্প, নলকূপ ইত্যাদির পরিচালন বায়ুচাপ থাকার জন্যই সম্ভব হয়েছে। ডাবের জল সরু নল দিয়ে পান করার সময় বা ফাউন্টেন পেনে

কালি ভরার সময় পরোক্ষে বায়ুচাপেরই সাহায্য নিচ্ছি। আকাশে পাখী যে ভেসে বেড়াচ্ছে তাও বায়ুর চাপের জন্যই।

বায়ুপ্রবাহ

বাতাস সর্ব্বদাই সচঞ্চল, কখনও স্থির হ'য়ে থাকে না, থাকতে পারে না। কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রূপে এর প্রকাশ। বৈশাখের খর মধ্যাহ্নে দেখেছি মহাযোগী সন্ন্যাসীর মতো স্থির নিষ্কম্প নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে বাতাস। সে-ই আবার শরতের সন্ধ্যায় ঘরের কোণের গাছের শিউলি, বনজুঁই-এর মিষ্টি সৌরভ ব'য়ে নিয়ে এসে নব-বধূর মতো কানে কানে বলে গেছে, এইত আমি রয়েছি। শান্ত উষায় আমলকী বনের মাথায় মাথায়, নিম-পল্লবের কচি পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আদর ক'রে দুলিয়ে দিয়ে যেতে তাকে দেখেছি, দেখেছি তাকে অঘ্রাণের 'স্বর্ণ শীর্ষ আনমিত' ধানের ক্ষেতের ওপর কিশোর বালকের উল্লাসের মতো আনন্দের তরঙ্গে প্রসারিত। আষাঢ়ের সজল সন্ধ্যায় দেখেছি দূর শাল মহুয়ার বনে বাতাসের নৃত্য চঞ্চল পদসঞ্চার, শুনেছি শাখে শাখে উদ্বেল যৌবনের মর্মর গুঞ্জন। দেখেছি কালবৈশাখীর উদ্দামতায় বাতাস সব বাধা বন্ধ ছেড়ে 'হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া প্রবাহিয়া চলে যায়······প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে পূরবে-পশ্চিমে।' প্রকৃতির এ আনন্দ-সমারোহ অপূর্ব্ব।

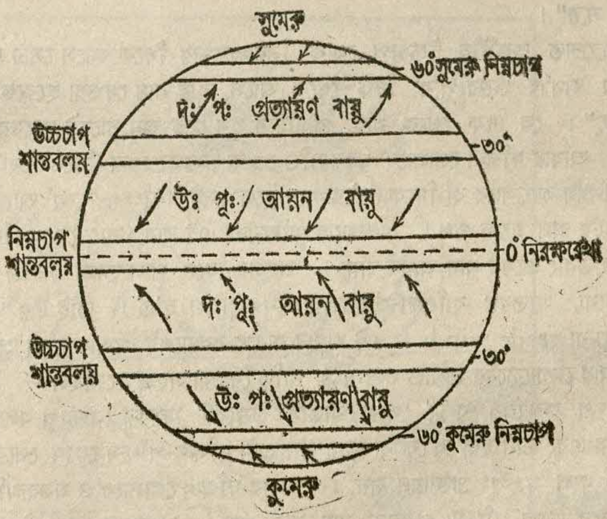
এবার কল্পনা ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে এসে একটু অঙ্কের হিসাব করি। অনেক সময় আমরা বলি, 'মোটেই বাতাস নেই', 'বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না,'—তখনও কিন্তু বাতাস ব'য়ে যায়। তবে তখন তার গতিবেগ খুবই কম। আবার প্রবল ঝড়ের সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস ছুটে চলে। যখন একেবারে শান্ত তখনও প্রতি সেকেন্ডে বাতাস এক মিটার বেগে ব'য়ে চলে। যে প্রবাহে গাছের সরু ডালপালা দুলতে থাকে সে রকম প্রীতিকর মৃদুমন্দ বাতাসের গতিবেগ সেকেন্ড 5-7 মিটার হবে। ঝ'ড়ো-হাওয়ার বেগ খুব বেশী, সেকেন্ডে 30 মিটার হ'তে পারে। বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগের একটা ধারণা নীচের তালিকায় পাওয়া যাবে :

বায়ুর পরিচয়	গতিবেগ মাইল প্রতি ঘণ্টায়	বায়ুর প্রক্রিয়ার নিদর্শন
শান্ত	1—2	গাছের পাতা স্থির, চিমনীর ধোঁয়া সোজা উঠে যায়।
মৃদু-মন্দ	2—12	গাছের পাতা এবং সরু ডাল দুলতে থাকে।
তাজাবায়ু	13—23	জলে ঢেউ ওঠে, গাছের ডালপালা আন্দোলিত হয়।
প্রবল বায়ু	24—37	বড় বড় গাছ দুলতে থাকে, জানালার খড়খড়ি নড়ে।
ঝ'ড়ো-হাওয়া	37—55	জলে প্রচণ্ড ঢেউ হয়, ঘরের চাল উড়ে যায়, ছোট ছোট গাছ উপড়ে যায়, বড় বড় গাছও দুলতে থাকে।
প্রবল ঝড়	>55	ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের মূলে কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বায়ুচাপের অসমতা। কোথাও বায়ুচাপ বেশী আবার কোথাও কম। চাপের এই অসমান বিন্যাসের জন্য বাতাস উচ্চচাপ থেকে সর্ব্বদা নিম্নচাপের দিকে ব'য়ে যায়। আর চাপের এই অসম বিন্যাসের প্রধান কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে তাপ একরকম ভাবে পড়ে না, ফলে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। বাতাস উষ্ণ হ'লে সেটা হালকা হ'য়ে উপরের দিকে উঠে যায়, নীচের চাপ কমে যায়, তাই অন্যদিকের উচ্চচাপের ঠাণ্ডা আর ভারী বাতাস সেখানে আসতে থাকে। বায়ুর প্রবাহ হ'তে থাকে।

ট্রোপোস্ফিয়ারের বায়ুমন্ডলে দেখা যায়, কয়েকটা প্রধান বায়ুস্রোত সব সময়েই মোটামুটি একই দিক থেকে ব'য়ে যায়। এদের বলা হয় "নিয়ত বায়ুপ্রবাহ"। নিরক্ষরেখার কাছে সৌরতাপ বেশী, সেখানকার উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায়। তাই নিরক্ষরেখার খুব কাছের অংশে বাতাসের চাপ কম, অর্থাৎ এখানে পৃথিবী ঘিরে নিম্ন চাপের একটি বলয় রয়েছে। এখানে নীচের দিকের বাতাসের গতিবেগ বেশ কম এবং সীমিত অর্থাৎ বায়ুস্তর মোটামুটি প্রশান্ত। তাই এটাকে বলা হয় "নিরক্ষীয় শান্ত বলয়"। ইংরেজী নাম "ডলড্রামস" (Doldrums)।

এ রকম আরও শান্ত-বলয় রয়েছে। নিরক্ষরেখা থেকে যতই মেরুর দিকে যাওয়া যাবে, অক্ষাংশ বাড়ার সঙ্গে বায়ুচাপ বাড়তে থাকে, এবং কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে গিয়ে সবচেয়ে উচ্চচাপ দেখা যায়। এই কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে পৃথিবী ঘিরে আরও একটি



চিত্র ২৪ নিয়ত বায়ুপ্রবাহের গতির দিক

করে উচ্চচাপের শান্ত-বলয় রয়েছে। কর্কট এবং মকর ক্রান্তি ছাড়িয়ে গেলে প্রায় 70° অক্ষাংশে রয়েছে আবার দু'টি নিম্নচাপের বেষ্টনী। এরা 'মেরুপ্রদেশীয় নিম্নচাপ শান্ত বলয়'। এর পর মেরুর কাছে আবার বায়ুচাপ খুব বেশী (চিত্র ২৪)।

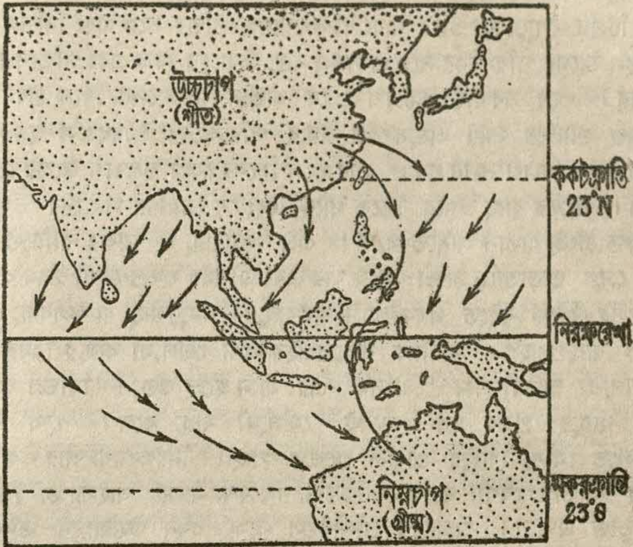
পূর্বে সমুদ্রতরী চলত পালের সাহায্যে। তখন উত্তর আমেরিকা থেকে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোড়া চালান যেত। কর্কটীয় শান্তবলয় দিয়ে যাবার সময় বায়ুপ্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে থাকার জন্য জাহাজগুলোকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হ'ত। পানীয় জলের অভাবের আশঙ্কায় তখন ঘোড়াগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হ'ত। এজন্য কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয় অঞ্চলকে নাম দেওয়া হয়েছিল "অশ্ব অক্ষবৃত্ত" (Horse latitudes)।

আগেই বলেছি, বাতাস উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে ব'য়ে চলে। তাই কর্কটীয় এবং মকরীয় উচ্চচাপ-বলয় থেকে বাতাস নিরক্ষরেখার দিকে এবং মেরু প্রদেশীয় নিম্ন চাপের বলয়ের দিকে বইতে থাকবে। কিন্তু বাতাস সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ব'য়ে যায় না। তার কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি। পৃথিবী তার মেরুদন্ডের উপরে 24 ঘন্টায় একবার ঘুরছে। নিরক্ষরেখার উপরে বা কাছাকাছি কোন স্থান একদিনে যতটা পথ ঘুরবে, মেরু অঞ্চলের কোন স্থানকে তার চেয়ে অনেকটা কম পথ পরিক্রমা করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের গতিবেগ বিভিন্ন হবেই। যেমন, সিঙ্গাপুর প্রায় নিরক্ষরেখার কাছে, সুতরাং দিনে তাকে 25000 মাইল ঘুরে আসতে হয়, আর লন্ডনকে (অক্ষাংশ 51°) ঘুরতে হয় মাত্র 15750 মাইল। আর সেই তুলনায় মেরুদেশের স্পিটবার্জেন দ্বীপ পরিক্রমা করে মাত্র সাড়ে চার হাজার মাইল। এর ফলে পৃথিবীর উপরের গতিশীল সব কিছুই উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে হেলে যায় আর দক্ষিণ গোলার্ধে সেগুলো বাঁ দিকে বেঁকে যায়। এটাকে বলে "ফেরেলের সূত্র"।

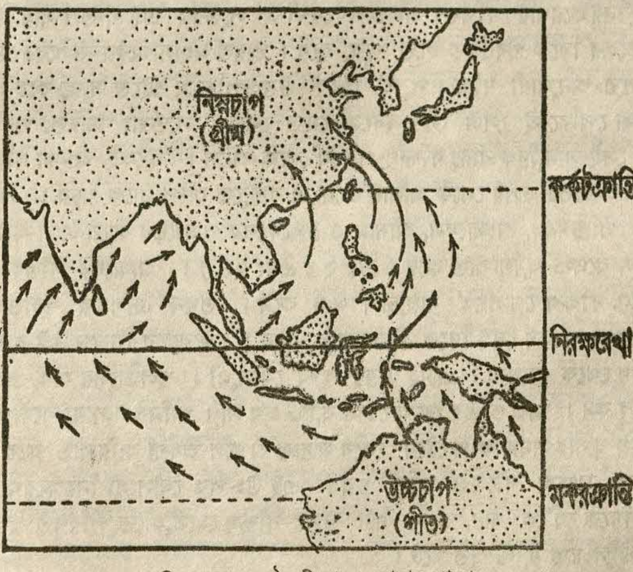
যে বায়ুস্রোত কর্কটীয় উচ্চচাপ থেকে নিরক্ষরেখার দিকে আসে সেটা ডান দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে, তার নাম দেওয়া হয়েছে "উঃ-পূঃ আয়ন বায়ু"। যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই অনুসারেই তাদের নামকরণ করা হয়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি থেকে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত বায়ু ফেরেলের নিয়ম অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে যায় বলে' সেটা "দক্ষিণ-পূর্ব্ব আয়ন বায়ু"। অয়ন শব্দটির অর্থ হচ্ছে পথ। এককালে নাবিকেরা এই বায়ুপ্রবাহ দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করত। সুতরাং এদের নাম আয়ন বায়ু। আগের দিনে পালতোলা জাহাজ চলত এই বায়ুর সাহায্যে, সুতরাং বাণিজ্য-জাহাজের খুব সুবিধা হ'ত। তাই এর অপর নাম বাণিজ্য-বায়ু বা trade winds। এই আয়ন বায়ুর কল্যাণেই কলোম্বাসের আটলান্টিক মহাসাগর আর মেগালেনের প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া সহজ হয়েছিল।

উচ্চচাপের কর্কটীয় বলয় থেকে বাতাস উত্তরের দিকের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ডানদিক বেঁকে যাওয়ার জন্য এটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আসে। এ বায়ুকে বলে দঃ-পঃ প্রত্যায়ন বায়ু। আবার দক্ষিণ গোলার্ধেও মকরক্রান্তি থেকে দক্ষিণের দিকে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু ব'য়ে যায়। প্রত্যায়ন বায়ুর বিদেশী নাম, Westerlies। দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির পরে স্থলভাগ খুব কম। এখানে 40-50° দঃ অক্ষাংশে দঃ-পঃ প্রত্যায়ন বায়ু প্রবল বেগে শোঁ শোঁ ক'রে ব'য়ে যায়। এর জন্যে এখানে প্রত্যায়ন বায়ুকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে, "গর্জনকারী চল্লিশা" (Roaring forties)। তাছাড়া সুমেরু বৃত্তের মধ্যে অতি শীতল উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু

দক্ষিণ দিকে ব'য়ে আসে, তাই সাইবেরিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ এত ঠান্ডা।



চিত্র ২৫। মৌসুমী বায়ু : পৌষ-মাঘ



চিত্র ২৬। মৌসুমী বায়ু : আষাঢ়-শ্রাবণ

কুমেরু বৃত্তের মধ্যে তেমনি ব'য়ে যায় দক্ষিণ-পূর্ব অতি শীতল বায়ু। এই সব

বায়ুপ্রবাহগুলি সারা বছরই মোটামুটি একই রকম ভাবে বয়ে যায় ব'লে এদের "নিয়তবায়ু" বলা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে বায়ুপ্রবাহের ধারা এত সরল নয়, বরং যথেষ্ট জটিল। সূর্য্যের উত্তর এবং দক্ষিণায়নের গতির সঙ্গে এবং বিভিন্ন অক্ষাংশে জল ও স্থল ভাগের পরিমাণের সঙ্গে এ সকল বায়ু প্রবাহের দিক এবং গতিবেগ অনেকটা বদলে যায়। তবে সর্বদাই উচ্চচাপ থেকে বাতাস নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়।

অনেক জায়গায় সময় অনুসারেও বায়ুর পরিচলনের পরিবর্তন হয়। জলের এবং স্থলের তাপমাত্রা সমান নয়। তার ফলে দিনের বেলা স্থলভাগ জলের চেয়ে বেশী গরম হয়। স্থলের বায়ু উপরে উঠতে থাকে, এবং সে জায়গায় সমুদ্রের ওপর থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাস আসতে থাকে। এটা সমুদ্রবায়ু। আবার রাত্রিতে স্থলভাগ সমুদ্রের চেয়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হ'য়ে যায় এবং এ সময় সমুদ্র বেশী গরম বলে স্থলের বাতাস সেই দিকে বইতে থাকে, এটা স্থলবায়ু। সমুদ্রবায়ু বা স্থলবায়ু এরা হচ্ছে "সাময়িক বায়ুপ্রবাহ"। সাময়িক বায়ুপ্রবাহর মধ্যে মৌসুমী বায়ুর বিষয় প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। আরবী শব্দ "মৌসিম" এর মানে হচ্ছে ঋতু। বিভিন্ন ঋতুতে যে বিশেষ বায়ুর প্রবাহ হয় তাকেই মৌসুমী বায়ু বলে। পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মৌসুমীবায়ুর প্রাধান্য দেখতে পাই। নিরক্ষরেখা আর কর্কট ক্রান্তির মাঝখানে স্থল ভাগ বেশী, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন প্রভৃতি এখানে। আমাদের গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে তখন স্থলের উপরের বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায় এবং নীচে চাপ কমে যায়। এ সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল, সেখানকার বাতাস বেশ শীতল এবং বায়ুচাপ বেশী। তাছাড়া নিরক্ষরেখার দক্ষিণে জলভাগ বেশী। সুতরাং এই শীতল সামুদ্রিক আর্দ্র বাতাস স্থলের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ভারত মহাসাগরের উপরের বায়ুপ্রবাহ ফেরেল সূত্র অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে বইতে সুরু করে। কিন্তু নিরক্ষরেখা পেরিয়েই সেটা ডান দিকে মোড় নেয়। সুতরাং ভারত, পাকিস্তান বা ব্রহ্মদেশে সেই সামুদ্রিক বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসে। একেই আমরা বলি দঃ-পঃ মৌসুমী। জলের ওপর থেকে আসার জন্যে এ বায়ুতে বাষ্প থাকে প্রচুর। পশ্চিমঘাট, হিমালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ের গায়ে এসে শীতল হ'য়ে এই বাতাস যথেষ্ট বৃষ্টিপাত করে (চিত্র ২৫ এবং ২৬)। আমাদের শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণায়নে, দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুচাপ যায় কমে। তখন এশিয়ার স্থলভাগ থেকে উত্তরের ঠান্ডা বাতাস সেই দিকে বইতে সুরু করে। ফেরেলের নিয়মে এই বায়ু উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আসবে। এটাই উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী। স্থলভাগের বায়ু-প্রবাহ, তাই এতে বাষ্প কম। ভারতে এর জন্যে কোন বৃষ্টি হয় না। খানিকটা বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যাবার সময় বাষ্প টেনে নিয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে অবশ্য বারিপাত করে। সেই জন্যে ঐসব অঞ্চলে শীতেও বৃষ্টি হয়। এই উঃ-পূঃ মৌসুমী নিরক্ষরেখা পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে যায়, তখন এটা উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীতে পরিণত হয়। এর ফলে অষ্ট্রেলিয়াতে বৃষ্টিপাত ঘটে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উপরের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্যও নানা জায়গায় স্থানীয় বায়ু-প্রবাহ দেখা যায়। যেমন, গ্রীষ্মকালে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা খুব বেড়ে

যায়, তখন সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর গরম হাওয়া দিনের বেলায় বইতে থাকে—এ হাওয়াকে আমরা বলি "লু"। চৈত্র-বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গে বিকেলের দিকে প্রায়ই উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝড়ো-হাওয়া ব'য়ে যায়। অনেক সময়েই এর সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি থাকে। এরই নাম কালবৈশাখী বা Nor'wester। সাহারা মরুর উপর থেকে মিশরের দিকে খুব গরম ও শুকনো বাতাস বয়ে আসে, এর নাম "খামসিম"। খামসিমে থাকা খুব কষ্টকর আর শস্যও এতে নষ্ট হ'য়ে যায়। সাহারার খানিকটা বায়ুস্রোত ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইতালীর দক্ষিণেও যায়, সেটা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ এবং কিঞ্চিৎ আর্দ্র। এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় "সিরক্কো"। শীতকালে সাহারার এই বায়ুস্রোত প্রচুর বালুকণা নিয়ে গিয়ে উপকূলের দিকেও ব'য়ে যায়—তার নাম "হার্মাটান"। হার্মাটানে অনেক সময় গাছপালা শুকিয়ে যায়।

আল্পস্ পর্ব্বতের গা বেয়ে উত্তর দিকে সুইজারল্যান্ডে এক শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ চলে, তার নাম "ফন"। তেমনি আমেরিকায় রকি পর্ব্বতের উপর থেকে শুষ্ক "চিনুক" বায়ুপ্রবাহ কানাডার দিকে প্রবাহিত হয়। আল্পস্ থেকে যে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আড্রিয়াটিক সাগরের দিকে আসে তাকে বলা হয় "বোরা"। ওরকম ঠাণ্ডা হাওয়া উত্তরের রোন উপত্যকা অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূলে বয়ে আসে, নাম "মিস্ট্রাল"। এমনি নানা দেশে নানা রকম বায়ুপ্রবাহের সন্ধান মেলে। সীমাবদ্ধ এলাকার ভিতরে ব'য়ে যায়, তাই এদের "স্থানীয় বায়ু" বলে ধরা হয়।

বায়ুপ্রবাহের জন্য অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের অবস্থা বদলে যায়। বায়ু অনেক সময় প্রচুর বালুরাশি ব'য়ে নিয়ে এসে মরুভূমির সৃষ্টি করে; ভারতের থর মরু এমনি করে উত্তর-পূর্ব্বে ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। চীনে গোবি মরুর হলুদ বালু বাতাসের সঙ্গে গিয়ে "লোয়েস" মাটি তৈরী করেছে। আবার কখনও বালুকণাগুলো কঠিন শিলার সঙ্গে সংঘর্ষে এসে শিলাগুলোকে ক্ষয় ক'রে দেয়। সমুদ্রতটে এবং মরুপ্রান্তে যে প্রচুর বালি জ'মে বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়, তাও বায়ু-প্রবাহের জন্যেই।

এসকল বায়ুপ্রবাহ পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি। ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যেই অনেকটা উচুঁতে অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের একটু নীচে এক অপ্রশস্ত বায়ুস্রোত অনেক সময় অতি তীব্রবেগে বয়ে যায়। এসব বায়ুস্রোত সাধারণতঃ পশ্চিম দিক থেকে পূবের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছোটে। এদের বলা হয় "জেটস্ট্রীম" (jet stream)। এদের বিরুদ্ধে দ্রুতগামী উড়োজাহাজও এগুতে পারে না। এরা অনেকসময়েই ঘণ্টায় চার-পাঁচ শত কিলোমিটার গতিতে প্রবাহিত হয়, বিশেষ করে 30-35° অক্ষাংশের খাড়া উপরে এদের প্রাবল্য বেশী।

শীতকালে জেটস্ট্রীমের গতিবেগ অনেক বেশী থাকে এবং প্রায় কর্কট-ক্রান্তির বরাবর উপরে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই জেট-প্রবাহ চলে সুমেরু বৃত্তের সন্নিকটে। সারাবছর ধরে এই জেটস্ট্রীম ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরস্তরে সাপের মতো একেঁ বেঁকে পৃথিবীর চারদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, কখনও এই প্রবাহ মেরু-অঞ্চলের খানিকটা শীতল বায়ুকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে টেনে আনে, আবার কখনও নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণতর বায়ুকে মেরু-প্রদেশের উপরের শীতল মণ্ডলে পাঠিয়ে দেয়। এই জন্যই অনেক সময়, বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর মধ্যে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বৈষম্য দেখা দেয়।

দক্ষিণ গোলার্ধেও এমনি একটা জেটস্ট্রীম রয়েছে। তবে জেটস্ট্রীম সর্বদাই অনেক অনেক উঁচুতে প্রবহমান। জেটস্ট্রীম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। ওদের খামখেয়ালী গতিবিধিগুলো জানা গেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার অনেক সুবিধা হবে এবং বৈজ্ঞানিকদের খুব উপকার হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, পরিচলন ক্রিয়ার ফলে ঘূর্ণবাত আর প্রতীপ ঘূর্ণবাত এই দুইয়ের বৈপরীত্যে উচ্চস্তরে জেটস্ট্রীম জন্ম নেয়। আবার অনেকের ধারণা, মেরু থেকে আসা শীতল বায়ুস্রোত ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণবায়ুস্রোতের মিলিত হওয়ার সময় এই রকম জেটষ্ট্রীমের উদ্ভব হয়। জেটস্ট্রীমের সব তথ্য এখনও জানা যায় নি। আশা করা যাচ্ছে, এটা একদিন আমাদের কাজে লাগবে। জেটষ্ট্রীমে বিমান চলাচল করাতে পারলে গতি অনেক বাড়বে এবং জ্বালানি কম খরচ হবে। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাসও আরও সঠিক ভাবে করা যাবে।

বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যে গতিশক্তি বিধৃত রয়েছে, তার পরিমাণ প্রচুর। একটা বড় রকমের ঝড়ো হাওয়া যখন কয়েক শত মাইল প্রবাহিত হ'য়ে যায়, তার শক্তির পরিমাণ অনেকগুলো পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের শক্তির চেয়েও বেশী। এই শক্তি অবশ্যই সূর্য্যের কাছ থেকে পাওয়া। সারা পৃথিবীতে আজ যখন শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তখন এই মারুত শক্তির খানিকটা কাজে লাগাতে পারলে সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব। কয়লা, কাঠ, তেল, পুড়িয়ে শক্তির উৎপাদন এখন পর্য্যাপ্ত নয়, আর তার ব্যয়ও অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এককালে এই বাতাসের শক্তি ব্যবহার ক'রেই ত' পাল-তোলা নৌকো নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া হ'ত। কোথাও কোথাও জল তুলতে বা গম-পেষাইয়ের কাজেও wind-mill বা বাত-চক্র ব্যবহৃত হ'ত। আজ অভাবে পড়ে আবার সেই মারুত শক্তির সন্ধান হচ্ছে। আমাদের দেশে বছরের অধিকাংশ সময়েই ত' জোর হাওয়া বেশ বেগে বইতে থাকে। এর শক্তিকে ব্যবহার-উপযোগী করার চেষ্টা চলছে। কোনো কোনো দেশে আজকাল খুব উঁচু স্টীলের পাইলনের উপর ২।৩টি ব্লেড-যুক্ত বিরাট পাখা বসান হয়; বায়ু-প্রবাহে সেই পাখা দ্রুত ঘুরতে থাকে। এই বাত-চক্রের সঙ্গে ডায়নামো বসিয়ে তার সাহায্যে শক্তিটুকুকে বিদ্যুতে পরিণত ক'রে নেওয়া হয়। বলা সহজ বটে, তবে কাজটি এত সহজ নয়। দিনের নানা প্রহরে বা বছরের নানা সময়ে বায়ুর গতিবেগ সমান থাকে না। কখনও পাখা হয়ত একেবারেই চলবে না। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন শক্তি-উৎপাদন হবে না। তা ছাড়া, বায়ুপ্রবাহের গতির দিকও প্রায়ই পরিবর্তিত হ'চ্ছে। আবার বায়ু অত্যন্ত হালকা, তাই বাতচক্র আলোড়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বায়ুর দরকার হয়; এই জন্য উঁচুতে বিশালাকার পাখা দরকার। সেটাকে তৈরী করা এবং স্থিরভাবে রাখা বেশ সুকঠিন ও ব্যয়সাধ্য। তবু আমাদের মত গরীব দেশে যদি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাতচক্রের সাহায্যে জলতোলা বা ছোট কল চালানো বা ব্যাটারী চার্জ করাও যায় তবে অনেকটা আর্থিক সুবিধা হবে। এ প্রচেষ্টা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়

বায়ুমণ্ডলে জলের পরিমাণ খুব সামান্য নয়, আয়তনের হিসাবে গড়ে বায়ুর শতকরা একভাগেরও বেশী হবে। তবে বিভিন্ন জায়গায় এর পরিমাণ এক নয়।

স্থান, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উষ্ণতা এ সবের উপর বাতাসে জলের পরিমাণ অবশ্যই নির্ভর করে। রাজপুতানার বাতাস যখন প্রায় একেবারে শুষ্ক ও অনার্দ্র, আসামের পাহাড়ের বাতাস তখন খুবই জলসিক্ত। মোটামুটি একটা হিসেব থেকে দেখা গেছে, সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মোট জলের পরিমাণ 0·13 Gg বা 13×10^{15} কিলোগ্রাম (1000 কোটি টনেরও উপরে)।

বাতাসে এই জল আসে সাগর-মহাসাগর, নদী, নালা, হ্রদ, জলাশয়, ভূপৃষ্ঠে যেখানেই জল রয়েছে সেখান থেকে—বাষ্পীভবনের ফলে। ভূতলের প্রায় শতকরা সত্তর ভাগই সাগর আর মহাসাগর। এই বিপুল বারিধি থেকেই বাষ্পীভবন হয় সবচেয়ে বেশী। একথাও সবার জানা, উষ্ণতা যত বেশী হয়, বাষ্পীভবনের কাজটাও হয় তত বেশী। নিরক্ষ-অঞ্চলের সাগর থেকেই তাই বাষ্প আসে সর্ব্বাধিক।

কিন্তু বাতাস যে কোন পরিমাণ বাষ্প ধ'রে রাখতে পারে না, তার একটা সীমা আছে। নির্দিষ্ট কোন উষ্ণতায় বাতাসে যে সর্ব্বাধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে সেটা নির্দিষ্ট। তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণটা বেড়ে যায়। এই সর্ব্বাধিক পরিমাণ বাষ্প যখন থাকে তখন বাতাস জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত। বেশী বাষ্প থাকলে, বাতাসকে সম্পৃক্ত ক'রে অতিরিক্ত বাষ্পটুকু ঘনীভূত হ'য়ে জলবিন্দুতে পরিণতি লাভ করে। মনে কর, সম্পৃক্ত হওয়া কোন বাতাসের তাপমাত্রা কোন কারণে কমে গেল। সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এই ঠাণ্ডা বাতাসের বাষ্পের প্রয়োজন আগের চেয়ে এখন কম। সুতরাং বাতাসে যে বাষ্প ছিল এখন সেটা ওর সম্পৃক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশী। এই অতিরিক্ত বাষ্প তখন জলকণাতে পরিণত হবে। এভাবেই শিশিরের জন্ম। দিনে তাপমাত্রা থাকে বেশী। যে পরিমাণ বাষ্প থাকে তাতে হয়ত বাতাস সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু রাতে উষ্ণতা যথেষ্ট নেমে যায়, তখন সেই বাষ্পটুকুই বাতাসকে সম্পৃক্ত ক'রেও বাড়তি হ'য়ে পড়ে। ঘনীভবনের ফলে এই বাড়তি বাষ্প তখন জলের ফোঁটার আকারে ঘাসের পাতায় বা উন্মুক্ত শীতল জিনিষের উপরে শিশির হ'য়ে জমে। ধীর বায়ুপ্রবাহে মেঘমুক্ত আকাশের নীচেই শিশির সহজে পড়ে।

কেটলীর ফুটন্ত জল থেকে অস্বচ্ছ মেঘের মতো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখি, সেটাও কিন্তু বাষ্প থেকে ঘনীভূত খুব ছোট ছোট জলকণা। যে প্রচুর বাষ্প কেটলীর মুখ থেকে বেরোয় তা সেখানকার বাতাসের সম্পৃক্তির প্রয়োজনের চেয়ে অধিক, তাই খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হ'য়ে যায়।

বাতাস যদি অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, তাহ'লে রাত্রিতে ঠাণ্ডা জমির সংস্পর্শে এসে নীচেকার বায়ুস্তর শীতল হ'য়ে পড়ে। সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বাতাসের বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে প্রচুর সূক্ষ্ম জলকণার সৃষ্টি করে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এই জলকণাগুলি বাতাসেই ভাসে—একে বলে কুয়াশা। ফলে বাতাসের স্বচ্ছতা কমে যায়, অনেক সময় কাছের জিনিসও দেখা যায় না। তাপমাত্রা বাড়লে, বা রৌদ্র কিরণে, জলবিন্দুগুলি উড়ে যায় বাষ্প হ'য়ে, আর কুয়াশা লোপ পায়। এ রকম কুয়াশা কয়েক মিটার পুরু হয়।

আবার কখন কখনও গরম আর্দ্র বাতাস যদি ঠাণ্ডা সমুদ্র বা মাটির উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, তখনও সম্পৃক্তির ফলে বাতাসের নিম্নস্তরের বাষ্প ঘনীভূত হ'তে থাকে।

ফলে এখানেও কুয়াশার সৃষ্টি হয়। তবে এসব কুয়াশা যোজনব্যাপী হয় এবং উপরের দিকে কয়েকশত মিটার পর্য্যন্ত থাকে। খুব সহজে এই কুয়াশা দূর হয় না। সমুদ্রের শীতল জলপ্রবাহের উপরে এরকম কুয়াশা বেশী দেখা যায়। একে বলে "অ্যাডভেক্সন ফগ্"।

বাতাসে কতটা বাষ্প আছে সেটা নানারকমের আর্দ্রতামান-যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার দিয়ে সহজেই জানা যায়। প্রতিদিনের কাগজে বিভিন্ন জায়গার বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা দেওয়া থাকে। যেমন, আজকের কাগজে কলকাতার বাতাসের আর্দ্রতা 71%। অর্থাৎ, যে পরিমাণ বাষ্প থাকলে বাতাস সম্পৃক্ত হ'তে পারত, তার শতকরা 71 ভাগ মাত্র রয়েছে।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়

বায়ুমন্ডলের জল সবটাই যে বাষ্পাকারে রয়েছে তা নয়, যদিও অধিকাংশই তাই। খানিকটা বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সূক্ষ্ম জলকণা ও তুষার-কণা হয়ে থাকে।

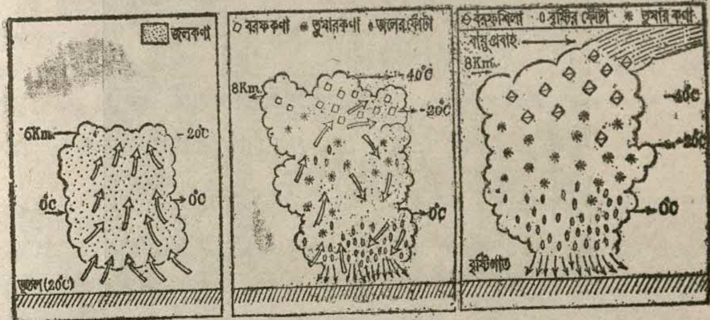
বাতাসে যদি যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকে আর কোন উপায়ে যদি সেই বাতাস ঠাণ্ডা হ'য়ে পড়ে তবে বাষ্প খানিকটা ঘনীভূত হবে। বাষ্পের ভেতরেই তখন প্রচুর জলকণা এবং অতিরিক্ত শীতল হ'লে এমনকি ছোট্ট ছোট্ট তুষারকণাও তৈরী হবে। এই কণাগুলো এত ছোট আর হাল্কা যে সেগুলো বাষ্পের মধ্যেই ভেসে থাকে, থিতিয়ে মাটিতে পড়ে যায় না। জলকণাগুলোর ব্যাস 0·01 মিলিমিটার বা তার চেয়েও কম। এমনি জলকণা, বরফকণা-ভরা বাষ্প যখন বায়ুমন্ডলে কোথাও পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে আমরা বলি মেঘ। ছোট কণা থাকে অসংখ্য, তাই বাতাস সেখানটায় অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, সেই জন্যেই মেঘকে আমরা দেখতে পাই।

দেখা যাচ্ছে, মেঘ-সৃষ্টির জন্য বাতাসকে শীতল হ'তে হবে, বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'তে হবে। প্রশ্ন উঠবে বাতাস কি করে ঠাণ্ডা হবে। যে সব মেঘ আমরা সর্ব্বদা আকাশে দেখতে পাই, সেগুলো সবই পৃথিবীর কাছের ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যেই। ভূতল থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে চাপ এবং তাপমাত্রা দুটোই কমতে থাকে। বাতাস ঠান্ডা হয় নীচ থেকে উপরে উঠে গিয়ে। তিনটি কারণে বাতাসের ঊর্ধ্বগতি হ'য়ে থাকে। প্রধানতঃ, ভূপৃষ্ঠ যখন তেতে যায় তখন তার কাছের বাতাসও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। তখন এই গরম বাতাস খাড়া উপরের দিকে উঠতে থাকে। চারদিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম গরম এবং ভারী বাতাস সেখানে চলে আসে, আবার সেটাও গরম হ'য়ে উপরের উঠতে থাকে। এমনি ক'রে উপরের দিকে বাতাসের একটা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উপরে চাপ কম, তাই এই ঊর্ধ্বগতি বাতাস উঁচুতে গিয়ে প্রসারিত হতে থাকে। প্রসারণের ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বাতাস অনেকটা শীতল হ'য়ে পড়ে, তাছাড়া উপরের তাপমাত্রাও কম। প্রতি কিলোমিটার উঠলে গড়ে তাপমাত্রা 10°C নেমে যায়। উষ্ণতা যথেষ্ট ক'মে গেলে, বাতাস বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'য়ে পড়ে আর জলবিন্দুর সৃষ্টি হ'তে থাকে।

অনেক সময় বাতাস জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে গিয়ে কোন পাহাড়-পর্ব্বতে ধাক্কা খায় বা অন্য বাধার সম্মুখীন হয়। তখন বাধ্য হ'য়েই সেই বায়ু-প্রবাহ উপরের

দিকে উঠতে থাকে, ফলে তাপমাত্রা কমে এবং বাষ্প ঘনীভূত হ'তে শুরু করে। এই কারণেই প্রায়ই উপত্যকায় বা পর্বতের সানুদেশে বৃষ্টিপাত দেখতে পাই।

এ ছাড়াও, দু'টি বিভিন্ন উষ্ণতার বায়ুপ্রবাহ যদি এসে পরস্পরের সম্মুখীন হয় তা হ'লে যে প্রবাহটি উষ্ণতর সেটি শীতল প্রবাহের উপরে উঠে যায়। তখন উষ্ণ প্রবাহের নীচের দিকের অংশে ঘনীভবন আরম্ভ হয়। এ থেকে প্রায়ই কুয়াশা বা মেঘ অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সঞ্জাত হয়।

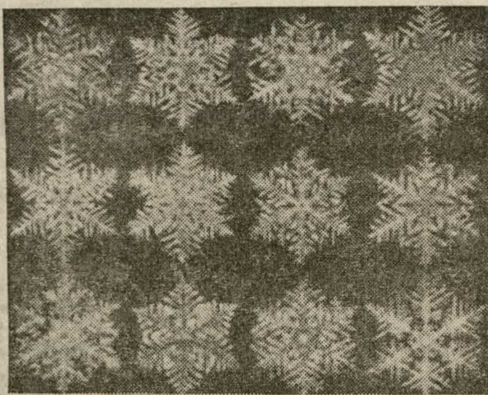


চিত্র ২৭। মেঘ থেকে বৃষ্টি

বাতাস ঠান্ডা হ'য়ে বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'লেই তৎক্ষণাৎ জলকণা তৈরী হয় না। এর জন্যে আরও একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। ঘনীভবনের জন্য কঠিন কণাগুলো ঘনীভবনের কেন্দ্ররূপে কাজ করে। আগেই বলেছি, বাতাসে রয়েছে অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা। এই কণাগুলোর উপর এসে বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং জলকণায় পরিণত হয়। যদি বাতাস ধূলিকণামুক্ত হ'ত তবে তাপমাত্রা অনেক নেমে গেলেও কিন্তু বাষ্পের ঘনীভবন হ'ত না। শুধু ধূলিকণা নয়। সাগর থেকে জল উড়ে যাওয়ার সময় খানিকটা সূক্ষ্ম লবণকণাও বাতাসের উপরের স্তরে গিয়ে হাজির হয়। তাছাড়া নানা কলকারখানা থেকে যে গ্যাস আসে, তার ফলে বাতাসের সালফিউরিক অ্যাসিডের বিন্দুও কিছু থাকে। এ সবই বাষ্পের ঘনীভবনের কেন্দ্র হ'য়ে থাকে। এদের উপরেই জলকণা গড়ে ওঠে।

জলকণাগুলো আবার যদি খুব ঠান্ডা হ'য়ে যায় তবে বরফের কণা তৈরী করতে পারে। সাধারণ অবাস্থয় সবাই জানে যে 0°C তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। কিন্তু জল যখন খুব ছোট্ট ছোট বিন্দু হ'য়ে থাকে তখন 0°C কেন, তার অনেক নীচে গেলেও সহজে জমতে চায় না। শুধু তাই নয়। তুষার-কণা হ'তে হ'লেও জমে যাবার জন্যে কঠিন কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। সব কঠিন ধূলিকণাই তুষার তৈরীর কেন্দ্র হয় না, কতকগুলো হ'তে পারে। খুব সামান্য বরফের ছোট্ট কণা কোনরকমে একবার তৈরী হ'য়ে গেলে জল তার ওপর সহজেই স্ফটিকাকারে জমতে পারে। সাধারণতঃ −20°C তাপমাত্রায় তুষারকণার সৃষ্টি হয়। আর তাপমাত্রা যদি −40°C-এ নেমে যায় তাহ'লে জলবিন্দুগুলির প্রায় সমস্তটাই বরফের কণা হ'য়ে পড়ে। ট্রোপোস্ফিয়ারের

উপরের অংশে যে মেঘ থাকে তাতে ভাসমান তুষার-কণাই থাকে, সেখানকার তাপমাত্রা খুবই কম। এই তুষারের ছোট স্ফটিকগুলো নানা বিচিত্র রূপ নিয়ে তৈরী হয়। তার কয়েকটি মাত্র ২৮ নং ছবিতে দেখান হ'ল। সবগুলোতেই ছ'টি কোণ রয়েছে।



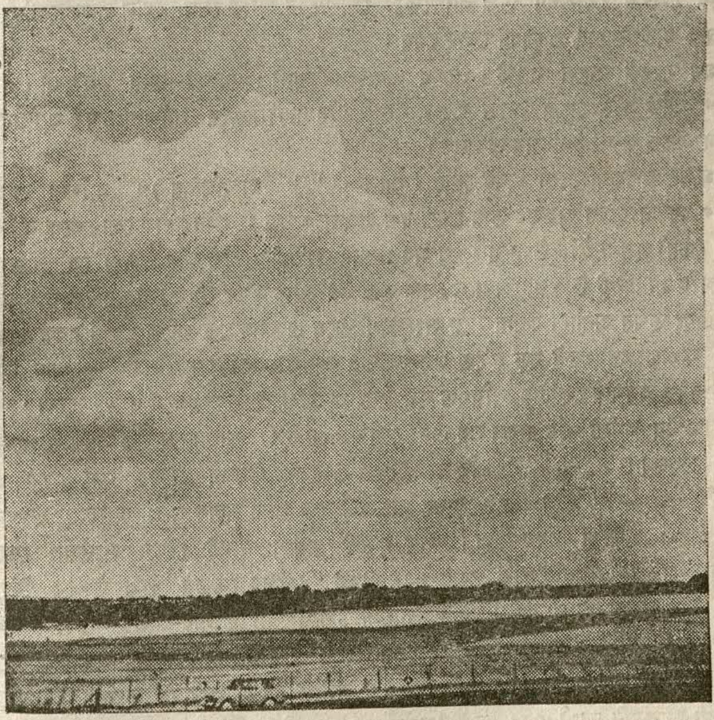
চিত্র ২৮। তুষারকণার বিভিন্ন রূপ

এ-ত' হ'ল মেঘের জন্মকথা। মাথার উপরের আকাশকে রূপে বর্ণে অতুল বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে এই মেঘ। যদি আকাশে মেঘ না থাকত সারাক্ষণ আকাশ একমাত্র অসীম নীল হ'য়ে থাকত, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হ'ত সমস্ত পরিবেশ। কতরকম সাজ নিয়ে আকাশে মেঘের আবির্ভাব—কখনও 'শুভ্র সমুজ্জল', কখনও ধূসর পাংশুল, কখনও স্বর্ণ কিরীট মাথায়, কখনও ভীষণ 'কুটিল কৃষ্ণকালো'। কখনও সে সারা আকাশ জুড়ে আছে, কখনও এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে রয়েছে। কখনও দিগন্তে সব বিরাট ঐরাবত শিশুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আবার কখনও ফুলের ছোট ছোট স্তবকের মতো ঘন নীলিমার বুকে ছড়ানো। মেঘ কখনও নিস্পন্দ নিথর, কখনও ভেসে যায় 'পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে দলে দলে,' আবার কখনও মত্ত বেগে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মত উদ্দাম হয়ে ছোটে। এমন কোন দেশ নেই, যার কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এই মেঘের রূপ দেখে তার বন্দনা করেননি। 'দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর' দেখে কবি রচনা করেছেন অমর কাব্য। রামগিরির নবীন মেঘকে অভিশপ্ত বিরহ-ব্যথাতুর যক্ষ তার অন্তরের অরুন্তুদ মর্মবেদনার কথা সুদূর অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিতে কত আকুতি জানিয়েছিল—মহাকবির সেই বিরহ-গাথা চিরকালের জন্যে অক্ষয় অমর হ'য়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানীর মনে কল্পনা-বিলাস নেই—তাঁরা দেখেন মেঘকে অন্য দৃষ্টিতে। তাঁরা বলেন, মেঘগুলো প্রধানতঃ চার রকমের। সবচেয়ে উপরে যে মেঘ থাকে তাকে বলা হয় "অলক মেঘ" (Cirrus Cloud)। হাল্‌কা সাদা মেঘ আকাশের খুব উপরে প্রায় 20000 ফিট বা তারও বেশী উঁচুতে ভেসে থাকে। এ মেঘ থেকে বৃষ্টি বড়

হয় না। পেঁজা তুলোর মতো বা পাটের আঁশের মতো নীল আকাশে ভেসে থাকে। অলক মেঘ অজস্র তুষারকণা দিয়ে তৈরী, জলকণা বিশেষ নেই। আমাদের দেশে শরতের আকাশে এ মেঘ দেখা দেয়। এ মেঘ শান্ত সুন্দর আবহাওয়ার নির্দ্দেশ দেয়।

প্রচুর জলবাষ্প নিয়ে খুব গরম হাওয়া যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন উপরে গিয়ে শীতল হ'লে সেখানে মেঘের সব ঢিপি তৈরী হয়। বড় বড় তুলোর বস্তা বা ছোট ছোট পাহাড়ের মতো আকাশের জায়গায় জায়গায় এই মেঘ পুঞ্জীভূত হয়। একে বলে "স্তূপ মেঘ" (Cumulus Cloud)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এ রকম মেঘ বেশী দেখা যায়। স্তূপ মেঘ থেকে বেশ বৃষ্টি হয়। এ মেঘ থাকে 6000 ফিটেরও উপরে। স্তূপ মেঘে প্রধানতঃ জলকণা থাকে। কখনও কখনও স্তূপমেঘের চুড়ো গিয়ে অলকমেঘের তলার সঙ্গে মিশে যায়, শীতল হওয়ার জন্যে সেই মেঘে যথেষ্ট তুষারকণাও দেখা যায়; একে তখন বলা হয় অলক-স্তূপ মেঘ (Cirro-cumulus)।



চিত্র ২৯ ক। অলক-স্তূপ মেঘ

কখনও হঠাৎ ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহে স্তূপ মেঘে অপরিমিত জলকণা সঞ্চিত হ'য়ে যেতে পারে। তখন স্তূপ মেঘ এক গভীর কালো ভারী মেঘে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এটা "জলদ মেঘ" (Nimbus)। এই জলদ-স্তূপ মেঘ থেকে খুব প্রবল বর্ষণ হয়। অনেক

সময় শিলাবৃষ্টিও হয়। আমাদের দেশে বর্ষার প্রথম দিকে এমনি ধরনের মেঘ প্রায়ই দেখা যায়।

শীতল আর উষ্ণ বাতাসের সংমিশ্রণের ফলে যখন বাষ্পের ঘনীভবন হয়, তখন অনেক জায়গা জুড়ে মেঘ ছড়িয়ে থাকে। একটা ভারী আচ্ছাদনের মতো অনেকটা আকাশ ঢেকে রাখে। এরা "স্তর মেঘ" (Stratus)। স্তর মেঘ সবচেয়ে নীচের মেঘ —এমনকি দেড় দুই হাজার ফিটেও এই মেঘের চাদর হ'তে পারে। স্তর মেঘ থেকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট ফোঁটায় অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হ'তে থাকে। কখনও স্তূপ মেঘ নীচে নেমে এসে স্তর মেঘের সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে যায়—তৈরী হয় স্তূপ-স্তর মেঘ (Cumulo-stratus)। শ্রাবণের বারিধারা এই মেঘ থেকেই। স্তর মেঘ উপরে উঠে কদাচিৎ অলক-স্তূপের সঙ্গে একত্র হ'য়ে একটা প্রায় স্বচ্ছ হালকা ওড়নার মতো ছড়িয়ে থাকে—এটা অলক-স্তর (Cirro-stratus)। এই অলক-স্তর মেঘের জন্যেই মাঝে মাঝে চাঁদ বা সূর্য্যের চারদিকে উজ্জ্বল গোলাকার বৃত্ত দেখা যায়।

স্তর মেঘের বৈশিষ্ট্য তার ব্যাপ্তিতে, সৌন্দর্য্যে অলক মেঘ, মৌন গাম্ভীর্য্যে স্তূপ মেঘ আর শক্তিমত্তার প্রাচুর্য্যে জলদ মেঘ।

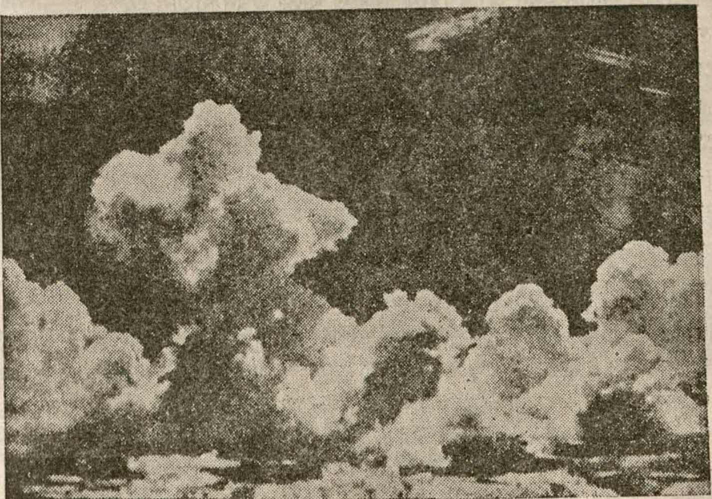
মেঘ থেকে আসে বৃষ্টি। মেঘ বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী ; ত্যাগই তার মর্মকথা। সে বাণী শুনেছি কবিগুরুর উদাত্ত কণ্ঠে, "মেঘ বরিষার/নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার/ সব ধর্ম মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার ভুবনে"।

মেঘের জলকণাগুলো খুবই ছোট (ব্যাস=0·01 মিলিমিটার)। বৃষ্টির জলের সাধারণ ফোঁটাগুলো অন্ততঃ তার চেয়ে দশ লক্ষগুণ বড়। মেঘকণাগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরী হয় দুইটি উপায়ে। যে সব মেঘের তাপমাত্রা খুব নীচু নয়, 0° সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি বা একটু উপরে, সেখানে ছোট্ট জলকণা অতি ধীরে ধীরে নীচের দিকে পড়তে থাকে এবং তখন অন্যান্য কণার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে একত্র হ'তে থাকে। এ রকম একীভবনে কণাগুলো যতই বড় হ'তে থাকে ততই আরও বেশী কণার সঙ্গে ধাক্কা খায়, ফলে শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয় এবং ভূতলে অধঃক্ষিপ্ত হয় বৃষ্টি রূপে। এ রকম মেঘের বৃষ্টি খুব প্রবল নয় এবং ফোঁটাও ছোট। আবার অনেক সময় স্তূপমেঘে নীচের উষ্ণতা 0° C∼−5°C কিন্তু স্তূপের উপরের উষ্ণতা অনেক কম, মনে কর −20°C ∼ −25°C। এই মেঘের নীচের দিকে প্রচুর জলকণা থাকে কিন্তু উপরের অংশে থাকে অসংখ্য বরফ-কণা। সব কণাই প্রথমে খুবই ছোট, সুতরাং ভেসে থাকতে পারে। নীচে থেকে বায়ুপ্রবাহ যেই মেঘের ভেতর দিয়ে উপরে উঠতে থাকে (স্তূপ মেঘে তা থাকেই) জলকণাগুলো উপরে উঠে তুষার-কণার সান্নিধ্যে এসে পড়ে। তুষার কণার বাষ্পচাপ জলকণার চেয়ে কম। এর ফলে জলকণাগুলো উদ্বায়িত হ'য়ে গিয়ে তুষার কণার কেলাসে জমতে সুরু করে। তুষার কণাগুলো হ'য়ে যায় অনেকটা ভারী এবং বড় ; সেগুলো তখন নীচে নামতে থাকে। যতই নীচে আসে সেগুলো আরও জলকণার সংস্পর্শে আসে—সেগুলোও জমে যায়। ক্রমশঃ এমনি করে বেশ বড় বড় বরফের টুকরো হয়। এগুলো যখন পড়তে থাকে, তখন আরও নীচে 0°C-এর উপরের উষ্ণতায় এলে গলতে শুরু করে এবং বড় বড় জলের ফোঁটাতে পরিণত হয়। এই জলই বৃষ্টি হয়ে 'নিদাঘ-তাপে তপ্ত ধরায় তৃপ্তি ধারা' হ'য়ে নেমে

আসে। কখনও কখনও ঠাণ্ডার জন্যে মেঘের উপর তলায় বড় বড় বরফের চাঁই জমে যায়। সেগুলো নামবার পথে সবটা হয়ত গলতে পায় না, তাই কোন কোন সময়,



চিত্র ২৯খ। স্তর মেঘ



চিত্র ২৯গ। স্তূপ মেঘ

বিশেষ ক'রে হঠাৎ খুব গরম দিনের শেষে বরফের ডেলাও এসে ভূতলে পৌঁছয়। আমরা বলি, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

পৃথিবীর উপর বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই বারিধারা। মেঘলোকের এই অকৃপণ বর্ষণ ধরিত্রীকে দিয়েছে তার প্রাণরস, বসুন্ধরা হয়েছে শ্যাম-ছায়া-ঘন সুজলা সুফলা। অরণ্যে, শস্যক্ষেতে, বৃক্ষলতায়, হিল্লোলিত পত্রপল্লবে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে জীবনের উল্লাস। তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"—মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃতরস—তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে অনন্ত-যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।"

বর্ষণ কিন্তু সবজায়গায় একরকম নয়। কোথাও বৃষ্টির বিরাম নেই আবার কোথাও সারা বছরে একদিনও বৃষ্টির দেখা মেলে না। আসামে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই একই অক্ষাংশে রাজস্থান বৃষ্টির অভাবে ধু ধু মরুভূমিতে পরিণত। বারিপাত নির্ভর করে আঞ্চলিক অবস্থান আর নৈসর্গিক অবস্থার উপরে। প্রচুর বাষ্প নিয়ে বাতাস যখন পাহাড়ে ধাক্কা খায়, সানুদেশে বৃষ্টি নামে। বায়ু ক্রমশঃ বাষ্পহীন হ'তে থাকে আর পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠে। শিখর পেরিয়ে গিয়ে বাতাস যখন অপর দিকে নামতে থাকে তখন বাতাস শুষ্ক ও বাষ্পহীন, তাই পাহাড়ের অনুবাত দিকে বৃষ্টি নেই। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে আর্দ্র মৌসুমী বায়ুর কল্যাণে চেরাপুঞ্জীতে যখন চারশ' ইঞ্চি বৃষ্টিপাত, পাহাড়ের উত্তরে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে শিলংয়ে (অনুবাত দিকে) বৃষ্টিপাত মাত্র পঞ্চান্ন ইঞ্চি। মহাসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু এসে হিমালয়ের বুকে ধাক্কা খায়। পর্ব্বতের দক্ষিণে বাংলা-আসাম অঞ্চলে তাই বৃষ্টি নামে। কিন্তু পর্ব্বতের উত্তর দিকে তিব্বত মালভূমিতে নেই কোন বৃষ্টি। তেমনি আরব সাগরের বায়ু এসে পশ্চিম ঘাটের মালাবার উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টি দেয়। কিন্ত পাহাড় পেরিয়ে যখন সেই বায়ু দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়ে যায়, হায়দ্রাবাদ অঞ্চল তখন অতি সামান্যই বৃষ্টি পায়।

বর্ষণের পরিমাণ আমরা জানতে পারি নানারকম বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে। কোন অঞ্চলের বারিপাত ইঞ্চিতে বা মিলিমিটারে মাপা হয়। সমস্তটা বৃষ্টি যদি সেই অঞ্চলে একত্র জমা করা যেত, জমিতে যদি শোষণ না হ'ত বা বাষ্প হয়ে উড়ে না যেত কিংবা নদী নালায় চলে না যেত, তা হ'লে সেই জলের উচ্চতা যা হ'ত সেটাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

বৃষ্টির সময় একটি নির্দিষ্ট আকারের বোতলে একটা ফানেলের সাহায্যে জল সংগ্রহ করা হয়। বিজ্ঞানীরা সেই জলের পরিমাপ ক'রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এই যন্ত্রকে বলা হয় রেন-গেজ (Rain gauze), বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্র।

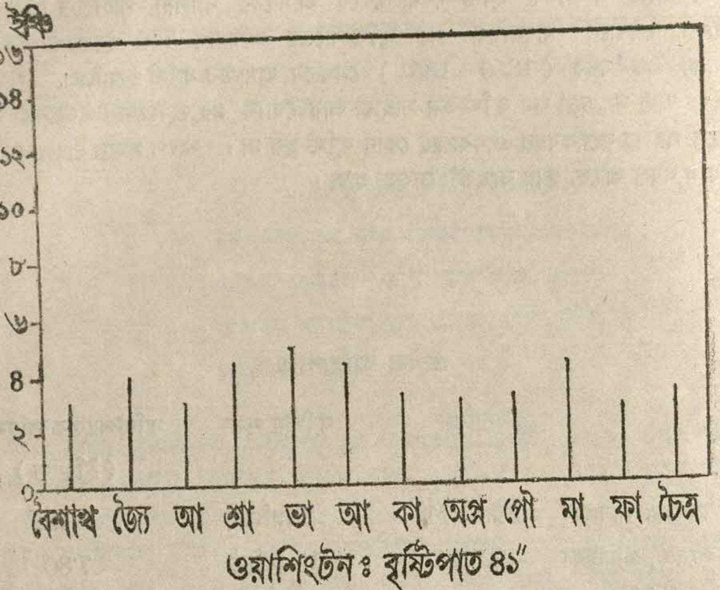
পৃথিবীর সর্ব্বাধিক বৃষ্টি দেখা গেছে আসামের খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে। সেখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 500 ইঞ্চিরও উপরে। এমনকি, এক বছর (1860–1861) সেখানে অসম্ভব বৃষ্টি হয়েছিল, 1041·8 ইঞ্চি। আর সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয় সাহারা আর গোবি মরুভূমিতে। অনেক সময় সেখানে পরপর কয়েকবছর একেবারেই কোন বৃষ্টি হয় না। স্বল্প সময়ে প্রবল বর্ষণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তার কয়েকটা দেওয়া হ'ল।

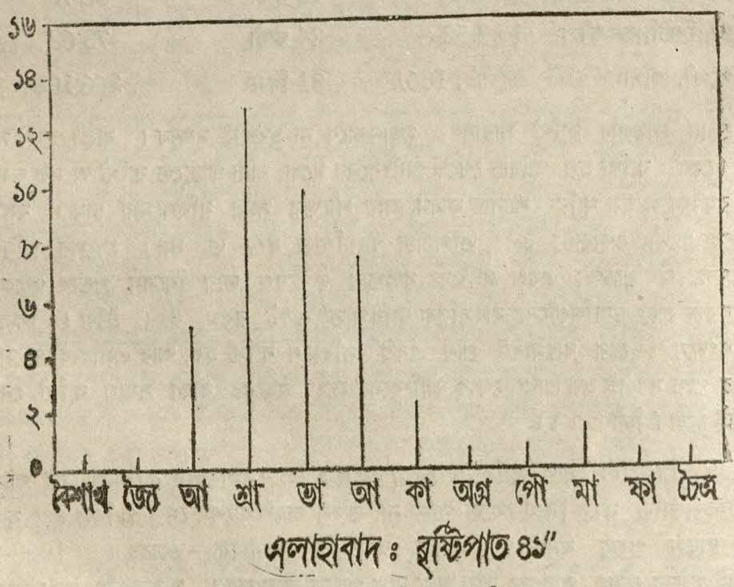
প্রবল বারিপাত

স্থান	তারিখ	বৃষ্টির সময়	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (ইঞ্চিতে)
পোর্টোবেলো, পানামা	29.11.11	5 মিনিট	2·48
প্লাম্ব পয়েণ্ট, জামাইকা	12.5.16	15 মিনিট	7·80
বেলোভে, রিউনিয়ন দ্বীপ	28.2.64	12 ঘণ্টা	52·76
সিলাও, রিউনিয়ন দ্বীপ	15.3.52	24 ঘণ্টা	73·62
চেরাপুঞ্জী, আসাম	জুলাই, 1861	31 দিন	366·10

কোন জায়গার বৃষ্টি সারাবছর সমানভাবে না হওয়াই সম্ভব। বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় আষাঢ় থেকে আশ্বিনের মধ্যে, অন্য ঋতুতে বৃষ্টি অনেক কম। তাই বর্ষাকালে হয় খারিফ শস্যের ফলন, আর শীতের সময় রবিশস্যের চাষ। বর্ষণ যে শুধু স্থানীয় জলবায়ু এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়। দেশের কৃষিজ উৎপাদন, কর্মপ্রচেষ্টা এবং আর্থিক ব্যবস্থার উপরেও তার বিশেষ প্রভাব থাকে। এলাহাবাদ আর ওয়াশিংটনের বাৎসরিক বারিপাত একই রকম, 41.0 ইঞ্চি। কিন্তু ওয়াশিংটনে বছরের বারমাসই প্রায় একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়, আর এলাহাবাদে সেই বৃষ্টির প্রায় সবটাই হয় শ্রাবণ থেকে আশ্বিনের মধ্যে, বছরের বাকী সময়ে বৃষ্টি নেই বললেই চলে (চিত্র ৩০)।

বেশ কিছুদিন ধরে অবিশ্রাম প্রবল বর্ষণ হ'লে, সেখানকার নদীনালা সেই প্রচুর জল তাড়াতাড়ি ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে না, তখন আশেপাশের দেশ প্লাবিত হয়ে যায় নেমে আসে প্রবল বন্যা। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অসামান্য—ভয়াবহ। 1968-র জলপাইগুড়ির হঠাৎ প্লাবনের কথা সদ্য মনে পড়বে অনেকের। মুহূর্তের মধ্যে কত মানুষ জীবজন্তু, বাড়ীঘর নিঃশেষ হ'য়ে গেল। 1931 খৃস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যাও হয়েছিল প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত থেকে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত মানবসেবার কথা সেই সূত্রে মনে পড়ে—সেদিন জন্ম নিয়েছিল বাংলার সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি।





চিত্র ৩০। এলাহাবাদ ও ওয়াশিংটনের বারিপাতের তুলনা

আচার্যদেব বাংলার তরুণদের পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। শুধু ভারতে নয়, ইউরোপ আমেরিকাতেও এরকম অনেক বন্যার ইতিহাস আছে। 1951-এ আল্পসের উপর প্রবল বারিপাতের ফলে ইতালীতে এক ভীষণ বন্যা নেমেছিল। সেই বছরেই মিসিসিপির উপত্যকায় প্রচণ্ড বর্ষণের ফলে এক বিরাট প্লাবনে মহাক্ষতি হয়েছিল।

বৃষ্টির সঙ্গে কখনও আবার অন্যান্য জিনিষ পড়তে দেখা যায়। একবার Aix সহরে (1608) রক্তিম বৃষ্টিধারা পড়েছিল। ভয় পেয়ে লোকে মনে করেছিল রুধির-পাত হচ্ছে। সম্ভবতঃ সমুদ্র থেকে বায়ু-প্রবাহে খুব ছোট্ট ছোট্ট লাল শৈবাল-দল উপরে উঠে গিয়েছিল, বৃষ্টির সঙ্গে সেগুলো নেমে এসেছিল। 1903 সালে সাহারার সূক্ষ্ম লাল বালুকণা উড়ে এসে বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণ ইংলণ্ডে বর্ষিত হয়েছিল। খুব ছোট ছোট ব্যাঙাচি বা মাছ অনেক সময় বৃষ্টির সঙ্গে পড়তে দেখা যায়, কারণটা একই।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনেক দেশ আছে, যার বৃষ্টিপাত অনেক কম। মরুসন্নিহিত অঞ্চলেও তাই। অনাবৃষ্টির জন্য এসব দেশে শস্যের ফলন কম। এখানকার বাতাসে বা মেঘে যে জলীয় বাষ্প বা জলকণা আছে সেটা তুষার-কণায় পরিণত না হওয়ার ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোনরকমে যদি সেখানকার মেঘে কৃত্রিম উপায়ে তুষার কণার সৃষ্টি করা যায় তা হ'লে বৃষ্টিপাত হ'তে পারে। আমেরিকান বিজ্ঞানী শেফার (Schaefer, 1946) এটা প্রথম ক'রতে সক্ষম হন। তিনি প্লেনে ক'রে উঠে 14000 ফিট উপরে একটি মেঘের মধ্যে ছয় পাউন্ড "শুকনো-বরফ" (dry ice, solid carbon dioxide) ছড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে এই শুকনো-বরফের উপর জল জমে গিয়ে তুষার-খণ্ডের সৃষ্টি হ'য়ে গেল। এর পরের বছর (Feb 5, 1947) অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর কাছে এক স্তূপ মেঘের অভ্যন্তরে সেই শুকনো বরফের বীজ বপন ক'রে দিলে, কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত অঞ্চল ধরে প্রচুর বারিপাত হ'ল। পরে বৃটেনে ও অন্যান্য দেশেও এরকম কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে। অনাবৃষ্টি হ'লে এমনি ক'রে যদি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করা যায়, নিঃসন্দেহে সেটা আশার ও মঙ্গলের কথা।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের কিছু কুফলও থাকে ; যেমন পারমাণবিক বিভাজনে। এখানেও দেখা যায়, একটি শুকনো-বরফের টুকরো ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার টন তুষারকণা মুহূর্তে তৈরী হ'য়ে যায়। হঠাৎ একটা জলীয় বাষ্প বা জলকণা ঘনীভবনের ফলে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হবেই এবং তাতে স্থানীয় অঞ্চলের বায়ুমন্ডল খুবই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠবে। জলবায়ুর উপর তার প্রভাব অনুকূল নাও হ'তে পারে, তাছাড়া ঝড়-ঝঞ্ঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আর একটা অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও কল্পনা করা যেতে পারে। মৌসুমী বায়ু এসে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত ঘটায়, তা থেকেই আমাদের শস্যসম্পদ। যদি আমাদের কোন শত্রুপক্ষ মৌসুমী বায়ু আমাদের উপকূলে পৌঁছানোর আগেই কৃত্রিম উপায়ে তার

থেকে বৃষ্টিপাত করিয়ে দেয়— তাহ'লে ত সেই বায়ু থেকে আর বৃষ্টি পাওয়া যাবে না! জমি অনুর্ব্বরা হয়ে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে। এটা একটা কল্পনা বটে, তবে এরকম সম্ভাবনা কি নেই?

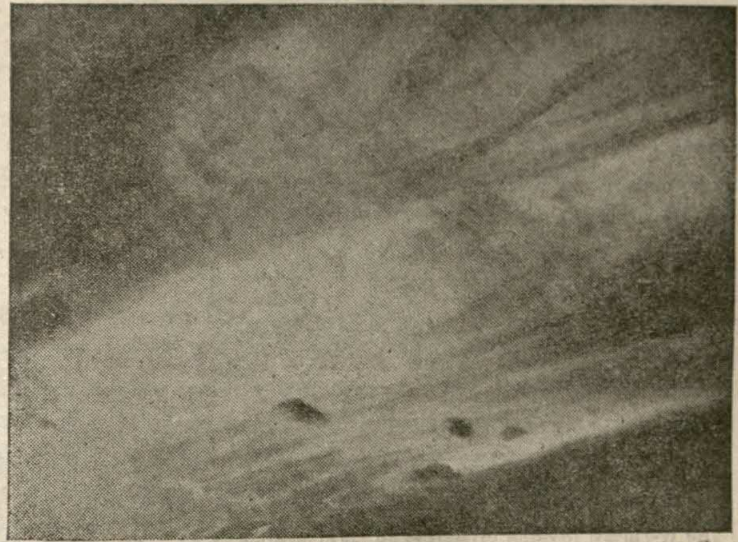
বৃষ্টির পরে বা অনেক সময় মেঘ-ভরা আকাশে রামধনু উঠতে দেখা যায়। সূর্য্যের সাদা আলো যদি একটা কাচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে চলে আসে তাহলে সেই আলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় সাতটা বিভিন্ন রঙে, এটা সকলেই জানেন। সূর্য্যের আলো এই সাতটা রঙের আলোক তরঙ্গের মিশ্রণ, তাই সাদা। কাচের প্রিজমে ঢুকলে বিভিন্ন তরঙ্গের প্রতিসরণ বিভিন্ন থাকার জন্যে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সরে সরে যায়। অর্থাৎ সাদা আলো বিশ্লেষিত হ'য়ে পড়ে। সূর্য্যের আলো তার ভেতর দিয়ে গিয়ে সাতরঙে বিশ্লেষিত হ'য়ে যায়, সেই আলো রামধনু হ'য়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

পরিষ্কার আকাশে বায়ু বিশেষ করে নীল আলোটাকে আলাদা ক'রে বিচ্ছুরিত ক'রে দেয়, সেইজন্যেই আকাশের রঙ নীল। এই বিচ্ছুরিত নীল রঙের জন্যে দূরের গ্রহ-নক্ষত্রকে আমরা দেখতে পাই না। অনেক উপরে বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলে, বিচ্ছুরণের সম্ভাবনা নেই, সুতরাং দিনের বেলাতেও মাথার উপরের আকাশ ঘনকালো, গ্রহ-নক্ষত্র সবই দেখা যায়। মহাকাশযাত্রীরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

মেঘের বিষয়ে আর একটি কথা এ পর্যন্ত বলা হয়নি। মেঘের আধারে সমাহিত হ'য়ে থাকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি। বড় রকমের ঝড় বাদলের আগে তার প্রকাশ দেখতে পাই উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-চমকে আর দিগন্তব্যাপী তড়িৎ-মোক্ষণে। ভীষণ অথচ অপরূপ সুন্দর। সঙ্গে থাকে ভৈরব নিনাদ—বজ্র-নির্ঘোষ।

বজ্র-বিদ্যুতের সমারোহ সাধারণতঃ স্তূপ মেঘেই হ'য়ে থাকে। বাষ্প-ভারাক্রান্ত উষ্ণ বাতাস অনেক সময় খুব দ্রুত খাড়া উপরে উঠে যায়। এই বাতাসের ঊর্ধ্বগতি খুবই বেশী, কখন কখনও সেকেন্ডে 30 মিটারও হ'তে পারে। উপরে উঠলে ঠাণ্ডায় বাষ্প ঘনীভূত হ'তে শুরু করে। 2-3 কিলোমিটার উঠে গেলে উষ্ণতা নেমে যায় $0°\sim-20°C$-এ, মেঘের নীচের দিকটাতে তখন প্রচুর জলকণা আর তুষারকণা দেখা দেয়, আরও উপরের মেঘে, $-40°C$ তাপমাত্রায় ছোট ছোট বরফের কণা তৈরী হয়। এ ধরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে প্রত্যেক স্তূপ মেঘেই। অনেক সময় অনেকগুলো এরকম মেঘের স্তূপ একত্র এসে পুঞ্জীভূত হয়। দূর থেকে তাকালে দেখা যায়, একটা স্তূপ ফুলে ফুলে উপরে উঠছে এবং উপরে গিয়ে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার তারপাশেই অপর স্তূপ 'কেশর ফোলা সিংহের' মত ফুলে ফুলে উঠছে এবং ভেঙে যাচ্ছে; উত্তাল স্তূপ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের আগে এরকম অনেক স্তূপ এসে জড় হয়। সমস্ত মিলে একটা বিশালকায় গাঢ় ঘন কালো জলদ-স্তূপ মেঘের সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। এই মেঘ প্রায় 8-10 কিলোমিটার জুড়ে থাকে আর উপরের দিকেও সেই রকম 8-10 কিলোমিটার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে থাকে। উপরে যদি বায়ু-প্রবাহ ব'য় তাহ'লে সেই জলদ-স্তূপও তার সঙ্গে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলে (চিত্র ৩১)। বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত আর হিমায়িত হ'লে এ রকম জলদ-স্তূপে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ ঘটে আর মাটির ওপর বিদ্যুৎ-সম্পাত হয়। তখন তড়িৎ-চমক দেখতে পাই আর তার বজ্রনাদ শুনতে পাই। মনে হয় সেই ভীষণ

মেঘ 'কালো শ্যেনপাখীর মতো বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে' যাচ্ছে। এ সময় বরফ আর তুষার কণা আর তার সঙ্গে জলকণা সবেগে নীচের দিকে নামতে থাকে। 0°C-এর উপরে এসে মেঘের নীচ থেকে বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। এই হ'ল বজ্রঝঞ্ঝার মোটামুটি চিত্র।

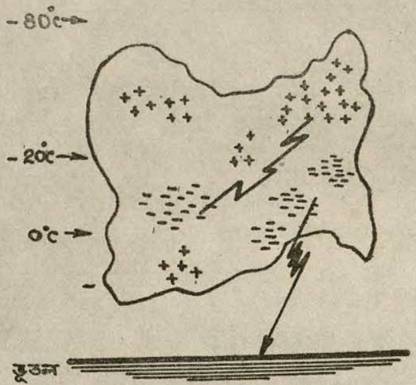


চিত্র ৩১। বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ জলদ স্তূপমেঘ

কিন্তু বিদ্যুৎ-মোক্ষণের কারণ কি? মেঘের ভেতরে বিদ্যুৎ-সঞ্চার ঠিক কি ক'রে ঘটে তার খুব সদুত্তর দেওয়া কঠিন। এ সম্পর্কে অনেক রকমের মতবাদ গড়ে উঠেছে। এ রকম একটা মতবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেঘের অভ্যন্তরে বড় বড় জলের ফোঁটাগুলো, যা থেকে বৃষ্টি তৈরী হয়, আর বরফখণ্ডগুলো ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-আহিত থাকে। আর তাদের চারদিকের ছোট ছোট জলকণাগুলোতে এবং পারিপার্শ্বিক বাতাসে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ। ঋণাত্মক কণাগুলো ভারী এবং বড় তাই মেঘের নীচের দিকে থাকে। আর অনেক হাল্‌কা ধনাত্মক জলকণা (বা তুষার কণা) উপরের দিকে চলে যায়। সূক্ষ্ম জলকণাগুলোর হিমায়ন, জলকণা ও তুষার কণার সংঘর্ষণ ও সম্মিলন, এই সব প্রক্রিয়া থেকেই বিদ্যুৎ-সৃষ্টি প্রধানতঃ হ'য়ে থাকে। ফল কথা, জলদ-স্তূপের উপরের অংশটা ধনাত্মক এবং নীচের দিকটা ঋণাত্মক। অর্থাৎ মেঘের বিভিন্ন অংশের তাড়িত-বৈভব বিভিন্ন এবং সুযোগ পেলেই এই বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রশমন ঘটে এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হয়ে থাকে। সেই মোক্ষণই বিজলীচমক। কখনও জলের বড় ফোঁটাগুলো বাতাসের ধাক্কায় ভেঙে যেতে পারে। তখন তার থেকে যে সব খুব ছোট

ফোঁটা তৈরী হয় সেগুলো ঋণাত্মকই থেকে যায়, কিন্তু ফোঁটার মাঝখানের বড় অংশটা ধনাত্মক এবং ভারী ব'লে নীচের দিকে যেতে থাকে। সেইজন্যে কখনও কখনও মেঘের নীচের প্রান্তেও কিছু পরা-বিদ্যুৎ দেখা যায় (চিত্র ৩২)।

স্তূপ-মেঘ যদি মাটির কাছাকাছি থাকে তাহ'লে তখন মেঘের বিদ্যুৎ-আধান এবং মাটির মধ্যেই মোক্ষণ হয় অর্থাৎ বজ্রসম্পাত ঘটে। কিন্তু মেঘ যদি মাটি থেকে অনেক উপরে থাকে তবে মেঘের অভ্যন্তরে বিপরীত আধানের মধ্যেই বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হয়।



চিত্র ৩২। মেঘে বৈদ্যুতিক আধানের সমাবেশ

বিদ্যুৎ-মোক্ষণ বিপরীত তড়িৎবিভরের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বিভবের মধ্যে ব্যবধান যত বেশী, মোক্ষণও তত তীব্র হয়। মেঘের ভিতরে প্রতি সেন্টিমিটার উচ্চতার ব্যবধানে বিভব 1000 ভোল্টেরও বেশী বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু মোক্ষণ হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-সম্পাত হ'তে প্রায় এক সেকেণ্ড সময় লাগতে পারে, কিন্তু প্রধান তড়িৎ-প্রবাহটা 1/10,000 সেকেণ্ডের মধ্যেই চলে যায়। ফলে, মোট যে তড়িৎ-প্রবাহ বিদ্যুৎ-মোক্ষণে পরিচালিত হয় তার পরিমাণ 10,000 থেকে 1,00,000 আম্পিয়ার হয়ে থাকে। মাটির উপরে যে বজ্রসম্পাত হয় তাতে বিদ্যুৎ বৈভবের ব্যবধান এমনকি 1,00.000,000, ভোল্টও হ'তে পারে। একটা সাধারণ আকারের বজ্রঝঞ্ঝা থেকে যে বিদ্যুৎ-শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে সেটা মানুষের তৈরী বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের ক্ষমতার চেয়েও বেশী।

আমরা দেখতে পাই শাখাপ্রশাখা-সম্বলিত একটা বিজলী-সম্পাত। কিন্তু আজকাল বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে বিদ্যুৎ-মোক্ষণের ছবি তুলে সরাসরি প্রমাণ করা গেছে, প্রতিটি বিদ্যুৎ-চমক শত শত ছোট ছোট বিদ্যুৎক্ষরণের সমষ্টি। ওদের ভেতর সময়ের ব্যবধান এত কম যে আমাদের চোখে তাদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, সবগুলো একাকার হ'য়ে একটা শাখা প্রশাখাযুক্ত মোক্ষণ দেখা যায়। বজ্রসম্পাতে প্রথমে মেঘ থেকে অপেক্ষাকৃত ধীরগামী একটা মোক্ষণ মাটির দিকে আসে। পথ তৈরী হ'য়ে গেলেই তার পেছনে আসে বড় একটা প্রধান মোক্ষণ পৃথিবীতে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই পথেই

বিপরীত দিকে মাটি থেকে মেঘে উজ্জ্বল তড়িৎ-মোক্ষণ ছুটে আসে। এই রকম আসা যাওয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু বহুবার ঘটে।

বিদ্যুৎ-মোক্ষণ যে পথে যায় সেখানকার তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়। সেখানে বাতাস হঠাৎ প্রসারিত হ'য়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। এর ফলে বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাই বিদ্যুৎ-ক্ষরণের একটু পরেই বজ্রনাদ শুনতে পাই। যদিও একই সঙ্গে মোক্ষণ এবং শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আলোর গতি সেকেণ্ডে 300,000,000 মিটার আর শব্দের গতি সেকেণ্ডে 330 মিটার। এই জন্য শব্দ অনেকটা পরে এসে আমাদের কাছে পৌঁছয়। মাটির সঙ্গে মোক্ষণ হলে শব্দটা খুব তীব্র হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম থাকে, সেই জন্য এই শব্দ খুব বেশী দূরে পর্যন্ত যায় না। কিন্তু মেঘের ভিতরের মোক্ষণের শব্দ গুর গুর করে বেশ কয়েক সেকেণ্ড মন্দ্রিত হ'তে থাকে। কারণ মোক্ষণ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হ'তে হ'তে চলে, তাই বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বাতাস মথিত করে শব্দ পর পর এসে কানে পৌঁছুতে থাকে।

মাটির সঙ্গে অশনি-সম্পাতের সময় পথে ঘরবাড়ী গাছপালা যা পড়ে সবই ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষ বা জীবজন্তুর ত' কথাই নেই। অনেক সময় বজ্রপাত থেকে বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। কিন্তু বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকে আর একটা মহৎ লাভও হয়। বায়ুমণ্ডলে সর্বদাই কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ-মোক্ষণ চলছে। গিস্ (Gish, 1951) একটা হিসেব করে দেখিয়েছেন যেকোন সময়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই নানা কেন্দ্রে তিন থেকে ছয় হাজার বজ্র-বিদ্যুৎ মোক্ষণ চলছে। এই মোক্ষণের ফলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নাইট্রেটে পরিণত হচ্ছে। এই নাইট্রেটের ওপর সমস্ত জীবজগৎ যে নির্ভর ক'রে থাকে, সে কথা আগেই আলোচনা করেছি।

আর একটা কথা। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে তাড়িত বৈভব তত বাড়বে। মাটি থেকে ছ'ফুট উপরে গেলে তাড়িত বৈভবের ব্যবধান হবে প্রায় 200 ভোল্ট। কিন্তু এতটা ব্যবধান সত্ত্বেও কোন বিদ্যুৎ-মোক্ষণ দেখতে পাই না তার কারণ বাতাসের তড়িৎবাহিতা খুব কম। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উঁচু স্তর আয়নোস্ফিয়ার। সেখানে বায়ুর অণুগুলি আয়নিত হয়ে আছে, সুতরাং তার আধান যথেষ্ট এবং সে স্তর খুবই বিদ্যুৎবাহী। আয়নোস্ফিয়ারের বৈভব ভূপৃষ্ঠের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ ভোল্ট বেশী। এই আয়নোস্ফিয়ার আর ভূতলের মধ্যে রয়েছে ট্রোপোস্ফিয়ার বায়ুস্তর, যার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা খুবই কম। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, স্বল্প-পরিবাহী হলেও এই বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে সারা ভূপৃষ্ঠে অন্ততঃ 1800 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ-প্রবাহ চলে আসে। যদি এটা কিছুক্ষণ চলে তবে অল্পক্ষণেই সমস্ত বায়ুমণ্ডল তড়িৎ-উদাসী হয়ে পড়বে এবং তাড়িত বৈভবের পার্থক্য থাকবে না। এই জন্যে আয়নোস্ফিয়ারের বিদ্যুৎ-আধানের পরিপূরণ প্রয়োজন। এই পরিপূরণ হচ্ছে মেঘের নিরন্তর বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকে। বিদ্যুৎ-মোক্ষণের এটা আর এক অবদান।

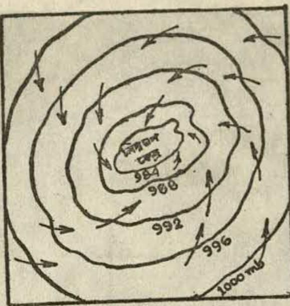
বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ আর বজ্রসম্পাতের সঙ্গে এসে প্রায়ই মিশতে দেখা যায় ঝ'ড়ো-হাওয়াকে। দু'য়ে মিলে সৃষ্টি করে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত। ঝড়ের উৎপত্তির কারণটা কিন্তু স্বতন্ত্র।

বড় রকমের ঝড়ঝঞ্ঝাগুলো প্রধানতঃ দেখা দেয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিষুবরেখার কাছাকাছি। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর আর আতলান্তিক মহাসাগরে বিষুব-রেখার কাছে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে, গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপে দ্বীপগুলো খুব তেতে যায়, কিন্তু চারদিকের সমুদ্রের তাপমাত্রা খুব বেশী বাড়ে না। দ্বীপগুলোর বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায় এবং সেখানে "নিম্নচাপের" সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপকে ইংরেজীতে বলে depression। চারদিকের বাতাসের চাপ বেশী। সেই বাতাস নিম্ন-চাপ কেন্দ্রের দিকে জোরে ছুটে আস্‌তে থাকে। এই নিম্নচাপ কেন্দ্র প্রায়ই অনেকটা প্রশস্ত, তার ব্যাস অনেক সময়েই 300-400 মাইলও হয়। পারিপার্শ্বিক বাতাস যখন কেন্দ্রের দিকে আসে, তখন সোজা আসে না, পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য (Coriolis নিয়ম অনুযায়ী) ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের দিকে যায়। এই বাতাস কেন্দ্রে পৌঁছুলে, সেটাও আবার উপরে উঠতে থাকে। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যতটা বাড়বে বাতাসের চাপও তত বেশী হবে। বাতাসের এই ঘূর্ণন-গতি উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত, আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার গতির মতোই। সমচাপের বায়ুপ্রবাহগুলি প্রায় চাকের মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে কেন্দ্রে উপস্থিত হয় (চিত্র ৩৩)। এই জন্যেই এদের নাম ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন (Cyclones)। কোন কোন সময় একটা বড় ঘূর্ণবাত ভেঙে গিয়ে কয়েকটা ছোট ঘূর্ণবাতও হ'য়ে থাকে। এই বায়ুতে এমনিও প্রচুর বাষ্প থাকে। কয়েক শত মিটার উপরে উঠলে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বড় বড় জলদ-স্তূপ মেঘের সঙ্গে সংহত হয়। বাষ্প সম্পৃক্ত হ'য়ে যাওয়াতে, প্রচণ্ড বর্ষণ এবং ঝড় হয়। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র কিন্তু এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাকে না, কেন্দ্রসহ সম্পূর্ণ সাইক্লোন এগোতে থাকে ঘণ্টায় 10~20 মাইল বেগে। কিন্তু ঘূর্ণবাতের ভিতরে বাতাসের ঘূর্ণনগতি ভীষণ, ঘন্টায় 75 মাইল ত' বটেই, সময় সময় তার চেয়েও অনেক বেশী হ'তে পারে। 1896 সালে সেন্ট লুইসে যে ঝড় এসেছিল, তার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 558 মাইল। ঘূর্ণবাত যখন সমুদ্র-উপকূলের স্থলভাগে এসে পৌঁছয় তখন সেখানে ঝড়ের বেগে প্রচন্ড ধ্বংস অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে।

ঘূর্ণবাত বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছের ঘূর্ণবাতকে বলা হয় "হ্যারিকেন" (Hurricanes)। আবার চীনসমুদ্রের ঘূর্ণবাতকে "টাইফুন" (Typhoon) বলা হয়। ভারত মহাসাগরের ঘূর্ণবাত কেবল "সাইক্লোন" নামেই প্রসিদ্ধ। সাইক্লোন স্থলভাগের উপরে ব'য়ে যাবার সময় বাধা পায়, তখন প্রচন্ড বেগে বাতাস এলোপাথাড়ি হ'য়ে নানা দিকে ছুটে চলে। সেই জন্যে ঠিক ঝড়ের মধ্যে থাকলে সবদিক থেকেই ঝড় এসে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হয়। কিন্তু পুরোপুরি সম্পূর্ণ সাইক্লোনটা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে বইতে থাকে।

ঝড়ের তাণ্ডব আর ধ্বংসলীলা ভয়াবহ। এর ধ্বংস-কাহিনীর ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। 1807-এ বঙ্গোপসাগর থেকে যে ঝড় এসে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিল তা'তে 90 হাজারেরও বেশী লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল, অসংখ্য ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও প্রায় প্রতি বছরেই প্রচন্ড ঝড়ে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের উপকূল, রামেশ্বর সেতুবন্ধ বিধ্বস্ত হ'য়ে থাকে। 1931-এ হন্ডুরাসে এক প্রবল

ঘূর্ণবাত, আধঘন্টার মধ্যে সহস্র সহস্র বাড়ী গির্জা সব ভেঙে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রতীর থেকে দু'শ টনের একটা মাটিকাটা ড্রেজারকে তুলে নিয়ে অনেকটা দূরে একটা বাড়ীর ছাদে রেখে দিয়েছিল। 1954 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে জাপানের উপকূলে এক মারাত্মক ঝঞ্ঝার আক্রমণ হয়েছিল। তার দৌরাত্ম্যে হাজার হাজার বাড়ী, কারখানা



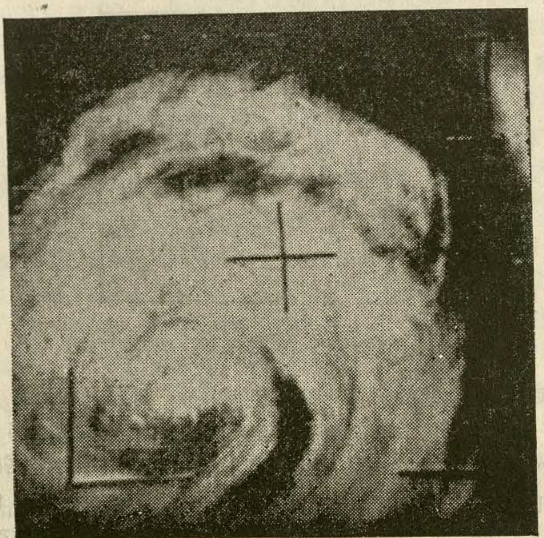
চিত্র ৩৩। ঘূর্ণবাত (উত্তর গোলার্ধ)

ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং অভাবনীয় ধ্বংস-ক্ষতি হয়। মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঞ্চলে প্রায়ই হ্যারিকেন বিরাট ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে (1926, 1935)। ঝড়ের তাণ্ডব ত' রয়েছেই, তার সঙ্গে আসে সমুদ্র থেকে বিশাল ঢেউয়ের প্লাবন, সমস্ত উপকূল ভাসিয়ে নিয়ে চলে। ক্ষয়ক্ষতিটা তা'তে সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

ঝড় যখন ফেনিল উন্মত্ততায় অন্ধবেগে প্রলয়-নৃত্য শুরু করে, তখন তার কাছ থেকে রক্ষা পাওয়া দুরূহ। ঝড়-তুফানকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা সাধ্যের অতীত। তবুও নৈসর্গিক এই দুর্য্যোগের উৎপত্তি ও আগমনের সঠিক সম্ভাবনা জানা থাকলে অনেকটা সাবধান হ'তে পারা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাটা কমানো যায়। আজকাল আবহবিদরা বেলুন, যন্ত্রযুক্ত উড়োজাহাজ, রেডিয়োসন্ডে, রাডার প্রভৃতির সাহায্যে, কোথায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হ'চ্ছে, কত জোরে বাতাস কোনদিকে বইছে, এসব সংবাদ আগেই সংগ্রহ ক'রে সাবধান ক'রে দেন, তাই খানিকটা রক্ষা। সমুদ্রপোত আর উড়োজাহাজের চলাচলের জন্য এ সংবাদ অপরিহার্য্য ; তাছাড়া, এ সংবাদের বিশেষ প্রয়োজন বন্দর কর্তৃপক্ষের, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধবাহিনীর।

আজকাল টিরোস জাতীয় (Tiros) কৃত্রিম উপগ্রহ অনুক্ষণ আকাশ পরিক্রমা করছে এবং সঠিক ও নির্ভুলভাবে আকাশের অবস্থা প্রতিমুহূর্ত্তে জানিয়ে দিচ্ছে। 1960-এর ১লা এপ্রিল প্রথম টিরোস উপগ্রহটিকে আকাশে ওর কক্ষপথে দেওয়া হয়। তারপর থেকে আরও অনেকগুলি এজাতীয় 'আবহাওয়া উপগ্রহ (Weather satellite)' আকাশে রাখা হয়েছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে কোথায় কি রকম নিম্নচাপ হচ্ছে, কত বেগে কোনদিকে সেই নিম্নচাপ-কেন্দ্র যাচ্ছে, তাপমাত্রা কত, এসব সংবাদ স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপগ্রহ সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা পৃথিবী সে খবর জানতে পারছে এবং সতর্ক হ'তে পারছে। টিরোস শুধু

সংবাদই দেয় না, নবজাত সাইক্লোনের জন্মচিত্র পর্যন্ত বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখানে টিরোস থেকে পাওয়া একটা ঘূর্ণবাতের ভ্রূণ-অবস্থার চিত্র দেওয়া হ'ল (চিত্র ৩৪)। উড়োজাহাজ, রাডার প্রভৃতি দিয়ে বড় জোর

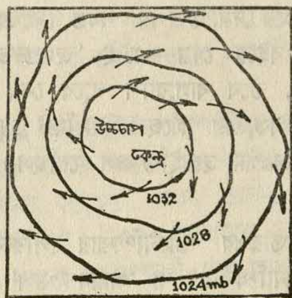


চিত্র ৩৪। ঘূর্ণবাতের জন্ম (টিরোস থেকে পাওয়া)

100-200 বর্গ মাইল এলাকার অবস্থা জানা যেতে পারে, কিন্তু টিরোস প্রদক্ষিণ ক'রে যাবার সময় একবারেই অন্ততঃ পাঁচলক্ষ বর্গমাইল আকাশ ক্ষেত্রের ছবি পাঠাতে পারে এবং সেটা দশ মিনিটের মধ্যেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। দিনটা ছিল, ৫ই নভেম্বর, 1964। মাদ্রাজে মোটামুটি আবহাওয়া ভালই ছিল। কিন্তু টিরোস-৪ থেকে সংবাদ এল : '12° উঃ অক্ষাংশে এবং 81° পূঃ দ্রাঘিমাতে আন্দামানের পশ্চিমে নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে এবং সেটা উত্তরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।' হিসেব ক'রে আবহাওয়াবিদগণ মাদ্রাজ এবং সন্নিহিত অঞ্চলকে বিপদ-সঙ্কেত পাঠালেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরজীর মাদ্রাজের সৈকতে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করে দেওয়া হ'ল। পরদিন সন্ধ্যায় ঠিক হিসেব মতোই 24 ঘন্টায় প্রায় 300 শত মাইল অতিক্রম ক'রে এসে এক প্রবল ঝড় মাদ্রাজকে লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল। ঝড়ের বাতাসের বেগ ছিল ঘন্টায় 53 মাইল। প্রচুর ক্ষতি হ'ল, কিন্তু প্রয়োজনীয় সতর্কতার জন্যে সেটা অনেকটা সীমিত হ'ল আর কোন প্রাণহানি হ'ল না।

উপরের আবহাওয়ার, বিশেষ করে ঝড়ো-বাতাসের গতিবেগ এবং দিক, তাপমাত্রা প্রভৃতি জানার জন্যে ত্রিবান্দ্রামের কাছে চুম্বকীয় নিরক্ষরেখার উপরে তৈরী হয়েছে থুম্বা রকেট

ষ্টেশন। এখান থেকে রকেট-উৎক্ষেপণ করে 19 থেকে 125 মাইল উপরের বায়ুস্তরের নানা খবর সংগ্রহ করা হ'চ্ছে। সেটাও যথেষ্ট কাজে লাগছে।



চিত্র ৩৫। প্রতীপ ঘূর্ণবাত (উত্তর গোলার্ধে)

কাছাকাছি দু'টি ঘূর্ণবাতের মাঝখানে অনেক সময় একটা উচ্চচাপ কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। তখন সেই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বাতাস বাইরের দিকে চক্রাকারে বেরিয়ে আসতে থাকে থাকে, একে বলা হয় 'প্রতীপ ঘূর্ণবাত' (Anti-cyclones)। ঘূর্ণবাত এলে ব্যারোমিটারের পারা নেমে যায়, অর্থাৎ নিম্নচাপ দেখা দেয়, সেটা ঝড়-বাদলের আভাস নির্দেশ করে। আর প্রতীপ ঘূর্ণবাতে ব্যারোমিটারের পারা উপরে উঠে যায়, সেটা শুষ্ক ও ভাল আবহাওয়ার লক্ষণ। প্রতীপ ঘূর্ণবাতের গতি ঘূর্ণ-বাতের বিপরীত দিকে (চিত্র ৩৫)।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ঘূর্ণবাত হয়। সেখানে একটা গরম বাতাস যদি একটা ঠান্ডা বাতাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আসে তাহ'লে একে অপরকে নিয়ে ঘুরতে থাকে এবং ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও ঝড় হয় তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের সাইক্লোনের মত তীব্র নয়; মৃদুগতি এবং বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম।

অল্প পরিসরের ঘূর্ণবাতকে বলে ঘূর্ণি বা টর্ণেডো (Tornado) এদের কেন্দ্রের ব্যাস 1000/2000 ফিটের বেশী নয়। সেখানে চাপ অত্যন্ত কম। কেন্দ্রের চারদিকে বাতাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। আর সম্পূর্ণ ঘূর্ণিটা দুর্দম বেগে একদিকে ছুটতে থাকে। আয়তনে ছোট বটে, কিন্তু তীব্রতা খুব বেশী। পথে যা কিছু পড়ে সব ধ্বংস ক'রে চলে যায়। 20/30 মাইল পর্যন্ত ঘূর্ণি সাধারণতঃ চলে। ছোট ছোট বাড়ীর ভিতসুদ্ধ, বড় বড় গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ঘূর্ণি চলে যায়। বেশ বড় বড় গাড়ী, বাড়ীর ছাত এসব উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়, মানুষ জীবজন্তুর ত' কথাই নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ঘূর্ণির সংখ্যা বেশী। একবার ডাকোটাতে গ্রেট নর্দান রেলের একটা ট্রেনকে লাইন থেকে তুলে অন্যত্র বসিয়ে রেখে গিয়েছিল এক প্রচন্ড ঘূর্ণি। প্রবল ঘূর্ণির কেন্দ্রে যদি কোন বাড়ী এসে যায়, তবে সেখানে বাইরের চাপ হঠাৎ খুবই কমে যায় আর বাড়ীর ভেতরের চাপ থাকে খুব বেশী, সুতরাং ভেতরের চাপের জন্য বাড়ীটা বিস্ফোরণ-সহ ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ঘূর্ণির মাঝখানের ছোট কেন্দ্র থেকে বাতাস উপরে উঠে ছড়িয়ে যায়। কাজেই একটা ঘূর্ণায়মান বাতাসের ফানেল তৈরী হয়। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যখন ঘূর্ণি চলে, কখনও এই ফানেল দিয়ে ঘূর্ণি সমুদ্র থেকে জল শুষে উপরে তুলে নিয়ে শীতল মেঘের রাজ্যের সঙ্গে যোগ করে দেয়, তারপর সমস্ত মেঘের বিপুল জলরাশি ফানেল দিয়ে নেমে এসে প্লাবন বইয়ে দেয়—এটাই "জলস্তম্ভ"। তেমনই ঘূর্ণি যদি মরুভূমির উপর দিয়ে যায়, তবে বালুরাশি শুষে নেয়; বালুস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। শোনা যায়, 1856 সালে কলকাতার কাছে 1500 ফিট উঁচু এক জলস্তম্ভ থেকে জলের ধারায় প্রায় আধ বর্গমাইল জায়গায় ছয় ইঞ্চি জল হয়েছিল।

আয়নোস্ফিয়ার

ট্রোপোস্ফিয়ার আর তারপর স্ট্রাটোস্ফিয়ার পেরিয়ে আরও উপরে উঠলে যে বায়ুস্তর তার নাম "আয়নোস্ফিয়ার" বা 'আয়ন-মণ্ডল'। এখানকার বাতাস অত্যন্ত হালকা, ঘনত্ব খুবই কম, অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান অনেকটা। কিন্তু এই স্তরটির বিস্তৃতি যথেষ্ট। 70/80 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু ক'রে প্রায় 800 কিলোমিটার পর্যন্ত। বিস্তার যথেষ্ট হ'লেও আয়নোস্ফিয়ারে বাতাসের মোট ভরের মাত্র 1/200 অংশ রয়েছে।

আয়নোস্ফিয়ারের বাতাস খুবই তনুকৃত বটে, কিন্তু সেই বাতাস খুব তড়িৎবাহী। একথা এখন সকলেরই জানা, পদার্থ মাত্রেই অণু পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুগুলো সাধারণ অবস্থায় তড়িৎ-নিরপেক্ষ তাদের কোন নীট তড়িৎ-আধান নেই, যদিও পরমাণু গঠিত হয়েছে কতগুলো ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণা দিয়ে; সঙ্গে অবশ্য তড়িৎ-মাত্রাহীন নিউট্রনও রয়েছে। বিদ্যুৎ-বাহী কণাগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন আর প্রোটন। পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে বলে পরমাণুর কোন বিদ্যুৎমাত্রা থাকে না। কিন্তু পরমাণু যদি কোন শক্তিশালী বিকিরণের, যেমন রঞ্জনরশ্মি বা অতি-বেগুনী রশ্মির, সংস্পর্শে আসে তবে পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটে। ফলে, পরমাণু ভেঙে গিয়ে ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক বস্তুকণার উদ্ভব হয়। এরকম তড়িতাবিষ্ট কণাকে বলে "আয়ন"। কিন্তু পুনরুক্তি দোষ হ'ল, কারণ এসব কথা প্রকারান্তরে আগেই বলা হয়েছে!

এবার আয়নোস্ফিয়ারের কথায় ফিরে যাই। আলোকরশ্মি এবং তাপরশ্মির সঙ্গে সূর্য্য থেকে আরও অনেক অদৃশ্য রশ্মি উৎসারিত হ'য়ে পৃথিবীতে নিরন্তর আসছে। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট, অতি-বেগুনী রশ্মিও রঞ্জন-রশ্মি জাতীয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে তরঙ্গের শক্তি হয় তত বেশী। অর্থাৎ সূর্য্য-রশ্মিতে প্রচুর অদৃশ্য খুব শক্তিশালী তরঙ্গও রয়েছে। এই বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে এসে পৌঁছয় তখন গ্যাসের পরমাণু প্রথমতঃ এই শক্তিশালী তরঙ্গ-গুলিকে সোজাসুজি শুষে নেয়। এর ফলে যে শুধু প্রচুর তাপ জমে এবং উপরের স্তরের উষ্ণতা বেড়ে যায় তাই নয়, পরমাণুগুলো আয়নিতও হ'য়ে যায়। অজস্র ইলেকট্রন আর ধনাত্মক বস্তুকণার সৃষ্টি হয়। প্রচুর আয়ন থাকায় এই বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয় এবং এই জন্যেই এই স্তরের নাম দেয়া হয়েছে "আয়নোস্ফিয়ার"।

মনে হ'তে পারে ক্রমাগত সৌর কিরণ শোষণের ফলে ইলেকট্রন ও আয়নের পরিমাণ নিরন্তর বেড়েই যাবে। কিন্তু আবার বিপরীত বিক্রিয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কণাগুলো সবসময়েই ছুটোছুটি করছে আর পরস্পরের ভিতর সংঘর্ষ হচ্ছে। আয়নিত কণাগুলো এবং ইলেকট্রনগুলোও এভাবে ধাক্কা দিচ্ছে এবং ধাক্কা খাচ্ছে। একটি ইলেকট্রন যদি কোন ধনাত্মক কণার সঙ্গে ধাক্কা খায় তাহ'লে দুয়ে মিলে আবার তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণুতে পরিণত হ'য়ে যাবে। আবার কখনও তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইলেকট্রনটি তার সঙ্গে সংহত হ'য়ে একটা ঋণাত্মক কণা তৈরী করবে। এটা আবার একটা ধনাত্মক কণার সংঘর্ষে এলে উভয়েই তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণায় পরিণত হ'তে পারে।

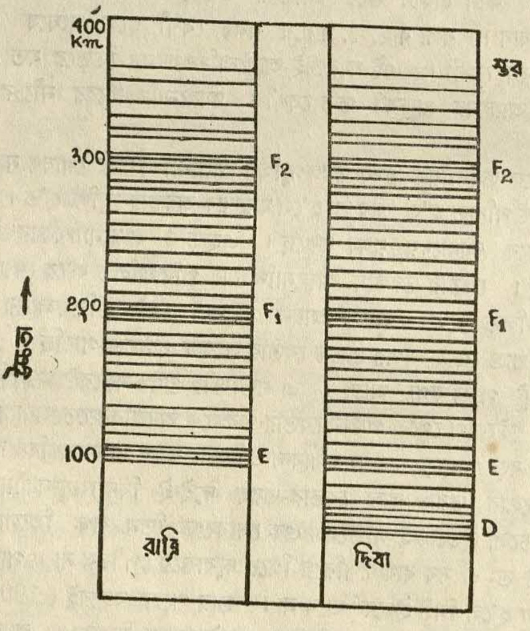
দেখা যাচ্ছে, উচ্চ বায়ুস্তরে সৌর রশ্মির শক্তিশালী তরঙ্গগুলি মুক্ত ইলেকট্রন এবং আয়ন তৈরী করছে। আর একটা কথাও বলা দরকার, সূর্য্যদেহ থেকে সৌর রশ্মির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ হালকা বস্তুকণা, যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদিও বিপুলবেগে উৎসারিত হ'য়ে আসে। এরাও উচ্চস্তরের বায়ুর আয়নীকরণে যথেষ্ট অংশ নেয়। এই আয়নীকরণে সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মিও সামান্য কিছু অংশ নেয়। অপর দিকে, আয়নগুলোর এবং বস্তুকণাগুলোর সংঘর্ষে এবং পুনর্মিলনে আয়ন ও ইলেকট্রন লোপ পাচ্ছে। এই দুই বিপরীত বিক্রিয়ার মধ্যে একটা ভারসাম্য রয়েছে, তাই যে কোন একটা স্তরে আয়নের ও ইলেকট্রনের গড় পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বায়ুর ঘনত্ব বেশী হলে সংঘর্ষে আয়নের লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণেই আয়নোস্ফিয়ারের ভিতরে যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে আয়নের প্রাচুর্য্য তত বেশী। আয়নোস্ফিয়ারের নীচের অংশে আয়নের পরিমাণ কম।

সূর্য্য থেকে উৎসারিত হ্রস্ব-তরঙ্গগুলির আয়নোস্ফিয়ারে শোষণ না হ'লে সেগুলো ভূতলে এসে উপস্থিত হ'ত আর তা হ'লে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। আয়নোস্ফিয়ার সেই ধ্বংস থেকে আমাদের রক্ষা করছে। এছাড়াও আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলের আরও গুরুত্ব রয়েছে। বেতার তরঙ্গকে আয়নোস্ফিয়ার প্রতিফলিত ক'রে দেয়, যেমন আলোর তরঙ্গ প্রতিফলিত হ'য়ে আসে আয়না থেকে। এই প্রতিফলনের জন্যেই আমরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বেতার সংবাদ পাঠাতে পারছি।

এর একটু পূর্ব্বকথা আছে। এ শতাব্দীর প্রথম বছরেই মারকনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে, ইউরোপ থেকে পাঠান বেতার-তরঙ্গকে আমেরিকাতে অনায়াসেই ধরা যেতে পারে। বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত বাধাবন্ধ অতিক্রম ক'রে এ তরঙ্গ কি ক'রে পৌঁছুতে পারে? আলোর তরঙ্গ আর বেতার-তরঙ্গ দুই-ই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, উভয়েই সরল রেখায় চলে, উভয়েরই গতিবেগ এক সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু আলোর তরঙ্গ ত' এ সব বাধা পেরিয়ে গিয়ে দূরান্তরে পৌঁছয় না। প্যারিসের আলোক-রশ্মি কেন তা হ'লে নিউ-ইয়র্কে যাবে না। তার পরের বছরেই (1902), ইংল্যাণ্ডের হেভিসাইড এবং আমেরিকার কেনেলি এর একটা ব্যাখ্যা দিলেন। ল্যাবরেটরীতে দেখা গেছে ইলেকট্রন বা তড়িৎ-কণার সংস্পর্শে বেতার-তরঙ্গের গতিপথ বেঁকে যায়, এমন কি বিপরীত দিকেও ফিরে যেতে পারে। কেনেলি ও হেভিসাইড প্রস্তাব করলেন, বায়ুমণ্ডলের

খুব উচ্চস্তরে যেখানে বাতাস খুব হালকা, সেখানে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎবাহী স্তর রয়েছে যেখানে গিয়ে বেতার-তরঙ্গ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে অর্থাৎ প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও তখনও কোন সাক্ষাৎ-প্রমাণ মেলেনি, তবু বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন, অনেক উঁচুতে বিদ্যুৎ-পূর্ণ বায়ুস্তর রয়েছে। এই স্তরের নাম দেওয়া হ'ল, "হেভিসাইড-কেনেলী স্তর"। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বেতার-তরঙ্গ মাপজোকের যন্ত্র-সরঞ্জামের অনেক উন্নতি হ'ল, তার সাহায্য নিয়ে 1944 সালে অ্যাপেলটন এবং বার্ণেট এই বিদ্যুৎবাহী বায়ুস্তরের শুধু অস্তিত্ব নয়, তার উচ্চতা পর্য্যন্ত স্থির করে দিলেন, বেতার-তরঙ্গকে খাড়া উপরের দিকে পঠিয়ে দেওয়া হ'ল, সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হ'য়ে সেখানেই ফিরে এসে গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ল। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং তার গতিবেগও জানা আছে, সুতরাং ফিরে আসতে যে সময়টা লাগল সেটা মেপে আয়নোস্ফিয়ারের উচ্চতা জানতে পারা গেল। কিন্তু একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ পাঠালে যে উচ্চতা থেকে ফিরে আসে, হ্রস্ব তরঙ্গ কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী উঁচুতে গিয়ে তারপর প্রতিফলিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল বিদ্যুৎবাহী বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত ক'রে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। এই দূরবর্তী স্তরটির তখন নাম হয়েছিল "অ্যাপেলটন স্তর"।

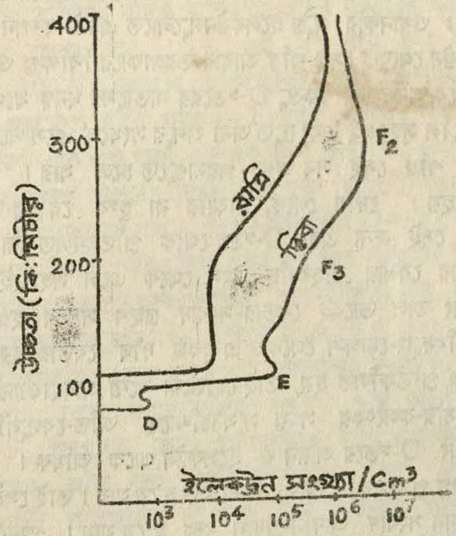
তারপর গত তিন দশকে আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এখন আমরা জানি আয়নোস্ফিয়ারে রয়েছে চারটি স্তর, বিভিন্ন



চিত্র ৩৬। আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তর

উচ্চতায়। বিভিন্ন স্তরের মোট তড়িৎ-আধানের পরিমাণ অর্থাৎ বিদ্যুৎকণার

প্রাচুর্য্য বিভিন্ন। সবচেয়ে নীচু স্তরকে বলা হয় D-স্তর এবং তারপর পর পর



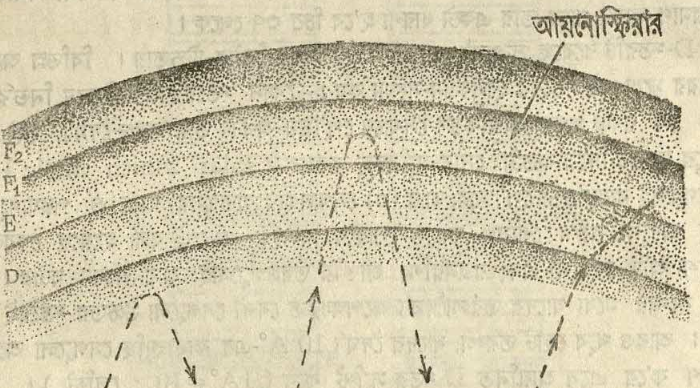
চিত্র ৩৭। আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরে আয়নের পরিমাণ

রয়েছে E, F_1 এবং F_2 স্তর (চিত্র ৩৬)। বিভিন্ন স্তরের প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে কি পরিমাণ আয়ন থাকে তার একটা ধারণা হ'বে চিত্র ৩৭ থেকে।

D-স্তরটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 70/80 কিলোমিটার উচ্চতায়। বিভিন্ন আয়নিত স্তরের মধ্যে এই স্তরের ইলেকট্রন-সংখ্যা কম। কোন স্তরের আয়নীভবন নির্ভর করে (১) কি রকম প্রখর সৌরকিরণ সেখানে পেঁছয় অর্থাৎ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, (২) কতটা বায়ুর ভেতর দিয়ে কতটা সৌর-সুবিন্দু কোণে (solar zenith angle) এসে কিরণ সেই বায়ুস্তরে পেঁাছবে, আর (৩) সেখানকার বাতাসের অণু ও পরমাণুগুলো সেই অদৃশ্য রশ্মি শোষণ করতে পারবে কিনা। আগেই বলা হয়েছে কেবল মাত্র অদৃশ্য অতি-বেগুনী এবং রঞ্জনরশ্মি জাতীয় তরঙ্গগুলোই আয়ন-ক্রিয়া ঘটায়। এই সব রশ্মির মধ্যে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী সেগুলো উচ্চতর স্তরেই শুষে যায়। আরও খুব ছোট তরঙ্গ, যাদের দৈর্ঘ্য 10 A°-এর কাছাকাছি সেগুলো অনেকটা প্রবেশ ক'রে এসে আয়নিত D-স্তর সৃষ্টি করে ($1A° = 10^{-8}$ সেন্টি.)। কিন্তু এদের পরিমাণ বেশী নয় বলে স্তরটি তত বেশী আয়নিত হ'তে পারে না। D- স্তরে আয়ন সৃষ্টির আরও একটা সম্ভাবনা আছে। সূর্যদেহের হাইড্রোজেন থেকে 1216 A° দৈর্ঘ্যের এক তরঙ্গস্রোত বিচ্ছুরিত হ'য়ে আসে; একে বলে "লাইমেন তরঙ্গ" (Lyman lines)। উপরের স্তরের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির এই তরঙ্গ শোষণের ক্ষমতা নেই। এই তরঙ্গ যখন আরও নীচে আসে তখন বাতাসে যে সামান্য নাইট্রিক অক্সাইড আছে তার অণুগুলো এই তরঙ্গ টেনে নিয়ে আয়নিত হয় এবং এ ভাবেও D-স্তর খানিকটা তৈরী হয়।

বেতার-তরঙ্গগুলি উৎস থেকে যখন উপরে উঠে আয়নোস্ফিয়ারে উপস্থিত হয় তখন তরঙ্গাঘাতে প্রথমতঃ ওখানকার মুক্ত ইলেকট্রনগুলোতে একটা কম্পন বা দোলা লাগে। এই কম্পমান ইলেকট্রন থেকেই সেই শক্তি আবার তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত হ'য়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু D-স্তরের বাতাসের ঘনত্ব যথেষ্ট, সুতরাং এই কম্পমান ইলেকট্রনগুলি সহজেই এবং দ্রুত অন্য অণুর সংঘর্ষে এসে পড়ে। ফলে বেতার-তরঙ্গের খানিকটা শক্তি সেই সব অণু পরমাণুতে চলে যায়। মোটকথা, বেতার-তরঙ্গের শোষণ হয়। দেখা গেছে, মাঝারি বা হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গকে D-স্তর শোষণ করে এবং সেই জন্য এরা D-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না। খুব দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ দিনের বেলায় কাছকাছি উৎস থেকে এলে সহজেই D-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় এবং ভাল ভাবেই বেতার-সংবাদ গ্রহণ সম্ভব হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, মেঘের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকেও এ রকম দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ আসে। আর সেগুলোও D-স্তরে প্রতিফলিত হয়, তাই রেডিয়ো যন্ত্রে আবহাওয়ার উৎপাত আমরা শুনতে পাই। সৌর-কলঙ্কের সময় সূর্যরশ্মিতে অতি-বেগুনী ছোট তরঙ্গের প্রচুর্য্য ঘটে, সুতরাং D-স্তরে আয়ন ও ইলেকট্রন থাকে অধিক। সুতরাং হ্রস্ব ও মাঝারি বেতার-তরঙ্গ প্রায় সবটাই সেখানে শোষিত হ'য়ে যায়। তাই সেই সময়ে রেডিয়োর তরঙ্গ সাহায্যে কোন সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হ'য়ে যায়। অন্যদিকে রাত্রিবেলায় সৌরকিরণ না থাকার জন্যে D-স্তরের অনেকটাই লোপ পেয়ে যায়।

D-স্তরের পর 100 কিলোমিটারের একটু বেশী উচ্চতায় হ'ল E-স্তর। এবং আরও



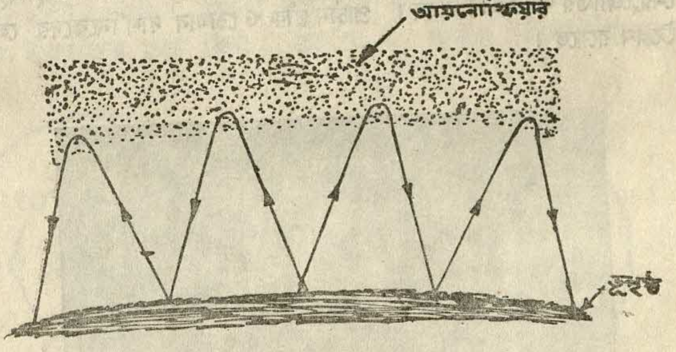
চিত্র ৩৮। বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গের গতিপথ

উঁচুতে 200 কিলোমিটারের কাছে রয়েছে F_1-স্তর। এদের মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা প্রচুর।

গ্যাস এখানে বিরল, ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এই দুইটি বিদ্যুৎবাহী বায়ুস্তর অনেকটা সুস্থির, যদিও রাত্রিকালে এদের ভিতরের আয়নক্রিয়া খানিকটা কম থাকে। পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, এই সব স্তরে এবং উচ্চতর F_2-স্তরেও, সৌর-কিরণের 100A° দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলির দ্বারা এখানকার বাতাসের অণু-পরমাণুগুলো আয়নিত হ'য়ে থাকে। F_2-স্তর যথেষ্ট আয়নিত ও বিদ্যুৎবাহী, কিন্তু তার আচরণ এক এক সময় এক এক রকম, সেটা যেন একটু অস্থির প্রকৃতির।

হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ উপরের দিকে গিয়ে যখন আয়নোস্ফিয়ারে ঢোকে তখন D-স্তরে খানিকটা শোষিত হ'য়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ D-স্তর পেরিয়ে আরও উপরের E এবং F_1-স্তরে গিয়ে প্রতিফলিত হ'য়ে যায় আর পৃথিবীর দিকেই ফিরে আসে। বেতার-বার্তা পাঠানোর কাজে হ্রস্ব-তরঙ্গের কার্যকারিতা এই স্তরের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বেতার-তরঙ্গগুলো যখন উপরের দিকে যায় তখন ক্রমশঃই কম আয়নিত স্তর থেকে বেশী আয়নিত স্তরে যায়। তাই স্বাভাবিক নিয়মে তরঙ্গ বেঁকে যায় অর্থাৎ প্রতিসরিতও হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে ততই সেটা উঁচুতে উঠতে পারবে। F_1-F_2 স্তরগুলো থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে এই তরঙ্গ বহু দূরদূরান্তরে পেঁছুতে পারে। অতি হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ, যার দৈর্ঘ্য দশ মিটারেরও কম, অনেক সময় মোটেই প্রতিফলিত না হ'য়ে, আয়নোস্ফিয়ার পেরিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে (চিত্র ৩৮)। সেই কারণে এদের রাডার এবং টেলিভিসনে ব্যবহার করা সম্ভব।

জোরালো হ্রস্ব-তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হ'য়ে যখন পৃথিবীর গায়ে এসে



চিত্র ৩৯। ভূতল আর আয়নোস্ফিয়ারের মধ্যে হ্রস্ব তরঙ্গের বার বার প্রতিফলন

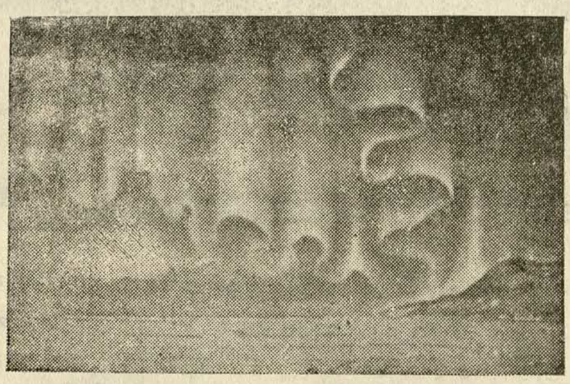
পড়ে, তখন সেখান থেকেও আবার প্রতিফলিত হ'য়ে উপরে উঠে যেতে পারে। এই রকম বারবার প্রতিফলিত হ'য়ে তরঙ্গ বহু বহু দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই ভাবেই দূরদূরান্তরের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে (চিত্র ৩৯)।

1930-এর 12ই জানুয়ারী ক্রেনকেল উত্তর-মেরু সাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপ থেকে একটা বেতার বার্তা পাঠান এবং সবাইকে তার উত্তর দিতে বলেন। অল্পক্ষণেই তিনি একটা জবাব পেলেন, দেখা গেল সেটা আসছে দক্ষিণ-মেরুর সন্নিকটে বার্ডের (Byrd)

অভিযাত্রী দলের শিবির থেকে। বার্ড তখন ছিলেন দক্ষিণ-মেরু অভিযানে ক্রেনকেলের দ্বীপ থেকে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে। অর্থাৎ বেতার-বার্তাটি পৃথিবীর সম্ভাব্য বৃহত্তম দূরত্ব অতিক্রম করেছে—12500 মাইল। আয়নোস্ফিয়ার আর ভূপৃষ্ঠ থেকে হ্রস্ব তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ প্রতিফলনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

মেরুজ্যোতি

আয়নোস্ফিয়ারের আর একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে মেরুজ্যোতি। মেরুবৃত্তের মধ্যে আর তার কাছাকাছি দেশগুলোতে রাত্রির আকাশে তাকালে অনেক উঁচুতে প্রায়ই এক অভিনব সুন্দর আলোর জ্যোতি দেখা যায়। উজ্জ্বল অপরূপ নানা রঙের সব আলোর ঝরণা অনেক উঁচু থেকে যেন পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। একই সময়ে আকাশের বুকে বিভিন্ন জায়গায় নানা রংয়ের আর নানা আকারের সব আলোর জ্যোতি ফুটে উঠছে। আবার ক্ষণে ক্ষণেই এদের আকার বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তাদের বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্য। এক একটি আলোর রঙ একে একে আসে, মিলিয়ে যায়, আবার আসে, চলে আলোর ঝিলিমিলি। কখনও এরা লাল সবুজ হলদে সব তীক্ষ্ণ বর্শার মতো, আবার পরক্ষণেই সেগুলো ফুলে গিয়ে পরিণত হ'চ্ছে বিচিত্র রংয়ের বড় বড় চওড়া পটিতে। কখনও ভাঁজে ভাঁজে ঝালরের মতো স্থির হ'য়ে রয়েছে, আবার ক্ষণপরেই প্রসারিত হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বা ঢেউয়ের মত সরে সরে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের আকাশে অনেক সময় সারারাত ধ'রে চলে এমনি বিচিত্র আলোর খেলা। অলৌকিক এর দীপ্তি, অবর্ণনীয় এর ছটা—এ এক অপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য। এরই নাম মেরুজ্যোতি বা অরোরা (Aurora)। যুগযুগ ধ'রে এই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেদের লেখাতেও এর উল্লেখ রয়েছে।



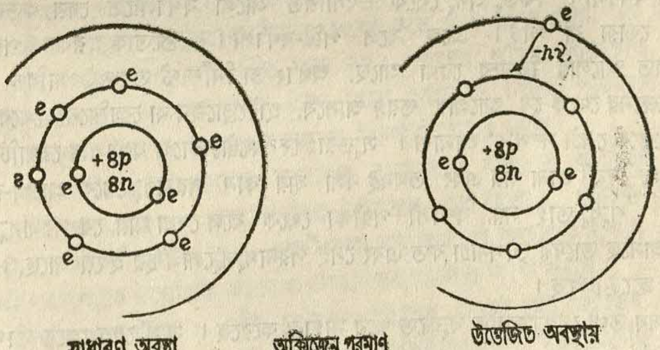
চিত্র ৪০। মেরুজ্যোতি

মেরু অঞ্চলের বাইরে এ রকম জ্যোতি কদাচিৎ দেখা যায়। খুব জোরালো মেরু-জ্যোতির আবির্ভাব ঘটলে কখনও কখনও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও, এমনকি মস্কো বা

স্কটল্যাণ্ডে থেকেও দেখা যায়, যেমন দেখা গিয়েছেল 1938 ও 1956 সালে। সাধারণতঃ উত্তর কানাডা, সাইবেরিয়া, আইসল্যাণ্ড, নভো-জেমলা, উত্তর নরওয়ে এসব জায়গা থেকে খুব সুন্দর মেরুজ্যোতি দেখা সম্ভব। দক্ষিণ মেরুবৃত্তের কাছে গেলেও মেরুজ্যোতি দেখা যায়। মেরু-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক এর নাম দিয়েছেন "অরোরা অস্ট্রালিস" কারণ উত্তর মেরুর মেরুজ্যোতির নাম "অরোরা বোরিয়ালিস্"।

মেরুজ্যোতির নীচের দিকের সীমানা মোটামুটি ভূতল থেকে 100 কিলোমিটার উঁচুতে আর উপরের দিকে সেটা বিস্তৃত হয়ে যায় প্রায় 500 কিলোমিটার পর্য্যন্ত। এসব মাপজোক বিজ্ঞানীরা এই কিছুদিন আগে সঠিকভাবে করতে পেরেছেন। দেখা যাচ্ছে, মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটে আয়নোস্ফিয়ারের রাজ্যে। কিভাবে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয় এই প্রশ্নটিই প্রথমে মনে আসে। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে পরমাণুর সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

প্রত্যেক পরমাণুই কতকগুলি নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন এবং পরাবিদ্যুৎযুক্ত প্রোটনগুলি একত্র পুঞ্জীভূত হ'য়ে কেন্দ্রে থাকে, আর এই কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে নিরন্তর ঘুরছে। কিন্তু এই ইলেকট্রনসমূহ যে কোন কক্ষপথে ঘুরতে পারে না, এরা শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে থেকেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। কক্ষপথগুলিকে "কোয়াণ্টাম স্তর" বলা হয়। বিভিন্ন কোয়াণ্টাম স্তরে বা কক্ষপথে থাকার জন্য ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণও বিভিন্ন হয়। কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনের কক্ষপথ যত দূরে হবে, ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণও তত বেশী হবে। যেমন, অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন একত্র পুঞ্জীভূত আছে, আর বাইরে রয়েছে দুইটি কক্ষপথে যথাক্রমে দুইটি এবং ছয়টি ইলেকট্রন। দ্বিতীয় কক্ষবৃত্তের ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণ প্রথম কক্ষবৃত্তের ইলেকট্রনের চেয়ে বেশী (চিত্র ৪১)। অন্যান্য মৌলের পরমাণুতেও



চিত্র ৪১। অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন-বিন্যাস

এইরূপ কেন্দ্র রয়েছে এবং তার বাইরে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। যদি কোন সময় বাইরের শক্তি পেয়ে একটি ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথ ছেড়ে

দূরের কক্ষপথে চলে যায়, তবে শক্তিমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পরমাণুটি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে।

আমরা অনেক সময়েই দেখি গ্যাস থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যেমন, মারকারি ল্যাম্পে, নিয়ন লাইটে। গ্যাসও ত অণু-পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং গ্যাসের পরমাণু থেকেই আলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোন আলোকরশ্মি পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি কোন শক্তিশালী বস্তুকণা যেমন, ইলেকট্রন বা আয়ন বা কোন হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এসে পরমাণুকে আঘাত করে, তখন সেই শক্তি পেয়ে পরমাণুর ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পরমাণুর মধ্যেই অপর একটা দূরবর্ত্তী কক্ষপথে চলে যায়। তখন পরমাণুটি উত্তেজিত অবস্থায় (excited) থাকে। একটু পরেই আবার কক্ষচ্যুত ইলেকট্রনটি নিজের কক্ষে ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় যে শক্তিটা সে পেয়েছিল, সেটা আলো হ'য়ে পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। তাই দেখি, গ্যাস থেকে আলোর বিকিরণ হচ্ছে।

যদি অপর কণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রনটি পরমাণু থেকে একেবারে বিচ্যুত হ'য়ে যায়, তাহ'লে পরমাণুটি আয়নিত হয়। তখন কিন্তু আলো-বিকিরণ হয় না। আরও একটা কথা, গ্যাস যদি খুব কম চাপে থাকে তবেই উত্তেজিত পরমাণু থেকে আলো-রশ্মি বেরোয়। সাধারণ চাপে থাকলে, সেখানে থাকে অসংখ্য অণু-পরমাণু। উত্তেজিত পরমাণু তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে এবং ওর শক্তিটা তাতেই ব্যয় হ'য়ে যায়। সুতরাং সাধারণ চাপে থাকলে গ্যাস থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না। এই কারণেই নিয়ন ল্যাম্পের নলের ভিতর চাপ খুব কমিয়ে দিতে হয়।

কি ধরণের আলো, কত তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, এ সব পদার্থবিদরা স্থির করেন বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্র বা স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে। পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ বর্ণালীতে এসে কতকগুলি সরু সরু রেখা সৃষ্টি করে, একে বলে পরমাণু-বর্ণালী বা রেখ-বর্ণালী। কিন্তু অণু থেকে উৎসারিত আলো বর্ণালীতে দেয় কতকগুলো প্রশান্ত ডোরা বা পটি। একে বলে পটি-বর্ণালী। প্রত্যেক রকম পরমাণুর উৎসারিত আলোর নিজস্ব রেখা আছে, অর্থাৎ তা নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ উৎসারিত করে। নাইট্রোজেনের থেকে যে আলোর তরঙ্গ আসবে, হাইড্রোজেন বা ক্লোরিনের থেকে আসা আলো থেকে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং স্পেকট্রোস্কোপে বর্ণালীর রেখাটি পেলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য জানা যায় এবং তখনই বলা যায় কোন পরমাণু থেকে আলো-রশ্মিটি আসছে। শুধু তাই নয়, বর্ণালী পরীক্ষা থেকে বলে দেয়া যায়, যে পরমাণু থেকে আলো আসছে তাদের তাপমাত্রা কত এবং সেই পরমাণুগুলো স্থির হ'য়ে আছে, না দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে।

এ সব তথ্য মেরুজ্যোতি বুঝতে খুব সাহায্য করেছে। সূর্য্যদেহ থেকে তাপ এবং আলোকের অজস্র তরঙ্গের সঙ্গে প্রচুর সূক্ষ্ম বস্তুকণাও বিচ্ছুরিত হ'য়ে আসে, এই কণাগুলোর প্রধান হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন (বা প্রোটন) এবং ইলেকট্রন। এরা তড়িৎবাহী আয়ন, সে জন্য ত' এমনিই বেশ শক্তিশালী, তাছাড়া এগুলো ছুটে আসে যথেষ্ট গতিবেগে, তাতেও ওদের শক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধসীমায়, যেখানে বায়ু খুবই বিরল এবং চাপ খুব কম, সেখানে এসে এরা গ্যাসের অণু ও পরমাণুর

সঙ্গে ধাক্কা খায়। এখানে অতি-বেগুনী রশ্মিও আসে, এই রশ্মির সংস্পর্শে অক্সিজেন প্রায় সবটাই এবং নাইট্রোজেনের অণুরও অধিকাংশই ভেঙে পরমাণুতে পরিণত হ'য়ে থাকে। এই পরমাণুগুলি শক্তিশালী প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংঘাতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। উত্তেজিত পরমাণু থেকে তারপর আলো বিচ্ছুরিত হয় স্বাভাবিক নিয়মেই, যেমন ক'রে নিয়ন-ল্যাম্পের আলো-বিকিরণ ঘটে। উপরের বায়ু তনুকৃত থাকাতেই এবং ইলেকট্রন প্রোটনের আক্রমণেই আয়নোস্ফিয়ারে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

মেরুজ্যোতির আলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়েছে স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে। মেরুজ্যোতিতে যে উজ্জ্বল একটা সবুজ আলো খুব দেখা যায়, বর্ণালী পরীক্ষাতে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পাওয়া গেছে 5577A°। এ কথা জানা গেছে, কেবলমাত্র অক্সিজেন পরমাণু থেকে এই তরঙ্গ উৎসারিত হ'তে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল উপরের স্তরে অক্সিজেন আছে এবং সেটা পরমাণু হ'য়ে আছে। সেই অক্সিজেন পরমাণু উত্তেজিত হ'য়ে মেরুজ্যোতির আলোর খানিকটা উৎপাদন করছে। তেমনি নাইট্রোজেন পরমাণুর অস্তিত্ব এবং তার উত্তেজিত অবস্থার আলো-বিকিরণও মেরুজ্যোতির বর্ণালী অনুশীলনে ধরা পড়েছে। যে সকল পটি-বর্ণালী ধরা পড়েছে সেগুলো প্রায়ই নাইট্রোজেনের অণু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, মেরুজ্যোতিতে হাইড্রোজেন-সঞ্জাত আলোরশ্মিও ধরা পড়েছে। সৌরকণাস্রোতে যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে তার ত' আলোবিচ্ছুরণ ক্ষমতা নেই। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর মুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে সংহত হ'য়ে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হয়। সেই হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোও উত্তেজিত অবস্থায় মেরুজ্যোতির আলোতে অংশ নেয়। সূর্য্য থেকে প্রবল বেগে হাইড্রোজেন আয়ন ছুটে আসে। বর্ণালী যন্ত্রের পরীক্ষায় মনে হয়, সেকেণ্ডে অন্ততঃ 3000/4000 কিলোমিটার গতিতে এসে এই কণাগুলো বায়ুস্তরের সীমানায় প্রবেশ করে, তাই এদের প্রচুর শক্তি থাকে।

সৌর কণার সবগুলোর গতি এক নয়। তাদের শক্তির পরিমাণও এক নয়। বায়ুর পরমাণুগুলো এদের সঙ্গে ধাক্কা খেলে সেগুলো বিভিন্ন পরিমাণে উত্তেজিত হয়, তাই ভিন্ন ভিন্ন আলোর তরঙ্গ ক্রমাগত উৎসারিত হ'তে থাকে।

মেরুজ্যোতিতে যে আলোর সদাচঞ্চল নৃত্য দেখা যায় আর আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, এটাই তার কারণ। মেরুজ্যোতির বৈচিত্র্যের এটাই হেতু। সৌরকণাগুলো যত বেশী দ্রুতগতিশীল হবে, ততই বেশী তারা বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে ঢুকবে এবং আরও বেশী পরমাণুকে উত্তেজিত করবে ও উজ্জ্বলতর আলোর সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে: যদি সৌরকণা-প্রবাহের জন্যেই মেরুজ্যোতির উদ্ভব, তা হ'লে সেই কণাস্রোত ত' পৃথিবীর উপরে সর্বত্রই আসছে। মেরুজ্যোতি শুধু মেরু অঞ্চলের আকাশে দেখা যায় কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব এর জন্য দায়ী। প্রোটন, ইলেকট্রন এগুলো ত' বিদ্যুৎকণা। এরা যখন প্রবাহিত হয় তখন কার্য্যতঃ একটা তড়িৎপ্রবাহ ব'য়ে যায়। পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র, কারণ পৃথিবী নিজেই হচ্ছে একটা বিরাটাকার চুম্বক। এই চুম্বকের দুই প্রান্ত-মেরু ভৌগোলিক মেরুর কাছেই একটু কোণাকুণি হ'য়ে রয়েছে। উত্তর প্রান্ত রয়েছে 78·5°N এবং 69°W অর্থাৎ গ্রীনল্যাণ্ডে। তড়িৎ-প্রবাহের উপরে

চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব খুব প্রখর। পৃথিবীর কাছে যখন প্রোটন, ইলেকট্রন বা অন্যান্য আয়ন উপস্থিত হয় তখন এরা চুম্বকের আকর্ষণে চুম্বক-রেখার নির্দেশে বেঁকে যায় এবং উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এসে জড় হয়। এই প্রান্তদেশেই চৌম্বক ক্ষেত্র খুব জোরালো এবং শক্তিশালী। সুতরাং দুই মেরু-অঞ্চলের বাতাসের কণা থেকেই মেরুজ্যোতি দেখা যায়।

বিজ্ঞানী ব্রিকল্যাণ্ডের পরীক্ষায় এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একটি চৌম্বকীয় গোলক তৈরী ক'রে তার উপরে ফসফরের প্রলেপ দিয়ে নেন। এটিকে একটি স্বল্প চাপের প্রকোষ্ঠে রেখে তাতে ইলেকট্রন-রশ্মি প্রেরণ করেন। দেখা গেল, গোলকের দুই প্রান্তে আলোর বিকিরণ হচ্ছে, মেরুজ্যোতির অনুরূপ।

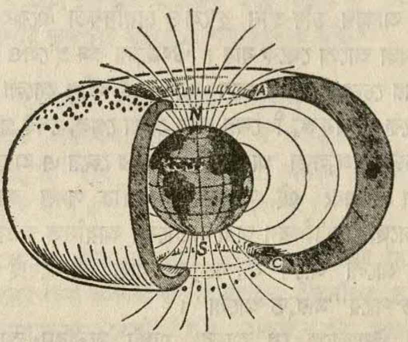
চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির প্রভাব বিদ্যুৎকণাগুলোর গতিবিধির উপর খুব প্রবল। চুম্বক-শক্তির অতি সামান্য পরিবর্তন হ'লেই বিদ্যুৎকণাগুলোর গতির দিক এবং বেগ বদলে যায়। ওরা তখন ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে, তাই অনবরত মেরুজ্যোতিতে আলোর উজ্জ্বলতার আর আকারের পরিবর্তন দেখা যায়।

চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে মেরুজ্যোতির এবং আয়নোস্ফিয়ারের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যে কম্পাসের কাঁটা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করি, সেটা ত' পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্র আছে বলেই। অনেক সময় দেখা যায়, যে কম্পাস-কাঁটা তার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন ধরে এটা হ'তে পারে। এবং অনেক সময় সেটা কাঁপতে থাকে। তখন বোঝা যায়, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন চলছে—একে বলে "চৌম্বক-ঝড়" (Magnetic storm)। সৌরকলঙ্কের বছরগুলিতে এ রকম চৌম্বক-ঝড় খুব বেশী হয়। সৌরকলঙ্ক থেকে অত্যধিক বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ ছুটে আসে এবং পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তোলে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে। চৌম্বক-ঝড়ের সময় মেরুজ্যোতি তাই খুব উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়। চৌম্বক-ঝড়ের সময় আয়নোস্ফিয়ারের বিরাট সব পরিবর্তন হয়। F_2-স্তর ত' খুবই অস্থির হ'য়ে পড়ে। বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন দুষ্কর হয়ে ওঠে। সমস্ত আয়নোস্ফিয়ারটাই এলোমেলো হ'য়ে যায়। রেডিও সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হ'য়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, সাতাশ দিন পরপর তীব্র মেরুজ্যোতি এবং আয়নোস্ফিয়ারের চৌম্বক-ঝড়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনে রাখতে হবে, সূর্য্যও 27 দিনে নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসে। মনে কর, আজ সৌরদেহে কলঙ্ক দেখা দিল এবং সেজন্য আয়নোস্ফিয়ারে ঝড় দেখা দিল। সূর্য্য ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই সৌরকলঙ্কগুলি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরে যেতে থাকবে। এইভাবে সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর বিপরীত দিকে গিয়ে অদৃশ্য হ'লে সৌরকলঙ্কের প্রভাব কমে যাবে, আয়নোস্ফিরার সুস্থির হবে, মেরুজ্যোতি স্তিমিত হবে। সাতাশ দিন পরে সেই সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর মুখোমুখী হবে (যদি তখনও তার অস্তিত্ব থাকে), তখন আবার মেরুজ্যোতির উজ্জ্বলতা বাড়বে। চৌম্বকঝড়েরও প্রাবল্য দেখা দেবে।

বেশী দিনের কথা নয়—এই কয়েক বছর হ'ল বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ আর রকেট পাঠিয়েছিলেন বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্তরে অর্থাৎ আয়নোস্ফিয়া-

রেরও অনেক উপরে। উদ্দেশ্য ছিল বহিঃস্তরের সীমানার মহাজাগতিক রশ্মির এবং বিদ্যুৎকণার তথ্য-সন্ধান। দেখা গেল, নিরক্ষরেখা অঞ্চলের উপরের আকাশের বহিঃস্তরে বিদ্যুৎকণার পরিমাণ বেশ বেড়ে যাচ্ছে। এটা আগে ভাবতেও পারা যায়নি, ধারণা ছিল অধিকাংশ বিদ্যুৎকণা গিয়ে জড় হবে মেরু অঞ্চলের উপরে চুম্বক-ক্ষেত্রের



চিত্র ৪২। ভ্যান-এলেন স্তরের অবস্থান

প্রভাবে। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, 2000~4000 কিলোমিটার উচ্চতায় অর্থাৎ আয়নোস্ফিয়ারের অনেক উপরে একটা পুরু স্তরে প্রচুর বিদ্যুৎকণার (ইলেকট্রন ও প্রোটনের) ঘনবসতি রয়েছে। নিরক্ষরেখা অঞ্চলের আকাশেই এটা ধরা পড়ল। এটা পেরিয়ে আরও উপরে গেলে প্রায় 15000 কিলোমিটার উচ্চতায় আর একটা এমনি ঘন বিদ্যুৎস্তর রয়েছে। এই স্তরগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন ভ্যান-এলেন আর তাঁর সহকর্মীরা, এই জন্য এই স্তর দু'টোকে বলা হয় "ভ্যান এলেন দীপ্তি স্তর" (Van Allen Radiation belt) অর্থাৎ, পৃথিবীর অনেকটা বাইরে দুটো বিদ্যুৎ-খোল রয়েছে, (চিত্র ৪২)। এখন বোঝা গেছে সৌরদেহ থেকে যে বিদ্যুৎ-কণা-প্রবাহ আসে, সেটার উপর পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাব যথেষ্ট দূরে থাকতেই পড়ে। ফলে, সৌরকণাগুলো বিক্ষিপ্ত হ'য়ে সর্পিল পথ ধরে চলতে থাকে। এবং তড়িৎ-চুম্বকের বিধি অনুযায়ী সেই কণাগুলো দুই মেরুপ্রান্তের মধ্যে যাওয়া-আসা ক'রতে থাকে, সরাসরি আর ভূতলের দিকে এগোতে পারে না। সব সময়েই কিছুটা বিদ্যুৎকণা এই স্তর থেকে ছুট দেয় বা মুক্তি পায়। সেগুলো প্রবল আকর্ষণে মেরু প্রান্তের দিকে চলে যায়। আর তার সাহায্যেই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটে।

এ ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে কোন রকমে যদি আমরা হঠাৎ বহিঃস্তরে যথেষ্ট বিদ্যুৎকণা ছেড়ে দিই, সেগুলো চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে ভ্যান-এলেন স্তরে যাবে এবং নতুন আরও মেরুজ্যোতি সৃষ্টি ক'রতে পারবে। এটা সত্যিই সম্ভব হ'ল। 1958 সালে 38° দক্ষিণ অক্ষাংশের বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্তরে প্রায় 500 কিলোমিটার উপরে কয়েকটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ত' মেরুজ্যোতি দেখা গেলই, উপরন্তু এক মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তর গোলার্ধেও পূর্ব্ব গণনা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মেরুজ্যোতির আবির্ভাব

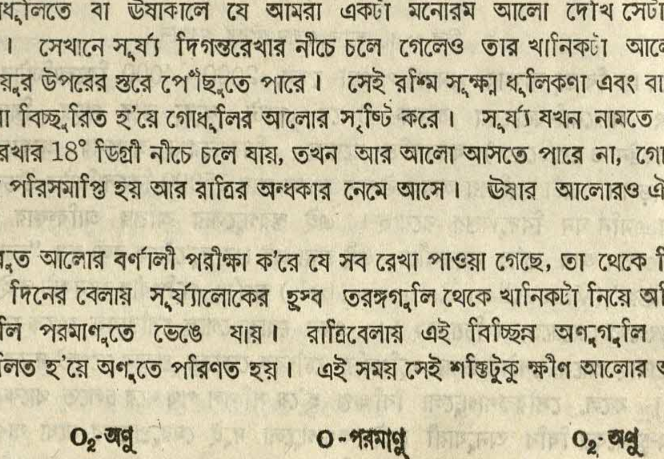
হ'ল। বোমা বিস্ফোরণে ইলেকট্রনগুলি বিদ্যুৎগতিতে ভ্যান-এলেন স্তরে গিয়ে পড়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বিদ্যুৎকণা ঠিকরে বেরিয়ে কৃত্রিম মেরুজ্যোতি সৃষ্টি করেছিল। এই কৃত্রিম মেরুজ্যোতি শুধু বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য নয়, এটা আমাদের তত্ত্বটিকে নির্ভুল প্রমাণ ক'রে দিল। এ ধরনের পরীক্ষা পরে আরও করা হয়েছে।

মারুত আলো (Airglow)

রাত্রির নির্ম্মল আকাশ চাঁদ-হীন হ'লেও চারদিকটা একেবারে নিকষ কালো হ'য়ে যায় না। একটা আবছা আলো থেকে যায়। ঔজ্জ্বল্য কম হ'লেও সেই স্তিমিত আলোতে পথ চলা যায়, বাড়ীঘর চেনা যায়। মনে হবে, এই ক্ষীণ আলো আসছে সুদূর নক্ষত্র-লোক, নীহারিকা থেকে। কিন্তু হিসেব কষে দেখা গেল, সেই গ্রহ-তারা ইত্যাদি থেকে আসা আলোকের যতটা উজ্জ্বলতা থাকার কথা তার চেয়ে এ আলোর উজ্জ্বলতা অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। এবং এই আলো পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতেই পাওয়া যায়। এটাও বেশ বোঝা গেছে, সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাতাসের আয়নিত হওয়া অথবা মেরুজ্যোতির অবশেষ থেকেও এই আলো আসে না, বস্তুতঃ বাতাসের মধ্যেই এই আলোর উৎপত্তি। তাই একে বলা যেতে পারে "মারুত আলো"।

গোধূলিতে বা ঊষাকালে যে আমরা একটা মনোরম আলো দেখি সেটা কিন্তু আলাদা। সেখানে সূর্য্য দিগন্তরেখার নীচে চলে গেলেও তার খানিকটা আলোরশ্মি এসে বায়ুর উপরের স্তরে পৌঁছুতে পারে। সেই রশ্মি সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বাতাসের অণুদ্বারা বিচ্ছুরিত হ'য়ে গোধূলির আলোর সৃষ্টি করে। সূর্য্য যখন নামতে নামতে দিগন্তরেখার 18° ডিগ্রী নীচে চলে যায়, তখন আর আলো আসতে পারে না, গোধূলির আলোর পরিসমাপ্তি হয় আর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। ঊষার আলোরও ঐ একই কারণ।

মারুত আলোর বর্ণালী পরীক্ষা ক'রে যে সব রেখা পাওয়া গেছে, তা থেকে সিন্ধান্ত হয়েছে, দিনের বেলায় সূর্য্যালোকের হ্রস্ব তরঙ্গগুলি থেকে খানিকটা নিয়ে অক্সিজেন অণুগুলি পরমাণুতে ভেঙে যায়। রাত্রিবেলায় এই বিচ্ছিন্ন অণুগুলি আবার পুনর্মিলিত হ'য়ে অণুতে পরিণত হয়। এই সময় সেই শক্তিটুকু ক্ষীণ আলোর আকারে



চিত্র ৪৩। মারুত আলো সৃষ্টির ব্যাখ্যা

বেরিয়ে এসে মারুত আলো সৃষ্টি করে। এ সব পরিবর্ত্তনের সময় সামান্য সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম পরমাণুও উত্তেজিত অবস্থায় এসে যায় এবং আলো বিকিরণ করে।

বায়ু-দূষণ

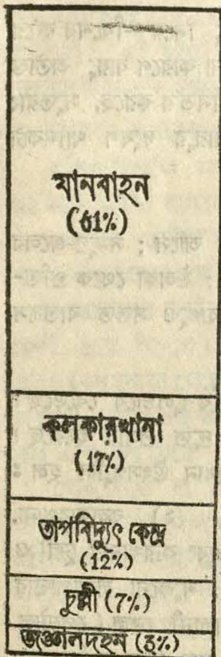
বাতাস সম্পর্কে আর একটা কথা আছে। বর্তমানে বায়ু নিয়ে—বিশেষ ক'রে ট্রোপোস্ফিয়ারের বায়ু নিয়ে—একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নানা কারণে বায়ু অত্যন্ত দূষিত হয়ে উঠছে। বায়ুর উপর আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করছে, সুতরাং এই বায়ুদূষণ চলতে থাকলে অবস্থাটা মারাত্মক হয়ে উঠবে। বায়ুর দূষণ খানিকটা প্রকৃতিজাত, কিন্তু বেশীর ভাগটাই মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য।

বায়ুপ্রবাহ প্রচুর ধূলিকণা মাটি থেকে বাতাসে নিয়ে আসে; সমুদ্র-জলের বাষ্পায়নের সঙ্গে যথেষ্ট লবণকণা এসে বাতাসে হাজির হয়; উলকা থেকে প্রতি-মুহূর্তে প্রচুর ভস্ম বায়ুতে স্থান পায়; তাছাড়া অসংখ্য জীবাণুও সতত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বায়ুদূষণে এগুলি প্রকৃতির অবদান।

এই শতকে, বিশেষতঃ গত তিন চার দশকে জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কলকারখানা যানবাহন ইত্যাদির দ্রুত প্রসার হয়েছে। এই সকল থেকেই বায়ুদূষণ বেশী হয়। বায়ুদূষণের প্রধান উৎসগুলি হল: (১) যানবাহন, মোটরগাড়ী, রেল, এরোপ্লেন ইত্যাদি, (২) কলকারখানা, (৩) তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানীর দহন, (৪) গৃহের এবং কারখানার চুল্লী ও উনুন (৫) অনাবশ্যক জঞ্জাল ও আবর্জনা (garbage), শুকনো লতাপাতার দহন। শেষেরটি ছাড়া অন্যগুলিতে সচরাচর কয়লা অথবা জ্বালানী তেল (পেট্রোল, ডিজেল) পোড়ান হয়। সেইসব থেকে অবাঞ্ছিত ধোঁয়া সতত এসে বাতাসে মিশছে। চিমনীর ধোঁয়া এবং বাড়ীর চুল্লীর ধোঁয়া থেকে অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধূলিকণা, বিশেষতঃ কয়লার গুঁড়ো, বাতাসে আশ্রয় নিচ্ছে। ধূলোকণা ছাড়াও নানা বিষাক্ত গ্যাস আসছে এবং কিছু কিছু তরল পদার্থ সূক্ষ্ম বিন্দু হ'য়ে বাতাসে ভাসছে। কয়লার চুল্লী বা চিমনী থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াতে সর্বদাই কিছু সালফার-ডাইঅক্সাইড থাকে, সেটা পরে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এর সঙ্গে কিছু অতি সান্দ্র আলকাতরা-জাতীয় তরল পদার্থও থাকে। ঘরের পাখা বা জানালার পর্দার দিকে তাকালেই এর অস্তিত্ব জানা যাবে। যানবাহনের জ্বালানী তেল থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোকার্বন-জাতীয় জৈব পদার্থ ত' থাকেই, তার সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইডও থাকে। এগুলো বিশেষ অপকারী।

গ্রামাঞ্চলে যেখানে কলকারখানা নেই এবং যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচল কম সেখানে বায়ু বিশেষ দূষিত হয় না। বায়ুদূষণ বেশী হয় বড় বড় সহরে আর শিল্পনগর-গুলিতে। আমাদের দেশে বায়ুদূষণের পরিমাণ সম্পর্কে তেমন কোন পরীক্ষা হয় নি, সবেমাত্র সুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে অনেকদিন থেকেই এসব সন্ধান করা হ'চ্ছে। মোটরগাড়ী, বাস ইত্যাদি থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় দশ কোটি টন দূষক বাতাসে প্রবেশ করে আর ফ্যাক্টরীগুলি থেকে প্রায় তিন কোটি টন। চুল্লী আর উনুন থেকে বছরে সেখানে দূষিত পদার্থ বাতাসে আসে 1.1 কোটি

টন এবং তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় দুই কোটি টন। পাশের ছবি (চিত্র ৪৪) থেকে এর একটা ধারণা হবে। বিভিন্ন দেশে এবং সহরে অবশ্য এই অনুপাতের তারতম্য হবে।



চিত্র ৪৪

বায়ুদূষণ থেকে নানারকম ক্ষতি সাধিত হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর দূষিত বায়ুর প্রতিক্রিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম কণাগুলো, যাদের ব্যাস মোটামুটি 10^{-5} সেমি, ফুসফুসে গিয়ে প্রবেশ করে এবং অনেক সময় সেখানেই থেকে যায়। এর ফলে খুবই শ্বাসকষ্ট হয়। গলায়, নাকে, শ্বাসনালীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। সিলিকোসিস খুব সহজে হয়। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ঐসব কণার সঙ্গে অনেক জীবাণু কিংবা সান্দ্র তরলও প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানারোগের সৃষ্টি করে। মানুষের হাঁচি-কাশি থেকে বাতাসে যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে সেটা প্রশ্বাসের সঙ্গে অপরের দেহে গিয়ে সেই সব রোগের উৎপত্তি ঘটায়। অনেক সংক্রামক ব্যাধি এইভাবে দূষিত বায়ুর মাধ্যমেই বিস্তারিত হয়। ইংল্যাণ্ডের একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলকারখানা বা অফিসের অনুপস্থিতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই সকল জীবাণুর আক্রমণের ফলে। শুধু মানুষ নয়, দূষিত বায়ুর গ্যাস গ্রহণের ফলে অনেক জীবজন্তুরও ক্ষতি হয়। বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে থাকলে শাকসব্জীর উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণেই বড় বড় ফ্যাকটরীর আশেপাশে বিশেষ শাকসবজী বা ছোট গাছপালা দেখা যায় না। বড় বড় প্রধান সরণীতে প্রচুর যানবাহন চলে বলে তার দুপাশেও ফলন খুব সামান্য। অর্থাৎ বায়ুদূষণের ফলে কৃষি এবং শস্যের চাষবাসের ক্ষতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই কারণে ক্ষতি হয় বছরে পঞ্চাশ কোটি ডলার। আবার দূষিত সবজীর জন্য গরু ছাগল এরাও রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। পারিবেশিক আবহাওয়া দূষণের ফলে কী ভীষণ ক্ষতি হতে পারে তার একটি বাস্তব উদাহরণ এক সাময়িক পত্রিকা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, 1982) থেকে উদ্ধৃত করছি।

"ধানবাদ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে টুণ্ডুতে লেড-স্মেল্টারের কারখানায় সীসা ও রূপা তৈরী হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ সীসার বাষ্প, সালফার ডাইঅক্সাইড ও ধূলো নির্গত হয়। তা'তে কর্মরত শ্রমিকদের উপর যে অস্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়ে, তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয় চারপাশের গ্রামের। কারখানা থেকে নির্গত ধোয়ানী অতি মাত্রায় অম্ল এবং সেই জলে সীসা ও সালফেটের মাত্রা খুব বেশী। সেটা যথাযথ পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় পাশাপাশি অঞ্চলের মানুষ, পশুপাখী ও গাছপালার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে। বাতাসে ভেসে যাওয়া সীসা বাষ্প ও সালফার ডাইঅক্সাইড নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী জটিল বুকের রোগ তৈরী করছে মানুষ এবং পশুর। সেই সঙ্গে গাছের পাতা হয় বিবর্ণ, উদ্ভিদের

ফলের বৃদ্ধি রোধ ঘটে। জীবজন্তুসহ কৃষি হয় বিপন্ন। এই সব ভারী ধাতুকণা ও তাদের রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণে দূষিত বাতাস, জল ও মাটি দিয়ে মানুষ ও পশু-পাখী প্রত্যক্ষভাবে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়; বিশেষ করে স্নায়ুরোগ ও রক্তদূষণ। একইভাবে ঐ সীসা তৈরী কারখানার আশেপাশে গাছপালা, ঘাস ও সবজীর উপর সীসা জমতে থাকে। গবাদি পশুরা ঐ ঘাস খাওয়াতে তাদের দুধে সীসার মাত্রা পরিবেশের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী। ....কৃষিরও স্থায়ী অনিষ্ট ঘটে।"

বায়ুদূষণের জন্য দেশের আর্থিক ক্ষতিও হয় প্রচুর। আর্দ্র দূষিত বায়ুর সালফার-ডাইঅক্সাইড এবং আলকাতরা-জাতীয় ক্ষয়কারী পদার্থগুলি লোহ ও অন্যান্য ধাতু, কংক্রীট, কাঠ রবার, নাইলন প্রভৃতিকে সহজেই আক্রমণ করে ও ক্ষয় করে, যেমন রেলিং, জানালার শিক ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলের অবাহাওয়ার তুলনায় শিল্পাঞ্চলে অন্ততঃ ত্রিশগুণ দ্রুত ক্ষয় পায়। বাড়ীঘর, জামাকাপড় ইত্যাদি নোংরা হওয়ার ফলে সেগুলোকে ঘনঘন পরিষ্কার করার জন্য কেবল অতিরিক্ত সময়ের ব্যয় হয় তাই নয়, সেজন্য সোডা সাবানের খরচও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ধোঁয়াশা ঃ সাধারণতঃ ধোঁয়া আর কুয়াশার সংমিশ্রণেই ধোঁয়াশার সৃষ্টি। ঘন ধোঁয়ার প্রচুর সুক্ষ্ম কঠিন কণাগুলোর উপর জলবিন্দু এবং অন্যান্য সান্দ্র তরল জমে গাঢ় ভারী অস্বচ্ছ বায়বীয় পরিবেশ তৈরী করে, সেটাই ধোঁয়াশা। একটা গভীর আচ্ছাদনের মত ঢেকে থাকে। বড় বড় সহরে ও শিল্প নগরীতে, যেখানে প্রচুর ধোঁয়া আছে, সেখানেই ধোঁয়াশা বেশী হয়। এর মধ্যে অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসও থাকে। মাটির উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল ধোঁয়াযুক্ত বায়ুর উপর যদি একটি উষ্ণতর বায়ুস্তর এসে স্থিতিশীল হয় তবে সহজেই ধোঁয়াশা গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। অপ্রতুল বায়ুচলাচলের জন্য এই ধোঁয়াশার অবস্থা অনেক সময় ধ'রে থাকে, এমন কি তিন চার দিন থাকতে পারে। কয়লার চুল্লী বা ফ্যাক্টরী থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াশাতে যথেষ্ট সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে। এজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে খুব কষ্ট হয় এবং ফুসফুসের ও শ্বাসনালীর প্রদাহ হয়। বিষাক্ত গ্যাসের জন্য মৃত্যুসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। নানাস্থানে অনেক ধোঁয়াশা-জনিত দুর্ঘটনা ঘটেছে; কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ—

স্থান	তারিখ	প্রতিক্রিয়া
১। নিউইয়র্ক	24-30 নভেম্বর 1966	মৃত্যু ঃ 168
২। লণ্ডন	5-9 ডিসেম্বর 1952	মৃত্যু ঃ 4000
৩। ডোনোরা (ফিলাডেলফিয়া)	6-31 অক্টোবর 1948	মৃত্যু ঃ 20, অসুস্থতা 6000

একটি বিশেষ ধরণের ধোঁয়াশা, যেটা যানবাহনের অতিরিক্ত ধোঁয়া থেকে কুয়াশার সংযোগে তৈরী হয় সেটাকে বলা হয় আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা Photo-chemical smog। জ্বালানি তেল, ডিজেল, পেট্রোল প্রভৃতি পোড়ানোর ফলে মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোকার্বন জাতীয়-পদার্থ

থাকে এবং সেই সঙ্গে তাপের জন্য উদ্ভূত বেশ খানিকটা নাইট্রোজেন অক্সাইডও (NO, NO_2) থাকে। সূর্যালোকে এই সব পদার্থগুলির আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোকার্বন-জাতীয় জৈব পদার্থগুলি জারিত হয় ; কিছু ঝাঁঝালো এবং বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে। এই পদার্থের মধ্যে থাকে বিশেষ ক্ষতিকর পার-অক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট, সংক্ষেপে PAN। যানবাহনের ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াশাতে যথেষ্ট PAN থাকায় তা দুঃসহ। লস এঞ্জেলস সহরে এ রকম ধোঁয়াশা বেশী দেখা যায়। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় সহরেও এরূপ ধোঁয়াশার প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

ধোঁয়াশার সালফার-ডাইঅক্সাইড বাতাসের আর্দ্র বস্তুকণার সঙ্গে মিশে কলয়ডীয় এয়ারোসল তৈরী করে। এটি শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ ক'রে বিপত্তি ঘটায়। সামান্য পরিমাণ (100 Mg/m^3) গ্রহণ করলে বিশেষতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা গুরুতর ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। এমন কি তরুণ ও শিশুদেরও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। হাঁপানির রোগীদের মৃত্যুও হ'য়ে থাকে।

ধোঁয়াশাতে নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড থাকে। এই গ্যাস (NO_2) 0.5 নিযুতাংশ (ppm) বায়ুতে থাকলে উদ্ভিদ ও ফলাদির বৃদ্ধি রোধ করে। আরও বেশী পরিমাণ থাকলে (>100 ppm) শ্বাসনালী আক্রান্ত হয় এবং নিউমোনিয়া হয়।

যানবাহনের মোটরের ভিতরের ঘর্ষণকালে কিছু ওজোন তৈরী হয় এবং সেটা ধোঁয়াশাতে থাকে। 1 ppm মাত্রার ওজোন অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্ভিদের প্রচুর ক্ষতি করে। বিশেষ ক'রে মটরশুঁটি জাতীয় গাছের পাতা, তামাকপাতা প্রভৃতিকে একেবারে বিবর্ণ ও নষ্ট ক'রে দেয়। এটা শ্বাসকষ্টেরও একটা কারণ।

আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশাতে রয়েছে ঝাঁঝালো অ্যাক্রোলিন, PAN ইত্যাদি। এগুলো থেকে খুব চোখের যন্ত্রণা হয়। তাছাড়া সামান্য পরিমাণ PAN সবুজ উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে।

ধোঁয়াশার জন্য সূর্যালোকের অধিকাংশই এসে মাটিতে পৌঁছয় না। পাতার সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয় ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না। আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের উপরেই সূর্যালোকের বিশেষ প্রভাব আছে। সূর্যালোকের অভাবে কর্মক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। দীর্ঘ সময় স্তিমিত আলোতে অথবা অন্ধকারে কাজ করলে বিষণ্ণতা এসে পড়ে। পরোক্ষে এসব উৎপাদনের ক্ষতি করে। ধোঁয়াশার জন্য যানবাহন চলাচল সীমিত থাকে। এরোপ্লেনের যাতায়াত বন্ধ রাখতে হয়। এর জন্যও কোটি কোটি টাকার ক্ষতি অনিবার্য। আশার কথা, সমস্ত জাতিই এই মানুষের তৈরী উৎপাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এখন সচেষ্ট। উন্নত ধরণের ইঞ্জিনের ব্যবস্থা, চিমনীর গ্যাসের পরিষ্করণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করার জন্য অনেক দেশেই আইন তৈরী হচ্ছে।

* * * *

পৃথিবী বাতাসের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে আছে। তাই আমাদের অস্তিত্ব। শুধু যে অক্সিজেন দিয়ে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তথা প্রাণ ধারণে বাতাস সাহায্য করছে তাই নয়, সমস্ত জীবজগতের খাদ্যের প্রধান যোগানদারও বাতাস। বাতাসের

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর ক'রে উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব আর বৃদ্ধি। আর সেই উদ্ভিদই মেটাচ্ছে সমস্ত প্রাণীজগতের খাদ্যের প্রয়োজন।

শুধু তাই নয়, যদি এই বাতাসের মোড়কটা হঠাৎ কোন কারণে উঠে যায় বা লোপ পায় তাহ'লে দিনের বেলা সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি সরাসরি পৃথিবীর উপরে পড়বে আর খানিকক্ষণের মধ্যে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে শুষ্ক মরুতে পরিণত হবে। জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পাবে। আর রাত্রিতে হ'লে সব কিছু জমে এত হিমশীতল হবে যে প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

বাতাস আছে, তাই উল্কার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি। বাতাস না থাকলে লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড এসে সারা পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত আর আগুন ধরিয়ে দিত।

শব্দ যে কম্পন সৃষ্টি করে সেটা বাতাসের মাধ্যমে চারিদিকে পরিচালিত হয়। সেই কম্পন এসে যখন কানের পর্দায় আঘাত করে তখন মস্তিষ্ক সেটা জানতে পারে। বিভিন্ন তরঙ্গের কম্পন থেকে মস্তিষ্ক বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য ধরতে সক্ষম। বাতাসই আমাদের শব্দের পরিবহণকারী। বাতাস আছে তাই যেমন মেঘগর্জন শুনতে পাই, শুনতে পাই পাখীর কূজন, তেমনি আবার শুনতে পাই লতা মুঙ্গেশকরের সুরলহরী। বাতাস যদি শব্দ বহন না ক'রত, তাহ'লে কি হ'ত? উচ্চারণও হ'ত না, কথাও বলা যেত না।

বাতাস আছে, তাই বসুন্ধরা এত শস্যশ্যামলা, ধরিত্রীর এত রূপ। বাতাস আছে, তাই মেঘকে ধরে রাখছে, বাতাসের জন্যই ত মাথার উপরের আকাশ এত বৈচিত্র্যময়।

সুদূর অতীতে মানুষের প্রত্যয় ছিল যে পঞ্চভূত দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৃষ্টি, বাতাস তারই একটি, সে ধারণা থেকে অনেকদূরে আমরা সরে এসেছি। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা মানুষকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তার ফলে মানুষ বাতাসের রাজ্যের যেসব কথা জেনেছে, যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারই সংক্ষিপ্ত সংবাদ রয়েছে এই পৃষ্ঠাগুলিতে। কিন্তু এখনও জানার অনেক বাকী। আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে অতি সামান্যই এ পর্য্যন্ত জেনেছি আমরা। উপরের স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় এখনও আমাদের গোচরে আসে নি। একথা সত্য, বায়ুর অনেক কিছুই আমরা নিজেদের প্রয়োজনে সার্থক প্রয়োগ করেছি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সংঘটন-প্রক্রিয়াগুলিকে এখনও আমরা আয়ত্তে আনতে পারিনি। কিন্তু যে মানুষ আজ পরমাণুর কেন্দ্র থেকে শক্তি আহরণ করছে, যে আজ অনায়াসে চাঁদের বুকে পদচারণ করছে, সেই মানুষ যে প্রক্রিয়াগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে, সেটা সুনিশ্চিত। সেদিন মানুষ নিজের ইচ্ছামত বৃষ্টি নামাবে, মেঘের বিদ্যুৎভার টেনে নিয়ে এসে নিজের প্রয়োজনে লাগাবে, বায়ুপ্রবাহের গতিশক্তিকে সংগ্রহ ক'রে মেসিন চালাবে, ঝড়ঝঞ্ঝাকে সংরোধ করে তার প্রলয় তাণ্ডব থেকে নিজেকে রক্ষা করবে—সেই সম্ভাবনা রয়েছে।

ধাতুর কথা

—অধ্যাপক বেদুইন চক্রবর্ত্তী তার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে আমাকে সাহায্য করেছেন; তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ বইয়েরও কয়েকটি ছবি কল্যানীয়া মালবিকা চৌধুরী এঁকে দিয়েছে, তার জন্য আমার স্নেহাশিস রইল।—

প্রঃ চঃ রঃ

১

ধাতুর কথা

পূর্বাভাস

বর্তমান মানবসভ্যতায় ধাতুর দান অপরিসীম। আজকের দিনে ধাতুকে বাদ দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম করা কল্পনার অতীত। কলমের নিব থেকে শুরু করে কামান বন্দুক পর্যন্ত, জলের পাইপ থেকে আরম্ভ করে মোটর ইঞ্জিন পর্যন্ত, সবই ধাতু নির্ভর। লাঙলের ফলাতে ধাতু আবার উড়োজাহাজেও ধাতু। যানবাহনে, অস্ত্রে, যন্ত্রে, মুদ্রায় সর্বত্রই কোন না কোন ধাতুর প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় এবং তার ব্যবহার খুব বেশী পুরানো নয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মানুষের ধাতু সম্পর্কে সচেতনতা আসে এবং তারও প্রায় একহাজার বছর পরে তার ব্যবহার শুরু হয়। এখন এযুগে অবশ্যই লোহা আর ইস্পাতের প্রয়োগ খুবই বেশী, কিন্তু প্রাচীনযুগে মানুষের সঙ্গে প্রথমে লোহার পরিচয় ঘটে নি। যে ধাতুর সঙ্গে মানুষ প্রথম পরিচিত হয়েছিল তা হল সোনা আর তামা। ধাতুর সন্ধান কি করে প্রথম সম্ভব হল সেটা জানতে হলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটু পূর্বকথা বলা প্রয়োজন।

আজ থেকে অন্ততঃ দশলক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম অভ্যুদয় ঘটেছিল। আজকের দিনের হোমো-সেপিয়েনস্ বা বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে সেই আদিম যুগের মানুষের বিস্তর ব্যবধান। মানুষেরই নানা প্রজাতির মধ্য দিয়ে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক ইত্যাদির পরিবর্তন হতে হতে মানুষ আজকের আকার ও অবয়ব পেয়েছে। প্রথম যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে পশুর জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পরিমিত আহার সংগ্রহ আর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান ছিল মানুষের একমাত্র প্রয়োজন। বিশাল

এবং হিংস্র সব জন্তু-জানোয়ার দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে অতি প্রতিকূল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে প্রাণধারণ করতে হত। সে সময় বনজঙ্গলের গাছপালাই ছিল মানুষের বড় সহায় ও অবলম্বন। গাছের ফলমূলই ছিল তার প্রধান খাদ্য। জন্তুর আক্রমণের বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য রাতের অন্ধকারে তাকে উচ্চ বৃক্ষের উপরেই আশ্রয় নিতে হত। আবার দিনের বেলায় গাছের ডাল ভেঙে নিয়েই সে হিংস্র পশুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হত। গাছের ডাল ছিল তার প্রথম হাতিয়ার। এ ছাড়াও মানুষ তখন বড় বড় পাথর ছুঁড়েও দূর থেকে শত্রুকে আঘাত করত। ঐ পাথর দিয়েই সে কাছিম, হরিণ, আর ছোট ছোট প্রাণীকে মেরে তার কাঁচা মাংস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। কখনও কখনও মানুষ দেখতে পেত, হঠাৎ পাথরটি হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে আর পাথরের ধারালো এবং ছুঁচলো মুখ বের হয়েছে। এসব দেখে মানুষের একটু বুদ্ধি খেলল, সে পাথর ভেঙে ভেঙে বা ঘষে ঘষে সেটাকে তীক্ষ্ন ও প্রখর করে তুলে ব্যবহার করতে শুরু করল। খাদ্যের প্রয়োজনে শিকারের পশু বধ করতে, কুপিয়ে মাংস কাটতে, মাটিতে গর্ত করে গাছের মূল তুলতে এমনি তীক্ষ্নতর পাথরের যন্ত্র অনেক সুবিধা এনে দিল। প্রত্নবিদেরা নানা স্থানে—মধ্য প্রাচ্যে, প্যালেস্টাইনে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ ভারতে, স্পেনে মাটি খুঁড়ে আর গুহার মধ্যে এইসব পাথরের হাতিয়ারের সন্ধান পেয়েছেন। শিলাতো সহজে নষ্ট হয় না; কালজয়ী এইসব পাথর সেই সুদূর অতীতের ইতিবৃত্ত নিঃশব্দে আমাদের সামনে খুলে ধরেছে। এর সঙ্গে মানুষ গাছের ডালের প্রান্তটিকেও ছুঁচলো করে কিংবা অতিকায় জন্তুর শক্ত হাড়কে শানিত করেও ঐভাবে প্রয়োজনে লাগাতে শিখল। এসব মানুষের প্রথম যন্ত্র। এভাবে মানুষ প্রথম যন্ত্র-স্রষ্টা হল। যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার শুরু সেই পাথরের অস্ত্র ব্যবহার থেকে। যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ বড় বড় পশুকে হারিয়ে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। বর্তমানের মানুষের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মূলে যন্ত্রের দান অপরিসীম। আজও মানুষ নূতন থেকে নূতনতর যন্ত্র তৈরী করে চলেছে ক্ষমতা আর প্রগতির তাগিদে।

সেই পুরাকালের মানুষের আর একটা বিষয়ে ছিল প্রচণ্ড ভীতি—সেটা হল অগ্নিদানব। মাথার উপরের আকাশে মেঘে মেঘে বিদ্যুতের দীপ্তি ও বজ্র নির্ঘোষে সে বিস্ময়ে হতবাক হত এবং ভয় পেত। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত লেলিহান অগ্নিশিখাকে সে ভয় করত, প্রচণ্ড দাবানলে বন ছারখার হয়ে পুড়ে যেতে দেখে সে ভয়ে পালাত। এমনি সময় হয়ত কখনও কখনও হাতের গাছের ডালটি দাবানলের সংস্পর্শে এসে কিংবা জ্বলন্ত লাভার

ছোঁয়া লেগে হঠাৎ জ্বলে উঠত। তার চেয়েও বেশী সম্ভাবনা, দুটি পাথর ঘষে ঘষে যন্ত্র বানানোর সময় একটা ফুলকি গিয়ে শুকনো কাঠ বা ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এ থেকেই মানুষ আগুন সৃষ্টি করার কৌশলটি শিখে নিয়েছিল সন্দেহ নেই। অর্থাৎ যে অগ্নিদানব মানুষের ভীতির কারণ ছিল, সে মানুষের হাতের মুঠোয় বন্দী হল। আগুন জ্বালাবার পদ্ধতির আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রায় নিয়ে এল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। মানুষের যাত্রাপথে এক নতুন পদক্ষেপ আরম্ভ হল। সভ্যজগতে প্রবেশ করার প্রথম দুয়ারের চাবিকাঠি তার হাতে এল।

অল্পকালের মধ্যেই মানুষ অগ্নিকে সরাসরি তিনটি প্রয়োজনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রথমতঃ, আগুন জেলে সে গুহাবাসী সবলতর হিংস্র পশুকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই গাছ থেকে নেমে গুহাতে অনেক নিরাপদ আশ্রয় পেল। আগুনের ভয়ে পশু গুহা ছেড়ে দূরে সরে গেল। দ্বিতীয়তঃ, অগ্নির উত্তাপ মানবদেহে অনেক আরাম এনে দিল। নগ্নদেহের শীতের কাঁপুনি আর দুরন্ত শীতের রাত্রির বিভীষিকা থেকে সে রক্ষা পেল। তৃতীয়তঃ, মানুষ আগুনে মাংসকে ঝলসিয়ে নিয়ে খেতে অভ্যস্ত হল। আগে কাঁচা মাংস খাদ্য ছিল, সেটা কষ্টসাধ্য ছিল, আর হজমেও সময় লাগত বেশী। একদিন হয়ত খেতে খেতে একটুকরো কাঁচা মাংস হঠাৎ আগুনে পড়ে গিয়েছিল। সেই পোড়া মাংস খেয়ে দেখল সেটা বেশ স্বাদু। অথবা এমন হতে পারে, দাবানলে পোড়া কোন জন্তুর মাংস খেতে গিয়ে মানুষ প্রথম আগুনে ঝলসানো মাংসের স্বাদ পেয়েছিল। বলা যেতে পারে, এইভাবেই মানুষের পাকশিল্পে প্রথম দীক্ষা হয়েছিল।

প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত অনেক গুহাতে দেখা গেছে সেখানে পোড়ামাটি আর ছাই রয়েছে। আর তার সঙ্গে বা কাছাকাছি রয়েছে পাথুরে হাতিয়ার এবং হরিণ, মহিষ প্রভৃতি নানারকম জন্তুর ঝলসানো হাড়গোড়। এসব থেকেই তখনকার মানুষের স্বভাব কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ পশু শিকার করে আনত, জঙ্গলের অজস্র কাঠ নিয়ে এসে গুহাগৃহে আগুন জ্বালাত, মৃত জন্তুকে পাথরের অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে প্রিয় খাদ্যে পরিণত করে নিত। অবশ্য এর সঙ্গে গাছের ফলমূলের অফুরন্ত ভাণ্ডার তো ছিলই। এই ছিল পুরাকালের প্রাণধারণের পন্থা।

হাতিয়ার এবং যন্ত্র তৈরী করতে এবং প্রয়োগ করতে পেরেছিল বলেই বহুগুণ অধিকতর বলশালী পশুকে মানুষের পক্ষে জয় করা সম্ভব হয়েছিল। এই কাজে মানুষের মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধি সহায় হয়েছে। পশুর পেশীশক্তি, দন্ত,

নখর ছিল বটে, কিন্তু সে হাতিয়ার তৈরী করতে সক্ষম ছিল না। দূর থেকে পশু তার শত্রুকে আঘাত বা হনন করতে পারত না, তাই পশুকে মানুষের কাছে পরাজয় বরণ করতে হল। পাথরের কুড়াল, বর্শা ইত্যাদি তৈরী করার শিল্প আয়ত্ত করতে এবং ব্যবহার শিখতে অবশ্যই লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গিয়েছিল। পাথুরে যন্ত্রের উপর নির্ভর করেই তখন মানুষের শক্তির বিকাশ; ধাতু তখন মানুষের অজানা ছিল। সেইজন্য ঐ পুরাকালের যুগটাকে **প্রস্তর যুগ** বলা হয়। বস্তুতঃ জীবনযাত্রার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিচার করে নৃতত্ত্ববিদেরা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন ঃ

১। পুরাপ্রস্তর যুগ	২। নবপ্রস্তর যুগ
৩। তাম্র যুগ	৪। কাংস্য যুগ
৫। লৌহ যুগ	৬। আধুনিক বিজ্ঞান যুগ।

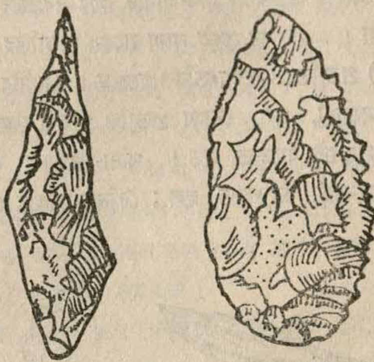
মানবজাতির সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত কালটিকে বলে "পুরাপ্রস্তর যুগ (Paleolithic era)"। সে যুগের প্রথম দিকে প্রকৃতিলব্ধ খণ্ডিত পাথরই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ধীরে ধীরে মানুষ বড় বড় পাথর থেকে স্থূলধরণের অস্ত্র ও যন্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হল, তার মধ্যে প্রধান ছিল কুপিয়ে কাটবার জন্য কুড়াল, দূর থেকে আঘাত-হানার জন্য বর্শা, চাঁছনি বা ছুরির অনুরূপ ফলক ইত্যাদি। এরপর ফ্লিন্ট জাতীয় কঠিনতর পাথর দিয়ে অন্য শিলাকে



চিত্র ১। আদিম যুগের মানুষ চকমকি পাথরের যন্ত্র তৈরী করছে

কেটে কেটে যন্ত্র তৈরী করার কৌশল শিখল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে, মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাথর দিয়ে যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করার কৌশলেরও

খানিকটা উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছিল। মানুষ প্রথমে যে সব পাথুরে হাতিয়ার ব্যবহার করত তাদের বলা হয় ইয়োলিথ (eolith)। এই প্রস্তরযুগের মানুষ আহার-সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার উপায় নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল—একথা আগেই বলেছি। তার জীবনযাত্রার উন্নতি সেই কারণে এত মন্থর ছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

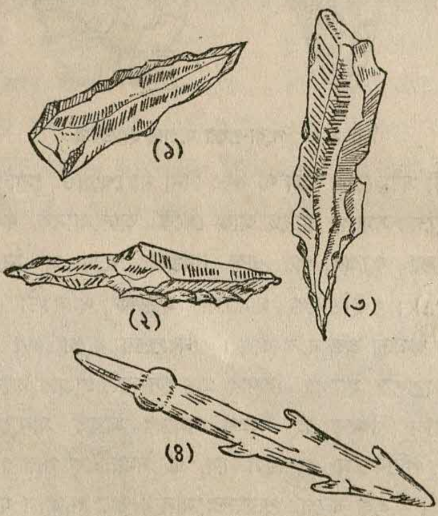


চিত্র ২। পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

সময়ের একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে টানা না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় পুরাপ্রস্তর যুগের সমাপ্তি ঘটেছে আজ থেকে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। পুরাপ্রস্তর যুগের পর এল নবপ্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক যুগ (Neolithic era)। ইতিমধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক খানিকটা দূরদর্শিতা আর পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। নবপ্রস্তর যুগে এর বিশেষ পরিচয় মেলে। এই নবপ্রস্তর যুগের বিস্তার মাত্র ছয়-সাত হাজার বছর ; পুরাকালের তুলনায় প্রায় নগণ্য। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের জীবনধারার এমন অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল যে এই সময়টিকে পুরাকালের বিপ্লব-যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগের প্রারম্ভেই মানুষ তার পাথুরে যন্ত্রগুলির অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। সহজে এবং আরও জোরের সঙ্গে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য কুড়াল হাতলযুক্ত হল। এই সময়েই শক্ত জিনিষে ছিদ্র করার জন্য বেধন-যন্ত্র, বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হল। পাথরের তীক্ষ্ণ ফলক বা হাড়ের তৈরী ফলক বর্শা ও তীরের মাথায় বসিয়ে অস্ত্রকে আরও ক্ষুরধার করার কৌশল আয়ত্ত করা হল। প্যালেস্টাইন, মিশর, দক্ষিণ-ভারত, আফ্রিকা—অনেক অঞ্চলেই পুরাবিদেরা এসব বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এই সকল উন্নত ধরণের পাথুরে যন্ত্র সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পদার্থবিদ্যার এক ক্ষীণ

সূত্রপাত। আর এরও অনেক আগে মানুষ যখন অগ্নি-প্রজ্বলনের উপায় আয়ত্ত করে, তখনই তার রসায়নে হাতে-খড়ি হয়েছিল।

এর চেয়েও বড় কথা মানুষ এই নবপ্রস্তর যুগে খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল। যাযাবর মানব ঘুরতে ঘুরতে প্যালেস্টাইনে বা মিশরের নীল-নদের তীরে বিভিন্ন বন্য-তৃণের সন্ধান পেয়েছিল যার বীজ খাদ্যোপযোগী। আবার এই বীজ চাষ-আবাদ করে নবপ্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য-উৎপাদনে সমর্থ হল। এই সব তৃণই নানা সংকর প্রজাতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত গম, বার্লি, (যব) প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মাটির নীচে বা গুহাতে পাথরের কাস্তে, নিড়ানী, খল, নোড়া প্রভৃতি পাওয়া গেছে; স্পষ্টতঃই তখন চাষ-আবাদে পাথরের যন্ত্রই ব্যবহৃত হত। খাদ্য-উৎপাদন করতে পেরে মানুষ আহার সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল; দৈনিক শিকার ও ফল-অন্বেষণ থেকে



চিত্র ৩। নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রাদি
(১) ছুরির ফলা (২) তীরের ফলা (৩) বেধন যন্ত্র (৪) হাপুর্ন

অনেকখানি মুক্তি পেল। ইতিমধ্যে ভেড়া, ছাগল, শুয়োর, গবাদি পশুকেও মানুষ ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই পালিত পশুর অধিকাংশই মানুষের খাদ্য যুগিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মালবহনে বা চাষের কাজেও লাগানো হয়েছে। এদের চামড়া ব্যবহৃত হয়েছে পরিধেয় রূপে।

খাদ্য-উৎপাদন মানুষকে দুর্দিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এনে দিল। আর সঞ্চয় করে রাখার জন্য ভাণ্ডের প্রয়োজন দেখা দিল। এর আগেই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে মাটি আগুনে তেতে গেলে সেটা কঠিন হয়ে ওঠে, তখন জলে সেটার আর ক্ষতি হয় না। এই নবপ্রস্তর যুগেই মানুষ মৃৎশিল্পী হয়ে উঠল। শুধু যে নানাধরণের ছোট বড় মাটির পাত্র তৈরী হল তাই নয়; সেগুলিকে নানা বর্ণে ও চিত্রাঙ্কণে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা হল। এ যুগেই আবার চামড়া ও বল্কলের বদলে গাছের তন্তু থেকে পরিধেয় তৈরী শুরু হল। নিউগিনি, সুইজারল্যাণ্ড, মিশরের হ্রদের তীরে এই নিওলিথিক যুগে গাছের খুঁটির উপরে বেশ মজবুত গৃহ তৈরী হয়েছিল, তারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ যথেষ্ট কর্মকুশলতা, প্রখর বুদ্ধি, উদ্যম এবং কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় রেখে গেছে। পরবর্তীকালে নীলনদের তীরে, সিন্ধু তীরে, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে যে সব সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল তার সকল বিদ্যা, কলাকৌশল, আয়োজনের ব্যবস্থা নবপ্রস্তর যুগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

আর এই নবপ্রস্তর যুগের প্রায় প্রারম্ভেই ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় হল। পূর্বেই বলেছি যে দুটি ধাতুর সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল—সে দুটো হল সোনা আর তামা। এর প্রধান কারণ, পৃথিবীর অধিকাংশ সোনাই স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ মৌল অবস্থায় রয়েছে। তামারও বেশ খানিকটা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যেত। অবশ্য অনেক সময় মুক্ত তামা সবুজ কালো রঙে দেখা যায়, কিন্তু একটু পেটালেই লালচে উজ্জ্বল তামা বেরিয়ে আসে। পাথরের তুলনায় এই ধাতু দুইটির ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ নিঃসন্দেহে মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বালু এবং পাথরের মধ্যেই পাওয়া যেত সোনা আর তামা—অবশ্য এই দুটিকেই সেই যুগের মানুষ এক বিশেষ ধরণের শিলা বলে মনে করত। কিন্তু পাথরের মতো এগুলো ভঙ্গুর নয়, পিটিয়ে এদের আকৃতি বদলানো যায়। এই অসাধারণ গুণ প্রাচীন মানুষের মনে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এই জন্যেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের তীব্র আকর্ষণ ছিল এই দুইটি ধাতুর প্রতি। পরিমাণে স্বল্প ও দুর্লভ তথা মহামূল্যবান, সুতরাং সোনা সর্বদাই অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তামা অনেক বেশী পাওয়া গেলেও সমধর্মিতার জন্য সোনার মত তামাও অলংকার বা বিলাস দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই যুগে।

এই দুইটি ধাতুর ব্যবহার অবশ্যই প্রকৃত ধাতু যুগ আরম্ভ হওয়ার বেশ কয়েক হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। সর্বত্র একই সময়ে যে ধাতুদ্বয় ব্যবহৃত হত তা নয়, তবে খ্রীস্টজন্মের চার হাজার বছর আগেই প্রায় সব মানুষই

সোনা ও তামার গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। এর অবশ্য বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফরাসী দেশে নবপ্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে সোনার পুঁতি ও মালা পাওয়া গেছে। মিশরের প্রাচীন কবরে এবং ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন গুহা থেকে নানা রকমের সোনার অলঙ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬০ সালে রাল্‌ফ সলেকী পারস্যের টেপ্‌ সিয়ালকের দুর্গম গুহা থেকে একটি ছোট্ট তামার অলঙ্কার উদ্ধার করেছেন। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা আজ থেকে অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। ১৯৬৪ সনে আনাতোলিয়ার মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি পিন জাতীয় তামার বস্তু। এদের সৃষ্টিকাল আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে। এমনি আরও তামা ও সোনার প্রচুর অলঙ্কার আবিষ্কার হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায়, যাদের সৃষ্টি আনুমানিক ৬০০০-৫০০০ (খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

তাম্র যুগ

প্রথম পরিচয় সোনার সঙ্গে হলেও প্রস্তরযুগের পর স্বর্ণের যুগ আসেনি। কারণ, দুর্লভ সোনা সকল মানুষের প্রতিদিনের কাজে, হাতিয়ার বা যন্ত্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। যে সামান্য সোনাটুকু পাওয়া যেত তার প্রায় সবটাই অধিকতর শক্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীর করায়ত্ত ছিল। তামা সোনার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী এবং সহজলভ্য, তাই তামা ধীরে ধীরে পাথরের জায়গা দখল করে নিল। নবপ্রস্তর যুগের পরে এল তাম্র যুগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কি করে লক্ষ লক্ষ বছরের পাথরের রাজত্বকে হটিয়ে দিয়ে তামা সেটা অধিকার করতে সক্ষম হল। এটা সম্ভব হয়েছিল তামা তথা ধাতুর কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকার জন্য। পাথরের কুড়াল বা বর্শা অল্পেই ভোঁতা হয়ে যায়, তার তীক্ষ্ন ফলকগুলি খুলে পড়ে বা ভেঙে যায়। সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করা বা সারানো কঠিন ও শ্রমসাধ্য। কিন্তু তামা ঘষে নিয়ে সহজেই ক্ষুরধার বর্শা, কুড়াল ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব এবং দীর্ঘ দিন সেটা ব্যবহার করা সম্ভব ; যদি ভোঁতা হয়ে যায় তবে আবার শাণিত করে সহজেই তাকে প্রখর করা যায়। এই ধাতুকে পিটিয়ে এবং (পরবর্তীকালে দেখা গেছে) গলিয়ে নিয়ে বিভিন্ন রূপে বা আকৃতিতে পাওয়া যেতে পারে। তামা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। গলিয়ে নিয়ে তাকে আবার কাজে লাগানো যায়। ভিন্ন ভিন্ন তামার টুকরা তাতিয়ে নিয়ে পিটিয়ে জোড়া দেওয়া চলে। শিলার এ সকল গুণ নেই।

মানুষ যখন তামার এসব চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হল স্বভাবতঃই তখন সে পাথরের পরিবর্তে তামাকে পছন্দ করল।

নবপ্রস্তর যুগের পরিসমাপ্তির একটা সঠিক সন তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। এই আধুনিক কালেও তো কোন কোন গভীর অরণ্যের আদিবাসীদের গাছ কাটতে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এস্কিমোরা এবং অনেক পলিনেশীয় দ্বীপের অধিবাসীরা এখনও পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে। ওরা তামা দেখেছে কিনা সন্দেহ। এই বিংশ শতাব্দীতেও বাইরে থেকে আনা কোন লোহার জিনিসকে তারা অসম্ভব মূল্যবান মনে করে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক এমনি একটি দ্বীপে গিয়ে একটা লোহার পেরেকের বিনিময়ে ছয়টি শূকর পেয়েছিলেন। এটা নিশ্চিত, অনেকদিন ধরে নবপ্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ার আর সোনা-তামার ব্যবহার পাশাপাশি চলেছিল। মেসোপটেমিয়ায়, ইরাকে, ইরানে, মধ্যপ্রাচ্যের নানা পাহাড়ী অঞ্চলের পাথরের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় তামা ছিল যথেষ্ট। পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই তামা আলাদা হয়েছে অথবা মানুষ পাথরকে আগুন দিয়ে তাপিত করে ফাটিয়ে নিয়ে তামা সংগ্রহ করেছে। সেই তামা পিটিয়ে নিয়ে নানা উপকরণ প্রস্তুত করেছে। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও ছিল প্রচুর তামা। সেখানে এই কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্তও স্বাভাবিক তামা নিয়েই নানা কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রমে তামার চাহিদা সর্বত্রই বেড়ে গেল এবং স্বাভাবিক মুক্ত তামার অনটন দেখা দিল। আনুমানিক ৪৫০০~৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে আকরিক শিলা থেকে তাম্র-উৎপাদনের উপায়টি মানুষের আয়ত্তে এল। সেই থেকেই তাম্রযুগের শুরু; সভ্যতার সেটা উষাকাল। যেসব খনিজ-শিলার বিভাজন থেকে প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, সেই সব পাথরকে ধাতুর 'আকরিক' বলা হয়।

প্রকৃতির স্বাভাবিক তামা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা আর পাথরের আকরিক থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তামা উদ্ধার করে ব্যবহার করা— এই দুইয়ের মধ্যে অনেকটাই ব্যবধান। তামা আর অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই মানুষ নানা ধাতু সংযুক্ত পাথর বা ধাতব যৌগ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। বিভিন্ন শিলাচূর্ণ, যেমন সবুজ ম্যালাকাইট, (তাম্রযৌগ), নীল লাজাবর্দ বা ল্যাপিস-লাজুলি (অ্যালুমিনিয়াম যৌগ), লালচে হিমাটাইট (লোহ-যৌগ), ইত্যাদি দেহসজ্জায় বা চিত্রাঙ্কনে মানুষ পুরাপ্রস্তরযুগ থেকেই ব্যবহার করেছে। কিন্তু ওসব যৌগপদার্থ থেকে ধাতুকে উদ্ধার করার কথা ভাবতেও পারে নি।

পাথর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের উপায়টি কি করে মানুষ প্রথম আবিষ্কার করল তার ইতিহাস আজ সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে একটা বিশ্বাসযোগ্য অনুমান অবশ্যই করা যেতে পারে। নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে মানুষ চমৎকার মাটির পাত্র বানাতে পারত তার বহু প্রমাণ আছে। এইসব মৃৎপাত্র তৈরী করার জন্য বড় বড় ঢাকা চুল্লীর প্রয়োজন হয়েছিল। পাত্রের উপর চিত্রাঙ্কণের জন্য ম্যালাকাইট, কিউপ্রাইট, হিমাটাইট প্রভৃতি পাথরের গুঁড়ো ব্যবহার করত। এটা খুবই সম্ভব যে অনেক সময় এই রকম ম্যালাকাইট বা কিউপ্রাইট পাথর (যার মধ্যে তামা আছে) খানিকটা চুল্লীর ভিতরে পড়ে গেছে। সেখানে ছিল উত্তপ্ত কাঠ কয়লা আর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস (অপর্যাপ্ত বায়ুর জন্য)। ফলে ঐসব পাথর বিজারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে জবাকুসুমসংকাশ উজ্জ্বল তামা। বারবার সে আগুনে ফেলে দিয়ে দেখেছে সবুজ ম্যালাকাইট থেকে জন্ম নিচ্ছে লালাভ তামা। আফ্রিকার কাটাংগায় নিগ্রোদের অতি প্রাচীন চুল্লীর ছাইয়ের মধ্যেও পাওয়া গেছে তামার গুটি। সেই চুলা হয়ত তাম্রযুক্ত খনিজ পাথরের তৈরী ছিল এবং সেখানে নিশ্চয়ই অনুরূপ উপায়েই তামার সৃষ্টি হয়েছিল। যে তামা মানুষ বহু পরিশ্রম করে পাথর ভেঙ্গে তিল তিল করে সংগ্রহ করত, সেটাকে পাথরের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তামা উদ্ধারের জন্য তাপমাত্রা প্রয়োজন প্রায় ৮০০° সেণ্টিগ্রেড। মৃৎ-শিল্পীর চুল্লীতে সেই তাপমাত্রা ছিল। আরও পরে যখন আবদ্ধ চুল্লীতে হাঁপরের সাহায্যে জোরে হাওয়া বইয়ে উচ্চতর উষ্ণতা ১১০০° সেণ্টিগ্রেড করা গেল তখন মানুষ অবাক হয়ে দেখল, সেই তামা গলে তরলে পরিণত হয়েছে। আবার ঠাণ্ডা করলেই সেই তরল জমে যায় কঠিন লালচে তামায়। সহজাত বুদ্ধিতেই কয়েক শতাব্দী পরে তরল তামাকে ছাঁচে ঢেলে নিয়ে সে বিভিন্ন উপকরণে পরিণত করতে সক্ষম হল। ধাতুবিদ্যায় মানুষ পারদর্শী হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই মানুষ সে সময় আরও নানা পাথর আগুনে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করেছিল। এমনি করেই হয়ত সে এক সময়ে রূপা এবং সীসার সন্ধানও পেয়েছিল। মিশরের অতি প্রাচীন কবরে সোনার সঙ্গে এসব ধাতুর বস্তুও পাওয়া গেছে। পাথর থেকে ধাতু নিষ্কাশিত করে ঢালাই করে তামার উপকরণ প্রস্তুত করা সম্ভবতঃ ইরাকেই প্রথম হয়েছিল। এই ব্যাপারে যে নিপুণতা, কৌশল এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে মানুষ সে সব গুণের অধিকারী হয়েছিল সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কৃষি ও পশুপালনে, গৃহনির্মাণে, মৃৎশিল্পে, বয়নশিল্পে, গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণে মানুষের তখন অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

কাংস্যযুগ

তাম্রযুগ দীর্ঘায়ু হতে পায় নি। তামার উৎপাদন শুরু হওয়ার হাজার দেড়েক বছরের মধ্যেই ব্রোঞ্জ বা কাঁসা দেখা দিল। ধীরে ধীরে তাম্রযুগের বিলুপ্তি ঘটল। অবশ্য তামা আমরা এখনও ব্যবহার করি নানা কাজে, কিন্তু এখন তামার যন্ত্র বা অস্ত্রের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় না। যতদিন এই দুইটি প্রয়োজনে তামা অপরিহার্য ছিল সেই কালটিকেই তাম্রযুগ বলা হয়েছে। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে তা'তে মনে হয় ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই কাঁসার প্রচলন হয়েছিল, সেই থেকেই কাংস্যযুগের আরম্ভ।

নানা অঞ্চলে কাঁসার তৈরী বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন জিনিষ পাওয়া গেছে, তবে কোথায় প্রথম কাংস্য-শিল্প শুরু হয়েছিল সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। ক্রীট দ্বীপে ঈজিয়ান সভ্যতার মিনোয়ান কৃষ্টিকালের (৩০০০ খ্রীঃ পূঃ) পুরানো কাঁসার মূর্তি পাওয়া গেছে। সুমের অঞ্চলে ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণাংশে আর (Ur) রাজ্যের রাজাদের কবর খুঁড়ে বহু কাঁসার জিনিষের সন্ধান মিলেছে, যার সৃষ্টিকালও অন্ততঃ ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। সমসাময়িককালে ককেসীয় অঞ্চলেও উন্নত কাংস্যশিল্পের অস্তিত্ব ছিল তার চিহ্ন রয়েছে। মিশরের কবরে পাওয়া কাঁসার নানাদ্রব্যও আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরের পুরানো। ২য় ট্রয় নগরী খনন থেকে প্রত্নবিদেরা যে সকল কাঁসার পাত্র উদ্ধার করেছেন সেগুলো প্রস্তুত হয়েছে ২৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও আগে। শুধু মধ্য প্রাচ্যে এই কাংস্য শিল্প আবদ্ধ থাকে নি। ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে ধরে রোমের ভিতর দিয়ে কাঁসারীরা এই শিল্পকে বিস্তারিত করে দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পরে ইউরোপে এই কাংস্য শিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল সন্দেহ নাই।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর ষাটের দশকে অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শ্যামদেশে বা থাইল্যান্ডে একটি গ্রামের মাটির তলা থেকে প্রচুর কাঁসার জিনিষ পাওয়া গেছে—বর্শা, কলসী, বালা ইত্যাদি। পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে এগুলো খ্রীঃ পূঃ ৩৬০০-এরও আগে তৈরী। মধ্য প্রাচ্য থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশী। সে সময় বাণিজ্যিক যোগাযোগ খুব ছিল মনে হয় না। নিজস্ব উপায়েই শ্যামদেশের মানুষ কাঁসা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল মনে হয়। চীন দেশে কাঁসার ব্যবহার ২৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে হয় নি। হ'তে পারে থাইল্যান্ড থেকেই চীনে এই শিল্প বিস্তার লাভ

করেছিল। চীনে তাম্রযুগ প্রায় দেখা দেয় নি ; চীনে সোজাসুজি কাঁসার যুগে চলে এসেছে পাথুরে যুগ থেকে। এই সব থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে কাংস্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতার কাল মোটামুটি ৩২৫০~২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। মহেঞ্জোদারো এবং হরাপ্পার অত্যাশ্চর্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, ছাড়াও রয়েছে অপরূপ কাঁসা ও পেতলের নানা মূর্তি ও বস্তু। তবে এখানে কাংস্য শিল্পের প্রচলন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য বা থাইল্যাণ্ডের অনেকটা পরে। কিন্তু এটা এখন সর্বত্র স্বীকৃত যে সেই যুগের ভারতীয় কাংস্য-শিল্পীরা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও স্বর্ণশিল্পে তখন ভারতীয়দের দক্ষতা মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পীদের তুলনায় কম ছিল।

কাঁসার সন্ধান মানুষ কি করে প্রথমে পেল ? তামা তৈরী করতে গিয়ে সেদিনের তাম্রকারেরা নানা জায়গা থেকে পাওয়া ম্যালেকাইট আকরিক ব্যবহার করেছে। তখন ওরা এটা অবশ্যই লক্ষ্য করেছে, বিভিন্ন উৎস থেকে নিষ্কাশিত তামা সব ঠিক একরকম নয়। কোনটা খুব নরম, সহজে বেঁকে যায়, কোনটা ভঙ্গুর, কোনটা শক্ত, আবার কোনটা সহজে ধার নেয় না, সুতরাং অস্ত্র তৈরীর অনুপযুক্ত। স্বভাবতঃই ভাল তামার জন্য তাম্রকারেরা বিশেষ আকরিক পছন্দ করত। বিভিন্ন তামার গুণের এই তারতম্যের কারণ, তামার আকরিকে অন্যান্য ধাতু যেমন, আর্সেনিক, সীসা, নিকেল, লোহা ইত্যাদির যৌগ কিছু সর্বদাই মিশ্রিত থাকে। ঐসব আকরিকের বিজারণের ফলে যে তামা উৎপন্ন হয় তাতেও ঐসব ধাতু অল্পাধিক মিশে থাকে। ওদের উপস্থিতির জন্যই তামার গুণ বিভিন্ন হয়।

দুইটি ধাতুকে যদি একত্র গলান হয় তবে সচরাচর ওরা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। সেই মিশ্রিত তরলকে ঠান্ডা করলে যে কঠিন মিশ্রধাতু পাওয়া যায় তাকে বলা হয় "ধাতু-সংকর" (alloy)। এই ধাতু-সংকরের গুণ বা ধর্ম আদি ধাতুদ্বয়ের থেকে খানিকটা আলাদা দেখা যায়। কাঁসাও একটি ধাতুসংকর ; তামার সঙ্গে টিনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সচরাচর কাঁসাতে তিন থেকে দশ শতাংশ টিন থাকে। কখনও কখনও আরও কিছু বেশী থাকে। কাঁসা তাম্রজ ধাতু-সংকর।

তাম্রযুগের মানুষ যে তামা তৈরী করত সেগুলো বিশুদ্ধ তামা ছিল না। তামার সঙ্গে অন্য ধাতু কিছু মিশ্রিত থাকত। অর্থাৎ ওগুলো বিভিন্ন ধাতুসংকর ছিল। প্রথম যে ধাতুসংকর মানুষ পেয়েছিল সেটা ছিল তামা আর আর্সেনিকের। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ম্যালাকাইট আকরিক আর্সেনিক-যুক্ত

ছিল। এই ম্যালাকাইট পাথর থেকে উৎপন্ন তামাতে তাই আর্সেনিক মিশ্রিত থাকত। স্বাভাবিকভাবেই এই তামা-আর্সেনিক সংকরের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় মানুষ দুইটি ধাতু পৃথক সংগ্রহ করে নিয়ে গলিয়ে মিশিয়ে এই ধাতুসংকর তৈরী করেনি। দুই-তিন দশক পূর্বে (1961) প্রত্নবিদেরা ইজরাইলে মরুসাগরের (Dead sea) নিকটে এক গভীর দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রাজদণ্ড, মুকুট ইত্যাদি পেয়েছেন। এগুলো তামা-আর্সেনিক সংকরের তৈরী, আর এদের সৃষ্টিকাল ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ।

পাথুরে আকরিক থেকে তামা উৎপাদন করতে পেরে মানুষের খুবই সুবিধা হয়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তামাকে পিটিয়ে বা গলিয়ে নিয়ে ঢালাই করে নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ করা যায়, তামা সহজে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতর তামার কিছু কিছু ত্রুটি ছিল। বিশুদ্ধ তামা বড় নরম এবং সহজেই বেঁকে যায়। তামার অস্ত্র বা যন্ত্র কঠিন আঘাত সইতে পারে না। তদুপরি ঢালাই করতে গেলে কঠিন তামার মধ্যে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ থেকে যায়। ছাঁচ থেকে ঢালাই ভাল হয় না, তামা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কিন্তু আর্সেনিক-যুক্ত তামা অনেক বেশি শক্ত, ছাঁচে ঢালাই করলে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ থাকে না, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর উষ্ণতায় সেটা গলে যায়। এই সব সুবিধার জন্য তখন যে সব আকরিক আর্সেনিক-যুক্ত সেইগুলিই মানুষ তামা উৎপাদনে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু এই তাম্র-আর্সেনিক সংকরের একটা প্রধান দোষ ছিল। আর্সেনিক একটি তীব্র বিষ। চুল্লীতে ধাতু তৈরীর সময় নিশ্চয় বিষাক্ত বাষ্পে বহু মানুষ তখন প্রাণ হারিয়েছে। সুতরাং এই সংকরের ব্যবহার কিছু কাল পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আর্সেনিকযুক্ত তাম্র-সংকরের গুণ দেখে মানুষের অনিসন্ধিৎসু মন তখন অন্যান্য বস্তু মিলিয়ে উন্নততর তামা পাওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে একসময়ে দেখেছে তামার সঙ্গে টিন যুক্ত হলে উত্তম ধাতু অর্থাৎ কাঁসা পাওয়া যায়। এমন হতে পারে, কোন জায়গার তামার আকরিকেই খানিকটা টিনের যৌগ মিশ্রিত ছিল। সেগুলো থেকে তাম্র-উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ কাঁসার সন্ধান পেয়েছিল।

টিনের আকরিক ক্যাসিটেরাইট—এই খনিজ থেকেও উচ্চতাপে বিজারণ করে টিন ধাতু পাওয়া যায়। মানুষ তখন ধাতুবিদ্যায় অনেকটা পারদর্শী। এমনও হতে পারে, নানা জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে যদি তামার আকরিক ম্যালাকাইটের সঙ্গে কিছু ক্যাসিটেরাইট মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে উত্তম কাঁসার সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ এই করেই ব্রোঞ্জের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

মানুষ দেখল, কাঁসা তামার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তামার মত কাঁসা অত সহজে ভঙ্গুর নয়। কাঁসার কাঠিন্য অনেক বেশী, এর শক্তি বর্তমানের মৃদু-ইস্পাতের প্রায় সমান। কাঁসার বিষগুণ নেই। কম উষ্ণতায় গলিয়ে কাঁসা থেকে ছাঁচে সুন্দর ঢালাই করা যায়, গ্যাসের বুদবুদ থাকে না। সুতরাং পাথর আর তামার বদলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র, পাত্র ইত্যাদি তৈরী করার জন্য এক উন্নত উপাদান পেয়ে গেল।

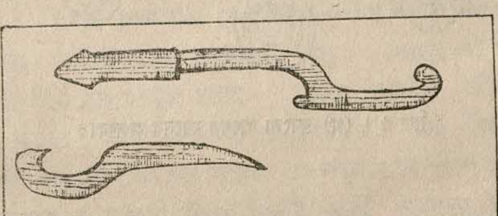
একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্য বা মিশরে তো টিনের আকরিক নেই। আর টিন-যুক্ত তাম্র-আকরিক খুব সামান্যই দেখা যায়। তা হলে সেই যুগে অত কাঁসা কি করে তৈরী হল। অনেকে মনে করেন, মেসোপটেমিয়ার অনতিদূরের পাহাড়ে তখন টিনের আকরিক ছিল। পাটিংটন লিখেছেন, ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দ্রাংগিয়ানো খনি থেকে সুমেরীয়রা টিনের আকরিক সংগ্রহ করত। বর্তমানে অবশ্য এসব অঞ্চলে টিন বিরল। ককেসীয় অঞ্চলের পাহাড়ে তামার আকরিক এবং টিনের আকরিক প্রচুর ছিল। ককেসীয়রা ব্রোঞ্জের জিনিষ তৈরী করতে সুদক্ষ ছিল। সুমেরের সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের আগে থেকেই ককেসাসের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল। খুবই সম্ভব এই ককেসাস থেকেই দক্ষিণাঞ্চলে টিনের আকরিক সরবরাহ হত। ইউরোপের জার্মেনী ও হাঙ্গেরীতে যথেষ্ট তামা আর টিনের খনিজ রয়েছে। আরও পরে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের সময় এইখানকার টিনও মধ্যপ্রাচ্যে চালান হয়েছে। কাঁসা তৈরীর জন্য মিশরের টিনের চাহিদা মিটিয়েছে ফিনিশীয় বণিকেরা। ফিনিশীয়রা সম্ভবতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কর্নওয়াল থেকে মিশরে টিনের খনিজ সরবরাহ করত।

কাঁসার উৎপাদন যখন সহজ হয়ে এল তখন কাঁসা দিয়ে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন গাছ কাটার কুড়াল, লাঙলের ফলা, শস্য কাটার কাস্তে, খননের শাবল ইত্যাদি তৈরী হল। মূল্যবান কাঁসা থেকে অলঙ্কারও তৈরী হত, বিশেষতঃ কানের গহনা। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, খুব শীগগীরই কাঁসা থেকে প্রস্তুত হল বড় বড় ছোরা, বর্শা, তীর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। কাঁসা অবশ্য তখন খুবই মহার্ঘ এবং সাধারণের পক্ষে পাওয়া কঠিন। সুতরাং এইসব কাংস্যবস্তু, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, ছিল প্রধানতঃ সম্পদশালী এবং দলপতিদের অধিকারে। সাধারণ লোক তখনও পাথুরে হাতিয়ারই ব্যবহার করত। উন্নত কাঁসার অস্ত্র যাদের করায়ত্ত হল স্বভাবতঃই তারা অপরের উপরে আধিপত্য করতে আরম্ভ করল। কাঁসার অস্ত্র হল শক্তির উৎস, তাই কাঁসার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একে অপরের গলা কাটার বা শত্রু নিধনের

সহজতর উপায় পাওয়া গেল। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর বিবাদ বিসংবাদ আর সংঘর্ষ অনিবার্য হল। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেঁধে গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহের গোড়াপত্তন হল। যে ধাতু মানুষের উপকারের জন্য এবং জীবনযাত্রা সহজতর করার জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল সেই ধাতুই আবার সভ্যতার উষাকালে যুদ্ধের জন্য ভীষণতর উপকরণ জুগিয়েছিল। লৌহযুগ আসার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায়, কাঁসারীরা যোদ্ধাদের জন্য তৈরী করেছে সাজসরঞ্জাম, কাঁসার বর্ম, শিরস্ত্রাণ, হাতে দিয়েছে কাঁসার ঢাল, বল্লম, তীর, তলোয়ার। এসব শুধু যুদ্ধের তীব্রতাই বৃদ্ধি করেছে। যুগযুগ ধরে ধাতুর ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহাসমরের নিষ্ঠুরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

সেসময় তামার আকরিক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বা পাহাড়ের গা থেকে সংগ্রহ করা হত। ক্রমে যখন সেসব আকরিক নিঃশেষ হয়ে এল তখন কাংস্য শিল্পীরা আকরিকের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে যেতে শুরু করল। যেখানে উপযুক্ত খনিজ মিলত সেখানেই চুলা তৈরী করে কাঁসা বা তামা প্রস্তুত করত। এই ভাবেই ধাতু শিল্পটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। চাহিদা ছিল প্রচুর, বিশেষতঃ যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনে। রোমক সভ্যতার দিনে কাঁসার বর্ম আর অস্ত্রই ছিল প্রধান ভরসা।

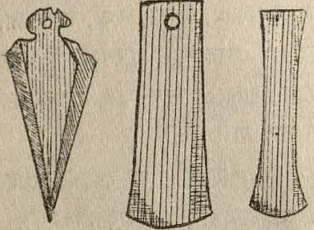
বর্তমানে ধাতব আকরিকের প্রায় সবটাই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাটির তলা থেকে সংগৃহীত হয়। সেই প্রাচীন যুগেও অন্ততঃ কোথাও কোথাও খনির ভিতর থেকে আকরিক পাথর তুলে আনা হত—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই কিছুদিন আগে প্রত্নবিদেরা পশ্চিম এশিয়ার নেগেভ মরুভূমি প্রান্তে পাহাড়ের ভিতরে প্রাচীন



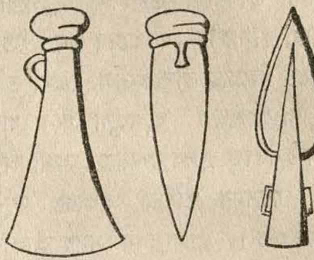
চিত্র ৪। সুমেরীয়দের তৈরী বাঁকা তামার তরবারি
(৩০০০ খৃীঃ পূঃ)

সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। সেখান থেকে কাঁসার বাটালি আর পাথুরে হাতুড়ি দিয়ে কেটে কেটে আকরিক পাথর নিয়ে আসা হত। পরীক্ষায় দেখা গেছে

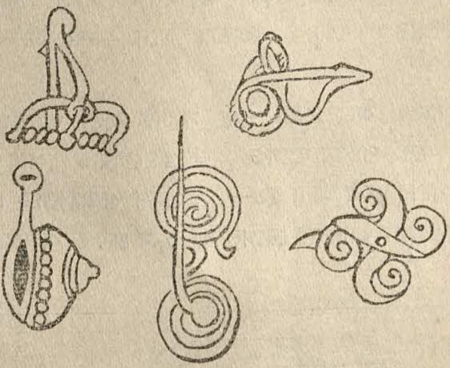
ঐসব কাঁসার বাটালি, ছেনি ইত্যাদি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের। শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত সুড়ঙ্গের মধ্যে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্তরে চলা-ফেরার জন্য সিঁড়ি ইত্যাদি সবই ছিল। সুড়ঙ্গের বাইরের নিকটবর্তী অঞ্চলে আকরিক থেকে কাঁসা-উৎপাদনের জন্য ছিল অনেকগুলি চুলা।



চিত্র ৫। (ক) তামার প্রাচীনতম অস্ত্র



চিত্র ৫। (খ) কাংস্য যুগের অস্ত্র



চিত্র ৫। (গ) কাংস্য যুগের কানের অলঙ্কার

লৌহ যুগ

খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি কাংস্য যুগের পরিসমাপ্তি হল আর তার পরিবর্তে লৌহ যুগের অভ্যুদয় ঘটল। অতএব সভ্যতার সূচনার প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে লৌহের প্রচলন হল। লৌহ যুগের আরম্ভ অর্থাৎ সেই থেকে কাঁসার বদলে লোহা দিয়ে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা আরম্ভ হল।

সর্বত্র যে একই সময়ে লৌহ যুগের আবির্ভাব হয়েছিল তা নয়। যেমন, নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দেই যথেষ্ট লোহার বস্তু ব্যবহৃত হত, আবার চীনে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে লোহার প্রচলন ঘটে নি। কোথাও কোথাও যেমন, আফ্রিকা মহাদেশে (মিশর ব্যতীত) আবার পাথুরে যুগের পর সরাসরি লৌহ যুগ দেখা দিয়েছে। মাঝখানের তাম্র বা কাংস্য যুগের আগমন ঘটেনি।

কাঁসার আধিপত্য চলে যাওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ তামার আকরিকের অপ্রতুলতা এবং তাও বিশেষ কতকগুলো অঞ্চলে শুধু সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই তুলনায় লোহার আকরিক যেমন প্রচুর তেমনই বহুধা বিস্তারিত, অধিকাংশ দেশেই সহজলভ্য। দ্বিতীয়তঃ লোহার ঋজুতা ও দৃঢ়তা কাঁসার চেয়ে বেশী, বিশেষতঃ ইস্পাতের (সামান্য কার্বন-মিশ্রিত লোহা)। তা ছাড়া, লোহার অস্ত্রশস্ত্র কাঁসার অস্ত্রের চেয়ে বেশী শক্ত এবং বেশী ক্ষুরধার। এই জন্যই শুধু অস্ত্র নয়, সাধারণ ব্যবহার্য কুড়াল, কাস্তে, ছুরি, লাঙলের ফলা কাটারি ও অন্যান্য দ্রব্য লোহা দিয়ে তৈরী করা শুরু হল। তামা, কাঁসা ও অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য। তাই কাঁসা তামার জিনিষ বা অস্ত্র যন্ত্র, উচ্চবংশীয় অভিজাতদের কাছেই শুধু ছিল। সাধারণ লোক, চাষী, মজু[illegible] জেলে, দোকানী এরা পাথুরে যন্ত্রপাতি নিয়েই কাজ সম্পন্ন করত। কিন্তু লোহা ছিল অনেক সস্তা এবং পরিমাণেও অনেক বেশী, তাই সাধারণ লোকে[illegible] দৈনন্দিন কাজকর্মেও লোহার জিনিষপত্র ক্রমে ক্রমে স্থান পেল। লোহার তৈরী শক্ত যন্ত্রপাতি সাধারণ মানুষ পাওয়াতে চাষ-আবাদ অনেক সহজ হল। বেশী শস্য উৎপাদন সম্ভব হল। ফলে, সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হল। মানুষ তখন সময় পেল শিল্প ও কারুকলায় নজর দিতে। বলা যেতে পারে, লোহাই প্রথম সার্বজনীন ধাতু। লোহার এই প্রাধান্য গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আজও আমাদের জীবনযাত্রা ও কল-কারখানা যুগের সভ্যতা একান্তই লৌহ-নির্ভর। এই বিংশ শতাব্দীতে মাত্র পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করে সভ্যতা এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। তবুও আরও বহুকাল যে লোহার উপর নির্ভর করেই আমাদের চলতে হবে সেটা নিঃসন্দেহ।

একটা সঙ্গত প্রশ্ন হচ্ছে, লোহার আকরিকের প্রাচুর্য যখন এত বেশী তখন তামার আগেই লোহার উৎপাদন ও প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ লৌহের উৎপাদন হয়েছে অনেক পরে। এই বিলম্ব হওয়ার কারণ ছিল। তামা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায়—মোটামুটি ৮০০-১০০০° সেণ্টিগ্রেডে—তৈরী করা

যায়, কিন্তু লোহার আকরিক থেকে ধাতু উদ্ধার করতে অন্যূন ১৬০০-১৭০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। এত উচ্চ উষ্ণতার চুল্লী আদি যুগে তৈরী করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিতে তামার খানিকটা মুক্ত বা মৌলাবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং সাধারণ অবস্থায় বা একটু গরম করে পিটিয়ে মানুষ তা থেকে নানা উপকরণ তৈরী করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে, মুক্ত অবস্থায় লোহা কদাচিৎ দেখা যায়। লোহাকে পিটিয়ে নরম করে বিভিন্ন রূপ দিতে সেটাকে লোহিত-তপ্ত অবস্থায় রাখতে হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব ব্যবস্থাপনা করতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছে।

পুরাকালে প্রথম কোথায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা নিয়ে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। এখন প্রায় সবাই একমত হয়েছেন যে এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কের পূর্বাঞ্চল) হিট্টাইটরাই সর্বপ্রথম আকরিক থেকে লৌহ উৎপাদন চালু করেছিল। হিট্টাইটরা আরমেনিয়ার ককেসাস্ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনরে এসে বসতি এবং রাজ্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে অনেক দক্ষ ধাতু কর্মী ছিল। ককেসাসে উন্নত তামা ও কাংস্য শিল্পে লো· প্রভৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। এশিয়া মাইনরে এসে তারা প্রচুর ..হার খনিজ দেখতে পেল এবং স্বল্প আয়াসেই সেই খনিজ থেকে লোহা তৈরী করতে সমর্থ হল। সেটা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কথা, তারপরে আরও দুই-তন শতক লেগেছিল কাঁসাকে হটিয়ে দিতে। সাধারণতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দ থেকে লৌহ যুগের শুরু মনে করা হয়।

হিট্টাইটদের আবিষ্কারের কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই কিন্তু লোহার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। মহাকাশ থেকে প্রায়ই ছোট বড় অনেক উল্কাপিণ্ড এসে পৃথিবীর বুকে পড়ে। সেই সব পাথরের মধ্যে অনেকটা লোহা থাকে; কখনও কখনও উল্কাখণ্ডের প্রায় সবটুকুই অবিমিশ্র লোহা। প্রস্তর যুগের মানুষ সেই লৌহপিণ্ড থেকে ছিল্‌কা নিয়ে ছুরির ফলার মতো ব্যবহার করত, সেরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্বর্গ থেকে আসা ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ এই লোহা তখন ছিল অতি মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মিশরের অতি প্রাচীন কবর থেকে নীল পাথরের গুটি ও লোহার পুঁতি দিয়ে গাঁথা হার পাওয়া গেছে। একটি পিরামিডের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দের পুরানো লোহার যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। ক্রীটের কনসস্ রাজ্যের সমাধিতে ৩৮০০ বছরের পুরানো লোহার জিনিসের সন্ধান মিলেছে—এসব লৌহ-বস্তু অবশ্যই উল্কা-জাত।

এশিয়া মাইনরে লৌহ-শিল্প আরম্ভ হওয়ার স্বল্পকাল মধ্যেই সেটা সারা মধ্যপ্রাচ্যে—প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, সুমের, ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এশিয়া মাইনরে পোড়ামাটির পাটাতে উৎকীর্ণ কতকগুলি দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে, কোন কোন পাহাড়ে লোহার খনিজ আছে, কোন কোন রাজা লোহা দান করেছে, ইত্যাদির তালিকা আছে। একটি পাটা থেকে জানা গেছে, অ্যাসিরিয়ার রাজা হিট্‌টাইট রাজাকে লোহা পাঠাতে অনুরোধ করেছে, তার উত্তরে হিট্‌টাইট রাজা একটি সম্মানসূচক লোহার ছোরা পাঠিয়ে জানাচ্ছে যে লোহা আপাততঃ নেই, তৈরী হলেই অ্যাসিরিয়াকে পাঠান হবে।

খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দে ইউরোপের দানিয়ুব উপত্যকা থেকে দুর্ধর্ষ কেল্ট, ডোরিয়ান জাতিরা এসে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে এবং অনেক হিট্‌টাইটকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এই সকল বন্দী হিট্‌টাইটদের মাধ্যমেই প্রধানতঃ লৌহবিদ্যা গ্রীস, ইতালী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতিতে বিস্তারিত হয়। বস্তুতঃ এই সময় ইউরোপে লৌহ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয় এবং ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। খ্রীঃ পূঃ ১১০০ নাগাদ গ্রীসের মাধ্যমে ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার প্রসারিত হয়।

মিশরে লৌহ খনিজ প্রায় নেই, সুতরাং সেখানে প্রথম দিকে লোহার জিনিসপত্র আমদানী করা হত। খ্রীঃ পূঃ ৮০০-এর পরে মিশরে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীঃ পূঃ ১২৫০-এ মিশর রাজ হিট্‌টাইট রাজাকে লৌহ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন। তার উত্তরে হিট্‌টাইট রাজ মিশরের রাজাকে লোহার তলোয়ার পাঠিয়ে তার পরিবর্তে সোনা পাঠাতে অনুরোধ করেন, কারণ মিশরে তো সোনা ধূলোর মতোই ছড়িয়ে রয়েছে। এই চিঠিগুলির পাণ্ডুলিপি আজও রয়েছে।

আনুমানিক শতকরা একভাগ কার্বন নিষিক্ত লোহার নাম ইস্পাত। ইস্পাতের অনেকগুলো বিশিষ্ট গুণ আছে, যা বিশুদ্ধ লোহাতে নেই। যেমন, ইস্পাত অনেক বেশী ঘাতসহ ও কঠিন, ইস্পাত উচ্চ তাপমাত্রায় বেশী নমনীয়; ইস্পাতের অস্ত্র বেশী ক্ষুরধার ইত্যাদি। বর্তমান কালে অধিকাংশ লোহাকেই ইস্পাতে পরিণত করা হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের গোড়ার দিকেই সিরিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চলে খুব উন্নত ধরণের ইস্পাত যথেষ্ট তৈরী হত। সে রকম ইস্পাত আধুনিক যুগের পদ্ধতিতে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে করা সম্ভব হয়েছে।

লৌহের ইতিহাসে আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ রয়েছে। মাত্র দুই দশক পূর্বে (১৯৬০) নৃতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন আফ্রিকার টানজানিয়া অঞ্চলের হায়া উপজাতির লোকেদের আজ থেকে দু'হাজার বছর আগেই খুব ভাল ইস্পাত

তৈরী করার কৌশল জানা ছিল। মানুষ সমান উঁচু চুল্লীর নীচের গর্তে ঘাসের উপরে আকরিক রেখে কাঠ দিয়ে ঢেকে নিয়ে উত্তপ্ত করা হত। তারপর চারদিক থেকে আটটি বড় হাপরের সাহায্যে চুলার অভ্যন্তরে জোরে বায়ু চালানো হত। এই ভাবে উচচ উষ্ণতার সৃষ্টি করে গলিত ইস্পাত তৈরী হত। এই ধরনের চুলার ধ্বংসাবশেষ টানজানিয়ায় অনেকগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই খ্রীষ্টজন্মের সময় থেকে প্রায় ১৮০০ বছর ধরে হায়ারা এই ভাবেই ইস্পাত তৈরী করে এসেছে।

২

প্রাচীন ভারতের ধাতু শিল্প

পুরাকালের ভারতের লোকেরাও ধাতুবিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং পারদর্শিতার প্রমাণ রেখে গিয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলতে আমরা 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতাই' মনে করি। সেই সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ থেকে। তারপর সহস্রাধিক বছরেরও বেশী ধরে সিন্ধু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগার তীরে এই সভ্যতার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ সেই সভ্যতা তাম্র-কাংস্য যুগের। ১৯২১ সালে দয়ারাম সাহানী হরপ্পাতে এবং ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোতে খনন করে প্রাচীন কালের বহু জিনিসের সন্ধান পান। এর পরে জন মার্শাল, ই ম্যাকে, ননী-গোপাল মজুমদার, কাশীনাথ দীক্ষিত প্রভৃতি পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থানের নানা জায়গায় খনন করে সেই যুগের সভ্যতার আরও বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। স্থাপত্যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায়, শিল্পকলায়, পরিকল্পনায় পুরাকালের সভ্যতার যে প্রমাণ রয়েছে সেটা অনেকদিকেই বর্তমান অতি-আধুনিক যুগের সঙ্গে তুলনীয়। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাই ঐ প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

আমাদের আলোচনা ধাতু নিয়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে সোনা, রুপা, তামা, কাঁসা, পিতল আর সীসার নানা প্রাচীন জিনিস পাওয়া গেছে। সোনার হার, কানের গয়না ও অন্যবিধ অলংকার উদ্ধার করা হয়েছে। সোনা আসত মহীশূরের কোলার এবং মাদ্রাজের অনন্তপুর থেকে। ওখান থেকে পাওয়া সোনার অলংকারে যে রুপার খাদ রয়েছে, সেই পরিমাণ খাদ দাক্ষিণাত্যের সোনাতেই দেখা যায়। সেই জন্য সেখান থেকে সোনা আসত বলে মনে হয়। তাছাড়া, সিন্ধু-সৈকতের বালু থেকে অবশ্য সোনা বা হিরণ্য সংগ্রহ হত। ঋক্-বেদে সিন্ধুনদের নাম "হিরণ্ময়ী"।

সোনার চেয়েও বেশী রুপোর জিনিস সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। রুপার অলংকার, বাসন, নানা আকারের পাত্র, কারুকার্যময় ঘট, ফুলদানী ইত্যাদি পাওয়া গেছে। রুপা অবশ্যই বাইরে থেকে আনা হত, খুব সম্ভবতঃ আর্মেনিয়া,

ইরান থেকে আসত। সেই যুগে সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে চতুর্দিকের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। সার্থবাহদের নানা পথ নানা দিকে গিয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতু এবং সম্ভবতঃ শিল্পীরাও সার্থবাহদের সঙ্গে ভারতে এসেছে। এটা খুবই সম্ভব, অনেকক্ষেত্রে ভারতের শিল্পীরাও সুমের ও অন্যান্য দেশে তাদের বিদ্যা নিয়ে গিয়েছে।

সোনা-রূপার অলংকারগুলির কারুকর্ম দেখে মনে হয়, সেই যুগের ধাতু-শিল্পীরা সূক্ষ্মকাজে বিশেষ দক্ষ ছিল। এই সকল অলংকার সম্বন্ধে পুরাবিৎ মার্শাল বলেছেন; "···so well finished and so highly polished that they might have come out of a Bond street jeweller's of today rather than from a prehistoric house of 5000 years ago."

তামা, কাঁসা এবং পিতলের বহু বাসন ও অন্যান্য জিনিষ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নীচের স্তরে পাওয়া গেছে। একটি ছোট প্রকোষ্ঠে অনেকটা পরিমাণ তাম্র-আকরিকও রয়েছে; অদূরেই একটি তাম্র-পিণ্ড পাওয়া গেছে। সেইজন্য মনে হয়, সেখানে তামা প্রস্তুত করে পিটিয়ে এবং ঢালাই করে নানা উপকরণ তৈরী করা হত। নিকটবর্তী পশ্চিমের পাহাড় থেকে তামার আকরিক সংগ্রহ হয়েছে; রূপা, টিন, সীসা, এসব আসত আফগানিস্থান এবং উত্তরাঞ্চল থেকে। তামা ও কাঁসার তৈরী বর্শা, তীর, কুড়াল, দা, বঁড়শি, বালা, আংটি এসব তৈরী করেছে কর্মকারেরা। যুদ্ধের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলো প্রায়ই কাঁসার তৈরী। ৪৫ সেণ্টিমিটার লম্বা তামার তলোয়ার মহেঞ্জোদারো থেকে উদ্ধার করা গেছে। কোন লোহার জিনিস পাওয়া যায় নি। সিন্ধু সভ্যতার কালে ওখানে লোহার প্রচলন হয়নি। সীসার জিনিসও অল্পই পাওয়া গেছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কাঁসার দাঁত বিশিষ্ট ৪২ সেণ্টিমিটার লম্বা একটি করাত পাওয়া গেছে। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন না প্রচলিত ধারণা ছিল, রোমকদের পূর্বে করাতের ব্যবহার কেউ জানত না। কাঁসার তৈরী মালসা, হাঁড়ি, কলসী, থালা, কড়াই এসব অনেক পাওয়া গেছে। কাঁসার দর্পণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ঢালাই করা কাঁসার একটি অপরূপ সুন্দর নর্তকীর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। এর গঠন-বৈচিত্র্য সেদিনের শিল্পকারদের কল্পনা ও প্রতিভার অক্ষয় সাক্ষ্য।

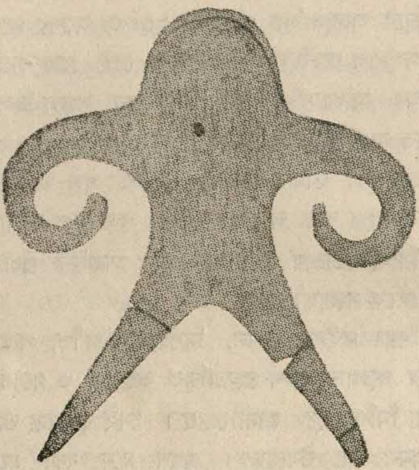
আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। সিন্ধুনদের প্রায় দেড়শ কিলোমিটার পশ্চিমে বেলুচিস্থানের নীল-উপত্যকায় এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থানের কোলা অঞ্চলের কুল্লীতে প্রাক্-হরপ্পা যুগের কৃষ্টির নির্ভরযোগ্য নিদর্শন রয়েছে। নীল-উপত্যকায় তামার কুড়াল, বাটালি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। কুল্লীতে হাতল-বিশিষ্ট দশ-সেণ্টিমিটার ব্যাসের তামার দর্পণ,

কয়েকটি তামার পিন, তামার বালা ও তামার মালসার ভগ্নাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার পর বোঝা গেছে, এসব জিনিষ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের। সে সময় এই বেলুচি-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল। শেষের দিকে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের পরে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বালুচীদের সংযোগ ঘটেছিল। যাইহোক, সেই প্রাক্-মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার কালে বেলুচিস্থানের অধিবাসীরা তামা উৎপাদনে সক্ষম ছিল। তবে তাঁরা ঢালাই করতে জানত না, পিটিয়ে উপকরণ তৈরী করত।

হরপ্পার কতকগুলি তামার জিনিসে সীসার খাদ রয়েছে। রাজপুতানা এবং হাজারীবাগ অঞ্চলের তাম্র আকরিকগুলিতে অনুরূপ সীসা মিশ্রিত। তাই থেকে মনে হয় সিন্ধু-সভ্যতার তামা বা তার আকরিক প্রধানতঃ বেলুচিস্থান এবং রাজপুতানা থেকে সংগৃহীত হত।

মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, মিশর, ক্রীটদ্বীপ, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশে দীর্ঘদিন ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও গবেষণা করে প্রাচীন-কালের অনেক তথ্য নিশ্চিতরূপে জানা গেছে। সেই তুলনায় ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এখন মাত্র উষাকাল। এখন মনে করা হচ্ছে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা যে শুধু সিন্ধুতীরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। খুব সম্ভবতঃ গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় তামার তৈরী পুরাকালের মাছ ধরার ও চাষ করার উপকরণ পাওয়া গেছে। যথেষ্ট ভারী তামার কুড়াল সেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ১৮২৯ সালে টি, উইলিয়ামস্ উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাধের কাছে ফতেগড়ের মাটির তলা থেকে তেরটি অতি প্রাচীন তামার জিনিস উদ্ধার করেন। সেগুলো এখন কলকাতার যাদুঘরের সম্পত্তি। এই বস্তুগুলির মধ্যে মনুষ্য আকারের একটি তাম্র মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি চ্যাপ্টা, পা দুটি ফাঁক করা, হাত দুটি গোল হয়ে রয়েছে। মাথাটা অবনমিত এবং বেশ ভারী (চিত্র ৬)। হাতের এবং পায়ের বাইরের দিকটা পাতলা এবং বেশ ধারালো। বস্তুটির ওজন দুই কিলোগ্রামের উপরে। লম্বায় উপর থেকে নীচে ৬৫ সেন্টিমিটার, কিন্তু খর্বকায় পা-টি ৫১ সেন্টিমিটার। প্রথমে ঢালাই করে নিয়ে পরে পিটিয়ে মূর্তিটি তৈরী করা হয়েছে। এরকম মূর্তির তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় নি। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন—তামার এই মানবোপম মূর্তিটি কোন ধর্মীয় প্রতীক বা দেবমূর্তি। আবার কোন কোন পুরাবিজ্ঞানীর মতে এটি একটি হাতিয়ার। ছুঁড়ে দিয়ে বড় বড় বন্য পাখীকে ঘায়েল করার জন্য এটি ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা

হত। গত দেড়শ বছরে ঐ উত্তরপ্রদেশের কানপুর অঞ্চল থেকে মোট আরও সাতটা অনুরূপ ছোট বড় মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। এসব থেকে মনে



চিত্র ৬। গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পাওয়া তামার নরোপম মূর্তি

হয়, গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাম্র-শিল্পের প্রচলন ছিল আজ থেকে অন্ততঃ সাড়ে চার হাজার বছর আগে।

কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশে নয়, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গাঙ্গেরিয়াতে মাটির নীচে একটি গর্ত থেকে একত্রে উদ্ধার করা হয়েছে ৪২৪টি তামার যন্ত্র এবং ১০২টি রুপার পাত। তামার যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ কুড়াল, কোদাল, বাটালি ইত্যাদি। এছাড়া বিহারের মানভূম জেলাতে ২৭-টি এবং রাঁচি জেলায় ২১-টি কুড়াল পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের একটি গ্রামে ছিল সেই প্রাচীন যুগের দশটি দ্বিমুখী কুড়ালের যুদ্ধাস্ত্র। এই বস্তুগুলির একত্র অবস্থান থেকে অনুমান করা হয়েছে—পশ্চিম থেকে বর্বরজাতি এসে যখন সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তখন বহু শরণার্থী নিশ্চয়ই ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গেই এই তামার জিনিস এসেছিল, পরে হয়ত তারাই স্থানীয় অধিবাসীদের ধাতুর কাজ শিখিয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির পর বেশ কয়েক শতক পর্যন্ত ভারতে ধাতুবিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের বা ধাতুকর্মের উন্নতির কোন প্রমাণ নেই। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি এক সময়ে আর্যরা এসে প্রথমে পশ্চিম ভারতে এবং পরে

সারা উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করে। অবশ্য এই তারিখ নিয়ে মতান্তর আছে। আর্যদের সমাজ ছিল প্রধানতঃ পশুপালন এবং কৃষিনির্ভর। কিন্তু নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর এবং ভারতের তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ-বিবাদ লেগে থাকত। সেই যুদ্ধে তারা কাঁসার অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করত। আর্যদের তথা হিন্দুদের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদ। এই ঋক্‌বেদে সোনা রূপা তামা কাঁসার উল্লেখ আছে কিন্ত লোহার কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে অন্ততঃ আর্যদের লোহার সঙ্গে পরিচয় হয় নি। ঋক্‌-বেদের অনেক সূক্তে অয়স্‌ শব্দের উল্লেখ আছে। অনেকে সেটাকে লোহা বলে মনে করেন। বস্তুতঃ "অয়স" শব্দটি যে-কোন ধাতুর সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বৈদিক যুগেরই পরবর্তীকালে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে লোহা বেশ সুপরিচিত। সেখানে তামা এবং লোহাকে লোহিতায়স এবং কৃষ্ণায়স বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এর অনেক আগেই মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে লৌহযুগের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। ভারতে লৌহ-উৎপাদন আরম্ভ হয় খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতক থেকে এবং খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে ইস্পাতও প্রস্তুত করা হত। এই সময় ভারতে কেবলমাত্র লোহা নয়, অন্যান্য সব ধাতুর উৎপাদন হত এবং নানা শিল্পকর্মে সেগুলির ব্যবহারের বিশেষ প্রসার ছিল। মৌর্য-যুগের চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"এর বিশদ বিবরণ রয়েছে (খ্রীঃ পূঃ ৩২১-২৯৬)।

বিভিন্ন ধাতুর কি কি খনিজ প্রকৃতিতে রয়েছে এবং কোথায় সেগুলো পাওয়া যায়, খনিজগুলো কিরূপ এবং কি উপায়ে তাদের চেনা যায়, কোন খনিজে ধাতুর পরিমাণ বেশী, এ সবের বিশদ বর্ণনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার বিভিন্ন ব্যবস্থা, ধাতুগুলির বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ও ব্যবহার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখও আছে। বহু রকমের ধাতুসংকরের সৃষ্টি ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছে। ধাতুর শিল্পকর্মের বিষয় নিয়ে নানা তথ্য দেওয়া আছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন, কৌটিল্য বলছেন ঃ শিল্পকর্মের সোনা ত্রিবিধ; "ক্ষেপন, গুণ এবং ক্ষুদ্র"। ক্ষেপন অর্থাৎ যে সোনাতে মণি বা কাচ প্রযুক্ত করা যায়। "ক্ষেপনের" সোনা পাঁচ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সঙ্গে দুইভাগ তাম্র-মিশ্রিত ধাতু-সংকর মিশিয়ে তৈরী হয়। এই ধাতু-সংকরে সোনা ঃ তামা — ২ ঃ ১ অনুপাতে থাকবে। খুব সরু তার তৈরী করার জন্য যে সোনা উপযুক্ত তাই হচ্ছে "গুণ" সোনা। আর বালা, আংটি ইত্যাদি অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত সোনা হল "ক্ষুদ্র"। সোনার

গিল্টির কাজ, সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়ার কাজ, ঢালাইয়ের পদ্ধতি, ঝালাইয়ের নিয়ম ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে কৌটিল্যের গ্রন্থে। স্বর্ণকার নিকৃষ্ট ধাতু মিশিয়ে সোনা অপহরণ করেছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বিবৃত রয়েছে। খনির অধ্যক্ষের এবং ধাতুবিদদের কি কি গুণ এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন কৌটিল্য তারও নির্দেশ দিয়েছেন। সে যুগে ধাতুবিদ্যা যথেষ্ট উন্নত না হলে এরূপ বিশদ বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে কখনও স্থান পেত না।

বৌদ্ধযুগে এবং তারপরে হিন্দু যুগে—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ—ভারতবর্ষে ধাতু-উৎপাদন এবং ধাতু শিল্পে বিশেষ উন্নতি সাধনের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সে সব প্রমাণের মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

নেপাল সীমান্তে রামপুরা অশোকস্তম্ভের পাদদেশে ১৮৮১ সালে মিঃ গেরিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের তৈরী একটি উৎকৃষ্ট তামার বল্টু পান। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪½ ইঞ্চি এবং পরিধি ১৪ ইঞ্চি। কলকাতার যাদুঘরে এটি এখন রয়েছে। স্তম্ভের সঙ্গে শিলালিপি সংযুক্ত করে দেওয়ার জন্য বোধ হয় এটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিহারের সুলতানপুরে এক বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিশুদ্ধ তামার তৈরী ৭½ ফিট উঁচু একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে (১৮৬৪)। এটি এখন বার্মিংহাম যাদুঘরে রক্ষিত। এই মূর্তির কাছে অনেকটা তাম্র-আকরিকও পাওয়া গেছে এবং আরও দুইটি ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি মুদ্রাও সেখানে ছিল। মূর্তিটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের। মনে হয় ঐখানেই তামা উৎপাদন করে মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছিল।

শিশুপালগড়ের ও বানগড়ের খনন থেকে এবং সুলতানপুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা (কিছু কিছু পিতল ও কাঁসার মুদ্রাসহ) পাওয়া গেছে। এগুলো মৌর্য, কুশান এবং গুপ্তসম্রাটদের সময়ের রাজকীয় মুদ্রা। ছোট ছোট পোড়ামাটির মুচিতে তামা গলিয়ে নিয়ে ঢালাই করে এসব মুদ্রা তৈরী হত। সেই সব মুচিও অনেক পাওয়া গেছে।

তাম্রপত্র বা প্লেট বহু যুগ থেকেই ভারতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেদিনের রাজারা তামার পাতে খোদাই করে ভূমির দানপত্র ব্রাহ্মণদের দিতেন। মৌর্যযুগের এ রকম তামার দানপত্র একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো অন্ততঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের। হিন্দুরা তামাকে খুব পবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে তামার বাসনপত্রের ব্যবহার অনেক প্রাচীনকাল থেকে আজও পর্যন্ত প্রচলিত।

আজ থেকে অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগেই ভারতে খনিজ থেকে তাম্র উৎপাদন একটা বড় শিল্প ছিল। আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন করে নিলে একটা কঠিন ধাতুমল (slag) পড়ে থাকে। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন, সিংভূম, হাজারীবাগ, রাজস্থানের অনেক জায়গায় এই ধাতুমল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে এসব স্থানে তামা উৎপাদন করা হয়েছিল। এ ছাড়া সিকিম, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানেও তাম্র-খনিজ পাওয়া যেত এবং সেখান থেকে তামা নিষ্কাশন করা হত।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের কাছে ছয় তলার সমান ৮০ ফিট উঁচু একটি তামার তৈরী দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি ছিল। এটি সম্রাট পূর্ণবর্মের সময়ের (সপ্তম শতক) তৈরী। এই বিশাল মূর্তিটির জন্য কী প্রচুর তামা তৈরী করে নিতে হয়েছিল! পরে কোন কারণে এই মূর্তিটি ধ্বংস হয়েছে, এখন তার কোন চিহ্ন নেই। হুয়েন সাঙ আরও বলেছেন, হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দার অদূরেই একটি বিহার কাঁসা দিয়ে তৈরী করা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটা অসমাপ্ত ছিল।

কাঁসা ও পেতল, এই দুই তাম্রসংকরও সেই যুগে অপর্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত হত। আয়ুর্বেদ সংহিতা সুশ্রুতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পানীয় জল কাংস্য পাত্রে রাখতে হবে। গৃহকাজের নানা পাত্র, বাসন, ঘণ্টা ইত্যাদি কাঁসা থেকে তৈরী করা হত। মাদ্রাজের তিনেভেলীর খনন থেকে নানা রকমের সুন্দর কারুকার্যময় কাংস্য বস্তু, পেয়ালা, অলঙ্কার, ছাকুনি, নল ইত্যাদি পাওয়া গেছে—এদের নির্মাণ ৩০০-৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। অষ্টম এবং নবম শতকে কাঁসার ঢালাইয়ের কাজে বঙ্গদেশের ধাতুবিদেরা সবিশেষ দক্ষ ছিলেন।

তক্ষশিলার স্তূপের খনন থেকে অসংখ্য ধাতব বস্তু সংগৃহীত হয়েছে। প্রচুর সোনা ও রূপার অলঙ্কার সেখানে রয়েছে, তারমধ্যে মণি-বসান বা তারের কাজও রয়েছে। এ ছাড়া পাওয়া গেছে তামা, কাঁসা, পেতল ও সীসার নানা রকমের দ্রব্য, গৃহকর্মের জিনিস, শল্যচিকিৎসার সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি। এমনকি, সীসা ও রাং মিশ্রিত ঝালাইয়ের সংকর ধাতুও পাওয়া গেছে। এর অনেকটাই খ্রীষ্টজন্মের ৬০০।৭০০ বছর পূর্বের। এসব থেকে স্পষ্ট যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্ববর্তী সহস্র বছরের মধ্যেই ভারতে অতি উচ্চমানের ধাতু শিল্প দেখা দিয়েছিল।

এবার লোহার কথায় আসা যাক। কুতুবমিনারের পাশে যে লৌহস্তম্ভটি রয়েছে সেটা তৈরী হয়েছিল চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতনার রাজা চন্দ্রবর্মনের বিজয় চিহ্ন হিসাবে। স্তম্ভটির উচ্চতা ২৪ ফিট, ব্যাস প্রায় ১৫ ইঞ্চি এবং ওজন ছয়

টনেরও বেশী। আশ্চর্যের কথা গত দেড় হাজার বছরেও এই বিশাল স্তম্ভটির কোথাও একটুও মরচে পড়েনি। জল, রোদ, বৃষ্টিতে এর কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। এর কারণ, স্তম্ভটি বিশুদ্ধতম লোহা দিয়ে তৈরী, অন্য কোন ধাতব খাদ নেই। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর লোহার ভাগ ৯৯.৭২%, কার্বন ০.০৮%, সালফার ০.০০৬%, ফসফরাস ০.১১৪%। এত পরিমাণে এ ধরনের বিশুদ্ধ লোহা বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও তৈরী করা সুকঠিন। কি করে এরকম বিশুদ্ধ লোহা সেই প্রাচীন যুগে তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। টাটার মত কারখানা তো তখন ছিল না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছোট ছোট (এক মণ) লোহার পিণ্ড তৈরী করে নিয়ে পরে সুনিপুণভাবে ঢালাই করে জুড়ে এই বিশাল স্তম্ভ তৈরী হয়েছে। অতি নিপুনতার সঙ্গে এমন মসৃণ ভাবে পিণ্ডগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে উপর থেকে বোঝাই যায় না। অর্থাৎ এই অতি উন্নত কৌশল সে যুগের শিল্পীদের জানা ছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ

"Expert observers of all classes are of opinion that this pillar presents an indisputable and permanent record of marvellous metallurgical skill and engineering ability of the ancient Indian workers, which can reasonably claim unstinted admiration even of our present time."

কিন্তু এই স্তম্ভ নির্মাণের আরও কয়েক শতাব্দী আগেই এ দেশে লৌহ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। তিনেভেলী, বানগড়, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানের খনন থেকে লোহার তৈরী প্রচুর জিনিস ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ছোরা, তরোয়াল, বর্শা, বল্লম, তীর, ত্রিশূল, কোদাল, কুপী, আংটা ইত্যাদি। এগুলোর অনেকটা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের ; আবার অনেক জিনিস কুষাণ ও গুপ্তযুগের। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভুবনেশ্বরের মন্দির তৈরী করতে যথেষ্ট লোহার কড়ি, বরগা ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধু লোহা নয়, প্রাচীন ভারতে খুব উন্নতমানের ইস্পাতও প্রস্তুত করা হত এবং তা আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করা হত। ভারতীয় ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা ছিল। যে দামাস্কাস ছোরার খ্যাতি সারা বিশ্ব জুড়ে সেটা এই ভারতীয় ইস্পাত থেকেই তৈরী হত। কথিত আছে, অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারকে পুরু ১৫ সের ওজনের একটি উৎকৃষ্ট ইস্পাত দন্ড দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। ভারতীয় ইস্পাত তখন অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ইস্পাতে পান দেওয়া এবং তার কোমলায়নের কলাকৌশলে ভারতীয় লৌহ শিল্পীরা ছিলেন

অদ্বিতীয়। এইজন্য এঁরা সর্বত্র খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান পেতেন। এই শিল্পকলা ভারত থেকে প্রথমে পারস্যে এবং সেখান থেকে আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হল, সেই কালটিকে ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণ যুগ মনে করা হয়। খ্রীষ্টজন্মের ৬।৭ শো বছর আগের থেকে খ্রীষ্টজন্মের পরে ৭।৮ শো বছর পর্যন্ত—এই কালটিতে ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল। শুধু কারুকলা, শিল্প-কর্মে নয়, দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, সর্বক্ষেত্রে ভারত তার প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে সেই যুগে। এ যুগের অতি প্রত্যুষে আমরা পেয়েছি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণ, এ যুগের প্রভাতকালেই এল কপিলের সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক, এলো আরও সব উপনিষদ, ঈশোপনিষদ, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। এ যুগের মধ্যাহ্নে উপস্থিত হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; এ যুগেরই অপরাহ্নে উপস্থিত হলেন কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, শূদ্রক আর তাঁরা দিয়ে গেলেন মেঘদূতম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মৃচ্ছকটিকম্, উত্তর রামচরিতম্ ইত্যাদি। এ যুগেরই গভীর প্রদোষে পেয়েছি অজন্তা-এলোরার অতুলনীয় গুহা চিত্র। সমস্ত আর্যবর্ত তখন উদ্দাম প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর। সেই প্রাণোচ্ছলতা কখনও স্ফুরিত হয়েছে পুরুষপুরে, কখনও তক্ষশিলায়, কখনও নালন্দায়, কখনও পাটলিপুত্রে, কখনও উজ্জয়িনীতে। কিন্তু তারপরে দুই তিন শতকের মধ্যেই সেই গৌরব অস্তমিত হয়ে গেল। মধ্যযুগের ভারতে এল এক অন্ধকারের যুগ।

এই মধ্যযুগটি ছিল অ্যালকেমীয় যুগ, এ সময় তান্ত্রিক সাধনার ছিল বিশেষ প্রাধান্য। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সেই সময় তান্ত্রিক বিশ্বাস ও পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তখন ভারতে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে রসায়ন চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মৃতসঞ্জীবনী-সুধা আর পরশপাথর আবিষ্কার, যার সাহায্যে অমর জীবন পাওয়া যাবে আর যার স্পর্শে অপকৃষ্ট ধাতু তৎক্ষণাৎ সোনায় পরিণত হতে পারে। এর ফলে কিছু কিছু নতুন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে নানা রকম জালিয়াতি, কৃত্রিমতা ও কপটতা স্থান পেয়েছিল।

অ্যালকেমী সম্পর্কে ফ্রান্সিস বেকন চাষীর সেই পুরাতন কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন। এক চাষী মৃত্যুর ঠিক আগে তার চারজন অলস পুত্রকে বলে গেলেন, "জমির তলায় আমার ধনরত্ন সব পুঁতে রেখে গেলাম।" বৃদ্ধের মৃত্যুর পর চার ছেলেই রত্নের লোভে সারা জমি খুঁড়ে খুঁড়ে রত্নের সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু কোন ধনরত্ন পেল না। কিন্তু সমস্ত জমিটার কর্ষণ হয়ে গেল, আর তার ফলে সেখানে সেবার খুব ভাল ফসল হল। তেমনি অ্যালকেমীবিদরা নানা

প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করেও কোন পরশপাথর পেল না, কিন্তু তাদের অসংখ্য পরীক্ষার ফলে রসায়নের বহু পদ্ধতি, তথ্য এবং বস্তুর সন্ধান মিলল, যার ফলে পরবর্তী বিজ্ঞান-যুগের রাসায়নিক আবিষ্কারে ও অন্বেষণে প্রচুর সাহায্য হল।

মধ্যযুগের এই পতনের নানা কারণ আছে মনে করা হয়। মনু নির্দেশিত উচ্চ ও নীচ জাতিভেদে পেশা এবং বৃত্তির বিভাগের একটি ফল হল, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মচর্চা, শাসনাধিকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত হল। হাতের কাজ, কারুকর্ম শিল্পকলা এসব হীন (!) কাজ হল নীচজাতের জন্য, ব্রাহ্মণের পক্ষে এসব কাজ অস্পৃশ্য ও অসম্মানের। সুতরাং এই সকল শিল্পকর্ম বংশানুক্রমে শূদ্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে মেধা, স্বাধীন সৃষ্টিমূলক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণার উদ্যম ইত্যাদির অভাবের জন্য শিল্পকলার উন্নতি ব্যাহত তো হলই, তাতে অবনতিও দেখা দিল। তদুপরি শাসন এবং অর্থব্যবস্থাও ছিল উচ্চবর্ণের অধিকারে, সেই হেতু এই সব শিল্পকলায় সরকারী সমর্থন ও উৎসাহ ছিল না। সারা দেশে আন্তঃরাজ্যীয় বিবাদ-বিরোধে গৃহযুদ্ধ সতত লেগেই ছিল, শিল্পোন্নতির সে ছিল আর এক অন্তরায়। একাদশ শতকে পুনঃ পুনঃ মুসলমানদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভেই উত্তর ভারতে পাঠানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা—এ সবই ভারতে সে যুগের কৃষ্টির পতনকে সাহায্য করেছে। বহু শিল্পকার পালিয়ে গেছে এবং অনেকে বিনষ্ট হয়েছে, যেমন পরবর্তীকালে ইংরেজ এসে ঢাকার বিখ্যাত মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে দিয়ে অক্ষম করে দিয়েছিল। আমাদের কথা ধাতু নিয়ে। ঐ মধ্যযুগটায় ভারতে ধাতু শিল্পের কোন উন্নতি হয়নি বটে, তবে সেই শিল্প যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা নয়। সাধারণ গতানুগতিকভাবে ধাতুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অবশ্যই তৈরী হত, হয়ত তার মান নিকৃষ্ট হয়েছিল। সুদক্ষ কারিগরেরও অভাব হয়েছিল। তবে লৌহের ক্ষেত্রে মোগল আমলের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এই সময়ে ভারতে বিশাল সব কামান তৈরী হত। ভারতে সম্রাট বাবরই প্রথম কামান ব্যবহার করেন। কিভাবে ছাঁচে ঢালাই করে বড় বড় কামান তৈরী করা হত তার বিস্তৃত বিবরণ বাবর লিখে রেখে গেছেন। পরে লোহার বদলে পেতল দিয়েও অনেক বড় বড় কামান তৈরী হয়েছে মোগল যুগে। সে সময়ের সব চেয়ে বড় কামান ছিল—"মালিক-ই-ময়দান", ব্রোঞ্জের তৈরী ১৪ ৩″ দীর্ঘ এবং ৪ ১০″ পরিধিবিশিষ্ট। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদনগরে সুলতান বারহাম্ নিজাম শাহ এটা তৈরী করিয়েছিলেন। আগ্রার বিখ্যাত পিতলের কামানটিরও দৈর্ঘ্য ১৪ ফিট আর ওজন ১৪৬৯ মণ। আগ্রার দুর্গের বাইরে যমুনার তীরে এটা বসান ছিল। ইংরেজরা পরে দুর্গ অধিকার করে ৮৬টি লোহার এবং ৭৬টি পেতলের কামান

হস্তগত করে, তার মধ্যে ঐ কামানটিও ছিল। ঢাকা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সে যুগের অনেক কামান ছিল। ঢাকার বিশাল কামান ছিল "কালু-খাঁ"-এর ওজন ছিল ত্রিশ টনেরও উপরে। বিজাপুরের কামান "লন্ড-কেশব", মুর্শিদাবাদের কামান "জাহান-কোষা", এসব বিখ্যাত কামান। এই সব বিশাল কামান তৈরী করতে যে যান্ত্রিক কৌশল ও নিপুণতা প্রয়োজন সেটা সে যুগের ভারতীয়েরা জানতেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

ইউরোপেও মধ্যযুগে সংস্কৃতির পথে একটা নির্জীবতা ও নিশ্চলতা দেখা দিয়েছিল এবং রেনেসাঁস পর্যন্ত চলেছিল। রেনেসাঁসের ফলে বহু মনীষীর অবদানে ইউরোপে নতুন চিন্তাধারা ও কর্মকুশলতার বিকাশ ঘটে, এবং এক নতুন সভ্যতার পথ খুলে যায়। গ্যালিলিও, নিউটন, রামফোর্ড, বয়েল, ফ্যারাডে, ডালটন প্রভৃতির অভ্যুদয়ে বিজ্ঞান জগতে এক বিরাট পরিবর্তন হয় এবং পৃথিবী নতুন এক বিজ্ঞানযুগে প্রবেশ করে। কিন্তু ভারতকে এই নতুন চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

৩

আধুনিক বিজ্ঞান যুগ : ধাতু উৎপাদন

প্রধানতঃ যে সকল বস্তুর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছিল, প্রাচীনকালটিকে আমরা সেইভাবে ভাগ করে নিয়েছি—প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, কাংস্য যুগ এবং সবশেষে এসেছে লৌহ যুগ। এই বিচারে অবশ্য বলতে হয় লৌহ যুগ এখনও চলছে, কারণ এখনকার এই উন্নত সভ্যতায়ও আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনে লোহা অপরিহার্য।

কিন্তু গত দুই শতকে পরীক্ষা পদ্ধতির অবলম্বনে এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের প্রয়োগে আমাদের বিজ্ঞান-চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে এবং অভাবনীয় নানা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই দুশো বছরের মধ্যে যত বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে, তার এক শতাংশও পূর্ববর্তী দশ হাজার বছরে হয়নি। ফলে, হঠাৎ সভ্যতার এক আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে, যেখানে লোহা ছাড়াও জনকল্যাণে, শিল্পে, যানবাহনে, বিলাস-ব্যসনে, নিত্যপ্রয়োজনে অসংখ্য রকমের বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জন্য এটাকে আর কেবলমাত্র লৌহ যুগ বলা চলে না। এটা বস্তুতঃ বিজ্ঞান আবিষ্কারের নতুন যুগ। ১৭৮৯-তে ল্যাভয়সিয়র যখন প্রথম প্রমাণ করলেন, প্রজ্বলন ও দহনের মূলে আছে অক্সিজেন আর সেই অক্সিজেনের জন্য প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, সেইদিন থেকেই রসায়নের নবযুগের আরম্ভ।

আধুনিক যুগের রসায়নের একটা গোড়ার কথা হল, পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ রয়েছে। এই কয়টি মৌল থেকেই জড়জগতের উদ্ভব। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্র সংযুক্ত হয়েই লক্ষ লক্ষ যৌগপদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চারদিকে যে অসংখ্য বস্তু রয়েছে, সবই ঐ মৌল-গুলির সমন্বয়ে হয়েছে।

এই ৯২টি মৌলের অধিকাংশই (৭২টি) ধাতু আর বাকী কুড়িটি (যেমন, সালফার, কার্বন, অক্সিজেন, ইত্যাদি) অধাতু। ধাতুগুলির প্রধান গুণ হল—এরা তাপ এবং তড়িৎ অনায়াসে বহন করতে পারে। অধিকাংশ ধাতুকেই গলিয়ে নিয়ে বা পিটিয়ে নানা আকার দেওয়া যেতে পারে—পাত বা সরু তার করা যেতে পারে। অধাতুগুলোর এসব গুণ নেই।

ধাতুগুলির মধ্যে বেশীরভাগই পৃথিবীতে অতি সামান্য পরিমাণে আছে অর্থাৎ তারা বিরল। কয়েকটি মাত্র ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আমাদের নানা প্রয়েজেনে বিভিন্ন উপায়ে তাদের ব্যবহার করা হয়। লাঙলের ফলা থেকে উড়োজাহাজ, পেরেক থেকে হাওড়ার পুল, এক পয়সার মুদ্রা থেকে কামান-বন্দুক, কাঁটা চামচ থেকে এক্স-রে যন্ত্র—বর্তমান দুনিয়ার অনেক কিছুই ধাতুর উপর নির্ভর।

খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই মানুষের সঙ্গে সোনা, রুপা, তামা, সীসা, টিন, দস্তা, লোহা—এই কয়টি ধাতুর পরিচয় ঘটেছিল এবং তাদের যথেষ্ট ব্যবহারও হয়েছিল। অ্যালকেমীয় যুগে বা রসসিদ্ধির যুগে আর একটি ধাতু পারদ বা মারকারির ব্যবহার শুরু হয়। বাকী প্রায় চৌষট্টিটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে এই আধুনিক যুগে। এদের মধ্যে কয়েকটি ধাতু এখন খুবই সমাদৃত—যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, ম্যাগনেসিয়াম, টান্‌স্টেন, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি এবং এদের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। পৃথিবীতে এসব ধাতু কদাচিৎ স্বাভাবিক বা মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশই অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা যৌগরূপে থাকে এবং তা থেকে ধাতুকে নিষ্কাশিত করে নিতে হয়। কয়েকটি ধাতু যেমন লোহা, তামা, কিছুটা মৌলরূপে পাওয়া যায় কিন্তু বেশীর ভাগটাই যৌগরূপে নানা খনিজে থাকে। কোন একটি ধাতুর সব খনিজ থেকেই ধাতুটিকে উদ্ধার করা হয় না। যে সমস্ত খনিজ থেকে সহজে এবং স্বল্প ব্যয়ে ধাতুকে নিষ্কাশন করা সম্ভব, সেগুলিকে ঐ ধাতুর "**আকরিক**" বলা হয়। যেমন, অ্যালুমিনিয়াম মাটিতে সিলিকেটরূপে প্রচুর রয়েছে, কিন্তু মাটি থেকে ঐ ধাতুকে উদ্ধার করা অতীব দুষ্কর ; সুতরাং মাটি অ্যালুমীনিয়ামের আকরিক নয়।

সচরাচর বিভিন্ন ধাতু তাদের আকরিকগুলিতে অক্সাইড, সালফাইড, কার্বনেট, ক্লোরাইড যৌগরূপে থাকে। একই ধাতুর অবশ্য একাধিক রকমের আকরিকও হতে পারে ; যেমন দস্তার প্রধান আকরিক সালফাইড (ZnS), কিন্তু তার কার্বনেট আকরিকও ($ZnCO_3$) আছে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি ধাতুর প্রধান আকরিকের একটি তালিকা দেওয়া হল।

যৌগ	ধাতু	আকরিক
অক্সাইড	লোহা	হিমাটাইট (Fe_2O_3)
	অ্যালুমিনিয়াম	বক্সাইট ($Al_2O_3,2H_2O$)
	টিন	ক্যাসিটেরাইট (SnO_2)
	ম্যাঙ্গানিজ	পাইরোলুসাইট (MnO_2)

যৌগ	ধাতু	আকরিক
সালফাইড	সীসা	গ্যালেনা (PbS)
	দস্তা	জিঙ্ক ব্লেণ্ড (ZnS)
	তামা	চালকোপাইরাইটিস ($CuFeS_2$)
কার্বনেট	ক্যালসিয়াম	চুণাপাথর ($CaCO_3$)
	ম্যাগনেসিয়াম	ডলোমাইট ($CaCO_3$, $MgCO_3$)
ক্লোরাইড	সোডিয়াম	নুন ($NaCl$)
	পটাসিয়াম	কার্নালাইট (KCl, $MgCl_2, 6H_2O$)

এই সকল স্বভাবজাত আকরিকগুলি প্রায়ই শিলারূপে কঠিন অবস্থায় থাকে। কখনো ভূপৃষ্ঠে, পাহাড়ের গায়ে বা কখনো মাটির নীচে পাওয়া যায়। আকরিকের আসল বস্তুটির সঙ্গে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বালু, মাটি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে। এই সকল মালিন্য বা অপদ্রব্যকে বলে **খনিজ-মল** (gangue)। অনেক সময়ে আকরিকের মধ্যে খনিজ-মলই খুব বেশী থাকে, আসল বস্তু থাকে সামান্যই। যেমন, টিনের আকরিকে খনিজ মল প্রায় ৯৫% এবং টিনের অক্সাইড মাত্র ৫%। ধাতু নিষ্কাশন করার আগে আকরিক থেকে যতটা সম্ভব এই খনিজ-মল দূর করার চেষ্টা করা হয়। এর ফলে আকরিকে প্রয়োজনীয় বস্তুটির পরিমাণ (শতাংশ) বৃদ্ধি পায়। এজন্যে খনিজ-মল দূরীকরণ প্রক্রিয়াটিকে "আকরিকের গাঢ়ীকরণ" বলা হয়। বিভিন্ন উপায়ে খনিজ-মল অপসারণের চেষ্টা করা হয়। (১) প্রায়ই বিচূর্ণ আকরিককে জলস্রোতে একাধিকবার ধুয়ে নেয়া হয়। এর ফলে কাদা মাটি ইত্যাদি অনেকটা চলে যায়; অপেক্ষাকৃত ভারী ধাতব উপাদানগুলি নীচে থিতিয়ে যায়।

(২) অনেক সময়, বিশেষতঃ যখন সালফাইড আকরিক থেকে ধাতু উৎপাদন করতে হয়, তখন বিচূর্ণ আকরিককে পাইন তেল ও জলের একটি ফেনিল মিশ্রণে মিশিয়ে একটি প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। নিবিড় সংমিশ্রণের জন্য এই প্রবাহের তলা থেকে সরু সরু ছিদ্র দিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ আকারে অনবরত বাতাস পরিচালনা করা হয়। আলোড়নের ফলে ধাতব সালফাইড কণাগুলিকে তেল আকর্ষণ করে নেয় আর অপদ্রব্যগুলি জলের নীচে থিতিয়ে পড়ে। সালফাইড তেলের সঙ্গে উপরে ভাসতে থাকে। সেখান থেকে ধাতব সালফাইডকে পৃথক করে নেওয়া হয়। এভাবে অনেকটা খনিজমল দূর হয়ে যায় এবং আকরিকে ধাতুর আপেক্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) প্রায়ই বিশুদ্ধতর আকরিককে একটি উপযুক্ত চুল্লীতে নিয়ে অনুচ্চ উষ্ণতায় মৃদু বায়ুপ্রবাহে তাপিত করা হয়। কিন্তু গলানো হয় না। এই

প্রক্রিয়ার নাম ভস্মীকরণ বা calcination। এতে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, গন্ধক প্রভৃতি থাকলে তা আকরিক থেকে উবে যায় ; আকরিক হাল্কা ও ফাঁপা হয়। এছাড়া, প্রয়োজনমত অন্যান্য পদ্ধতিতেও আকরিকের গাঢ়ীকরণ করা হয়।

ধাতু-নিষ্কাশন : আকরিক ধাতুটি যৌগাকারে থাকে, সুতরাং সেখানে থেকে ধাতুটিকে উদ্ধার করতে হলে অবশ্যই রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োজন হবে। ধাতু-উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ; এর দুইটি প্রধান উপায় হল (১) তাপ-প্রয়োগ পদ্ধতি এবং (২) তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি।

তাপ-প্রয়োগ পদ্ধতি : সালফাইড, কার্বনেট বা অক্সাইড জাতীয় আকরিক থেকে ধাতু-উৎপাদনে প্রায়ই এই উপায়টি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে উচ্চ উষ্ণতায় আকরিককে বিজারিত করে বিগলিত অবস্থায় ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। প্রক্রিয়াটি উত্তপ্ত অবস্থায় সংঘটিত হয়, তাই পদ্ধতির নাম তাপ-প্রয়োগ পদ্ধতি। আকরিকের ডেলাগুলিকে প্রথমে বায়ুপ্রবাহে একটি চুল্লীতে খুব তাপিত করা হয়, কিন্তু গলানো হয় না। উত্তাপে আকরিকের কার্বনেট বা সালফাইড যৌগ ধাতুর অক্সাইডে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম তাপ-জারণ বা roasting। তাপজারণের উদ্দেশ্য হল ধাতুর অক্সাইড পাওয়া।

তারপর এই অক্সাইডের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ কোক এবং প্রয়োজনীয় বিগালক (flux) মিশান হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় কোক বিজারক হিসাবে কাজ করে, ধাতব অক্সাইডের অক্সিজেনকে বিচ্যুত করে নিয়ে যায় এবং ধাতুটি মুক্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। বিগালকের কাজ হল উচ্চ উষ্ণতায় আবর্জনা ও খনিজমলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তরল "ধাতুমল" (slag) তৈরী করা। খুব উচ্চ তাপমাত্রায় বিশেষ রকম চুল্লীতে এই বিক্রিয়াগুলি করান হয়। উৎপন্ন ধাতু এবং উৎপন্ন ধাতুমল উভয়েই তরল অবস্থায় থাকে কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মেশে না। চুল্লীর নীচে একটি প্রকোষ্ঠে এই দুইটি এসে পৃথক পৃথক স্তরে জমা হয়। দুটিকে আলাদা-ভাবে বের করে সংগ্রহ করা হয়।

ধাতব অক্সাইড + কোক → ধাতু + কার্বন মনোক্সাইড

বিগালক + খনিজমল → ধাতুমল

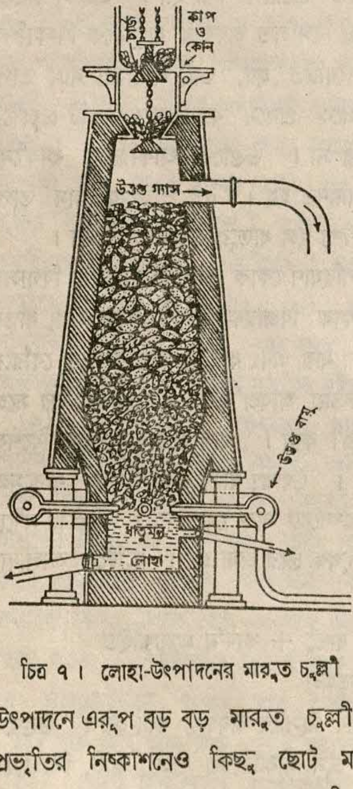
প্রায়ই চুনাপাথর ($CaCO_3$) বিগালক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উত্তাপে চুনাপাথর থেকে চুন তৈরী হয়। এই চুন আকরিকের বালু, মাটি, সিলিকেট প্রভৃতির সঙ্গে মিলে তরল ধাতুমলের সৃষ্টি করে। এইভাবে তরল ধাতুর উৎপাদনকে বলা হয় বিগলন-প্রক্রিয়া (smelting)।

লোহার অক্সাইড থেকে এভাবে লোহা তৈরী হয়। বিজ্ঞানীরা সেই বিক্রিয়াগুলিকে লেখেন ঃ

$$Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 2Fe + 3CO$$
$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$
$$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3 \text{ (ধাতুমল)}$$

বিগলন প্রক্রিয়ার জন্য নানা রকমের চুল্লী ব্যবহৃত হয়। এদের দু-তিনটির কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

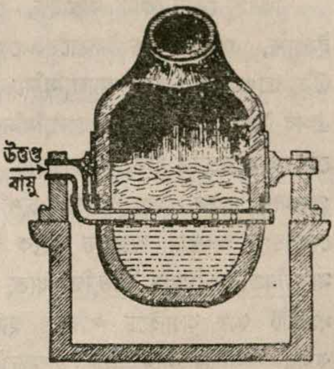
১। **মারুত-চুল্লী** (Blast Furnace) ঃ মারুত চুল্লী খুব উঁচু চিমনির মত ; ৫০-১০০ ফিট উঁচু। মাঝখানটা চওড়া আর সেখান থেকে উপরে ও নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে (চিত্র ৭)। মাঝখানের প্রশস্ত অংশের ব্যাস ১৫-২০ ফিট। আকরিক, কোক এবং বিগালকের মিশ্রণ চুল্লীর উপরের প্রবেশ-পথ দিয়ে অভ্যন্তরে দেওয়া হয়। চুল্লীর সর্বনিম্ন অংশে একটি প্রকোষ্ঠে এসে গলিত ধাতু এবং ধাতুমল জমা হয়। গলিত ধাতুমল ধাতুর উপরে ভাসে। এদের দুইটিকে আলাদা নল দিয়ে বের করে নেওয়া হয়। এই প্রকোষ্ঠের ঠিক উপরে কয়েকটি নলের সাহায্যে (tuyers) উচ্চচাপে উত্তপ্ত বায়ু চুল্লীর ভিতরে পরিচালিত করা হয়। তপ্ত বায়ুতে কোক জ্বলতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায় কোক ও কোকের প্রজ্বলনে উদ্ভূত কার্বন-মনোক্সাইড ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে দেয়। উৎপন্ন তপ্ত গ্যাস উপরের একটি নির্গম পথে বেরিয়ে যায়। লৌহ-উৎপাদনে এরূপ বড় বড় মারুত চুল্লী সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। তাম্র, সীসা প্রভৃতির নিষ্কাশনেও কিছু ছোট মাপের মারুত চুল্লী একটু পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। মারুত চুল্লীগুলি পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী। ইস্পাতের ভিতরের দিকে অগ্নিসহ মৃত্তিকার খুব পুরু আস্তর (lining)



চিত্র ৭। লোহা-উৎপাদনের মারুত চুল্লী

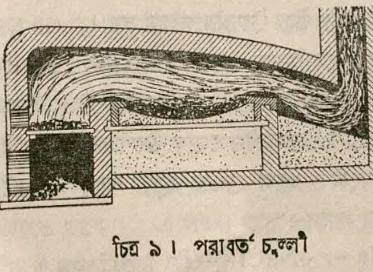
থাকে। জামসেদপুর, দুর্গাপুর, ভিলাই, সব লোহার কারখানাতেই এই চুল্লী দেখতে পাবেন।

২। **বিসিমার চুল্লী** (Bessemer Converter) : বিসিমার চুল্লী পেটালোহার পাত দিয়ে তৈরী এবং ডিম্বাকৃতি, ভিতরের দিকে পুরু আস্তর থাকে (চিত্র ৮)। চুল্লীর মাঝখানে বা ভিতরের দিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশের জন্য কতকগুলি নল থাকে। দুইটি শক্ত অক্ষদণ্ড এবং যন্ত্রযুক্ত চাকার সাহায্যে চুল্লীটি মাটি থেকে অনেক উপরে ঝুলান থাকে। চুল্লীটিকে কাত করে গলিত গাঢ় আকরিক বা অবিশুদ্ধ ধাতু ভরা হয়। তারপর সেটাকে উল্লম্ব অবস্থায় রেখে গলিত তরলে উত্তপ্ত বায়ু পরিচালনা করা হয়। এর ফলে আবর্জনা পুড়ে যায় এবং সেটা আস্তরের সাহায্যে ধাতুমলে পরিণত হয়ে গলিত ধাতুর উপরে ভাসতে থাকে। কয়েক মিনিটেই প্রক্রিয়াটি শেষ হয়। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি কাত করে প্রথমে ধাতুমলকে ফেলে দেওয়া হয় এবং তারপর গলিত ধাতুকে বের করে নেওয়া হয় ; কপার সালফাইড থেকে তামা নিষ্কাশনে এবং ইস্পাত তৈরীতে এরকম কনভারটার বা চুল্লী ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৮। তামা-উৎপাদনে ব্যবহৃত বিসিমার-চুল্লী

৩। **পরাবর্ত-চুল্লী** (Reverberatory Furnace) : এই চুল্লীটি নীচু ছাদ-বিশিষ্ট একটি অগভীর আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মত (চিত্র ৯)। পাশে কয়লা পুড়িয়ে চুল্লীটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীর ভিতরে উত্তপ্ত বায়ুও পরিচালিত করা হয়। চুল্লীর মেঝেতে আকরিক, কোক এবং বিগালকের মিশ্রণ রাখা হয়। উত্তপ্ত গ্যাসগুলি একটি চিমনী দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। বিগলনে এবং অনেক সময় তাপজারণেও এই রকম চুল্লী ব্যবহার করা হয়।


চিত্র ৯। পরাবর্ত চুল্লী

থারমাইট পদ্ধতি ঃ ধাতব অক্সাইডে ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত থাকে। এই অক্সাইড থেকে অক্সিজেনকে সরিয়ে নেওয়ার নাম বিজারণ। সচরাচর ধাতব অক্সাইডের এই বিজারণ উচ্চ উষ্ণতায় কোকের সাহায্যে করা হয় ; যেমন এর আগের অনুচ্ছেদে দেখেছি, আয়রন অক্সাইডকে কোক দিয়ে বিজারিত করে লোহা উৎপাদন করা হয়।

কিন্তু কোন কোন অক্সাইড, যেমন ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি, এগুলো উচ্চ উষ্ণতাতেও কোক দ্বারা বিজারিত হয় না। দেখা গেছে, উঁচু তাপমাত্রায় বিচূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিজেন আসক্তি খুব তীব্র। সেইজন্য ঐসব উত্তপ্ত অক্সাইডকে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিজারণ করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ঐসব ধাতুর অক্সাইডের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ ধাতব অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ মিশিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শ্বেততপ্ত অবস্থায় অক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনকে টেনে নেয় এবং ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি তার অক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এরূপ বিজারণ করার পদ্ধতির নাম "গোল্ডস্মিড্ট থারমাইট পদ্ধতি"। রসায়নবিদেরা এই বিজারণকে সংকেত দিয়ে প্রকাশ করেন ঃ—

$$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Cr$$ (ক্রোমিয়াম)

$$3MnO_2 + 4Al \rightarrow 2Al_2O_3 + 3Mn$$ (ম্যাঙ্গানিজ)

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

অনুরূপ একটি পদ্ধতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতব ক্লোরাইড থেকে সোডিয়াম ধাতুর সাহায্যে ক্লোরিন অপসারিত করে ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। অর্থাৎ সোডিয়াম দিয়ে ধাতব ক্লোরাইডকে বিজারিত করে ধাতুকে মুক্ত করা হয়।

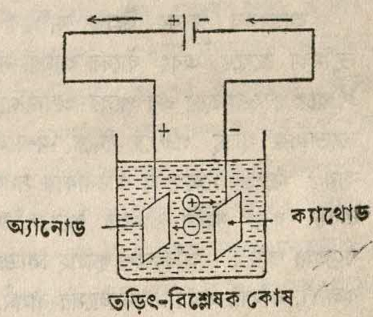
ক্লোরাইডের বিজারণ ঃ কোন কোন সময়ে যে ধাতুটি উৎপাদন করতে হবে আকরিক থেকে তার বিশুদ্ধ ক্লোরাইড প্রথমে প্রস্তুত করা হয়। তারপর সেই ধাতব ক্লোরাইডকে সোডিয়াম ধাতুসহ উচ্চ উষ্ণতায় গলান হয়। এর ফলে ক্লোরিন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং প্রয়োজনীয় ধাতুটি মুক্তাবস্থায় পাওয়া যায়। থোরিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এভাবে তাদের ক্লোরাইড থেকে উৎপাদন করা হয়। বিক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন পদার্থগুলিকে ফুটন্ত জলে দেওয়া হয়, লবণ ($NaCl$) দ্রবিত হয়ে যায় এবং ধাতুটি পৃথক হয়ে আসে।

$$ThCl_4 + 4Na \rightarrow 4NaCl + Th$$ (থোরিয়াম)

থোরিয়াম ক্লোরাইড — সোডিয়াম — সোডিয়াম ক্লোরাইড

তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ তামা বা অন্যান্য সব ধাতু তড়িৎ-পরিবাহী অর্থাৎ তাদের ভিতর দিয়ে অনায়াসে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ধাতুটির কোন রূপান্তর ঘটে না। ধাতব লবণগুলিরও একটি বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের গলিত অবস্থায় অথবা তাদের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই তড়িৎ-প্রবাহের সময় লবণটি বিভাজিত হয়ে যায়। যে সব পদার্থ এভাবে তড়িৎ সাহায্যে ভেঙে যায়, তাদের বলা হয় তড়িদ্-বিশ্লেষ্য পদার্থ। সব লবণই, যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কপার সালফেট, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি তড়িদ্-বিশ্লেষ্য।

তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণকে অথবা তাকে গলিত অবস্থায় একটি পাত্রে রেখে দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত (প্লাটিনাম বা নিকেল বা কপারের পাত) তরলে আংশিক ডুবিয়ে রাখা হয়। পাত দু'টিকে একটি ব্যাটারীর পজিটিভ ও নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে জুড়ে দিলে দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে (চিত্র ১০)। এই দুইটি ধাতুর পাতকে বলা হয় তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড। যেটি পজিটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত তার নাম অ্যানোড (anode) আর যেটি নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত তার নাম ক্যাথোড (cathode)। অতএব বিদ্যুৎপ্রবাহ অ্যানোড দিয়ে তরলে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। দেখা যায়, বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় লবণটি বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বদাই লবণের বিশ্লেষণজাত ধাতুটি ক্যাথোডে এসে জমা হচ্ছে। ক্যাথোড থেকেই ধাতুটি সংগ্রহ করা হয়। এটাই ধাতু-উৎপাদনের তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি।



চিত্র ১০। তড়িৎ-বিশ্লেষণ

সিলভার নাইট্রেট, কপার সালফেট প্রভৃতি লবণের জলীয় দ্রবণ নিয়ে তার ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথোডে সিলভার, কপার প্রভৃতি জমতে থাকে। ঐ সকল ধাতু এভাবেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ সাহায্যে বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরী করা যেতে পারে।

কোন কোন ধাতু আছে যাদের অক্সাইডকে উচ্চ তাপমাত্রাতেও কোক অথবা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিজারিত করা যায় না ; যেমন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড।

এসব ক্ষেত্রে প্রথমে অক্সাইডকে ধাতুটির ক্লোরাইডে পরিণত করে নিতে হয়। তারপর বিশুদ্ধ ক্লোরাইড লবণটিকে বিগলিত অবস্থায় রেখে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। তখন ধাতুটি ক্যাথোডে উৎসারিত হয়ে আসে।

		ক্যাথোডে		অ্যানোডে
$CaCl_2$	$\rightarrow$	Ca	$+$	Cl_2
$2NaCl$	$\rightarrow$	$2Na$	$+$	Cl_2
		(ধাতু)		

কখনও কখনও আকরিক থেকে পাওয়া অক্সাইডকে গলানো যায় না ; যেমন, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। তখন সেই অক্সাইডকে অন্য কোন তড়িৎবাহী পদার্থে দ্রবিত করে নিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করা হয়। ফলে, প্রয়োজনীয় ধাতুটি ক্যাথোডে উৎপন্ন হয়।

আজকের দিনের উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে সকল ধাতুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং যাদের আমরা নানা প্রয়োজনে নিয়োগ করি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে এর পরের অধ্যায়গুলিতে। আগেই বলা হয়েছে দুই বা ততোধিক ধাতু গলিয়ে নিয়ে মিশালে সেগুলো সাধারণতঃ ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। ঠান্ডা হলে সেই কঠিনাকার সমসত্ত্ব মিশ্রণকে বলা হয় ঐ ধাতুদের সংকর। একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, বিশুদ্ধ একক ধাতু আমরা খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন ধাতু-সংকর ব্যবহৃত হয়। পিতলের কলসী, কাঁসার থালা, স্টেনলেসের বাসন, কোনটাই বিশুদ্ধ ধাতু নয়, সবই সংকর-ধাতু। মিশ্রণের ফলে সংকরের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমন্বয় হয় এবং সেইজন্য সংকর-ধাতু বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী হয়। বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম বা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে উড়োজাহাজের কাঠামো করা যায় না। কিন্তু এই দুইয়ের সংকর-ধাতু ডুরালুমিন ঐ কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী।

৪

দৈনন্দিন প্রয়োজনের ধাতু

সোনা (Au)

ধাতুর মধ্যে সোনার সঙ্গেই মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল সেই উপলযুগেই। তার প্রধান কারণ পৃথিবীতে প্রায় সবটুকু সোনাই মৌলিক অবস্থায় বা ধাতুরূপে পাওয়া যায়। পাথর খুঁজতে গিয়ে মানুষ ছোট্ট ছোট্ট সোনার গুটি বা স্বর্ণ-খণ্ডের সন্ধান পেয়েছিল। স্বর্ণের অপরূপ বর্ণ, মনোরম উজ্জ্বলতা ও দ্যুতি, কোমল মসৃণতা আর তার নানা গুণের জন্য মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল। জলে, বাতাসে এর কোনই পরিবর্তন হয় না, আঘাতের ফলে পাথরের মত চূর্ণ হয়ে যায় না, গলানো হলেও ঠাণ্ডা করলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে—তাই এই দুর্লভ বস্তুটি সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের পরম প্রিয়। আজও পর্যন্ত মানুষের যা কিছু পরম আদরের, যা কিছু উত্তম, তাকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মা পরম স্নেহে শিশুকে বুকে চেপে বলে, 'সোনা, আমার সোনা।' লক্ষ্মী ছেলেকে বলে, 'সোনার টুকরো।' কোন জাতি বা সভ্যতার সবচেয়ে উন্নত কালটিকে বলা হয় 'স্বর্ণযুগ'।

আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগেও সোনার চলন ছিল। মেসোপটেমিয়াতে আর (Ur)-এর খনন থেকে সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের যে প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তাতেও স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে। ঋক্‌বেদেও হিরণ্যের উল্লেখ আছে, হিরণ্য সোনার এক নাম। সোনার এরকম অনেক নাম রয়েছে। স্বর্ণ, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, কনক, কাঞ্চন, শাতকুম্ভ, তপনীয়, জাম্বুনদ, চামীকর, রুক্ম ; সোনার ল্যাটিন নাম Aurum, তাই এর রাসায়নিক চিহ্ন, Au।

প্রকৃতিতে সোনা মাটির নীচে কোয়ার্জ পাথরের বুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার আকারে থাকে। পাথরের সর্বত্র সোনা থাকে না। পাথরের মধ্যে লম্বা লম্বা শিরা সৃষ্টি করে সোনা বিধৃত হয়ে থাকে। এই স্বর্ণবাহী পাথুরে শিরাগুলিই সোনার উৎস। এই শিরার মধ্যে অনেক সময় সোনা এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে উপর থেকে দেখে সোনার অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। বিস্তৃত

স্বর্ণশিরাকে বলে লোড (lode)। খনির ভেতর থেকে এই স্বর্ণধর কোয়ার্জ শিরা বা লোডকে যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে প্রচুর বালুসহ উপরে তুলে আনা হয়। তারপর জলস্রোতের সঙ্গে এই বালু ও স্বর্ণকণার মিশ্রণকে পারদ-মাখানো তামার চাদর বা টেবিলের উপর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। হাল্কা বালু জলের সঙ্গে বয়ে যায়। কিন্তু ভারী সোনার কণাগুলো পারদে আটকে যায় এবং সংকর সৃষ্টি করে। পরে পারদ স্তরটি চেঁচে নিয়ে পাতিত করলে, পারদ বাষ্পীভূত হয়ে আসে আর পাতন যন্ত্রে সোনা পড়ে থাকে।

যখন সোনার অনুপাত খুব কম থাকে তখন বালু-সোনার মিশ্রণটিকে একটি ট্যাঙ্কে লঘু সোডিয়াম সায়ানাইডের দ্রবণের সঙ্গে মিশান হয়। সোনা সায়ানাইডে দ্রবিত হয়ে যায়। বালু ছেঁকে আলাদা করার পর, দ্রবণে একটি জিঙ্ক দণ্ড রাখলে দ্রবণ থেকে সোনা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সোনা গলিয়ে নিয়ে বড় বড় টুকরা করা হয়।

সোনা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম কণাতেই থাকে, তবে ক্বচিৎ কখনও বড় ডেলাও (nugget) হঠাৎ পাওয়া যেতে পারে। একবার অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় দু'শ পাউণ্ড ওজনের একটি বিরাট সোনার তাল পাওয়া গিয়েছিল, এর নাম "হলটারম্যান পিণ্ড।" বিহারে একসময় এক নদীতটের বালুকাতে ২৮·৬ গ্রাম ওজনের একটি সোনার ডেলা পাওয়া গিয়েছিল।

প্রকৃতিলব্ধ সোনার সঙ্গে প্রায়ই অন্যান্য ধাতু, বিশেষতঃ রূপা, অল্পাধিক মিশ্রিত থাকে। রূপা ছাড়াও, সময় সময় তামা, অ্যাণ্টিমনি, টেলুরিয়াম ধাতু সোনার সঙ্গে থাকে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোনাকে বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়।

প্রাচীনকালে অনেক নদীর তীরের বালু থেকে যথেষ্ট সোনা সংগ্রহ করা হত। এখনও কোন কোন নদীতটের বালু থেকে সামান্য সোনা পাওয়া যায়। এই সোনা বস্তুতঃ কোয়ার্জ-শিরা থেকেই আসে। রোদে, জলে, বাতাসে, বৃষ্টিতে বা অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে কোয়ার্জ পাথর ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন স্রোতে সেই বালু-সোনার মিশ্রণ নদীপথে দূর দূরান্তরে চলে আসে এবং কালক্রমে বালুর সঙ্গে নদীতটে সোনার দানা থিতিয়ে পড়ে। ছোট ছোট ডালার মধ্যে বালু নিয়ে জলে মিশিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ধোয়া হয়; বালু জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ভারী সোনার কণা ডালার নীচে সঞ্চিত হতে থাকে। অনেকবার এই প্রক্রিয়া করলে ডালাতে সোনাটুকু সংগৃহীত হয়। এখনও নদীতটের বালু থেকে এইভাবে কিছু সোনা উদ্ধার করা হয়। আমাদের দেশে বিহারের সুবর্ণরেখা নদীতটের, নেফার সুবনসিরি, লোহিত প্রভৃতি নদীতীরের, উড়িষ্যার

হনুমনতিয়া, বোড়াই, বর্নাগর প্রভৃতি নদীতীরের বালু থেকে কিছু কিছু সোনা এইভাবে সংগ্রহ করা হয়।

সাগর জলেও সোনা আছে। সমুদ্রের সোনার মোট পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টন হলেও প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে সোনা রয়েছে মাত্র ০.০০০০০৬ ভাগ; এত স্বল্প গাঢ়ত্বে থাকার জন্য সাগরজল থেকে সোনা উদ্ধার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর আর্থিক অবস্থা যখন খুবই সঙ্গীন, সেই সময় বিজ্ঞানী হেভার সাগরজল থেকে সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খরচ এত বেশী পড়ল যে সেই প্রচেষ্টা সফল হল না। ভূত্বকে সোনার পরিমাণ ৫×১০^{-৭} %।

অধুনা প্লাটিনাম বা ইরিডিয়াম পরমাণুকে শক্তিশালী ডয়টেরন কণিকা দিয়ে আঘাত করে সোনার পরমাণুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ অ্যালকেমি-বিদ্‌দের স্বপ্ন রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এই রূপান্তরের শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে পারে না কারণ প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম সোনার চেয়ে দামী।

অতি প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা মিটত পণ্যবিনিময়ের দ্বারা। কৃষক তার শস্য দিয়ে তার পরিবর্তে পশুপালকের কাছ থেকে ভেড়া সংগ্রহ করত। তাঁতী তার বস্ত্রের বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে নিত গম। কুমোর হাঁড়ি-কলসী দিয়ে সংগ্রহ করত তার রুটি। এইভাবে পরস্পরের অভাব পূরণ হত। এমন কি শ্রমের বিনিময়েও প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া যেত। সেদিনে রাজকোষ বা রাজ-ঐশ্বর্য বলতে বোঝাত গম, ভুট্টা, রুটি, মদ, বস্ত্র, অস্ত্র, চামড়া প্রভৃতির সুবিশাল ভান্ডার। সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী, শ্রমিক এদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় জিনিস সেখান থেকেই সরবরাহ হত। এ রকম বিনিময়-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। এরপর যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পেল তখন উদ্বৃত্ত শস্য, বস্ত্র ইত্যাদির বিনিময়ের অসুবিধা দেখা দিল। চাষী যার কাছ থেকে বস্ত্র চায় সেই তাঁতীর হয়ত শস্যের তেমন প্রয়োজন নেই। আবার ধর, একটা দেশে প্রচুর শস্য রয়েছে। তাকে প্রয়োজনে অপর দেশ থেকে কাঁসা পিতল আমদানী করতে হবে। কিন্তু সেই দেশের শস্যের চাহিদা সীমিত—সুতরাং বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। মানুষ তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে কোন একটি মাধ্যমের ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা তথা অভাব পূরণ করা সহজতর হবে। কিন্তু মাধ্যমটিকে এমন হতে হবে যাতে সেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় হয় এবং সেটা মহার্ঘ হওয়া প্রয়োজন। এই মাধ্যম অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল

সোনার উপরে। সোনা অবিনশ্বর, সোনা দুর্লভ, সোনার প্রতি মানুষের লোভের অন্ত নেই। সুতরাং সোনা দিয়ে পণ্যের আদান প্রদান সহজতর হবে।

এর আগে সোনা ছিল সম্রাট, সামন্তরাজ, আর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের কাছে। আর সোনা ছিল নানা মন্দিরে, দেউলে। সোনার অলংকারের আদরই ছিল প্রধান, আর সম্রাটেরা সোনা দিয়ে তাদের ঐশ্বর্য ও মর্যাদা দেখাতেন। সেই পুরাকালেও কিন্তু সোনার পরিমাণ কম ছিল না। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে নেবুচাদ্‌নেজার যে বিরাট সাততলা ৬৫০ ফিট উঁচু দেব-দেউল জিগুরত (ziggurat) তৈরী করেছিলেন তার উপরের ছাদ ছিল সোনার আর তার উপর ছিল সোনার পালংক। এই সময়েই ব্যাবিলনে কিছু কিছু পণ্য সংগ্রহ হত সোনার বিনিময়ে। তখনও স্বর্ণমুদ্রা হয়নি। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড বা রৌপ্যখণ্ড ওজন করে করে তার বিনিময়ে শস্য, বস্ত্র পাওয়া যেত। আনুমানিক ½ আউন্স পরিমাণ সোনার টুকরাকে বলা হত এক শেকেল (shekel) আর ৩৬০০ শেকেলে হত এক ট্যালেন্ট (talent)। সমসাময়িককালে মিশরেও প্রচুর সোনা ছিল। সম্রাট তৃতীয় থুতমোসের (খৃীষ্টপূর্ব ১৪৪৭) সময়ে কর হিসেবে রাজকোষে সোনারূপা জমা দিতে হত। তার রাজকোষে তখন ছিল নয় হাজার পাউন্ড সোনা। সামন্তরা মিশরকে যে উপঢৌকন দিত তাতে হীরা, জহরৎ, অস্ত্রাদি ছাড়া, কখনও সোনা-রূপার তৈরী রথও থাকত। টুটেনখামেনের (খৃঃ পূঃ ১৩৬০) সমাধির প্রত্নসম্ভারে সোনা-রূপায় মোড়া চেয়ারও ছিল। এই থুতমোসের সময়েও ছোট ছোট সোনার গুটি ওজন করে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ হত। তখনও নির্দিষ্ট মানের কোন মুদ্রার প্রচলন হয় নি।

দুর্ধর্ষ অ্যাসিরিয় সম্রাট সেনাচারিব-ই (খ্রীঃ পূঃ ৭০০) সর্বপ্রথম টাঁকশালে রূপা গলিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট ওজনের 'অর্ধ-শেকেল' সরকারী মুদ্রা চালু করেন। তারপরে লিডিয়ার রাজা ক্রোসাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৭০-৫৪৬) সোনা এবং রূপার ছাপ দেওয়া বা মোহরাঙ্কিত মুদ্রা তৈরী করে প্রচলন করেন। এই সব রাজকীয় মুদ্রার মান নির্দিষ্ট থাকাতে প্রতিক্ষেত্রে ওজন করে মূল্য নির্ধারণের আর প্রয়োজন রইল না। পণ্যের মূল্য মুদ্রায় স্থির করা হতে থাকল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই সুবিধা হল। কিন্তু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ উইল ডুরাণ্টের মতে হরাপ্পা সভ্যতার সময়েই (খ্রীঃ পূঃ ২৯০০) ভারতে মুদ্রার প্রচলন ছিল।

সরকারী মুদ্রা-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই রাজকোষে সোনা জমা হতে শুরু করল এবং সেই সংগৃহীত সোনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শতক আগে সম্রাট দারিয়ুসের কালে (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫) পারস্য সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার এক উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল। সিন্ধুনদের তট থেকে পশ্চিমে আয়োনিয়া

এবং দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ২০টি সত্রপে বিভক্ত ছিল। ভারতকে তখন বার্ষিক নজরানা দিতে হত ৪৬৮০ ট্যালেন্ট সোনা, যার মূল্য আজ এক হাজার কোটি টাকা। সমস্ত সত্রপের কাছ থেকে যে সোনা রাজকোষে আসত তার পরিমাণ ১৪৫৬০ ট্যালেন্ট। ভারতকেই তার সিংহভাগ যোগাতে হত। ঐতিহাসিক হেরাডোটাস এবং পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস দুজনেই বলেছেন, খনিজ পাথর থেকে সোনা উদ্ধারের পদ্ধতিটি ভারতীয়েরাই প্রথম আবিষ্কার করে। পারস্য সম্রাটের সিংহাসন ছিল সোনার, তার মাথার উপরের স্বর্ণখচিত চাঁদোয়া ছিল স্বর্ণদণ্ডের উপর। রাজসভাসদদের গৃহে খাবার টেবিল ছিল সোনার পাতে মোড়া; পানপাত্র, চামচ ইত্যাদি থাকত সোনার। প্রচুর সোনা পারস্য সম্রাট যুদ্ধে ব্যয় করার পরেও আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য জয় করেন তখন রাজকোষ থেকে ১৮০০০০ ট্যালেন্ট সোনা পেয়েছিলেন।

অতীত ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারও ছিল বিপুল। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২২-২৯৮) পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় বলেছেন : "এমন ঐশ্বর্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিশাল প্রাসাদের স্তম্ভগুলি সব সোনার চাদরে মোড়া। তার উপর সোনার লতাপাতা, পাখীর সব কারুকার্য।" কত পরিমাণ সোনা থাকলে এটা সম্ভব তা এখন কল্পনা করাও কঠিন। তাছাড়া, হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরকাল থাকত অজস্র স্বর্ণালঙ্কার আর স্বর্ণমুদ্রা। তাই হাজার বছর পরেও মামুদ সেই সোনার লোভে বারংবার এসে সোমনাথের মন্দির লুট করেছিলেন। ইহুদী যুগের রাজা সলোমোনের স্বর্ণ ভান্ডারের খ্যাতি ছিল বিশ্ব জুড়ে। কথিত আছে প্রতি বছর আরবের খনি থেকে ৬৬০ ট্যালেন্ট সোনা আসত রাজকোষে। জেরুজালেমে সলোমন যে যেহোভার মন্দির করেছিলেন তার কড়ি, বরগা ছিল সোনার; দরজা, স্তম্ভ ইত্যাদি স্বর্ণাচ্ছাদিত। মন্দিরে ছিল সোনার ধূপদান, লণ্ঠন, শতাধিক সোনার পাত্র, চামচ ইত্যাদি।

এসব পুরাকালের কাহিনী। এ যুগেও কিন্তু স্বর্ণ আহরণ এবং সঞ্চয় সমান ভাবেই চলেছে। মানুষ যেখানেই সোনার সন্ধান পেয়েছে, সেখান থেকেই সম্পূর্ণ সোনাটুকু উদ্ধার করে এনেছে। তারপর আবার নতুন উৎসের সন্ধান করেছে। গত ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট উত্তোলিত সোনার ৬১% এবং ৮০% এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। আজ সে সব খনি নিঃশেষিত, সেখানে আর বিশেষ সোনা নেই। ভারতের কোলার স্বর্ণখনির ইতিহাসে একটু স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকেই ভারতের কোলার খনির প্রায় ১০০ ফিট গভীরতা এবং হুট্টি খনির ৬৫০ ফিট গভীরতা থেকে সোনা তোলা হত। আধুনিক যন্ত্রপাতি তো ছিল না, তবু এত গভীরে কী করে খননের কাজ হত সেটা

আশ্চর্যের বিষয়। কোন অজ্ঞাত কারণে—হয়ত জলস্রোতের জন্য কিংবা ধস নামার জন্য—আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেখানে আবার খনন শুরু হয়েছে এবং এখন প্রায় ৮০০০-৯০০০ ফিট নীচু থেকে সোনা তুলে আনা হচ্ছে।

সোনার প্রতি আসক্তি মানুষের মজ্জাগত। স্বর্ণলোলুপতা কত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, পাগলের মত ছুটিয়েছে। একসময় স্পেনীয়েরা মেক্সিকো থেকে প্রচুর সোনা আমদানি করত। তখন অনেক মানুষের মনে একটা ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর কোন এক সুদূর সীমান্তে এক সোনার দেশ—El Dorado—নিশ্চয়ই আছে, যার ধূলিমুঠিও সোনা। সেই দেশের সন্ধান সবাই করত। গত শতাব্দীতে বহু লোক গাঁইতি, শাবল, কোদাল, বন্দুক, ছোরা নিয়ে দূর দূরান্তরে যেত সোনার সন্ধানে। হঠাৎ কোথাও সোনা পাওয়া গেছে শুনলে হাজার হাজার লোক বনজঙ্গল ভেঙে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেও সেই দিকে ছুটত—এর নাম ছিল Gold Rush। সোনার লোভে মানুষ কি অসম্ভব কষ্ট সহ্য করত তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত এসব gold rush অভিযানের ইতিহাসে রয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত। ১৮৯৭ সনে আমেরিকার ইউকোনের স্কাগওয়েতে সোনা পাওয়া গেছে, খবর এল। দেখতে দেখতে ১০০০০ লোক সেদিকে ছুটল বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত ২০০০ গিয়ে সেখানে পেঁছাল, পথের কষ্টে অধিকাংশই মারা গেল আর কিছু যেতে না পেরে ফিরে এল।

আজকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেনের মাপকাঠি সোনা। আমরা যখন যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্য, এসব অন্য দেশ থেকে আমদানি করি তখন তার মূল্য সোনা দিয়ে পরিশোধ করতে হয়। সর্বত্রই এই রীতি। সুতরাং সব দেশেরই সোনার ভাণ্ডার রাখতে হয়। আজকাল সোনা সবচেয়ে বেশী সংগৃহীত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ্যালের খনি থেকে। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে রাশিয়া, কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬৭-তে কি পরিমাণ স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে উত্তোলিত হয়েছিল তার একটা তালিকা দেওয়া হল—এটা থেকে স্বর্ণ সংগ্রহের একটা ধারণা হবে।

১৯৬৭-তে স্বর্ণ উত্তোলন (কিলোগ্রাম)

দক্ষিণ আফ্রিকা	—	৯৪৯৫৭৭	ঘানা	—	২৩৭২৯
রাশিয়া	—	১৭৭২৭০	অস্ট্রেলিয়া	—	১৯৪৯৯
কানাডা	—	৮২১১৮			……
যুক্তরাষ্ট্র	—	৪৯২৬২	ভারত (১৯৭৭)	—	৩০৯৫

ভারতে সোনা সামান্যই সংগৃহীত হয়। ভারতের সবগুলি স্বর্ণখনিই দক্ষিণাপথে। কর্ণাটকের কোলার এবং হুট্টি খনি থেকে বেশী সোনা পাওয়া যায় আর কর্ণাটকের গাদক খনিও উল্লেখযোগ্য। তামিলনাদের ওয়াইনাদ স্বর্ণ ক্ষেত্র এবং অন্ধ্রের অনন্তপুর খনি থেকেও কিছু সোনা উদ্ধার করা হচ্ছে। সব খনিগুলিই ভারত সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত।

এ যুগের সোনার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী জমা রয়েছে বিভিন্ন দেশের সরকারী তোষাখানায় বা সরকারী ব্যাঙ্কে। এক সময়ে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী হত। আজকাল স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন প্রায় নেই। অলঙ্কারের জন্যও যথেষ্ট সোনা খরচ হয়। তবে শক্ত করার জন্য অলঙ্কারের সোনায় কিছু রূপা বা তামা মিশিয়ে নেওয়া হয়। সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় "ক্যারেটে"। বিশুদ্ধ সোনাকে ২৪ ক্যারেট ধরা হয়। অলঙ্কারে সচরাচর ২২, ১৮, ১৪ বা ৯ ক্যারেট সোনা থাকে। অর্থাৎ, ১৮ ক্যারেটের সোনা হচ্ছে ৭৫% সোনা এবং ২৫% অন্য ধাতু।

বিভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পকর্মেও সোনার ব্যবহার আছে; বুটি-জরির কাজে, সূক্ষ্ম লেসের কাজে। রূপা, তামা বা অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়ার জন্য বা গিলটি করার জন্য সোনা দরকার হয়। সোনার অতি পাতলা পাত তৈরী করা যায়। এমন কি মাত্র $\frac{১}{১০০০০}$ মিমি পুরু সোনার পাতও করা যেতে পারে। সন্দেশ, চকোলেট, পান প্রভৃতিতে তবক হিসেবে পাতলা পাত ব্যবহার হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে কিছু সোনা প্রয়োজন হয়। দাঁতের গর্ত ভরাট করতে সোনা রূপার সংকর ব্যবহার হয়। ইদানীং সোনার আর একটি ব্যবহার শুরু হয়েছে। সোনার সূক্ষ্ম স্তর বা পাত সূর্যের তাপরশ্মিকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে। এইজন্য কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বহিরাবরণে একটি সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্য সোনার স্তর জমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সূর্য রশ্মি উপগ্রহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেটাকে তাপিত করতে পারে না।

রূপা

রূপা বা রজতও সোনার মত মহার্ঘ। পাথুরে যুগের আদিকালে যখন সোনার সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল প্রায় সেই সময়েই মানুষ রূপারও সন্ধান পেয়েছিল। রূপার তুষারধবল রূপ, শুভ্রাংশুর মত তার পেলব কোমল কান্তি ও দীপ্তি মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নাই। সোনার চেয়ে রূপার পরিমাণ অবশ্য বেশী ছিল। মিশর, আর, মহেঞ্জোদারো, তক্ষশিলা প্রভৃতির খনন

থেকে যে প্রত্নসম্ভার পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সোনার তুলনায় রুপোর অলঙ্কার এবং বাসনপত্রই অধিক। প্রথম যে সীলমোহরাঙ্কিত মুদ্রা অ্যাসিরিয় সম্রাট সেনাচেরিবের আমলে প্রচলিত হয়েছিল সেটাও ছিল রুপার।

প্রকৃতিকে খানিকটা রুপা মৌলাবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়। পাথরের বুকে সোনার মতই লম্বা লম্বা শিরার মধ্যে রুপা জমে থাকে। পাথর চূর্ণ করে রুপা সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময় প্রকৃতিজাত সোনার সঙ্গে ও কিছু রুপা মিশ্রিত থাকে। যেমন, কোলার ক্ষেত্র থেকে যে সোনা পাওয়া যায় তাতে কিছু রুপাও থাকে। সোনা শোধন করার পর রুপা পাওয়া যায়। এছাড়া রুপার কোন কোন যৌগ নানা খনিজ পাথরে থাকে। রুপার ল্যাটিন শব্দ Argentum, সেইজন্য একে 'Ag' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। রুপার প্রধান আকরিকগুলো হল: (১) আরজেনটাইট, Ag_2S, (সালফার যুক্ত), (২) প্রাউস্টাইট, Ag_3AsS_3, (আর্সেনিক ও সালফার যুক্ত); (৩) পাইরার জিরাইট, Ag_2SbS_3, (অ্যান্টিমনি ও সালফার যুক্ত); (৪) সোরার-জিরাইট, AgCl, (ক্লোরিন যুক্ত)। আমাদের দেশে এসব আকরিক নেই। দুই একটি দেশে এইসব আকরিকই রুপার উৎস। ভূত্বকে রুপা আছে ১×১০^{-৫} %।

পৃথিবীতে যত রুপা সংগৃহীত হয় তার অধিকাংশই কিন্তু রুপার খনি থেকে বা আকরিক থেকে আসে না। বেশীর ভাগটাই আসে সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা (PbS) থেকে। গ্যালেনা খনিজ হচ্ছে সীসার সালফাইড, যার মধ্যে সর্বদাই কিছু রুপা থাকে। সালফার বিমুক্ত করে এই আকরিক থেকে সীসা ধাতুটি যখন উৎপাদন করা হয়, তখন সেই সীসার মধ্যেই রুপাটুকু থাকে। এই মিশ্রণকে বাতাসে তাপজারিত করলে, সীসা সম্পূর্ণতঃ তার অক্সাইডে পরিণত হয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। তখন অবিকৃত রুপা উদ্ধার করা হয়। সীসা থেকে এভাবে রুপা উদ্ধার করার পদ্ধতিটি ভারতে অনেক শতাব্দী পূর্বেই জানা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রুপা-উৎপাদন পদ্ধতি দেওয়া ছিল। রসরত্নসমুচ্চয়ে এবং নাগার্জুনের রসরত্নাকরে এই পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। অনেকের মতে নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক; আবার অনেকে বলেন নাগার্জুন ছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে।

সবচেয়ে বেশী রুপার উৎপাদন হয় মেক্সিকো, কানাডা, পেরু, রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রায় সমান পরিমাণেই। একটি তালিকায় ১৯৬৭-খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশের রুপার উৎপাদন দেওয়া হল। ভারতে রুপার আকরিক নেই। কোলার, হুট্টি এবং অনন্তপুরের খনি থেকে যে সোনা তোলা হয় তার মধ্যে

একট্ র্পা থাকে—প্রতি মেট্রিক টন আকরিকে মোটাম্টি ০.৬ গ্রাম র্পা থাকে। বাকী সবটা র্পাই সীসার আকরিক থেকে সংগৃহীত হয়। প্রতি মেট্রিক টন গ্যালেনাতে গড়ে প্রায় ৭৭৫ গ্রাম র্পা পাওয়া যায়। ১৯৭৭-এ ভারতে ১৩২৩১ কিলোগ্রাম র্পা সংগ্রহ হয়েছে।

কয়েকটি দেশের র্পার উৎপাদন (১৯৬৭)

দেশ	র্পা (কেজি)	দেশ	র্পা (কেজি)
মেক্সিকো	১১৭৯৯০২	অস্ট্রেলিয়া	৬১৪৬৯২
কানাডা	১১৩২৮৪৮	জাপান	৩৩৬৯৩৭
পের্	১১১৫৫৫৭	জার্মানী	১৪৯২৮০
রাশিয়া	১০৮৮৫০০	বলিভিয়া	১৩২৯৫৩
য্ক্তরাষ্ট্র	৯৯৮৯০০	হ্ন্ডুরাস	১২৪৬৮০

ভারত (১৯৭৭)—১৩২৩১ (কেজি)

সংগৃহীত র্পার অনেকটাই অবশ্য সরকারী তোষাখানায় থাকে। এক সময়ে অধিকাংশ দেশেই রৌপ্য ম্দ্রার প্রচলন ছিল। আগে আমেরিকার য্ক্তরাষ্ট্রের ম্দ্রায় ৯০% র্পা এবং ১০% তামা থাকত। ১৯৬৫ তে র্পার অংশ কমিয়ে শতকরা ৪০ ভাগ করা হয়। ইংল্যান্ডের ম্দ্রায় প্র্বে ছিল র্পা ৯২.৫%, তামা ৭.৫%। ১৯২০-তে র্পার ভাগ করা হয় ৫০ শতাংশ। আর ১৯৪৬ থেকে র্পার ম্দ্রার পরিবর্তে তামা-নিকেলের (৩ : ১) ম্দ্রা চাল্ হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় টাকায় থাকত র্পা, তামা, নিকেল আর দস্তা; র্পো ৫০%। এখন অনেক দেশেই ম্দ্রাতে র্পার ব্যবহার উঠে গেছে।

অলঙ্কার ও বাসনপত্র তৈরী করতে র্পা ব্যবহার হয়। মন্দিরের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের থালা বাটি ইত্যাদি র্পা দিয়ে তৈরী হয়। ভারতবর্ষেই বোধ হয় র্পার অলঙ্কার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। জলবায়্ এবং সাধারণ ক্ষার বা অম্ল দ্বারা র্পা আক্রান্ত হয় না। এই কারণে, দ্গ্ধ শিল্পে, কোহল এবং ভিনিগার প্রস্তুতিতে রৌপ্য-প্রলিপ্ত বড় বড় বাসন বা vats খ্বই ব্যবহৃত হয়। বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থাকলে র্পা কিন্ত্ তার সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়।

র্পার সর্বাধিক ব্যবহারিক প্রয়োগ ফটোগ্রাফীর শিল্পে। র্পা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড সাহায্যে সিলভার নাইট্রেট তৈরী করা হয়। এই সিলভার নাইট্রেট থেকেই সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার ক্লোরাইড অতি সহজে প্রস্তুত হয়।

ফটোগ্রাফীর প্লেট ও ফিল্মের জন্য এই সিলভার ব্রোমাইড ও ক্লোরাইড একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য যথেষ্ট রূপা খরচ হয়।

ডাক্তারেরা সিলভার নাইট্রেটকে দাহক (Caustic) হিসাবে ব্যবহার করেন। ল্যাবরেটরীতেও সিলভার নাইট্রেট একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিকারক।

তামা, দস্তা ও রূপা (৬ ঃ ৩ ঃ ১) এই অনুপাতের মিশ্রণ বিশেষ ধরণের ঝালাইয়ের কাজে লাগে। এর গলনাঙ্ক ৭৩৫°C। সোনার উপর মণিমুক্তা বসানোর কাজে বা সোনার তারজালির কাজে সূক্ষ্ম ও মসৃণ ঝালাই প্রয়োজন, সেজন্য এই মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়।

তামা

ধাতুর ব্যবহারিক প্রয়োগ সর্বপ্রথম তামা দিয়েই শুরু হয়েছিল। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে 'তাম্রযুগ' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাম্রযুগের কথা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই প্রাচীনকালের সহজ সরল জীবনযাত্রাতে নানা দৈনন্দিন কাজে শুধু তামা ব্যবহৃত হত। আজকের এই উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে কিন্তু বহুরকমের প্রয়োজনে আরও অনেক অনেক বেশী পরিমাণ তামা ব্যবহার হচ্ছে। তামার গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়ছে।

তামার ইংরেজী নাম কপার, খ্রীষ্টজন্মেরও প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস দ্বীপে প্রচুর তামা ছিল আর সেই তামা বিভিন্ন দেশে চালান যেত। সাইপ্রাস থেকে পাওয়া এই ধাতুকে রোমানরা নাম দিয়েছিল সাইপ্রিয়াম (Cyprium)। এই শব্দটি থেকেই তামার রাসায়নিক নাম হয় 'কিউপ্রাম' (Cuprum) এবং পরে তার অপভ্রংশে ইংরেজী নাম 'কপার' হয়েছে। চিহ্ন, Cu। ভূত্বকে তামা রয়েছে ০'০০৭%।

পুরাকালে পৃথিবীতে ধাতুরূপে তামা অনেকটা পাওয়া যেত; এখনও উরাল পর্বতের কাছে, সুইডেনে এবং আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের কাছে কিছু তামা মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে তামার উৎস হচ্ছে কয়েকরকম খনিজ পাথর। এই খনিজগুলিতে তামা সচরাচর সালফাইড বা অক্সাইড যৌগরূপে থাকে। তামার প্রধান আকরিক হল চালকোপাইরাইটিস [$CuFeS_2$], এতে তামা ও লোহার সালফাইড মিশ্রিত রয়েছে। অন্যান্য সালফারযুক্ত আকরিক হচ্ছে বোরনাইট [Cu_3FeS_3], কোভেলাইট [CuS] এবং চালকোসাইট

[Cu_2S]। অক্সাইড আকরিকসমূহের মধ্যে রয়েছে কিউপ্রাইট [Cu_2O], ম্যালাকাইট [$CuCO_3$, $Cu(OH)_2$] এবং অ্যাজুরাইট [$2CuCO_3$, $Cu(OH)_2$]। কঙ্গোতে ম্যালাকাইটের সঙ্গে কিছু ক্রাইসোকোলা [$CuSiO_3$, $2H_2O$] আকরিক পাওয়া যায়। অনেক সময়েই খনিজগুলি উঁচু পাহাড়ের গা থেকে কেটে আনা হয়। আমেরিকাতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর বরাবর আলাস্কা থেকে চিলি পর্যন্ত প্রসারিত রকি এবং অ্যান্ডিস পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই তামার আকরিক রয়েছে। আবার কখনও কখনও গভীর খাদ খনন করে মাটির নীচ থেকেও তামার খনিজ পাথর তুলে আনা হয়। যেমন আমাদের দেশে বিহারে মুসাবনী তাম্র খনিতে। এই সকল আকরিকে সচরাচর গড়ে ২-৩ শতাংশ তামা থাকে। বাকী সবটাই খনিজ-মল অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় মাটি, বালু, ডলোমাইট, কোয়ার্জ, প্রভৃতির আবর্জনা। এতটা মালিন্য থেকে মুক্ত করে তামা নিষ্কাশন করতে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি এবং যান্ত্রিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

বিচূর্ণ সালফাইড আকরিককে প্রথমে বারে বারে জল-তেলের মিশ্রণে ধুয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে অনেকটা কাদা-মাটি থিতিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং তেলের সঙ্গে সালফাইড আলাদা হয়ে আসে (পৃঃ ৩৪)। এই গাঢ়তর আকরিক-চূর্ণের সঙ্গে সিলিকা (বালু) মিশিয়ে মারুত-চুল্লীতে উত্তপ্ত বাতাসে তাপজারিত করা হয়। লোহা তখন আয়রন-সিলিকেট হিসাবে গলিত অবস্থায় অন্যান্য আবর্জনা নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে এবং প্রায় শুদ্ধ কপার সালফাইড [Cu_2S] পাওয়া যায়। এর নাম 'ম্যাট'। গলিত ম্যাটকে এর পরে বিসিমার চুল্লীতে (চিত্র ৮) উপযুক্ত পরিমাণ বাতাসে উত্তপ্ত করলেই তামা নিষ্কাশিত হয়ে আসে। এই তামা প্রায় ৯৮% বিশুদ্ধ। আকরিকে যদি কিঞ্চিৎ সোনা রূপা থাকে তবে সেগুলোও এই তামাতেই চলে আসে। এই তামাকে তড়িৎশোধন করে বিশুদ্ধ তামা (৯৯·৯%) তৈরী করা হয়। বাজারে প্রায় সর্বত্রই বিশুদ্ধ তামার চাহিদা। ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতিতেই তামা উৎপাদন করা হয়।

তামার প্রয়োজন প্রতিদিনই বাড়ছে। ১৮০১-১৮১০ এই দশ বছরে পৃথিবীতে মোট তামার উৎপাদন ছিল ১৮২০০ টন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ সনের উৎপাদন ছিল ২০ লক্ষ টন; ১৯৬০ সালে উৎপাদন বেড়ে হয় চল্লিশ লক্ষ টন। আর এই সাতের দশকে বাৎসরিক তামা উৎপাদনের গড় সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ টন, (৫৫৫০০০০) টন। লোহা ছাড়া অন্য কোন ধাতু তামার মত এত বেশী তৈরী হয় না। যদিও এখন অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন প্রায় তামার সমান। এই মোট উৎপাদনের প্রায় ৩/৪ অংশই পাঁচটি দেশে হয়,—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিলি, জাম্বিয়া আর কানাডা। কয়েকটি দেশে তাম্র-উৎপাদনের পরিমাণ কিরকম তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত তামা (১৯৬৭)

দেশ	তামা (টন)	দেশ	তামা (টন)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৯৫৪০০০	কঙ্গো	৩৫৩০০০
রাশিয়া	৮৮০০০০	পেরু	২০০০০০
চিলি	৭৩২০০০	দঃ আফ্রিকা	১৪১০০০
জাম্বিয়া	৭৩০০০০	জাপান	১৩০০০০
কানাডা	৬০৩০০০	অস্ট্রেলিয়া	৯৮০০০

আমাদের দেশে তামার আকরিক সামান্যই আছে। ভারতে দুইটি মাত্র তাম্রক্ষেত্র থেকে বর্তমানে এই ধাতুটি পাওয়া যাচ্ছে—একটি বিহারের সিংভূম জেলায় আর অপরটি রাজস্থানের ক্ষেত্রীতে। এই সব আকরিক সালফাইড জাতীয়। আকরিকের ওপরের অংশে কিছু কিছু সালফাইড আকরিক দীর্ঘদিন জলবায়ুর সংস্পর্শে অক্সিজেনযুক্ত সবুজ ম্যালাকাইটে পরিণত হয়ে থাকে। বিহারে মুসাবনী অঞ্চল থেকে আকরিক তুলে নিয়ে এসে ঘাটশীলায় মউভাণ্ডার ফ্যাক্টরীতে তামা নিষ্কাশন করা হয়। এখানকার আকরিকে তামার ভাগ ২·৩%। ১৯২৪ সালে এই কারখানার কাজ শুরু হয়। এখন ভারতে (১৯৮১-৮২) ২৪৭০০ টন তামা উৎপাদন করা হয়েছে। রাজস্থানে ক্ষেত্রীর আকরিকে তামার পরিমাণ শতকরা ১·০–১·৪ ভাগ। এখানে সম্প্রতি তামা-নিষ্কাশনের জন্য বিগলন-যন্ত্র বসেছে এবং কিছু কিছু উৎপাদন শুরু হয়েছে।

হাজারীবাগের বারগণ্ডায়, অন্ধ্রপ্রদেশের গুনটুর জেলার অগ্নিগুনডলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার মালঞ্জখন্ডে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলার বেলিগুড্ডা পাহাড়ে, সিকিমের ভোটাংয়ে এবং আরও কয়েক জায়গায় তামার খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এসব আকরিক থেকে তামা উদ্ধার সম্ভব কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন চলছে। ভারতে এখন যে তামা উৎপাদিত হয় তাতে চাহিদা মেটে না। প্রচুর তামা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

তামা একটি উৎকৃষ্ট তড়িৎবাহী ধাতু। রূপা ছাড়া আর কোন ধাতু এত স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ বহন করে না। মোটর, জেনারেটার, বৈদ্যুতিক রেল-ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ-বহনের তার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, সর্বরকম বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে তামা অপরিহার্য। তামার প্রসার্যতা-গুণ সমধিক বলেই বেশ সূক্ষ্ম তার তৈরী

সম্ভব, সেইজন্যই নানা যন্ত্রপাতির কাজে তামা প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ-শিল্পেই সর্বাধিক তামা ব্যবহৃত হয়। তামার তাপ-বহন ক্ষমতাও যথেষ্ট ; তাই রান্নার বাসন-পত্র, রেডিয়েটর, হিমায়ক-যন্ত্র প্রভৃতিতে তামার প্রয়োজন হয়। অবশ্য অনেক সময়েই বিশুদ্ধ তামার পরিবর্তে তামার নানা ধাতু-সংকর ব্যবহার করা হয়।

স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য প্রায় সব মুদ্রাতেই অল্পাধিক তামা মিশ্রিত থাকে। আমাদের দেশেই পাঁচ দশক আগে তামার পয়সা, আধ-পয়সা এবং পাই-পয়সা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যেও তাম্রমুদ্রা ছিল, তার তামার পরিমাণ ছিল ৯৬%।

তালা, দরজার ছিট্‌কিনি, নানারকম কলকব্জা, ছাপার ব্লক ইত্যাদিতে যথেষ্ট তামার ও পেতলের প্রয়োজন হয়। হিন্দুদের ঠাকুরঘরের নানা বাসনপত্র সাধারণতঃ তামা ও পিতলের। হিন্দুদের কাছে তামা ও তুলসী পবিত্র, তামা-তুলসী স্পর্শ করে তাঁরা শপথ নেন।

তামার ধাতুসংকর ঃ বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত করে তামার যত ধাতুসংকর তৈরী হয়েছে, লোহা ছাড়া আর কোন ধাতুর এত ধাতুসংকর নেই। টিন, দস্তা, নিকেল, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু নানা অনুপাতে তামার সঙ্গে গলিত করে বহু সংকর তৈরী হয়েছে। নানা বিশিষ্ট গুণের জন্য এই সব ধাতু সংকরের ব্যাপক ব্যবহার হয়। এদের মধ্যে পেতল এবং ব্রোঞ্জ বা কাঁসার ব্যবহারই সর্বাধিক।

দস্তা মিশিয়ে তামা থেকে পেতল তৈরী হয়। সাধারণতঃ তামা ও দস্তার অনুপাত ৪ ঃ ১। পেতলের ব্যবহার তো সর্বজনীন। নানা দৈনন্দিন কাজের জিনিস, মূর্তি, চেন, ঘড়া, কলসী, থালা ইত্যাদি পেতল থেকে তৈরী হয়। সৈন্যদের ব্যাজ, বোতাম, বন্দুকের টোটা রাখার খোল ইত্যাদি পেতলের। কঠিন পেতলে থাকে, তামা ঃ দস্তা = ৩ ঃ ২। এদের বলা হয় Muntz ধাতু ; শক্ত ও উচ্চ উষ্ণতার কাজের যন্ত্র তৈরীতে এটা ব্যবহার করা হয়।

অতিরিক্ত পরিমাণ দস্তা ও একটু লোহা তামার সঙ্গে মিশিয়ে Delta metal প্রস্তুত করা হয়। এটা ঢালাই করার পক্ষে এবং পেটাইয়ের পক্ষে দুয়েরই উপযুক্ত। তাই বেয়ারিং, ভালভ্‌, জাহাজের প্রপেলার প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়।

তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে সাধারণ কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। একসময় পৃথিবীতে কাংস্যযুগ ছিল। তখন যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক জিনিস কাঁসা দিয়ে তৈরী হত। সে ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে। এখনও বিভিন্ন অনুপাতে টিন মিশিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী কাঁসা পাওয়া যায়। যেমন ; গান-মেটাল (Gun metal) ; এই ব্রোঞ্জে, তামা ঃ টিন = ৯ ঃ ১। পূর্বে এই ধাতু-সংকর

দিয়ে কামান তৈরী হত। বর্তমানে নানা ঢালাই করা কাঁসার জিনিস, বাসনপত্র তৈরী হয়। আর একটি সংকর বেল-মেটাল (Bell metal) এটা দিয়ে ঘণ্টা, মূর্তি, কাগজ-চাপা ইত্যাদি তৈরী হয়; এতে তামা ঃ টিন = ৫ ঃ ১।

কখনও কখনও ব্রোঞ্জের সঙ্গে সামান্য একটু ফসফরাস মিশিয়ে দেওয়া হয়, এর নাম ফস্ফর-ব্রোঞ্জ ; তামা ঃ টিন ঃ ফসফরাস = ৯৪ ঃ ৫.৭ ঃ ০.৩। ফসফর-ব্রোঞ্জ মরচে পড়ে নষ্ট হয় না এবং চুম্বকাকৃষ্ট হয় না। ঘড়ির স্প্রিং, এবং অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই ব্রোঞ্জের সঙ্গে একটু দস্তা মিশান থাকে—তামা ঃ টিন ঃ দস্তা=৮৮ ঃ ১০ ঃ ২। জলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পাম্প, স্টীম-উৎপাদক যন্ত্রে অনেক সময় এটি ব্যবহার করা হয়।

ব্রোঞ্জ কথাটি এখন একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। টিন না থাকলেও ব্রোঞ্জ বলা হয়; যেমন সিলিকন-ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম-ব্রোঞ্জ। সিলিকন-ব্রোঞ্জ টেলিগ্রাফের তারে ব্যবহৃত হয়। ৭ শতাংশ অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত তামার ব্রোঞ্জ সিগারেট কেস, গৃহসজ্জায় এবং সস্তা কৃত্রিম অলংকার প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়।

'জার্মান সিলভার' তামার একটি সংকর, রূপার মত উজ্জ্বল, তাই এই নাম। প্লেট, কাপ এবং গৃহসজ্জার অনেক সামগ্রী জার্মান সিলভার দিয়ে তৈরী হয়। এতে আছে তামা, নিকেল ও দস্তা; মোটামুটি অনুপাত, তামা ঃ নিকেল ঃ দস্তা = ২ ঃ ১ ঃ ১।

তামার কয়েকটি যৌগেরও বহুল ব্যবহার আছে। তামার যৌগ পদার্থ জীবাণুনাশক বলে চাষের জমিতে পোকা-মাকড়ের ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা হয়। কপার অ্যাসিটেট "ভার্ডিগ্রিস" নামে উজ্জ্বল রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী দেহের কোষে এবং নানা উদ্ভিদে সামান্য তামার যৌগ থাকে, পুষ্টির জন্য এটা প্রয়োজন। শম্বুক জাতীয় এবং সন্ধিপদী প্রাণীদের শ্বাস-সহায়ক হেমোসায়ানিনে যে প্রোটিন রয়েছে তাতে আছে তামা, যেমন মানুষের রক্তের হেমোগ্লোবিনে রয়েছে লোহা। প্রবালদেহেও তামা রয়েছে। সামান্য একটু তামা পুষ্টির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কতকগুলো রক্তাল্প (anaemic) ইঁদুরকে দুধ এবং অন্যান্য লৌহযুক্ত খাদ্য দেওয়া হল। কিন্তু তাদের রক্তের কোনই উন্নতি হল না। কিন্তু পরে যখন সামান্য মাত্র কপার ঐ খাদ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল, তখন ইঁদুরগুলো সুস্থ হয়ে উঠল। অর্থাৎ তামার অবর্তমানে শুধু মাত্র লৌহ দ্বারা পুষ্টি সম্ভব না।

লোহা

লোহার ইংরেজী শব্দ আয়রন আর রসায়নবিদেরা নাম দিয়েছেন ফেরাম (Ferrum), চিহ্ন Fe। সংস্কৃত গ্রন্থে লোহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়; যেমন, অয়স, কালায়স, অশ্মসার, কান্তলোহ। লোহার পুরানো দিনের কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। সেই যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে লৌহযুগ শুরু হয়েছিল তার অপ্রতিহত গতি এখনও চলছে। বস্তুতঃ বর্তমান সভ্যতা প্রধানতঃই লৌহ-নির্ভর। এ যুগে প্লাস্টিক এবং অ্যালুমিনিয়াম থেকে অনেক বস্তুসম্ভারের সৃষ্টি সম্ভব হলেও লোহার প্রয়োজন রয়েই গেছে। লোহা কঠিন কঠোর, লোহা প্রচণ্ড চাপ গ্রহণে সক্ষম, লোহা থেকে তীক্ষ্ন ক্ষুরধার অস্ত্র তৈরী হয়। এমনি নানা গুণের জন্য লোহা তথা স্টীলের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে।

পৃথিবীতে মৌল অবস্থায় লোহা কদাচিৎ দেখা যায়। একমাত্র উল্কাপিণ্ডেই ধাতব লোহা পাওয়া যায়। লোহার প্রচুর যৌগ অবশ্য রয়েছে। দশ মাইল গভীর ভূ-পৃষ্ঠের স্তরকে ভূত্বক বলা হয়। এই স্তরের পদার্থের পরিমাণ মোটামুটি ১৭×১০^{১৮} টন। ভূত্বকে লোহা রয়েছে শতকরা ৫ ভাগ। অর্থাৎ মোট লোহার পরিমাণ $৮\cdot৫ \times ১০^{১৭}$ টন। লোহা রয়েছে সর্বত্র মাটিতে, পাহাড়ে, নানারকম পাথরে নানা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। পরিমাণে বিপুল হলেও সবকিছু থেকে তো লোহা নিষ্কাশন করা যায় না, খরচ পোষায় না। শুধুমাত্র কয়েকটি খনিজপাথর থেকেই সহজে লোহা উদ্ধার করা হয়। এই সব লৌহ-আকরিকের প্রায় সবগুলিই অক্সাইড অর্থাৎ অক্সিজেনযুক্ত। প্রধান আকরিকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) হিমাটাইট (Fe_2O_3), বাদামী লাল রংয়ের আকরিক। সাধারণতঃ এখানকার লোকে বলে লোহা-পাথর।

(২) ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4), কালো এবং ভারী, চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। এর সংস্কৃত নাম অয়স্কান্ত।

(৩) লিমোনাইট ($2Fe_2O_3 . 3H_2O$), লালচে-হলুদ রংয়ের আকরিক।

(৪) সিডেরাইট ($FeCO_3$), অপেক্ষাকৃত হাল্কা, ধূসর হলুদ রং।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ হিমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট থেকে লোহা উৎপাদন করা হয়। কিছু লিমোনাইট আকরিকও ব্যবহার হয়। আমাদের দেশের হিমাটাইট অতি উৎকৃষ্ট, এতে লোহা থাকে ৬২-৬৯%। বিশুদ্ধ Fe_2O_3-তে লোহার

পরিমাণ ৭০%। অর্থাৎ আমাদের আকরিকে যৎসামান্য আবর্জনা আছে। দাক্ষিণাত্যের ম্যাগনেটাইট আকরিকও বেশ উচ্চমানের।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অল্পাধিক লৌহ-আকরিক আছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক পরিমাণ লোহার আকরিক উত্তোলন করা হয়। সব দেশে অবশ্য সব রকম আকরিক পাওয়া যায় না। রাশিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ম্যাগনেটাইট যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ম্যাগনেটাইট প্রায় নেই, সেখানে হিমাটাইট ও বিশেষতঃ লিমোনাইট আকরিক বেশী। ভারতে, সুইডেনে, জার্মানীতে, রাশিয়াতে, যুক্তরাষ্ট্রে, আরও অনেক দেশেই হিমাটাইট প্রচুর পাওয়া যায়। ফ্রান্স, কানাডা, স্পেনে লিমোনাইট একটি প্রধান লৌহ-আকরিক। বিভিন্ন দেশে কতটা লোহার আকরিক তোলা হয় নীচের তালিকা থেকে তার আভাস পাওয়া যাবেঃ

উত্তোলিত লৌহ আকরিক (১৯৬৭)

দেশ	পরিমাণ (কোটি টন)	দেশ	পরিমাণ (কোটি টন)
রাশিয়া	১৮·৫২	সুইডেন	৩·১২
যুক্তরাষ্ট্র	৯·৪৩	চায়না	৩·০৯
ফ্রান্স	৫·৪৩	ভারত	২·৮৮
কানাডা	৪·৬৬	ব্রেজিল	২·৫৯

আরও দশ বছর পরে ১৯৭৭-এ ভারতে সংগৃহীত লোহার আকরিক বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪·১৩ কোটি টন।

ভারতে সবচেয়ে বেশী লৌহ-খনিজ হচ্ছে হিমাটাইট। হিমাটাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বিহারের সিংভূম এবং উড়িষ্যার কেওনঝর, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড় ও কটক জেলায়। এসব জায়গার প্রধান খনিগুলো হচ্ছে নোয়ামুণ্ডি, গরুমহিষানি, বাদামপাহাড়, জোদা খনি, বারসুয়া, বোলানি, বড়াজামদা খনি। মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার বাইলাডিলা, দহোলি-রাজহরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হিমাটাইট রয়েছে। কখনও কখনও সম্পূর্ণ পাহাড়ই প্রায় হিমাটাইট পাথরে গঠিত। এখানকার হিমাটাইটে লোহার পরিমাণ ৬৫% এর উপরে।

এই সকল খনির আকরিক ব্যবহৃত হয় টাটার (টিস্কো), ভিলাইয়ের, রাউরকেল্লার ফ্যাক্টরীতে। দুর্গাপুর স্টীল কারখানার হিমাটাইট আসে বড়াজামদা খনি থেকে।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে গোগটে খনি এবং গোয়াতে বিছোলাম-পালে খনিতে বিপুল হিমাটাইটের ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। বর্তমানে এখানকার উৎকৃষ্ট

হিমাটাইট বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। কর্ণাটকের হোসপেট, বেলারি এবং চিকমাগালুরে হিমাটাইট আছে যথেষ্ট। ভদ্রাবতীর কারখানায় অবশ্য দাক্ষিণাত্যের হিমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশে, রাজস্থানে এবং হরিয়ানাতেও কিছু ভাল হিমাটাইট আছে। ম্যাগনেটাইট সংগ্রহ হয় তামিলনাদের সালেম ও তিরুচিরাপল্লী, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কর্ণাটকের সিমোগা ও হাসান জেলা, বিহারের সিংভূম জেলা থেকে। এদেশে লোহার আকরিকের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে তার সবখানি পরিমাপ করা হয়নি।

ভারতের প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মোট লৌহ আকরিকের পরিমাণ

আকরিক	প্রমাণিত পরিমাণ [কোটি টন]	সম্ভাব্য ভাণ্ডার [কোটি টন]
হিমাটাইট	৫৩২	১৭৫৩
ম্যাগনেটাইট	৬০	১৬১
সিডেরাইট ও লিমোনাইট	৫০	২০০

আমরা 'লোহা' কথাটিকে সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি। রেলিং, পেরেক, ছুরি-কাঁচি, ট্রাঙ্ক-বাক্স, কামান, বন্দুকের নল, ঘড়ির স্প্রিং ইত্যাদি—এদের সবই "লোহার তৈরী" বলি। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিভিন্ন গুণের লোহা প্রয়োজন হয়। যে লোহাতে রেলিং তৈরী হয় সেই লোহা দিয়ে ঘড়ির স্প্রিং তৈরী করা যায় না। রান্নার কড়াইয়ের লোহা আর রেল লাইনের লোহা এক নয়। গুণ হিসাবে লোহা তিন শ্রেণীর। একেবারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ (১০০%) লোহা পাওয়া দুষ্কর; শুধু ল্যাবরেটরীতে সামান্য পরিমাণে তৈরী হতে পারে। শিল্পজাত লোহাতে সর্বদাই কিছু কার্বন মিশ্রিত থাকে। লোহার গুণাগুণ এই মিশ্রিত কার্বনের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। তাই কার্বনের পরিমাণ অনুযায়ী লোহাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে:

		কার্বনের পরিমাণ
১।	ঢালাই লোহা বা কাস্ট আয়রন (cast iron) ···	২~ ৪·৫%
২।	ইস্পাত বা স্টীল (steel)	··· ০·১৫~ ১·৫%
৩।	পেটা-লোহা বা রট-আয়রন (wronght iron) ···	০·১০~০·২৫%

অর্থাৎ কার্বনের পরিমাণ ঢালাই লোহাতে সব চেয়ে বেশী আর পেটা লোহাতে সব চেয়ে কম। কার্বন ছাড়াও সামান্য ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ও সিলিকন প্রায়ই লোহাতে থাকে, বিশেষতঃ ঢালাই লোহাতে।

ঢালাই লোহা অপেক্ষাকৃত সহজে গলে, গলনাংক ১২০০°~১৩০০°C।

তাই সহজেই এই তরল লোহা দিয়ে ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ চলে। কিন্তু পিটিয়ে এই লোহার জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, শক্ত হলেও এই লোহা ভঙ্গুর এবং ঘাতসহতা কম। ঢালাই লোহাতে পান দেওয়া যায় না। এই লোহার স্থায়ী চুম্বকও হয় না। লোহার রেলিং এবং গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিসপত্র তৈরী করতে এই লোহা ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ ঢালাই লোহার প্রায় সবটাই ইস্পাত এবং পেটা-লোহাতে পরিণত করা হয়।

পেটা-লোহা ১৫০০°C-এরও বেশী তাপমাত্রায় গলে। এই লোহা অপেক্ষাকৃত নরম কিন্তু খুব ঘাতসহ, সেজন্য পিটিয়ে জোড়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই লোহাতেও পান দেওয়া যায় না কিম্বা স্থায়ী চুম্বকও করা যায় না। পেটা-লোহা থেকে সরু তার, চাদর, জাল, বৈদ্যুতিক চুম্বক, পিন, শিকল, পেরেক, জাহাজের খোল প্রভৃতি তৈরী করা হয়।

ইস্পাতে কার্বন থাকে ০·২৫—১·৫% ; গলনাঙ্ক ১৩০০°—১৪০০°C। অনেক সময়ে ইস্পাতের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন, প্রভৃতির একটি বা দুইটি ধাতু মিশিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ ইস্পাতের সংকর তৈরী করা হয়। ইস্পাত একটি অদ্ভুত ধাতু। খাদের তারতম্যে ইস্পাতের গুণের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। শক্ত, নরম, মরিচাহীন, স্বল্প-প্রসারণশীল, অত্যন্ত ঘাতসহ, নানা রকমের ইস্পাত তৈরী করা হয় সামান্য কিছু কিছু অন্য ধাতু মিশিয়ে। স্থায়ী চুম্বকের জন্য ইস্পাতই শ্রেষ্ঠ। ইস্পাতকে পান দেওয়া যায়। পিটিয়ে আবার স্টীলের পাত জোড়া দেওয়া যায়।

লোহিত-তপ্ত করে নিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলে দিলে ইস্পাত খুব শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর হয়। একে বলে কঠিন ইস্পাত বা hardened steel। এই কঠিন ইস্পাতকে নিয়ে আবার কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করে যদি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয় তবে এর ভঙ্গুরত্ব লোপ পায়, স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) বাড়ে এবং যথেষ্ট নমনীয় স্টীল পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে 'ইস্পাতের পান (tempering) দেওয়া। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে শীতল করলে বিভিন্ন গুণের নমনীয় ইস্পাত পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকমের নমনীয়তা প্রয়োজন। যেমন, ছুরি তৈরীর স্টীল আর ইঞ্জিনের চাকার স্টীল এক নয়। তাদের ভিতর কার্বনের পরিমাণও বিভিন্ন অসংখ্য রকমে জিনিসে স্টীল বা ইস্পাত ব্যবহার করা হয় ; ঘড়ি, চুম্বক, ইঞ্জিন, মেসিনগান, কাঁটা-চামচ, কাস্তে, কুড়োল, ট্রাঙ্ক-বাক্স, রেল, পুল, কড়ি-বরগা যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রচুর ইস্পাত লাগে।

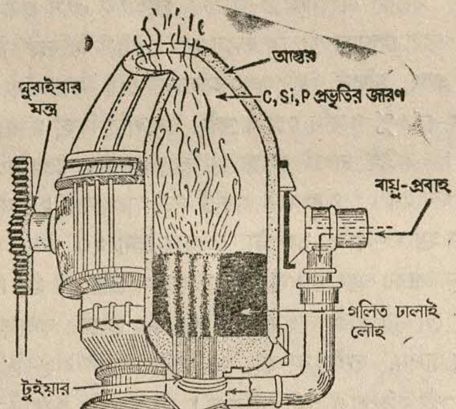
লৌহ-নিষ্কাশন ঃ আকরিক থেকে শুধু ঢালাই লোহাই নিষ্কাশন করা

হয়। ইস্পাত এবং পেটা-লোহা সরাসরি আকরিক থেকে উৎপাদন করা যায় না। এ দুটিকে ঢালাই লোহা থেকে তৈরী করা হয়। হিমাটাইট আকরিককে প্রথমে একটি পরাবর্ত চুল্লীতে নিয়ে বাতাসে উত্তপ্ত করা হয়। উদ্বায়ী পদার্থগুলি উড়ে যায় এবং আকরিকটি ছোট ছোট হালকা ও ঝাঁঝরা ডেলার আকারে পরিণত হয়। এর পর এই আকরিকের সঙ্গে বিজারক কোক এবং বিগালক চুনা-পাথর মিশিয়ে বিগলনের জন্য একটি মারুত-চুল্লীতে (চিত্র ৭) দেওয়া হয়। চুল্লীর তলার দিক দিয়ে প্রচুর উত্তপ্ত বায়ু ভিতরে পরিচালিত হয়। উচ্চ উষ্ণতায় কোক এবং কার্বন মনোক্সাইড হিমাটাইটের আয়রন অক্সাইডকে বিজারিত করে লোহায় পরিণত করে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিগালক চুনাপাথর থেকে চুন তৈরী হয় এবং এই চুন বালু জাতীয় (সিলিকা) আবর্জনাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গলিত ক্যালসিয়াম সিলিকেটের ধাতুমল তৈরি করে। এই ধাতুমল অন্যান্য সব মালিন্য যেমন ফসফরাস, সালফার যুক্ত যৌগগুলিকেও শোষণ করে নেয়। চুল্লীর নীচের অংশের উষ্ণতা সর্বাধিক, প্রায় ১৫০০°C। সেইজন্য লোহা এবং ধাতুমল উভয়েই গলিত অবস্থায় থাকে এবং চুল্লীর নীচের প্রকোষ্ঠে এসে জমা হয়। ধাতুমল হাল্‌কা, তাই তরল লোহার উপরে ভাসে। দুইটি বিভিন্ন নির্গম-দ্বার দিয়ে গলিত লোহা এবং গলিত ধাতুমল আলাদা বের করে সংগ্রহ করা হয়। এই লোহাতে ২-৪·৫% কার্বন তো থাকেই, তদুপরি কিছু ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতিও থাকে। এটাই ঢালাই লোহা। ধাতুমল রাস্তা তৈরীতে বা সিমেণ্টের কারখানায় প্রয়োজন হয়। আজকাল একটি বড় কারখানায় ২৪ ঘণ্টায় ১৫০০টন লোহা উৎপাদন হয়। প্রতি ১০ টন লোহার জন্য ২০ টন আকরিক, ৮ টন কোক, ৫ টন চুনাপাথর এবং ৪০ টন উত্তপ্ত বাতাস প্রয়োজন হয়। ব্যয় কমাবার জন্য স্বভাবতঃই লোহার কারখানাগুলো আকরিকের উৎসের কাছাকাছি করা হয়। প্রচুর কোক প্রয়োজন, তাই কয়লাখনিও কাছে থাকা বাঞ্ছনীয়। কয়লা যেন সহজলভ্য হয় সেই ব্যবস্থাও করা দরকার। যে কোক ব্যবহার করা হয়, সেটা কয়লা থেকে তৈরী করে নেওয়ার জন্য আজকাল লোহার কারখানার সঙ্গেই কোক-আভন বসান হয়।

পেটা-লোহা ঢালাই লোহা থেকে তৈরী হয়। ভিতরের দেওয়ালে ফেরিক-অক্সাইডের আস্তর দেওয়া একটি পরাবর্ত চুল্লীতে ঢালাই লোহা নিয়ে গলান হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় দেওয়ালের ফেরিক-অক্সাইড অধিকাংশ কার্বনকে জারিত করে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত করে এবং সেটা চিমনী দিয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যান্য পদার্থ যথা সালফার, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতিও ফেরিক-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গাদ হিসাবে গলিত লোহার উপরে ভেসে ওঠে এবং উপর

থেকে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়। বিশুদ্ধতর লোহা পড়ে থাকে। চুল্লী থেকে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের এক একটি পিণ্ড বের করে এনে স্টীমচালিত যন্ত্রের সাহায্যে পেটানো হয় এবং তার উপরে চাপ দেওয়া হয়। চাপের ফলে ভিতরের গাদ বেরিয়ে যায় এবং পেটা-লোহার পিণ্ড পাওয়া যায়।

ঢালাই লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী করার অনেক রকম পদ্ধতি আছে : বিসিমার পদ্ধতি, ওপেন-হার্থ পদ্ধতি, সিমেণ্টেসন পদ্ধতি, তড়িৎ-তাপন পদ্ধতি ইত্যাদি। এদের মধ্যে বিসিমার পদ্ধতিতে খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ে ইস্পাত পাওয়া যায়। সেইটিই এখানে উল্লেখ করা হবে। এই পদ্ধতিটি ১৮৫৬ সালে বিসিমার ইংল্যাণ্ডে স্বনামে প্রবর্তিত করেন। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু লিখেছেন, এই পদ্ধতিটি পূর্বেই আমাদের দেশে ছিল, "বিসিমার সাহেব মাদ্রাজ অঞ্চলের দেশী লৌহকারের কাছে শিখে" ওদেশে প্রবর্তন করেন। একটি ডিম্বাকৃতি বিসিমার চুল্লী বা কনভারটারে (চিত্র ১১) কয়েক টন গলিত ঢালাই লোহা নেওয়া হয়। তলা থেকে উচ্চ চাপে উত্তপ্ত বায়ু গলিত লোহার ভেতর দিয়ে



চিত্র ১১। বিসিমার কনভারটার

পরিচালনা করা হয়। কার্বন পুড়ে চলে যায়, অন্যান্য পদার্থ, যেমন ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ইত্যাদি চুল্লীর আস্তরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গাদ হিসাবে পৃথক হয়ে যায়। এর পর উপর থেকে প্রয়োজন মত "স্পাইজেল" মিশান হয়। স্পাইজেল হচ্ছে অল্প লোহার সঙ্গে কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটি গলিত মিশ্রণ। যে রকম স্টীল চাই তদনুরূপ ধাতু নিয়ে লোহার সঙ্গে প্রয়োজনীয়

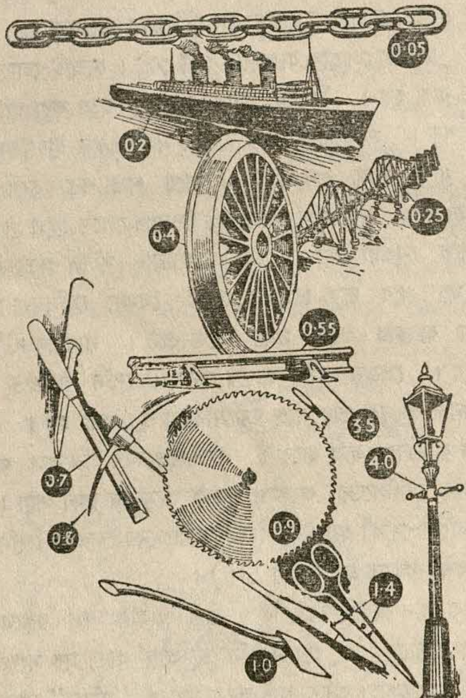
অনুপাতে মিশিয়ে নিয়ে গলিয়ে স্পাইজেল তৈরী করে রাখা হয়। যেমন, স্টেইনলেস স্টীলের জন্য স্পাইজেলে থাকে কার্বন, ক্রোমিয়াম ও নিকেল। বিসিমার চুল্লীতে আবর্জনাগুলো দূর হলে বিশুদ্ধ গলিত লোহা থাকে। তখন এই স্পাইজেল উপযুক্ত পরিমাণে চুল্লীতে দেওয়া হয়। তারপরেও প্রক্রিয়াটি কয়েক মিনিট চলে। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি কাত করে স্টীল বের করে নেওয়া হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই এভাবে ঢালাই লোহা থেকে স্টীল পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ ঢালাই লোহার ব্যবহার বেশী নেই। ঢালাই লোহার অধিকাংশই ইস্পাতে পরিণত করা হয়। কিছুটা অবশ্য পেটা লোহাও করা হয়। ইস্পাতের ব্যবহার খুব ব্যাপক। সাধারণ ইস্পাত ছাড়াও নানা রকম ইস্পাতসংকর ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধাতু নানা অনুপাতে মিশিয়ে শত শত রকমের ইস্পাতসংকর আজকাল তৈরী হচ্ছে। শক্ত এবং ক্ষয়রোধী ইস্পাত পেতে হলে প্রায় সব সময়েই ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে নেওয়া হয়। এই ম্যাঙ্গানিজ স্টীল অত্যন্ত কঠোর হয়। যে সব স্টীলের যন্ত্র খুব দ্রুত চালাতে হয়। যেমন, মেসিনগান, ধাতুকাটার করাত, সেগুলো ব্যবহার করার সময় তেতে ওঠে। সাধারণ স্টীল এই তাপে একটু নমনীয় হয়। সেজন্য এসব যন্ত্রের জন্য টাংস্টেন মিশ্রিত ইস্পাতসংকর প্রয়োজন। কখনও কখনও তার সঙ্গে ভ্যানেডিয়ামও দেওয়া হয়। এইসব সংকর উত্তপ্ত হলেও তার কাঠিন্য বজায় থাকে। ইস্পাতসংকরে নিকেল থাকলে ঘাত-সহতা বাড়ে এবং অ্যাসিডের আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা পায়। ক্রোমিয়াম মিশালে ইস্পাত মরিচা-রোধী হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনের লোহার জিনিসে কার্বনের অনুপাতও কম বেশী করতে হয় (চিত্র ১০)।

লোহার অনেক গুণ রয়েছে বটে, কিন্তু তার একটা বড় রকমের দুর্বলতা আছে। শুকনো বাতাসে কিছু হয় না, কিন্তু আদ্র বাতাসের সংস্পর্শে লোহার উপরে মরচে পড়ে এবং লোহা অতি দ্রুত ক্ষয়ে যায়। "মরিচা" লোহার ঝুরঝুরে বাদামী রংয়ের অক্সাইড। এভাবে যে লোহা নষ্ট হয় তাতে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। কলকব্জা, জিনিষপত্র অকেজো হয়ে যায়। মরচে যাতে না পড়ে সেজন্য লোহার জিনিষের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। জলের বালতি, ছাদের টিনে লোহার উপর দস্তার প্রলেপ থাকে। কেরোসিনের টিন, বিস্কুটের কৌটা ইত্যাদির উপরে টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। জানালার শিক, রেলিং ইত্যাদিকে রঙের আস্তর দিয়ে মরচে থেকে রক্ষা করা হয়। থালা বাটি কলাই করার কারণও তাই।

আজকাল অবশ্য ক্রোমিয়াম এবং নিকেল মিশ্রিত যে ইস্পাতসংকর—স্টেইনলেস স্টীল—তৈরী হয় তার বিস্তর চাহিদা। এই স্টীলে মরচে ত পড়েই না, তাছাড়া তা রূপার মত উজ্জ্বল এবং সুদৃশ্য। আবার সাধারণ অ্যাসিডেও আক্রান্ত হয়

না। ইস্পাতে বিভিন্ন অনুপাতে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী স্টেইনলেস স্টীল তৈরী করা হয় (ক্রোমিয়াম দ্রষ্টব্য)। দুগ্ধ-শিল্পে এবং কোন কোন রাসায়নিক শিল্পে এখন প্রায়ই স্টেইনলেস স্টীলের বড় বড় পাত্র, নল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বাসনপত্র, কাঁটা-চামচ ইত্যাদি আজকাল অধিকাংশই এই ইস্পাতের।



চিত্র ১২। বিভিন্ন প্রয়োজনে লোহা ও স্টীলের ব্যবহার। কার্বনের পরিমাণ নির্দেশ করা রয়েছে।

সোনা-রুপা ধনীদের ধাতু। তামা-কাঁসাও আজকাল বিশেষ প্রয়োজনে বিত্তবানদের সংসারেই দেখা যায় কিন্তু লোহা ধনী-দরিদ্র সবার একান্ত প্রয়োজন। লোহা সস্তা, সহজলভ্য, লোহা সর্বজনের—তাই লোহার আদর সর্বত্র। লোহার প্রশস্তি অনেকেই করেছেন। তবে কিপলিংয়ের চারটি পংক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"Gold is for the mistress, silver for the maid
Copper for the craftsman cunning at his trade."
"Good" said the Baron, sitting in his hall
"But Iron—Cold Iron—is the master of them all."

স্টীলের একটি প্রধান চাহিদা প্রতিরক্ষা বিভাগে। কামান, বন্দুক, রিভলবার, মেসিনগান, তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার অস্ত্র, সব কিছুর জন্যই উৎকৃষ্ট বিশেষ ধরণের স্টীল প্রয়োজন। ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজের মোটর ইত্যাদির জন্যও ভাল স্টীল খুব আবশ্যক।

সাধারণ প্রয়োজনের দা, কাস্তে, কুড়োল, ছাতের টিন, বালতি, শিকল, শিক, কব্জা, স্ক্রু, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষে স্টীল অপরিহার্য।

স্টীলের উৎপাদন সারা পৃথিবীতে কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে সেটা নীচের সারণী থেকে সহজেই বোঝা যাবে।

সারণী ঃ সারা পৃথিবীর স্টীল উৎপাদন

বৎসর	১৯০০	১৯২০	১৯৪০	১৯৬০	১৯৬৭
উৎপাদন (লক্ষ টন)	৩১০	৭৫৪	১৫৬০	৩৮১৫	৫৪৩০

২। কয়েকটি দেশের স্টীল উৎপাদন (১৯৬৭)

দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন)	দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন)
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১২৭২	চীন	১২১
রাশিয়া	১১২৬	পোলাণ্ড	১১৫
জাপান	৬৮৫	কানাডা	১০৬
পঃ জার্মানী	৪০৫	ভারত (১৯৬৭)	৭০
গ্রেট ব্রিটেন	২৬৭	ভারত (১৯৮২)	১০৯

প্রচুর লৌহ আকর থাকা সত্ত্বেও পরাধীন ভারতে গত শতাব্দী পর্যন্ত লোহার বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয় নি। এই কয়েক দশক আগে পর্যন্তও আমাদের প্রয়োজনের লোহার জিনিস ইংল্যাণ্ড থেকেই আসত। কোথাও কোথাও স্থানীয় প্রয়োজনে কিছু কিছু লোহা উৎপাদন হত। আমাদের নিজেদের একটা লোহার কারখানা গড়ে তোলার কল্পনা জামসেদজী টাটার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। বেরার ও মধ্য প্রদেশের নানা অঞ্চলে তিনি অনুসন্ধানও করেছিলেন, কিন্তু সব রকম উপাদানের ব্যবস্থা করা যায়নি ; বিশেষ করে কাছাকাছি কয়লার অভাবের জন্য। এরপর জামসেদজীর নির্দেশে ডোরাবজী টাটা দুর্গের ঢালি-রাজহারাতে খোঁজ করেন। সেখানে উৎকৃষ্ট আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেল এবং কোক ও চুনাপাথরেরও সন্ধান মিলল, কিন্তু জলের একান্ত অভাবের জন্য টাটারা সেখানে লৌহ-উৎপাদন সম্ভব বলে মনে করেননি। এর অর্ধশতাব্দী পরে অবশ্য সেখানে বিশাল "ভিলাই স্টীল কারখানা" হয়েছে।

এরকম সময়ে যখন টাটারা প্রকল্পটিকে বাস্তবে পরিণত করতে পারছিলেন না, সে যুগের বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু জামসেদজীকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি জানালেন, ময়ূরভঞ্জের ৩০০০ ফিট উঁচু গৌরমহিসানি পাহাড়ে আর তার আশেপাশে রয়েছে প্রচুর লোহার আকর, যার মধ্যে লোহার পরিমাণ অন্ততঃ ৬০%। তাছাড়া, কাছেই রয়েছে বাংলার কয়লার খনি; চুনাপাথরও সহজলভ্য। লোহার আকরিকের পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেল প্রায় ৩৫০ লক্ষ টন। প্রমথবাবু সে সময়ে ঐ অঞ্চলের নানারকম খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই বাঙালী ভূতাত্ত্বিকের যেমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল তেমনই দূরদৃষ্টি ছিল। প্রধানতঃ এরই আগ্রহ এবং সক্রিয় প্ররোচনায় জামসেদজী এ বিষয়ে উৎসাহিত হন। কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা ছিল, জলের অভাব। বড় কলকারখানার জন্য প্রচুর জল প্রয়োজন। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক ওয়েলড্ এবং তার সহকারী শ্রীনিবাস রাও গভীর জঙ্গলে অনুসন্ধান করতে করতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেন—খারকাই এবং সুবর্ণরেখার সঙ্গমে একটা বড় প্রাকৃতিক জলাধার বা হ্রদ রয়েছে, যেখানে সারা বছর ধরেই যথেষ্ট জল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নানা রকমের বৈজ্ঞানিক হিসাব করে ওখানেই প্রথম ভারতীয় লৌহ শিল্প বসানো স্থির হল। জঙ্গল পরিষ্কার করা হল, রেল বসানো হল, ইঞ্জিনিয়ারদের শিখিয়ে আনা হল। অতি কষ্টে মূলধন সংগ্রহ হল—যাতে বিদেশীর কোন অধিকার না থাকে সেজন্য দেশের লোকের কাছেই ঋণপত্র ছাড়া হল। প্রথম দিকে অবশ্য খুবই অসুবিধে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী (TISCO) স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াল। এই হল প্রথম ভারতীয় লৌহ শিল্পের ইতিহাস।

স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের দেশে মোট লোহা আর স্টীলের উৎপাদন ছিল ১৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে টাটাদের TISCO—থেকে উৎপাদন ১০ লক্ষ টন আর IISCO (ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী) থেকে ৩ লক্ষ টন। ১৯৫৪-এর পরে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আরও কয়েকটি স্টীল ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়েছে; যথা, ভিলাই, রউরকেল্লা, দুর্গাপুর ইত্যাদি। সমস্ত স্টীল ফ্যাক্টরিতে এখন মোট ৩০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের দেশে স্টীলের উৎপাদন কি ভাবে বেড়েছে, তার হিসেব দিচ্ছি :—

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২
স্টীল (লক্ষ টনে)	১৫	৩৪	৬৬	৯৫	১০৯

১৯৭৪ সনে "স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড" স্থাপন করা হয়।

TISCO ব্যতিরেকে অন্য সব স্টীল ফ্যাক্টরিকে এর অধীনে আনা হয়। এদের উৎপাদনের পরিমাণ :

লৌহ উৎপাদন (লক্ষ টনে)

	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৯-৮০
ভিলাই	২২	২১
দুর্গাপুর	১৩	৮
রউরকেল্লা	১০	১৩
বোকারো	৬	১৪
ইস্‌কো (IISCO)	৩	৬
টিসকো (TISCO)	১৮	১৮

ভারত এখন কিছু স্টীল রপ্তানীও করে। এই রপ্তানীর আর্থিক পরিমাণ :—

	১৯৫০-৫১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১
রপ্তানী মূল্য [কোটি টাকা]	৩	২৯০	৮২

লোহা সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয় নি। সামান্য হলেও আমাদের দেহের জন্য লোহা একান্ত প্রয়োজন। এই লোহাটুকুর শতকরা ৫৫ ভাগ আছে লাল রক্তকণিকার হেমোগ্লোবিনে। বাকীটুকুর অধিকাংশ লিভারে এবং কোষের সাইটোক্রোমে। প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ লাল রক্ত কণা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেটা নিয়ত পরিপূরণ করতে হয়। লোহা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। প্রতিদিন এইজন্য অন্ততঃ ২০—৩০ মিলিগ্রাম লোহা দেহের প্রয়োজন এবং সেটা খাদ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। সবুজ শাক-সবজী, ডাল, ফল এবং প্রানিজ লিভার থেকে এই লোহা দেহে প্রবেশ করে। ভুট্টা, মটরশাক, শালগম, ফুলকপি, শশা, নিমপাতা প্রভৃতিতে যথেষ্ট লোহা রয়েছে। এই লোহা দিয়ে হেমোগ্লোবিন তথা রক্তকণার সৃষ্টি না করলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। প্রাচীনকালে ভারতেই প্রথম রক্তশূন্যতা নিরাময়ের জন্য লোহা থেকে তৈরী "লৌহভস্ম" ব্যবহৃত হয়েছিল। এখনও ডাক্তারেরা রক্তহীনতায় সর্বদা লোহাঘটিত ওষুধ ব্যবহার করেন।

লোহার অপর কোন কোন যৌগেরও ব্যবহার আছে। যেমন, ফেরিক অক্সাইড রঙের কাজে ও পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। চিত্রাঙ্কনে প্রুশিয়ান ব্লু (লৌহ-যৌগ) নীল রঙ হিসাবে যথেষ্ট আদৃত। লেখার কালি তৈরী করতে ফেরাস সালফেট প্রয়োজন হয়।

অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটির প্রাচীন ঐতিহ্য কিছু নেই, এর সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছে এই আধুনিক যুগে। ফটকিরি বা অ্যালাম অনেক কাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। সেই অ্যালামের মধ্যে এই ধাতুটি রয়েছে তাই নাম অ্যালুমিনিয়াম ; চিহ্ন Al। সমস্ত ধাতুর মধ্যে ভূত্বকে অ্যালুমিনিয়ামই রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে—প্রায় ৮·০৭ শতাংশ। ধাতু হিসাবে প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়াম নেই। অ্যালুমিনিয়ামের বেশীর ভাগটাই রয়েছে নানারকম মাটি আর শিলাতে সিলিকেট রূপে—যেখান থেকে অ্যালুমিনিয়াম উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। যে খনিজ আকরিক থেকে এই ধাতুটি সর্বদা নিষ্কাশিত করা হয় সেটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড, নাম 'বক্সাইট' (Al_2O_3, $2H_2O$)। অবশ্য এর সঙ্গে আরও দুইটি অক্সাইড আকরিক 'গিবসাইট' (Al_2O_3,$3H_2O$) এবং 'ডায়াস্পোর' (Al_2O_3, H_2O) প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। বক্সাইট আকরিক অবশ্য বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_8) নয়—এর মধ্যে মালিন্য হিসাবে আয়রন অক্সাইড এবং সিলিকা (বালু) সর্বদাই খানিকটা থাকে। যে সব খনিজ আকরিকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ ৪০ শতাংশের বেশী, সেই আকরিকগুলিই ধাতু উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাটির উপরেই সমতলভূমিতে অথবা ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে বক্সাইট স্তূপীকৃত হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম-সমৃদ্ধ শিলা থেকেই আবহাওয়ার সংস্পর্শে ক্ষয়িত হয়ে এই বক্সাইটের উৎপত্তি। অনেক দেশেই অল্পাধিক বক্সাইট রয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জ্যামাইকা দ্বীপে প্রচুর বক্সাইট রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও খুব ভাল জাতের যথেষ্ট বক্সাইট আছে ; তা ছাড়া ফ্রান্স, রাশিয়া, গিনি, হাঙ্গেরী, সুরিনাম, যুগোশ্লাভিয়াতে বেশ বেশী পরিমাণে এই আকরিক রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বক্সাইটের পরিমাণ সীমিত এবং কানাডাতে বক্সাইট নেই।

ভারতের বক্সাইট-ভাণ্ডারও কম নয়। অনুমান করা হয়েছে, আমাদের প্রায় ১৩৫ কোটি টন বক্সাইট আকরিক মজুত আছে। এর অধিকাংশটাই রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালায় এবং তার কাছাকাছি। অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশেই বেশী বক্সাইট আছে। গুজরাট, কর্ণাটক, জম্বু-কাশ্মীর প্রদেশেও বেশ খানিকটা বক্সাইট আছে। ভারতের বক্সাইটে প্রায়ই ৫০ শতাংশেরও বেশী অ্যালুমিনা থাকে। ১৯৭৭ সালে ভারতে মোট বক্সাইট উত্তোলিত হয়েছে ১৪,৭১,১০৮ টন। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন দেশে খনি থেকে কত পরিমাণ বক্সাইট সংগ্রহ হয়েছে সেটা দেওয়া হল।

বিভিন্ন দেশে উত্তোলিত বক্সাইটের পরিমাণ (১৯৬৭)

দেশ	বক্সাইট (লক্ষ টন)	দেশ	বক্সাইট (লক্ষ টন)
জ্যামাইকা	১০২	ফ্রান্স	৩১
সুরিনাম	৫৮	যুগোশ্লাভিয়া	২৪
রাশিয়া	৫৬	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১৯
অস্ট্রেলিয়া	৪৭	গিনি	১৮
গায়েনা	৩৭	হাঙ্গেরী	১৮

অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কারের কাহিনীটি একটু বিচিত্র। মৃত্তিকা থেকে ডেভি (১৮০৭) একটি অক্সাইড জাতীয় পদার্থ পৃথক করেন। তিনি বলেছিলেন যে এর মধ্যে একটি অজ্ঞাত ধাতু রয়েছে কিন্তু ধাতুটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু এই অজ্ঞাত ধাতুটির তিনি নামকরণ করে দিয়েছিলেন,—"অ্যালুমিনিয়াম"। এরপর ১৮২৫ সালে অনেক প্রচেষ্টার পর ডেনিশ বিজ্ঞানী অরস্টেড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড থেকে সর্বপ্রথম সামান্য একটুখানি অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে সমর্থ হন। তার দু'বছর পরে জার্মান রসায়নবিদ্ উলার (Wöhler) একই উপায়ে স্বল্প পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম পাউডার তৈরী করেন। ১৮৫৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী ডেভিল কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা সরু একটি অ্যালুমিনিয়াম দণ্ড তৈরী করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এরকম হাল্‌কা ধাতু এর আগে কেউ দেখেনি। দুষ্প্রাপ্য সুতরাং দুর্মূল্য এই ধাতুর স্থান তখন সোনারও উপরে ছিল। সে সময় প্রতি আউন্স অ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল সাত পাউন্ড (£7)।

অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রথম যে জিনিষটি তৈরি হয়েছিল সেটি হল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শিশুপুত্রের জন্য একটি ঝুমঝুমি। এই সম্রাট তাঁর নিজের জন্য এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কয়েক সেট আলুমিনিয়ামের কাঁটা-চামচ তৈরী করিয়েছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং অভিজাতদের জন্য ছিল সোনার কাঁটা-চামচ। ১৮৮৪ সালে ওয়াশিংটনের মনুমেণ্টের মাথার চূড়ার আবরণে প্রায় ছয় পাউন্ড ওজনের অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহৃত হয়েছিল। সেদিনে এতখানি আলুমিনিয়াম ধাতু কোন ব্যাপারে ব্যয় করা যেতে পারে সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল।

গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত যেটুকু অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হত সেটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড থেকে। বর্তমানে কিন্তু বক্সাইটের অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে এই ধাতুটি তৈরী হচ্ছে। বিচূর্ণ বক্সাইটকে উত্তপ্ত গাঢ় কস্টিক সোডার দ্রবণে জীর্ণ করা হয়। একটি বিশেষ রাসায়নিক উপায়ে ঐ দ্রবণ থেকে মালিন্য দূর করে প্রায় বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। অ্যালু-

মিনিয়াম অক্সাইডের প্রচলিত নাম অ্যালুমিনা। বর্তমানে এই অ্যালুমিনাই ধাতুটির উৎপাদনের উৎস।

সচরাচর ধাতব অক্সাইডকে উত্তপ্ত অবস্থায় কোক দিয়ে বিজারিত করলে অক্সিজেন চলে যায় এবং ধাতুটি পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উপায়েই লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু যার যার অক্সাইড থেকে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু অ্যালুমিনা (Al_2O_3) অতি উত্তপ্ত অবস্থায়ও কোক দ্বারা আদৌ বিজারিত হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতিটি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে অচল।

কোন কোন ধাতব অক্সাইডকে উচ্চ উষ্ণতায় গলিয়ে নিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ধাতুটি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অ্যালুমিনা উচ্চ তাপমাত্রায় গলে না বরং ভাস্বর হয়ে ওঠে। অতএব সেই পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যায় না।

এই দুইটি অসুবিধার জন্য বহুদিন পর্যন্ত মানুষ অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটিকে বেশী করে উৎপাদন করতে পারেনি। ১৮৮৬ সালে এই সমস্যার সমাধান করেন পৃথক পৃথক ভাবে দুই তরুণ বিজ্ঞানী। আগে এঁদের একে অপরের পরিচয়ও জানতেন না। একজন ফরাসী, নাম পল হেরো (Paul Heroult) আর অপরজন আমেরিকান, নাম চার্লস মার্টিন হল। গ্রীনল্যাণ্ডে ক্রায়োলাইট (Na_3AlF_6) নামক একটি খনিজ পাওয়া যায়। অ্যালুমিনা গলে না বটে, কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় গলিত ক্রায়োলাইটে অ্যালুমিনা বেশ দ্রবিত হয়। এই গলিত দ্রবণের ভিতরে বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে এসে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উৎসারিত হয়। এই পদ্ধতিটি সহজতর এবং ব্যয়বহুল নয়। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টন অ্যালুমিনিয়াম এ ভাবেই তৈরী হচ্ছে। এক টন অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে চার টন বক্সাইট লাগে আর তার সঙ্গে ১৫০ পাউন্ড ক্রায়োলাইট ব্যয় হয়। প্রতি টন ধাতুর জন্য ২২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ২০০০ পাউণ্ড কার্বন, ৮০০ পাউন্ড সোডা, ৬০০ পাউন্ড চুনাপাথর এবং আড়াই টন কোক (তাপ-উৎপাদনে) খরচ হয়।

বিভিন্ন দেশে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি সারনী দেওয়া হল।

অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন (১৯৬৭)

দেশ	অ্যালুমিনিয়াম (লক্ষ টন)	দেশ	অ্যালুমিনিয়াম (লক্ষ টন)
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩২˙৭	ফ্রান্স	৩˙৯৮
রাশিয়া	১০˙৬	জার্মানী	২˙৮
কানাডা	৯˙৬	ইটালী	১˙৪০
জাপান	˙২	ভারত (১৯৬৭)	১˙০৬
নরওয়ে	৪˙০	ভারত (১৯৮১-৮২)	২˙০৬

অ্যালুমিনিয়াম বহু রকমের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কারণ অ্যালুমিনিয়ামে এমন নানা গুণের সমাবেশ, যেটা অন্য কোন ধাতুতে দেখা যায় না। অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হাল্কা; অ্যালুমিনিয়ামের ওজন সমায়তন স্টীলের ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। অ্যালুমিনিয়াম বেশ ভাল তাপ এবং তড়িৎ পরিবাহী। অ্যালুমিনিয়ামের খুব সরু তার এবং পাতলা পাত তৈরী করা যায়। এক কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়াম থেকে ২৫০০০ মিটার সরু তার করা সম্ভব। আবার গোলাকার বা চৌকো শিকও তৈরী হয়। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয়, ঘাতসহ, উত্তাপে পিটিয়ে নানা আকার বা জোড়া দেওয়া যায়। ঢালাই করা যায়। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম নরম হলেও এর অনেক সংকর অত্যন্ত শক্ত। অ্যালুমিনিয়াম জলবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে লোহার মত মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না।

সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সামান্য কিছু তামা (Cu) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মিশিয়ে সংকর প্রস্তুত করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের এই সকল সংকর বেশ শক্ত এবং এদের কাঠিন্য মিশ্রণের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। এসব সংকর প্রভূত চাপ সহ্য করতে পারে, এমন কি প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৯০০০০ পাউন্ড চাপ গ্রহণ করতে সক্ষম। সংকর ধাতুগুলির মধ্যে 'ডুরালুমিন' প্রধান। এটি উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে। কয়েকটি অ্যালুমিনিয়াম-সংকরের নাম উল্লেখ করা হল ঃ—

অ্যালুমিনিয়াম-সংকর

সংকর ধাতু	উপাদান অনুপাত	ব্যবহার
১। ম্যাগনেলিয়াম	Al : Mg = ৯৮ : ২	তুলাযন্ত্র, হাল্কা যন্ত্রপাতি
২। ডুরালুমিন	Al : Cu : Mg : Mn = ৯৫ : ৪ : ০·৫ : ০·৫	উড়োজাহাজ, রেলের কামরা ইত্যাদি
৩। Y-সংকর	Al : Cu : Mg : Ni = ৯২·৫ : ৪ : ১·৫ : ২	মরিচারোধী, জারনরোধী সামগ্রী
৪। অ্যালনিকো	ইস্পাত : Al : Ni : Co = ৫ : ২ : ২ : ১	স্থায়ী চুম্বকের জন্য

এছাড়াও আরও অ্যালুমিনিয়ামের সংকর রয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জের বিষয় তামার কথাতেই বলা হয়েছে। উত্তম ঢালাইয়ের জন্য সিলিকনযুক্ত সংকর উৎকৃষ্ট।

অ্যালুমিনিয়াম খুবই হাল্কা ; ডুরালুমিন সংকর তার চেয়ে সামান্য একটু ভারী। উড়োজাহাজ এবং তার ফ্রেম, পাখা ইত্যাদি আজকাল ডুরালুমিন দিয়ে তৈরী হচ্ছে। এমন কি উড়োজাহাজের বিখ্যাত রোলস্ রয়েস ইঞ্জিনেরও প্রায় ৪৬ শতাংশ অ্যালুমিনিয়ামের। স্টীলের বদলে এই সংকর ব্যবহার করাতে ওজন অনেক কমে গেছে। এর ফলে প্লেনের গতিবেগ বেড়েছে এবং পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অনেক দেশেই বর্তমানে রেলগাড়ীর কামরা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী হয়, যদিও স্টীলের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের দাম দশ শতাংশ বেশী। কিন্তু হাল্কা হওয়াতে ইঞ্জিন অনেক বেশী কামরা টেনে নিতে পারে। সেজন্য যথেষ্ট ব্যয় সংকোচ হয়। বড় বড় জাহাজের, যেমন ব্রিটিশ জাহাজ ক্যানবেরার উপরের কাঠামোর প্রায় ১১০০ টন অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী। ফলে, জাহাজটি অনেক বেশী যাত্রী বহন করতে পারে এবং গতির হারও বেশী। বাস, ট্যাক্সি, লঞ্চ, নৌকো ইত্যাদিও অ্যালুমিনিয়াম সংকর দিয়ে তৈরী হচ্ছে। ডুরালুমিনের চাদরের দু' পিঠেই অতি পাতলা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের আস্তরন দিয়ে নেওয়া হয়। একে বলে "Alclad" এটা সম্পূর্ণ মরিচারোধী। সুতরাং জলবায়ুতে, এমন কি লোনা জলেও তা ব্যবহার করা যায় ; কোন ক্ষয় হয় না। শক্ত বলে এবং ক্ষয়িত হয় না দেখে এই সংকর দিয়ে পুলও তৈরী করা হয়েছে। সাণ্ডারল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এরকম পুল আছে।

গৃহ নির্মাণে আজকাল যথেষ্ট অ্যালুমিনিয়াম লাগে। দরজা-জানালার ফ্রেম, ছিটকিনি, রেলিং, বেসিন ইত্যাদি আজকাল প্রায়ই অ্যালুমিনিয়ামের।

তড়িৎ-পরিবহনের জন্য তামাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তামা মহার্ঘ। সেইজন্য তামার পরিবর্তে আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের তার ও ক্যাব্‌ল দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও তামার তুলনায় অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ৬০ শতাংশ। কিন্তু সহজলভ্য এবং সস্তা হওয়াতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারে খরচ অনেক কম পড়ে। ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক মোটর ইত্যাদির আবর্ত কুণ্ডলী (armature) সরু অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে তৈরী হচ্ছে। বস্তুত বৈদ্যুতিক কাজেই অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা সর্বাধিক।

অ্যালুমিনিয়ামের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা সমধিক। তাই রান্নার বাসনপত্র, কেটলী, সস্‌প্যান, ইত্যাদি প্রায়ই অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয় এবং খুব পাতলা পাত করা যায় বলে চকোলেট, টফি, ওষুধের ট্যাবলেট, ও অন্যান্য খাবারের আবরণ হিসাবে খুব ব্যবহার হয়। দুধের বোতলের ঢাকনা, ও খাবারের প্যাকেটের প্যাকিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের চাদর থেকে ট্রাঙ্ক, বাক্স, সুটকেস, থালা-বাটি, কাপ-ডিস, ছাইদানি, পাউডারের

কৌটো ইত্যাদি তৈরী হয়। টেবিল-চেয়ারের ফ্রেমও অনেক সময় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী।

অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় আধার দুগ্ধ শিল্পে, মদ-চোলাইয়ের কারখানায়, ফরম্যালিন প্রস্তুতির সময় যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ্যালুমিনিয়াম থেকে আলোর প্রতিফলন খুব জোরালো। তাই মোটরের হেডলাইট, টর্চ, টেলিস্কোপ ইত্যাদিতে আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের দর্পণ ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে এলে তার উপর একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য অ্যালুমিনার (Al_2O_3) আবরণ পড়ে। এই আবরণ থাকার জন্য অ্যালুমিনিয়াম আর জলবায়ুতে ক্ষয়িত হয় না এবং মরচে পড়ে না। ১৮৯৩ সালে পিকাডিলি সার্কাসে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী যে Eros-এর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল—সেটা আজও অম্লান অক্ষত রয়েছে। লোহার তৈরী বিদ্যুৎ পরিবহনের খুঁটি, টেলিগ্রাফের খুঁটি, জানালার শিক ইত্যাদিকে মরচে থেকে বাঁচাবার জন্য বিচূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। আতসবাজী এবং কোন কোন বিস্ফোরক তৈরী করতে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ লাগে।

এই সব নানা প্রয়োজনের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা প্রচুর। ১৯০০ সালে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ছিল ৭৫০০ টন আর ১৯৬৭ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৮২৮৫০০০ টন।

এত বিচিত্র গুণ থাকা সত্ত্বেও অ্যালুমিনিয়াম লোহার উপরে স্থান করে নিতে পরে নি। এর প্রধান কারণ, অ্যালুমিনিয়াম ধার নিতে পারে না। ক্ষুরধার অস্ত্র অ্যালুমিনিয়াম থেকে করা যায় না। মানুষের হিংসাবৃত্তির শেষ নেই, ক্ষমতার লোভে অপরের নিধনের জন্য, আধিপত্য বিস্তারের জন্য অস্ত্র চাই-ই। ছোরা, তলোয়ার, বন্দুক, বল্লম এসব ত অ্যালুমিনিয়াম থেকে হয় না। তা ছাড়া, সংসারের কাজের দা, কাস্তে, কুড়োল, কাটারি, করাত, পেরেক, স্ক্রু, বাটালি প্রভৃতি ধারাল জিনিস, অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরী করা যায় না। তাই স্টীলের কদর বেশী।

অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি যৌগের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এর যৌগগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ব্যবহার হয় ফটকিরি বা অ্যালাম। জল-পরিশোধনে, বস্ত্ররঞ্জনে, কাগজশিল্পে ফটকিরির প্রচুর চাহিদা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অনেক সময় অভ্র প্রয়োজন হয়, এই অভ্রও একটি অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ, পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। আর একটি গাঢ় নীল খনিজ, লাপিস লাজুলি (সালফারযুক্ত সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট) রংয়ের জন্য যথেষ্ট সমাদৃত। উহার বিকল্পে আজকাল কৃত্রিম নীল,

আল্‌ট্রামেরিন (ultramarine) কোন কোন জিনিসকে সাদা করতে ও চুনকামে ব্যবহার হয়।

আ্যালুমিনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়। অ্যালুমিনা অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রকৃতিতে স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। এর নাম কোরাণ্ডাম, এটি হীরকের মত শক্ত এবং হীরকের পরিবর্তে কাটার কাজে ব্যবহার হয়। বিচূর্ণ কোরাণ্ডাম পালিশের কাজে খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময়েই অ্যালুমিনা স্বচ্ছ রঙীন স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। এগুলি উজ্জ্বল মণিপাথর হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন, সবুজ রংয়ের পান্না (emerald), এবং রক্তিমবর্ণ চুনি বা পদ্মরাগ মণি (ruby)। নীলা বা নীলকান্তমণি (sapphire) বা ঈষৎ বেগুনি অ্যামেথিষ্টও স্ফটিকাকার অ্যালুমিনা। অ্যালুমিনার আর একটি মণিপাথর হচ্ছে হলদে পোখরাজ বা পুষ্পরাগ-মণি (topaz)। অতি সূক্ষ্মমাত্রায় বিভিন্ন অক্সাইড মিশ্রিত থাকার জন্য এই সব রত্নের বিভিন্ন রঙ হয়।

দস্তা

লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় ব্যবহার অনেক কম হলেও দস্তা বা জিংক (Zn) নানা কাজে আমাদের প্রয়োজন হয়। দস্তার সংকর পিতল ত প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। মৌল হিসাবে দস্তাকে প্রথম চিহ্নিত করেন প্যারাসেলসাস।

যে বাদামী চকচকে আকরিক পাথর থেকে দস্তা প্রধানতঃ নিষ্কাশন করা হয়, তার নাম স্ফ্যালেরাইট বা জিংক-ব্লেণ্ড। এটি দস্তার সালফার-যুক্ত যৌগ, ZnS। এছাড়া অন্যান্য আকরিক হচ্ছে ; ক্যালামাইন ($ZnCO_3$), হেমিমরফাইট (Zn_2SiO_4, H_2O), ফ্র্যাংকলিনাইট (ZnO, Fe_2O_3)। জিংকের খনিজগুলো প্রায়ই সীসার খনিজের সঙ্গে পাওয়া যায়। এই সকল আকরিকে খনিজ-মলই বেশী, অনেক সময়েই দস্তার পরিমাণ ৫-৮ শতাংশ মাত্র।

দস্তার সব চেয়ে বড় ভাণ্ডার রয়েছে কানাডাতে। তারপরের স্থান রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, পেরু। বর্মাতেও কিছু উৎকৃষ্ট জাতের দস্তার আকরিক আছে। আমাদের দেশে দস্তা অতি সামান্যই আছে। রাজস্থানের উদয়পুর জেলাতে দস্তা ও সীসার খনি রয়েছে, দস্তার পরিমাণ ৪-৫ শতাংশ। সেখানে দস্তা উৎপাদনের জন্য একটি বিগলন-যন্ত্র চালু হয়েছে। গুজরাটের বরোদা জেলায় এবং বিহারের সিংভূম অঞ্চলে কিছু দস্তার আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিশুদ্ধ দস্তা তৈরীর পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম ভারতেই আবিষ্কার হয় এবং পরে সেটা চীনে যায়। হিন্দুরাজা মদনপালের সময় দস্তাকে নতুন ধাতুরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।*

সালফাইড আকরিক জিংক ব্লেণ্ড থেকে ধাতুটি উৎপাদনের পদ্ধতি তামা বা সীসার অনুরূপ। প্রথমে তাপজারিত করে বিচূর্ণ আকরিককে জিংক অক্সাইডে পরিণত করা হয়: ($2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$)। পরে এই অক্সাইডের সঙ্গে কোকচূর্ণ মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ছোট ছোট পাতনযন্ত্রে বিজারিত করা হয় ($ZnO + C \rightarrow Zn + CO$)। বাষ্পাকারে জিংক পাতনযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। এই বাষ্পকে শীতল অবস্থায় ঘনীভূত করে দস্তা সংগ্রহ করা হয়।

বিভিন্ন দেশে দস্তা উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৬৭)

দেশ	দস্তা-উৎপাদন (টন)	দেশ	দস্তা-উৎপাদন (টন)
কানাডা	১২৪৯০০০	অষ্ট্রেলিয়া	৪৪৫৮০০
রাশিয়া	৫৯০০০০	পেরু	৩৫০৫০০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫৪৯০০০	ভারত (১৯৭৭)	৩৮০০০

ঘরের ছাদে যে টিন ব্যবহার হয়, তাতে টিন ধাতু আদৌ নেই। লোহার উপরে দস্তার প্রলেপ দেওয়া থাকে। জলবায়ুতে মরচে পড়ে যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। কারণ জলবায়ুতে দস্তা আক্রান্ত হয় না। সেই একই কারণে, জলের বালতিগুলো দস্তালিপ্ত। এই দস্তালেপনের নাম Galvanisation। কখনও কখনও একটি আবদ্ধ পাত্রে একটি বস্তুকে বিচূর্ণ দস্তার সঙ্গে রেখে ৩৭৫°C পর্যন্ত তাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা উত্তপ্ত করলে বস্তুটির উপরে দস্তার একটি দৃঢ় আবরণ পড়ে। এইরূপ প্রলেপনকে বলা হয় sherardisation।

অধিকাংশ দস্তা প্রয়োজন হয় নানারকম সংকর তৈরীতে। পিতল, বিশেষ ব্রোঞ্জ, জার্মান সিলভার, ডাচ্‌মেটাল প্রভৃতি তামার সঙ্গে যুক্ত সংকরধাতু। এদের বিষয় তামার অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দস্তার কোন কোন সংকর ছাঁচে ঢালাইয়ের পক্ষে খুব উপযুক্ত। 'মাজাক' সংকর (ম্যাগনেসিয়াম, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম ও কপারের সংকর) থেকে অনেক যন্ত্রাংশ তৈরী হয়। ছাপার ব্লক তৈরী করতেও জিংক লাগে। টর্চের ব্যাটারীতে এবং কোন কোন বৈদ্যুতিক সেলে দস্তার ইলেকট্রোড ব্যবহার হয়।

---

*'Discovery of Elements by Marie Elvira Weeks & Henry Leicester page 138, 7th Edn"

অত্যন্ত মিহি জিঙ্ক অক্সাইড যৌগ 'জিঙ্ক হোয়াইট' নামে সাদা রঙ হিসাবে প্রচুর ব্যবহার হয়। "লিথোপোন" নামে জিঙ্ক সালফাইড এবং বেরিয়াম সালফেটের মিশ্রণও একটি ভাল সাদা রঙ।

টিন আর লেড

লৌহেতর ধাতুর মধ্যে দস্তা ছাড়া আরও যে দুইটি ধাতু নানা কাজে লাগে সে দুটি হচ্ছে, টিন (রাং) এবং লেড (সীসা)। এই রাং-এর পরিবর্তে ইংরেজী নাম 'টিন' বেশী প্রচলিত, সুতরাং সেই নাম ব্যবহার করছি।

টিনের রাসায়নিক নাম হল স্ট্যানাম, চিহ্ন Sn। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধাতুদ্বয়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। টিনের সংকর ব্রোঞ্জ ত লৌহযুগের আগে নানা প্রয়োজনে ব্যবহার হত। তেমনি দুহাজার বছরেরও বেশী পুরানো অনেক লেডের তৈরী জিনিসও পাওয়া গেছে।

টিন ঃ

প্রকৃতিতে টিনের পরিমাণ বেশী নয়—এর প্রধান আকরিক হল ক্যাসিটেরাইট (SnO_2), টিনের অক্সাইড। পেগমাটাইট, কোয়ার্জাইট শিলার মধ্যে এই টিন অক্সাইডের শিরা দেখা যায়। রোদ-জল-হাওয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিলাক্ষয়ের ফলে অনেক সময় এই খনিজ নদী-নালার জলস্রোতের তলায় এসে জমে। এই আকরিকে মলই বেশী, টিনের পরিমাণ ২-৭ শতাংশের বেশী নয়। টিনের বড় ভাণ্ডার রয়েছে মালয়েশিয়ায়। তারপরের স্থান বলিভিয়া, রাশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন ইত্যাদি। এসব দেশে টিনের উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৬৭) ঃ—

দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন)	দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন)
মালয়েশিয়া	৮·১	থাইল্যাণ্ড	২·৫
বলিভিয়া	৩·০	চীন	২·২
রাশিয়া	২·৮	ইন্দোনেশিয়া	১·৫

ভারতে টিন প্রায় নেই বললেই হয়। বিহারের রাঁচি ও হাজারীবাগ অঞ্চলে এবং গুজরাটের পালানপুর অঞ্চলে কিছু ক্যাসিটেরাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের প্রয়োজনের টিন বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

খনিজ-মল যথাসম্ভব দূর করে পরাবর্ত চুল্লীতে বিচূর্ণ কোকের সঙ্গে ক্যাসিটেরাইটকে উচ্চ উষ্ণতায় বিজারিত করা হয়। গলিত অবস্থায় টিন বেরিয়ে আসে। পরে সেটাকে বিশোধন করে নিতে হয়।

উজ্জ্বল সাদা রংয়ের টিন ধাতুটি প্রায় লোহার মতই ভারী কিন্তু লোহার মত কঠিন নয়; অপেক্ষাকৃত নরম। টিনের গলনাঙ্ক বেশ নীচু, 232°C। এইজন্য টিন ও সীসার মিশ্রণ ঝালাইয়ের কাজে সর্বদা ব্যবহার করা হয়। টিন দিয়ে স্টীলের মত বা তামার মত সরু তার তৈরী করা যায় না। তবে টিনের ঘাতসহতা যথেষ্ট তাই খুব পাতলা টিনের পাত তৈরী করা সম্ভব। সেই সব পাত দিয়ে মলমের, টুথপেস্টের টিউব তৈরী করা হয়।

খুব ঠাণ্ডায় টিনের পাত রেখে দিলে সেটা ফুলে ফেঁপে উঠে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। বলা হয়, 'টিনের প্লেগ' হয়েছে। বস্তুতঃ টিনের রূপান্তর ঘটে। এটা ধূসর টিন।

আমরা যে নানা টিনের কৌটো ব্যবহার করি, সেগুলো মাইল্ড স্টীলের পাত দিয়ে তৈরী-তার উপরে টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলে টিনের প্রলেপন বা tin-plating। যাতে মরচে না পড়ে সেজন্য এটা করা হয়। কেরোসিনের টিনও এরূপ টিন-প্রলিপ্ত স্টীল দিয়ে তৈরী।

অনেক সময় ব্রোঞ্জ বা তামার পাত্রের উপরে বিচূর্ণ টিন ও একটু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ছড়িয়ে দিয়ে তাপিত করা হয়। এর ফলে পাত্রের উপর টিনের একটি দৃঢ় প্রলেপ পড়ে। একেই 'রাংয়ের কলাই' বা tinning বলে।

টিনের ধাতুসংকর অনেক এবং সেগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

(১) ব্রোঞ্জ: তামা ৯২%, টিন ৮% (বাসনপত্র)
(২) মুদ্রা: তামা ৯৫%, টিন ৪%, দস্তা ১% (তাম্র মুদ্রা)
(৩) বেল মেটাল: তামা ৮০%, টিন ২০% (চামচ, বাসন, ঘণ্টা ইত্যাদি)
(৪) ঝালাই ধাতু: সীসা ৫০%, টিন ৫০% (ঝালাইয়ের কাজে)
(৫) পয়টার (Pewter): সীসা ২০%, টিন ৮০% (টেবিলের সরঞ্জামে)
(৬) ব্রিটানিয়া মেটাল: অ্যান্টিমনি ১০%, টিন ৯০% (ছুরি, কাঁটার জন্য)
(৭) ব্যাবিট মেটাল (Babbitt metals): টিন ৯০%, অ্যান্টিমনি ৭%, তামা ৩%।

"ব্যাবিট মেটাল"—এই সংকরটি মেশিনের "বেয়ারিং" (bearings) যন্ত্রাংশের জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

লেড ঃ

রোমানরা সেই যুগে জল সরবরাহের জন্য সীসার নল এবং জল রাখার জন্য সীসার চৌবাচ্চা ব্যবহার করত। যে সব মিস্ত্রী এগুলো তৈরী করত তাদের বলা হত প্লাম্বার (এখনও ঐ নাম চলিত রয়েছে) আর সীসাকে বলত, প্লাম্বাম (Plumbum, Pb)। রসায়নে সীসা এই নামেই প্রচলিত, চিহ্ন Pb।

সীসা মুক্তাবস্থায় মৌল হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। মাটির তলা থেকে সীসার খনিজ সংগ্রহ করতে হয়। সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা (লেড সালফাইড, PbS)। আরও দুইটি খনিজ থেকেও খানিকটা সীসা উৎপাদন করা হয়—সেগুলো হচ্ছে সেরুসাইট ($PbCO_3$) এবং অ্যাংগেলসাইট ($PbSO_4$)। গ্যালেনা আকরিকটি প্রায়ই দস্তার আকরিক স্ফেরালাইটের (ZnS) সঙ্গে একত্র থাকে। দু'টি ধাতুই মূল্যবান এবং অনেক সময়েই এই ধাতুদ্বয়কে পাশাপাশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

গ্যালেনা থেকে সীসা উৎপাদনের পদ্ধতিটি অনেকটা তামা নিষ্কাশনের মত। আকরিকে লেড সালফাইড মোটামুটি ৮-১০ শতাংশ থাকে, বাকীটা আবর্জনা। তেল ও সাবান মিশ্রিত জলের স্রোতে বিচূর্ণ গ্যালেনাকে ভাল করে ধুয়ে নিলে বালু, মাটি ও অন্যান্য ময়লা থিতিয়ে যায়, তেলের সঙ্গে সালফাইড আলাদা হয়ে আসে। তখন গাঢ় আকরিকে লেড সালফাইডের পরিমাণ হয় প্রায় ৭০ শতাংশ। এই আকরিক চূর্ণকে বালতির মত চুল্লীতে নিয়ে বাতাসে তাপজারিত (roasting) করা হয়। অক্সাইড গ্যাস (SO_2) হয়ে সালফার চলে যায় এবং ছোট ছোট ডেলার আকারে লেড ডাইক্সাইড পাওয়া যায়। এই সীসার অক্সাইড ও কোকের মিশ্রণকে তখন মারুত চুল্লীতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে বিজারিত করা হয়। চুল্লীর নীচে গলিত সীসা এসে জমে। এই সীসা পরে অবশ্যই তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশোধন করা হয়। সর্বদাই গ্যালেনা আকরিকে কিছু রুপা (এবং কিঞ্চিৎ সোনা) থাকে। বিশোধন করার সময় রুপা এবং সোনা উদ্ধার করা হয়। এইজন্যই বিশোধনের বিশেষ প্রয়োজন।

সীসার খনিজ অনেক দেশেই আছে। রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকাতেই বেশী সীসা উংপাদিত হয়। কয়েকটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৬৭) দেওয়া হল ঃ—

দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন)	দেশ	উৎপাদন (লক্ষ টন
রাশিয়া	৪˙৪	মেক্সিকো	১˙৯
অস্ট্রেলিয়া	৪˙২	পেরু	১˙৭
কানাডা	৩˙৪	যুগোশ্লাভিয়া	১˙১
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩˙২	বুলগেরিয়া	১˙১

আমাদের দেশে সীসার খনিজ বেশী নেই। রাজস্থানের উদয়পুর জেলার জাওয়ারেই আমাদের সীসার প্রধান উৎস। এখানে পুরনো যুগের বড় বড় খনি-খাদ দেখে মনে হয় সুদূর অতীত কালে এখান থেকে দস্তা ও সীসা সংগ্রহ করা হত। এখন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এখানকার পাহাড় ও খনি থেকে গ্যালেনা উত্তোলনের ভার নিয়েছে। এ জায়গার আকরিকে রয়েছে রূপামিশ্রিত গ্যালেনা আর স্ফেলারাইট, আনুমানিক ২% সীসা আর ৫% দস্তা এতে রয়েছে। যথা-সম্ভব আবর্জনামুক্ত করে গাঢ় আকরিক পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিহারের টুংডুর বিগলন কারখানায়। সেখানে সীসা ও রূপা আলাদা করে উদ্ধার করা হয়।

রাজস্থান ছাড়া অন্ধ্রের গুন্টুর জেলার পাহাড়ে গ্যালেনা আকরিক রয়েছে তামা ও দস্তার খনিজের সঙ্গে। এখানেও পুরানো দিনের পরিত্যক্ত খনি-খাদ দেখা যায়। উড়িষ্যার সুন্দরগড় ও ময়ূরভঞ্জ জেলাতেও সীসার খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। গুজরাট, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটকেও সীসার খনিজ রয়েছে বটে, তবে সেগুলো নিম্নমানের।

সীসার বর্ণ ধূসর কিন্তু তার একটা ধাতব দ্যুতি আছে। সীসার সরু তার হয় না। কিন্তু পাত তৈরী হয়। লোহার চেয়ে দেড়গুণ ভারী হলেও ধাতুটি নরম। সীসার পাতকে সহজেই বাঁকানো যায় অথবা ছুরি দিয়ে কাটা যায়। যে 'লেড পেন্সিল' দিয়ে আমরা লিখি, তাতে কিন্তু সীসা নেই, আছে গ্র্যাফাইট (কার্বন)। সীসা কাগজে কালো দাগ কাটে তাই পেন্সিলের ওই নাম। নানারকম প্রয়োজনে সীসা ব্যবহার হয়।

যদিও আমাদের শরীরের উপরে সীসার বিষক্রিয়া আছে, তবু সীসার নল দিয়ে জল সরবরাহ করা হয় এবং সীসার চৌবাচ্চাও ব্যবহার করা হয়। তার কারণ জলের সংস্পর্শে এলে সীসার উপরে একটি অদ্রব ও দৃঢ় সাদা আস্তর পড়ে। তখন জলের সঙ্গে আর সীসার সংযোগ থাকে না, তাই জল বিষাক্ত হতে পারে না। তবুও জল সরবরাহ এবং খাদ্য বস্তুর সংরক্ষণে সীসা ব্যবহার না করাই ভাল।

আমাদের শরীরের পক্ষে সীসা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। একশ সিসি রক্তে যদি

২৫ মাইক্রোগ্রামের বেশী সীসা থাকে তবে সেটা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং কিড্‌নীকে আক্রমণ করে। রোমানদের রাজত্বকালে বহু-লোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা যেত, তার কারণ রোমানরা সেযুগে সীসার তৈরী পানপাত্র ব্যবহার করত। কিছুদিন আগে দেখা গেল সুইডেনে যারা বস্ত্রকলে কাজ করে তারা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, তারা তাঁতের জন্য যে কাটিম বা ববিন ব্যবহার করে সেগুলো সীসার এবং তা থেকে রক্তে বিষ সংক্রমিত হয়েছে। আজকাল সব দেশেই বিশেষতঃ সহরাঞ্চলে সীসাজনিত দূষণ অনেক বেড়ে গেছে। পেট্রোল চালিত গাড়ী থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাতে থাকে সীসা। বাতাস থেকে সেই সীসা ফুসফুসে যায় এবং সেখান থেকে রক্তে গিয়ে মিশে।

সীসার অধিকাংশ চাহিদা ছাপাখানার টাইপ তৈরীর জন্য এবং ঝালাইয়ের কাজে। টাইপ ধাতুতে সীসা ৮০%, অ্যান্টিমনি ১৫%, এবং টিন ৫% থাকে। ঝালাই ধাতু সংকরে সীসা ঃ টিন = ১ ঃ ১। টিনের মত সীসারও গলনাংক নীচু, ৩২৬°C। বৈদ্যুতিক ক্যাবলের আবরক হিসাবে অনেক সীসা প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিক সেল এবং ব্যাটারীর তড়িৎদ্বার হিসাবেও যথেষ্ট সীসা দরকার। বন্দুকের বুলেটের জন্য সীসা অপরিহার্য। চায়ের প্যাকিংয়ের জন্য সীসার পাত ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লী এবং পারমাণবিক বিভাজনের পরীক্ষা যেসব প্রকোষ্ঠে করা হয় তার চারদিকে খুব পুরু সীসার দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে হয় যাতে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে এসে ক্ষতি না করে। এজন্যও সীসা প্রয়োজন হয়। সীসা আবার তার কতগুলো যৌগ পদার্থ তৈরী করতেও ব্যয় হয়। এগুলো প্রায়ই রঙ (pigment) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঃ সাদা রঙ সফেদা বা white lead। গাঢ় লাল সীস-সিন্দুর বা (red lead)। এদের চাহিদা প্রচুর। এ ছাড়া দুইটি হলুদে রঙ লেড ক্রোমেট এবং মুদ্রাশঙ্খও (লেড মনোক্সাইড) ব্যবহার হয়। বিস্ফোরণ যাতে না হয় সেজন্য মোটর গাড়ীর গ্যাসোলিনের সঙ্গে লেড-টেট্রাইথাইল যৌগ মেশান হয়।

ম্যাগনেসিয়াম (Mg.)

রুপার মত উজ্জ্বল এই ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন হামফ্রে ডেভি (১৮০৮)। নানা জিনিস তৈরী করার জন্য আমরা যে সব ধাতু ব্যবহার করি তাদের মধ্যে

ম্যাগনেসিয়াম সব চেয়ে হাল্কা। এর ঘনত্ব মাত্র ১·৭৪ গ্রাম প্রতি সিসি। অর্থাৎ স্টীল এর চেয়ে সাড়ে চারগুণ ভারী, এমনকি হাল্কা ধাতু অ্যালুমিনিয়ামও এর থেকে দেড়গুণ ভারী।

পৃথিবীতে ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে প্রচুর, তবে সবই বিভিন্ন যৌগরূপে। ভূত্বকে ধাতুদের মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামের স্থান তৃতীয় ; এর পরিমাণ ভূত্বকের প্রায় দুই শতাংশ। শুধু লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর পরিমাণ এর চেয়ে বেশী। খনিজ পাথর ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$) এবং ডলোমাইট ($MgCO_3$, $CaCO_3$) এর সাধারণ আকরিক এবং প্রায় সব দেশেই অল্প বিস্তর আছে।

কিন্তু বেশীর ভাগ ম্যাগনেসিয়ামই উৎপাদন করা হয় সমুদ্রজলের দ্রাবিত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড থেকে। এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্রজলে এক লক্ষ টনেরও বেশী ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে। সমুদ্র উপকূলের দেশগুলিতে সমুদ্রবারিই ম্যাগনেসিয়ামের উৎস। ১৮৩৩ সালে ফ্যারাডে ম্যাগনেসিয়াম ক্লেরোইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি তৈরী করেন। এরপরে ১৮৫২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী বুনসেন ঐ পদ্ধতিতে ম্যাগনেসিয়াম উৎপ াদনের জন্য বৈদ্যুতিক সেল উদ্ভাবন করেন। মোটামুটি সেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেই সমুদ্রজল থেকে বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সংগ্রহ করে তা থেকে আজকাল ধাতুটি তৈরী করা হচ্ছে। ১৯৪৩-এ আঃ যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে ১৮৪০০০ টন ম্যাগনেসিয়াম ধাতু তৈরী হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর শুষ্ক হ্রদের স্টাসফার্ট-স্তূপে যে কার্নালাইট, কাইনাইট, কাইসেরাইট খনিজ লবণ রয়েছে. তা থেকেও ম্যাগনেসিয়াম উদ্ধার করা হয়।

যাদের সমুদ্র-উপকূল নেই তারা খনিজ ডলোমাইট পাথর থেকেই এই ধাতুটি উৎপাদন করেন। উচ্চতাপে ডলোমাইট পাথর থেকে প্রথমে ম্যাগনেসিয়া অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরী করে নেয়া হয়। এরপর অতি উঁচু তাপমাত্রায় (>২০০০°C) বিচূর্ণ কোক অথবা ফেরো-সিলিকনের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াকে বিজারিত করলে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসে। বাষ্পটিকে ঠাণ্ডা করে ম্যাগনেসিয়ামের তার বা রিবন তৈরী করা হয়।

ভারতে সমুদ্রবারি তো আছেই, তাছাড়া বিশাল ডলোমাইট ভাণ্ডার রয়েছে দেশের প্রায় সর্বত্র। কিন্তু তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর সস্তা বিদ্যুৎ প্রয়োজন। সেটার অভাব রয়েছে। তাই এদেশে এখনও উৎপাদন সম্ভব হয় নি ; আমাদের বাইরে থেকেই ধাতুটি আনতে হয়।

ম্যাগনেসিয়াম সরাসরি ধাতু হিসাবে সামান্যই ব্যবহার হয়। বিচূর্ণ ম্যাগনেসিয়াম কোন কোন বিস্ফোরক বোমা তৈরীতে প্রয়োজন হয়। বাজী তৈরী

করতেও কিছু ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ ও রিবন লাগে। ধাতুটি আগুনে জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলো দেয়। টাইটেনিয়াম, বেরিলিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশনে ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন হয়। ম্যাগনেসিয়াম ধাতু ঘাতসহ কিন্তু খুব শক্ত নয়। তাই দৃঢ় অথচ হাল্‌কা ধাতু-সংকর প্রস্তুতিতে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার হয়। ম্যাগনেলিয়াম ও ডুরালুমিন এই দুইটি ধাতু-সংকরের কথা অ্যালুমিনিয়ামের আলোচনাতে বলা হয়েছে। উড়োজাহাজের কাঠামোতে এদের ব্যবহার যথেষ্ট।

ম্যাগনেসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সংকর যন্ত্রচালিত নৌকো, রেসের গাড়ি, সাইকেল আরোহীর টুপি, মুখোশ, ঘোড়ার পায়ের নাল, ক্যামেরার যন্ত্রাংশ প্রভৃতি তৈরী করার সময় ব্যবহার হয়। যেসব ক্ষেত্রে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে এই ধরণের ম্যাগনেসিয়াম সংকর ব্যবহার করা হয়; যেমন মাটির নীচের পাইপ-লাইনে বা ট্যাঙ্কে, জাহাজের খোলে।

ম্যাগনেসিয়ামের কয়েকটি যৌগেরও চাহিদা আছে। ডলোমাইট থেকে পাওয়া ম্যাগনেসিয়া অতি উচ্চতাপেও গলে না, এইজন্য চুল্লীর ভিতরের আস্তরে এটি ব্যবহার হয়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং সালফেট বহুল ব্যবহৃত ঔষধ। গাছের পাতায় যে সবুজ ক্লোরোফিল কণা রয়েছে, সেটা ম্যাগনেসিয়ামেরই একটি জটিল যৌগ। ক্লোরোফিল না থাকলে সালোক-সংশ্লেষ হত না এবং তার ফলে সমস্ত জৈবজগৎ লোপ পেয়ে যেত।

স্পাইনেল নামক একটি খনিজ আছে, $MgAl_2O_4$। মনি পাথর হিসাবে বিশেষ সমাদৃত।

৫

সংকর সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ধাতু

এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হল, সেসব ধাতু আমরা নানা কাজে লাগাই। এগুলো ছাড়াও আর কয়েকটি ধাতু আছে, যেমন, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইত্যাদি যেগুলো বর্তমান যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোহা বা তামার মত সরাসরি ধাতু হিসাবে এরা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ধাতু অন্য ধাতুর সঙ্গে, বিশেষতঃ স্টীলের সঙ্গে, মিশ্রিত হয়ে অনেক মূল্যবান এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় সংকর-ধাতুর সৃষ্টি করে। অসংখ্য রকম কাজে ঐসব সংকর-ধাতু লাগে। এই ধাতুগুলো প্রকৃতিতে কখনও মৌলাবস্থায় থাকে না। বিভিন্ন যৌগ আকরিক থেকে এদের নিষ্কাশিত করে নিতে হয়।

ম্যাঙ্গানিজ (Mn)

সুইডেনের রাসায়নিক গ্যান (Gahn) ১৭৭৪ সালে ম্যাঙ্গানিজ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীতে নানারকম ম্যাঙ্গানিজ খনিজ রয়েছে; এদের অধিকাংশই অক্সাইড। বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকরিক হচ্ছে; (১) সাইলোমিলেন (MnO_2, H_2O), (২) পোলিয়ানাইট (MnO_2), (৩) পাইরোলুসাইট (MnO_2), (৪) ম্যাঙ্গানাইট (Mn_2O_3,H_2O), (৫) ব্রনাইট ($3\ Mn_2O_3$, $MnSiO_3$), ইত্যাদি। ভূত্বকে ম্যাঙ্গানিজ ০·০৮৫% আছে। উপরের মাটি সরিয়ে উন্মুক্ত খাদ কেটে আকর সংগ্রহ করা হয়। রাশিয়াতেই সর্বাধিক ম্যাঙ্গানিজ খনিজ রয়েছে। তারপরের স্থান যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, গ্যাবন, ব্রাজিল, চীন। অর্থাৎ ভারতের স্থান তৃতীয়। বর্তমানে ভারতে বছরে গড়ে বিশ লক্ষ টন আকরিক তোলা হয়। আমাদের লোহার কারখানার চাহিদা মিটিয়েও অনেকটা আকরিক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এদেশের ম্যাঙ্গানিজ খনিজ বেশ উন্নত শ্রেণীর। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা ও নাগপুর অঞ্চলে, কর্ণাটকের শিমোগা ও চিতল দুর্গ অঞ্চলে, গোয়ার পেরনেম ও বারদেতে, গুজরাটের বরোদা, পাঁচ মহল এবং শিবরাজপুর অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর ও কোরাপুট জেলায়, বিহারের গুয়া, সিংভূম ও হাজারীবাগ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ রয়েছে। একটা হিসাবে দেখা গেছে ভারতে মোট ম্যাঙ্গানিজ খনিজের ভাণ্ডার রয়েছে ১৮৭০ লক্ষ টন।

আকরিক থেকে থারমাইট পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে ম্যাঙ্গানিজ ধাতু নিষ্কাশিত করা হয় (পৃঃ ৩৮)। ম্যাঙ্গানিজের সব আকরিকেই অল্পাধিক লোহার অক্সাইড থাকে। এজন্য উৎপাদিত ধাতু বস্তুতঃ ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার মিশ্রণ, এর নাম 'ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ'। ম্যাঙ্গানিজ ধাতু হিসাবে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। 'ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ' গলিত স্টীলে মিশিয়ে উন্নত মানের ম্যাঙ্গানিজ-স্টীল সংকর তৈরী করা হয়। প্রায় সমস্ত ভাল স্টীলেই কিছু ম্যাঙ্গানিজ মেশান হয়। ম্যাঙ্গানিজ অক্সিজেন বিতাড়িত করে স্টীলের কঠোরতা বাড়ায়। রেলের পাটি, ঘর্ষণ-যন্ত্র ও অন্যান্য শক্ত-কাজের জন্য ম্যাঙ্গানিজ-স্টীল বিশেষ প্রয়োজন। প্রতি টন স্টীলে ৫~৭ কেজি ম্যাঙ্গানিজ মেশান হয়। ম্যাঙ্গানিজ ধূসর সাদা কঠিন ধাতু (ঘনত্ব ৭.২, গলনাঙ্ক ১২৬০°C)।

স্টীল ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য ধাতুসংকর আছে। ম্যাঙ্গানিজ-সংকর (Cu ৮৪%, Mn ১২%, Ni ৪%) তড়িৎযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ-ব্রোঞ্জ (Mn ৪%, Cu ৬০%, Zn ৩৫%, Fe ১%) খনিতে এবং সমুদ্রে ব্যবহার-উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণে লাগে।

বিশুদ্ধ পাইরোলুসাইট বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে, কাচশিল্পে, দেশলাই তৈরী করতে প্রয়োজন হয়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যৌগটি জীবানুনাশক, জারক এবং বিরঞ্জকরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিকেল (Ni)

প্রায় তিন শতক আগে জার্মানীতে তামার আকরিকের সঙ্গে কিছু পরিমাণ আর একটি পাথর পাওয়া যেত, কিন্তু তা থেকে কখনও তামা বের করা সম্ভব হত না। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল, Kupfer-nickel অর্থাৎ "শয়তানের তামা" (Nick, শয়তান)। এটাকে বিশ্লেষণ করে সুইডেনবাসী ক্রনস্টেড (১৭৫১) নিকেল আবিষ্কার করেন। নিকেলের গুণাগুণ অনেকটাই লোহার অনুরূপ। লোহার মতই নিকেল বেশ মজবুত ও শক্ত, উচ্চ উষ্ণতায় গলে (১৪৫৪°C), চুম্বকধর্মী ইত্যাদি। তবে নিকেলের একটি বিশেষ গুণ আছে, নিকেল লোহার মত মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না। বিশুদ্ধ নিকেল রূপার মত সাদা, প্রসার্যমান, ঘাতসহ ধাতু।

পৃথিবীতে নিকেলের পরিমাণ বেশী নয়। এর নানা খনিজ হল ঃ— (১) পেন্টল্যানডাইট (Ni, Fe) S, (২) গারনিয়েরাইট (Ni, Mg) SiO_3, xH_2O (৩) নিকোলাইট (NiAs) (৪) নিকেল-গ্লান্স (NiAsS) ইত্যাদি। এর

মধ্যে প্রথম দু'টি খনিজই প্রধান আকরিক। ধাতুটিকে এই দু'টি আকরিক থেকে এক বিশেষ রকমের জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করতে হয়। সর্বাধিক পরিমাণ নিকেল সংগ্রহ হয় কানাডা থেকে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীপ থেকে। ভারতে নিকেল অতি সামান্যই আছে। এদেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিকেল-আকরিক রয়েছে উড়িষ্যার কটক ও ময়ূরভঞ্জ জেলায়—নিকেলের পরিমাণ অনধিক ১%। বিহারের সিংভূমের তামার আকরিকে এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রীর তামার আকরিকে সামান্য একটু নিকেল রয়েছে। আমাদের প্রয়োজনের নিকেল সবটাই কানাডা থেকে আসে।

ধাতু হিসাবে বিশুদ্ধ নিকেলের প্রয়োগ সামান্যই। মরিচা রোধ করার জন্য এবং উজ্জ্বলতা বাড়াবার জন্য অনেক সময় স্টীলের ও তামার জিনিসের উপর বৈদ্যুতিক উপায়ে নিকেলের প্রলেপ দেওয়া হয়। EPNS [Electro-plated Nickel Silver] নামে যে সুদৃশ্য ও রুপার মত ঝকঝকে বাসনপত্র, কাঁটাচামচ, ফুলদানি ইত্যাদি বাজারে প্রচুর পাওয়া যায় সেগুলো জার্মান-সিলভারের উপর ঐ রকম প্রলেপ দেওয়া। কিছু কিছু রাসায়নিক শিল্পে যেমন বনস্পতি উৎপাদনে বিচূর্ণ নিকেল লাগে। কোন কোন ব্যাটারীর তড়িৎদ্বার নিকেলের।

কিন্তু ৯০ শতাংশেরও বেশী নিকেল নানারকম ধাতু-সংকর তৈরী করতে ব্যয় হয়। এখানে মাত্র কয়েকটি নিকেলজাত সংকরের কথা বলা হচ্ছে।

নিকেল-স্টীল ঃ নিকেল সংযোগে স্টীলের দৃঢ়তা, কাঠিন্য এবং প্রসার্যতা বাড়ে। নিকেল-স্টীল স্থিতিস্থাপক এবং মরিচারোধী হয়। সচরাচর ২~৫% নিকেল মেশান হয়। এই নিকেল-স্টীল বর্ম, বিমান-যন্ত্রাংশ, মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশ, ভারী বন্দুক ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয়।

ইনভার ঃ ৩৬% নিকেল যুক্ত এই স্টীলের প্রসারাঙ্ক খুব কম, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ালেও আয়তনে বাড়ে না। এটা মরিচারোধীও বটে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম, স্কেল এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

প্লাটিনাইট ঃ ৪৬% নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতের ধাতুসংকরের প্রসারাঙ্ক ঠিক প্লাটিনামের মত, সেইজন্য এই নাম। অথচ প্লাটিনামের চেয়ে সস্তা। বৈদ্যুতিক বাল্বে এবং রেডিয়োর ভাল্বে এটা ব্যবহার করা হয়।

তামার সঙ্গে নিকেলের মূল্যবান ধাতুসংকর তৈরী হয়। **নিকেল সিলভার বা জার্মান সিলভার** (Cu ৫০%, Ni ২৫%, Zn ২৫%) গৃহস্থালীর নানা জিনিসপত্র ও গহনা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। **মোনেল মেটাল ঃ** (Cu ৩০%, Ni ৬৭%, Mn ৩%) অত্যন্ত ঘাতসহনশীল এবং উচ্চ তাপমাত্রায়ও অবিকৃত

থাকে। উন্নত মেশিন, জাহাজের প্রপেলার, ভাল্‌ভ, টারবাইন ব্লেড, দ্রুত চলনশীল যন্ত্রাংশে মোনেল মেটালের চাহিদা। **কিউপ্রো-নিকেল** (২০% Ni) বুলেটের জ্যাকেটে ব্যবহার হয়। **প্লাটিনয়েড** (Cu ৬০%, Zn ২৪%, Ni ১৬%) এবং **কনস্টানটিন** (Cu ৬০%, Ni ৪০%) এই দুইটি সংকর-ধাতু তড়িৎ-রোধকে এবং থার্মোকাপলে ব্যবহার করা হয়। অনেক মুদ্রার একটি উপাদান নিকেল। **নাইক্রোম** (Ni ৬০%, Cu ১৫%, Fe ২৫%) সংকরটি বৈদ্যুতিক চুল্লীর তার নির্মাণের জন্য বিশেষ সমাদৃত। স্থায়ী চুম্বকের জন্য অ্যালনিকোর কথা আগেই বলা হয়েছে।

ক্রোমিয়াম (Cr)

সাইবেরিয়া থেকে পাওয়া লাল খনিজ-শিলা ক্রোকোসাইট বিশ্লেষণ করে ফরাসী বিজ্ঞানী ভ্যাকুলিন (১৭৯৭) ক্রোমিয়াম ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ক্রোমিয়ামের যৌগগুলি নানারকম সুন্দর গাঢ় রঙের—সেইজন্য এই নাম, গ্রীক Chroma শব্দটির অর্থ রং। ক্রোমিয়াম ধাতুটি উৎপাদনের জন্য সর্বত্র তার একমাত্র আকরিক ক্রোমাইট (FeO, Cr_2O_3) ব্যবহার করা হয়। ক্রোমাইট আকরিক বেশী পাওয়া যায় রাশিয়া, দঃ আফ্রিকা, রোডেসিয়া, তুরস্ক, ফিলিপাইনস্‌, কিউবা, নিউ ক্যালেডোনিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতেও কিছু ক্রোমাইট রয়েছে। ভারতের প্রধান ভাণ্ডার উড়িষ্যার কটক, কেওঞ্জর, ঢেংকানল জেলায়। বিহার, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রেও ক্রোমাইট খনিজ রয়েছে। এসব জায়গায় খনন চলছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে বছরে গড়ে ৩~৪ লাখ টন এই আকরিক খনি থেকে তোলা হচ্ছে।

ক্রোমাইট পাথর উচ্চ উষ্ণতাতেও গলে না। তাই ফার্নেসের ভিতরের অগ্নিসহ আস্তরের জন্য এটি ব্যবহার হয়।

ক্রোমাইট আকরিক থেকে প্রথমে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে লোহা দূর করে বিশুদ্ধ ক্রোমিক অক্সাইড (Cr_2O_3) তৈরী করা হয়। এই ক্রোমিক অক্সাইডকে থারমিট পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে উচ্চ উষ্ণতায় বিজারিত করলে ক্রোমিয়াম ধাতুটি নিষ্কাশিত হয়ে আসে। ক্রোমিয়াম নীলাভ সাদা কঠিন ও ঘাতসহ ধাতু, ঘনত্ব ৭·২, গলনাঙ্ক ১৮৩০°C।

ক্রোমিয়াম ধাতুর প্রায় সবটুকুই ইস্পাতের বিশেষ ধাতুসংকর তৈরী করার জন্য ব্যয় হয়; সামান্য কিছুটা বৈদ্যুতিক প্রলেপ (electroplating) দিতে লাগে। ক্রোমিয়াম প্রলিপ্ত হলে ধাতুর ক্ষয় রোধ হয় এবং তা রূপার মত উজ্জ্বল দেখায়।

ক্রোমিয়াম মিশালে ইস্পাত খুব শক্ত হয়। এরকম ইস্পাত ঘর্ষণে ক্ষয় হয় না এবং মরিচারোধী হয়।

১৯১৩ সালে শেফিল্ডে হ্যারি বেয়ারলী মজবুত বন্দুকের নলের জন্য বিভিন্ন ধাতু মিশিয়ে নানারকম ইস্পাত-সংকর তৈরী করে পরীক্ষা করছিলেন। যেগুলো উপযুক্ত নয় এবং পছন্দ হয় নি সেগুলো তিনি বাইরে ফেলে রেখেছিলেন। কিছুদিন পরে দেখতে পেলেন, ফেলে-রাখা সংকরগুলো মরচে ধরে নষ্ট হয়েছে। শুধু যে ইস্পাত-সংকরগুলোতে ক্রোমিয়াম মিশিয়েছিলেন সেগুলোতে একটুও মরচে পড়ে নি ; আগের মতই উজ্জ্বল রয়েছে। এভাবেই ক্রোম-স্টীল তথা স্টেনলেস স্টীলের সূত্রপাত। আজকাল (৫~১০%) ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাতসংস্কর বর্ম, যুদ্ধাস্ত্র, দ্রুতগতি যন্ত্রাংশ, মোটরের ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। কখনও কখনও প্রয়োজন মত কিছু নিকেল, টাংস্টেন বা ভ্যানাডিয়ামও সঙ্গে দেওয়া হয়। ১২ শতাংশের বেশী ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত স্টেনলেস স্টীল হিসাবে বাসনপত্রের জন্য অধুনা বহুল ব্যবহৃত। প্রায়ই এতে সামান্য নিকেল থাকে। উড়োজাহাজের এবং রেলের উন্নতমানের ইঞ্জিনের জন্য ২০~২৫% ক্রোমিয়াম, ৭~১০% নিকেলযুক্ত স্টেনলেস ইস্পাত ব্যবহার হয়।

ক্রোমিয়ামের আরও সংকর-ধাতু আছে। যেমন, লেদ-মেশিনে শক্ত জিনিষ কাটার জন্য যে ধারাল ছুরি বা করাত ব্যবহার হয় সেটা "স্টেলাইট" নামে সংকর ধাতু ; কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং টাংস্টেনের সংকর। জেট ইঞ্জিন, গ্যাস-টারবাইনের যন্ত্রাংশ তৈরীতে স্টেলাইট প্রয়োজন হয়। নাইক্রোমের কথা আগেই বলা হয়েছে (পৃ ৮৪)।

টাংস্টেন (W)

এই ধাতুটির রাসায়নিক নাম উলফ্রাম, তাই চিহ্ন (W)। ১৭৮৩ সালে স্পেনদেশের বিজ্ঞানী দুই ভাই—ফস্টো দ্য এলুয়ার এবং জুয়ান যোসেফ দ্য এলুয়ার—এই ধাতু আবিষ্কার করেন। টাংস্টেনের দুইটি মাত্র উল্লেখযোগ্য আকরিক আছে ঃ শীলাইট (ক্যালসিয়াম টাংস্টেট, $CaWO_4$) এবং উলফ্রেমাইট (ম্যাঙ্গানিজ টাংস্টেট, Mn (Fe) WO_4)। এই আকরিক চীন, রাশিয়া, কোরিয়া আঃ যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশী সংগৃহীত হচ্ছে। ব্রহ্মদেশ থেকেও এই উলফ্রেমাইট অনেক রপ্তানি হয় ইউরোপে। ভারতে টাংস্টেন আকরিক সামান্যই আছে এবং সেটা পাওয়া যায় সিংভূম, ত্রিচিনপল্লী, রাজস্থানের যোধপুরে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়াজেলার ছেঁদাপাথর থেকে কিঞ্চিৎ টাংস্টেন উদ্ধার করা হয়। আমাদের

প্রয়োজনের প্রায় সবটুকু টাংস্টেন বাইরে থেকে আনতে হয়। ১৯৭৭-এ দেশে টাংস্টেন খনিজ তোলা হয়েছে মাত্র ৪৩,০৪৪ টন।

টাংস্টেন আকরিককে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে ফুটালে টাংস্টেন অক্সাইড (WO_3) পাওয়া যায়। উচ্চ উষ্ণতায় এই অক্সাইডকে কোক দিয়ে বিজারিত করে ধাতুটি উদ্ধার করা হয়।

টাংস্টেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি দুর্গল ধাতু। অতি উচ্চ তাপমাত্রাতেও এটিকে গলানো দুষ্কর। গলনাঙ্ক ৩৪১০°C। এর ঘনত্বও খুব বেশী, ১৯.৩। অ্যাসিডে এই ধাতু আক্রান্ত হয় না। এর প্রসার্যতা খুব বেশী—অত্যন্ত সরু টাংস্টেনের তার তৈরী করা যায়। প্রায় সমস্তটুকু টাংস্টেনই কঠোর ইস্পাত-সংকর তৈরী করার জন্য ব্যবহার হয়। টাংস্টেন ইস্পাত-সংকর অত্যন্ত কঠোর, ক্ষয়হীন এবং উচ্চ উষ্ণতায় নির্বিকার। এইজন্য টাংস্টেন-স্টীল ধাতু-কাটার বা পাথর-কাটার ধারালো যন্ত্রপাতিতে প্রয়োজন হয়। টাংস্টেন ও কার্বনের যৌগ টাংস্টেন কার্বাইড স্টীলের থেকেও কঠোর এবং ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরী করতে ব্যবহার হয়। আর একটি মূল্যবান সংকর "স্টেলাইটের" কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৮৫)। মিসাইলে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় প্রযুক্ত যন্ত্রাংশের জন্য টাংস্টেন অপরিহার্য। বিজলী বাতির ফিলামেণ্ট, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, এক্স-রে ও ক্যাথোড-রে টিউব, ঝালাই করার ইলেকট্রোড, টেলিভিসনের যন্ত্রাংশ—এসবের জন্যও টাংস্টেনের যথেষ্ট চাহিদা।

কোবাল্ট (Co)

স্বভাব একরকম বলে লোহা, কোবাল্ট এবং নিকেল এই তিনটি ধাতুকে রসায়নবিদেরা এক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। কোবাল্ট ধাতুটি অনেকটা লোহার অনুরূপ। কোবাল্ট সাদা দ্যুতিসম্পন্ন ধাতু, লোহার চেয়েও শক্ত এবং ভারী (ঘনত্ব, ৮.৭), এর গলনাঙ্কও বেশ উঁচু, ১৪৯৫°C। কোবাল্টও চুম্বকধর্মী। তবে কোবাল্ট জলে বাতাসে মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না। সুইডেনের রসায়নবিদ্ ব্রাণ্ড ১৭৩৭ সালে কোবাল্ট আবিষ্কার করেন। প্রকৃতিতে অবশ্য লোহার তুলনায় কোবাল্ট অতি সামান্যই রয়েছে; ভূত্বকে লোহা ৫.০%, নিকেল ০০.২% আর কোবাল্ট ০.০০১% আছে।

কোবাল্টের আকরিক হল: (১) লিয়ানাইট (Co_3S_4), (২) স্মলটাইট ($CoAs_2$), (৩) কোবাল্টাইট (CoAsS) ইত্যাদি। অবশ্য এদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক ধাতুর যৌগ মিশ্রিত থাকে। রোডেসিয়া এবং কাটাঙ্গার তাম্র-আকরিকের

সঙ্গে এবং অণ্টারিয়োর রূপার আকরিকের সঙ্গে অনেকটা কোবাল্ট সালফাইড থাকে। এই উৎসগুলো থেকেই প্রধানতঃ কোবাল্ট উপজাত ধাতুরূপে সংগৃহীত হয়। ভারতে কোবাল্টের আকরিক প্রায় নেই। ক্ষেত্রীর তামার খনিজের সঙ্গে সামান্য কোবাল্ট খনিজ রয়েছে। এই খনিজ উদ্ধার করে রাজস্থানের শিল্পীরা এনামেলের নীল রঙের জন্য ব্যবহার করে। সিকিমের তামার আকরিকের সঙ্গেও কিছু কোবাল্ট আছে। এদেশের প্রয়োজনের সবটুকু কোবাল্ট ধাতুই বিদেশ থেকে আনা হয়।

লোহা বা তামার মত কোবাল্ট ধাতুর সরাসরি ব্যবহার নেই। সবটা কোবাল্ট সংকর-ধাতু তৈরীতে খরচ হয়, বিংশষতঃ ইস্পাতের সঙ্গে মিশিয়ে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে এর সংকর ধাতু 'অ্যালনিকো' থেকে স্থায়ী চুম্বক তৈরী হয় (পৃষ্ঠা ৬৯)। 'স্টেলাইট' সংকর-ধাতুর কথা ক্রোমিয়ামের আলোচনার সময় বলা হয়েছে।

কাচের সঙ্গে প্লাটিনাম সহজেই জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রসারাঙ্কের (coefficient of expansion) অনেক ব্যবধান থাকার জন্য অন্যান্য ধাতু কাচের সঙ্গে জোড়া লাগে না। অধুনা কোবাল্টের একটি সস্তা সংকর-ধাতু মহার্ঘ প্লাটিনামের স্থান নিয়েছে, কাচের সঙ্গে জোড়া লাগাতে। এই সংকর-ধাতুতে আছে Co ১৮%, Ni ২৮%, Fe ৫৪%।

নিকেল এবং ইস্পাতের সংকর-ধাতু ইনভারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ; এর প্রসারাঙ্ক খুবই কম। আরও উন্নত ধরনের সম্পূর্ণ মরিচারোধী ইনভার আবিষ্কৃত হয়েছে ; এতে আছে লোহা ৩৬·৫%, ক্রোমিয়াম ৯·৫% এবং কোবাল্ট ৫৪%।

কোবাল্টের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কোবাল্ট 60 থেকে বীটা-রশ্মি এবং জোরালো গামা-রশ্মি বের হয়। এইজন্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় আজকাল রেডিয়ামের পরিবর্তে এই কোবাল্ট 60 ব্যবহার হচ্ছে। ভাইটামিন B_{12}-এর অভাবে প্রাণীদেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। সুস্থদেহের জন্য B_{12} অপরিহার্য। এই ভাইটামিন অণুতে কোবাল্ট আছে। সুতরাং আমাদের দেহের জন্য একটু কোবাল্টের প্রয়োজন রয়েছে।

অনেকদিন থেকেই দেখা গিয়েছিল যে অনেক জায়গায় গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু যথেষ্ট ঘাস-পাতা খেয়েও পুষ্টির অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। মনে করা হত কোন জীবাণুর সংক্রমণই এরূপ দুর্বলতার কারণ। কিন্তু নানা পরীক্ষার পর ১৯৩৫ সালে প্রমাণ হয়েছে, ওরকম পুষ্টির অভাবের মূলে রয়েছে ঐসব পশুচারণ-ভূমিতে কোবাল্টের অভাব। এই কারণে সেখানকার ঘাসেও কোবাল্ট

ছিল না। অতি সামান্য যেটুকু কোবাল্ট প্রয়োজন সেটুকু না পেয়ে পশুরা ভুগছিল। জৈব জগতের পুষ্টির ক্ষেত্রে কোবাল্টের এক ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুস্থদেহের জন্য অতিসামান্য একটু কোবাল্ট প্রয়োজন। আমাদের খাদ্যের মধ্যে চাল, গম, আলু, মটর, ভুট্টা প্রভৃতিতে ০·০৫ ppm-এরও কম কোবাল্ট আছে। বাঁধাকপি, শাক, লেটুস, ডুমুর ইত্যাদিতে রয়েছে ০·২ ppm-এর বেশী। (১ ppm = দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ)।

ভ্যানাডিয়াম (V)

ভ্যানাডিয়াম একটি বিরল ধাতু এবং পৃথিবীতে সামান্যই আছে। যেটুকু আছে তার অনেকটাই নানা বস্তুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, বক্সাইট এবং আরও অনেক শিলাতে ভ্যানাডিয়াম কিছু থাকে। ১৮০১ সালে মেক্সিকোর আঁদ্রে ডেল রিয়ো একটি সীসার আকরিকে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন "এরিথ্রোনিয়াম"। কিন্তু এটি একটি মৌলিক ধাতু কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। পরে সুইডেনে একটি লোহার খনিজে সেফস্ট্রম এই ধাতুটি আবার আবিষ্কার করেন (১৮৩০)। সুইডেনের সৌন্দর্যের দেবী হলেন "ভ্যানাডিস্"। এই ধাতুটির অনেক যৌগের রঙ অতিসুন্দর বলে তিনি ধাতুটির নামকরণ করেন, "ভ্যানাডিয়াম"।

পেরুর উঁচু পাহাড়ে পাওয়া "পেট্রোনাইট", ভ্যানাডিয়ামের একটি প্রধান আকরিক। এটা ভ্যানাডিয়ামের সালফাইড। অন্যান্য আকরিক হল ঃ কার্নোটাইট $[K_2(UO_2)_2(VO_4)_3, 3H_2O]$; ভ্যানাডিনাইট $[3Pb_3 (VO_4)_2,PbCl_2]$। ভ্যানাডিয়ামের খনিজ রয়েছে ফিনল্যান্ড, উরাল পর্বত, স্পেন, দঃ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতে যে সামান্য ভ্যানাডিয়াম আছে সেটা প্রায়ই ম্যাগনেটাইট লৌহ-আকরের সঙ্গে থাকে। বিহারের ধলভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে এবং কেওঞ্ঝরে এরকম ভ্যানিডিয়ামযুক্ত ম্যাগনেটাইট রয়েছে। কর্ণাটকের হাসানে, তামিলনাড়ুর নীলগিরিতেও কিছু ভ্যানাডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধাতুটি অবশ্য আমাদের দেশে উৎপাদন করা হয় না।

ভ্যানাডিয়াম অতি উচ্চ তাপমাত্রায় গলে, গলনাঙ্ক ১৮৯০ °C। এটি অত্যন্ত কঠোর এবং ক্ষার বা অম্লদ্বারা মোটেই আক্রান্ত হয় না। জলবায়ুতেও মরচে পড়ে না। ধাতু হিসাবে ভ্যানাডিয়ামের ব্যবহার প্রায় নেই। বিভিন্ন সংকর-ধাতুর জন্যই এর প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি, টাংস্টেন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতির সংমিশ্রণে ইস্পাতের

কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। ঐ বিষয়ে ভ্যানাডিয়াম অন্যতম। অতিরিক্ত রকম শক্ত ইস্পাত প্রয়োজন হলে ইস্পাতের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ভ্যানাডিয়াম মেশান হয়। ভ্যানাডিয়াম-স্টীল সংকর-ধাতুটি ভারী যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ এবং গাড়ীর কাঠামো, প্রভৃতির জন্য ব্যবহার হয়। ভ্যানাডিয়াম-ব্রোঞ্জ দিয়ে উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ তৈরী হয়। নিউট্রন-রশ্মি সহজে ভ্যানাডিয়ামের পাতের ভিতর দিয়ে যেতে পারে বলে পারমাণবিক রি-অ্যাকটারে কিছু ভ্যানাডিয়াম লাগে।

ভ্যানাডিয়ামের পেন্টোক্সাইড (V_2O_5) নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ঠ প্রভাবক (catalyst)। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন প্রত্যেক দেশেরই একটি মূল শিল্প। এই অ্যাসিড তৈরী করতে এতদিন মহার্ঘ প্লাটিনাম-চূর্ণ প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করতে হত। আজকাল প্লাটিনামের পরিবর্তে ভ্যানাডিয়াম পেন্টোক্সাইড প্রভাবক ব্যবহার হয়। ন্যাপথলিন থেকে থলিক অ্যানাহাইড্রাইড যৌগটি তৈরী করার সময়েও এই প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। থলিক-অ্যানাহাইড্রাইড নানা শিল্পে প্রয়োজন হয়। ভ্যানাডিয়াম যৌগ কীটনাশকরূপে, ফটোগ্রাফীতে, কাচশিল্পে এবং কোন কোন রঞ্জক প্রস্তুতিতেও লাগে।

মলিবডিনাম (Mo)

ভ্যানাডিয়ামের চেয়েও বিরল এই মলিবডিনাম ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের হিয়েল্‌ম্‌ (Hjelm, 1781)। এর আকরিক হল ঃ মলিবডিনাইট (MoS_2) এবং উলফেনাইট (Pb, MoO)। নরওয়ে, মেক্সিকো, কোরিয়া, চীন, আঃ যুক্তরাষ্ট্রে এই আকরিক পাওয়া যায়। ভারতে মলিবডিনাম আকরিক নেই বললেই হয়; কোন কোন জায়গায় সামান্য দেখা যায়। যেমন, বিহারের হাজারীবাগের তামা-সীসার খনিজের সঙ্গে, অন্ধ্রের গোদাবরী জেলার বা রাজস্থানের কিষণগড় জেলার পেগমেটাইটের সঙ্গে।

এই ধাতুটি (ঘনত্ব ১০·২) প্রায় ২৬১০°C-এ গলে এবং অনেক ধাতুর সঙ্গে মিশে সহজেই সংকর-ধাতু তৈরী করে। এত উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট ধাতু খুব কমই আছে। কাঠিন্য বাড়াবার জন্য এবং ক্ষয়রোধ করার জন্য ইস্পাতের সঙ্গে এই ধাতুটি অনেক সময় মেশান হয়। তার সঙ্গে প্রায়ই ক্রোমিয়াম নিকেলও থাকে। সেইসব ইস্পাত-সংকর দ্রুতগতিযুক্ত যন্ত্রের জন্য, উড়োজাহাজের মোটর ইঞ্জিনের জন্য, কামানের নল এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়। মিসাইলের খোল তৈরীতেও এর প্রয়োজন হয়। এক্স-রে টিউবে, রেডিয়ো ভালবে এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক টিউবের জন্য মলিবডিনাম-সংকর দরকার হয়।

টাইটেনিয়াম (Ti)

ইলমেনাইট নামে এক কালো রঙের বালুকায় একটি অজানা নতুন ধাতুর অক্সাইড রয়েছে যার প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম গ্রেগর (১৭৯১)। এর স্বল্পকাল পরেই জার্মানীর ক্ল্যাপরথ রুটাইল খনিজেও সেই অক্সাইড রয়েছে প্রমাণ করেন। ধাতুটি নিষ্কাশিত না হলেও ১৭৯৫ সালে ক্ল্যাপরথ এর নাম দিয়েছিলেন "টাইটেনিয়াম"। পৃথিবীতে প্রথমে যে মানবজাতি আবির্ভূত হয়েছিলেন, গ্রীক পুরাণে তাঁদের বলা হত "টাইটান"। এই টাইটানেরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। সেই কথা স্মরণ করে এই শক্ত ধাতুটির ওই নাম দেওয়া হয়েছিল। অক্সাইড থেকে ধাতুটিকে উৎপাদন করার কৌশল জানা ছিল না বলে, দীর্ঘদিন এর প্রতি মানুষের তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। এক শতাব্দীরও পরে ১৯১০ সালে হাণ্টার টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডকে উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রায় সোডিয়ামের সাহায্যে বিজারিত করে বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম ধাতুটি নিষ্কাশন করতে সমর্থ হন।

বর্তমানে ও প্রায় সেই পদ্ধতিই চলেছে। তরল টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডকে হিলিয়াম বা আর্গন গ্যাসের উপস্থিতিতে ম্যাগনেসিয়াম সহ উত্তপ্ত করলে স্পঞ্জের আকারে টাইটেনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। তাকে গলিয়ে নিয়ে ধাতুটির ব্লক, পাত, তার ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। টাইটেনিয়াম কিন্তু ভূত্বকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নানারকম শিলায়, কাদামাটিতে, সাগরবেলার বালুকাতে, কয়লায়, লোহার আকরিকের সঙ্গে, এমনি নানাস্থানে টাইটেনিয়াম যৌগ বিধৃত হয়ে আছে। এমন কি জৈবজগতেও কিছু টাইটেনিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে। টাইটানিয়ামের পরিমাণ ভূত্বকের ০·৬২ শতাংশ। পরিমাণের বিচারে টাইটেনিয়ামের স্থান মৌলদের মধ্যে নবম। আর আমাদের ব্যবহার-যোগ্য ধাতুদের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী হল অ্যালুমিনিয়াম, তারপর লোহা আর ম্যাগনেসিয়াম, চতুর্থ টাইটেনিয়াম। আকরিক হিসাবে দুইটি মাত্র খনিজ উল্লেখযোগ্য—ইলমেনাইট এবং রুটাইল। দু'টিতেই টাইটেনিয়াম অক্সাইডরূপে আছে। এই আকরিক-গুলির অধিকাংশই নদীতটের বা সমুদ্রতীরের বালুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, ব্রাজিল, নরওয়ে, সুইডেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট টাইটেনিয়াম আকর আছে। আমাদের দেশেও ইলমেনাইট রয়েছে অপর্যাপ্ত। আমাদের কেরালার সমুদ্রতটের বালুর কালো ইলমেনাইট দুনিয়ার বাজারে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। কন্যাকুমারীর কাছে মানাবালা কুরুচিতে এবং কুইলনের চাভারাতে উৎকৃষ্ট ইলমেনাইট রয়েছে—

মোটামুটি হিসাবে এর পরিমাণ অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ কোটি টন। এই আকরিক-বালুর সঙ্গে কিছু মোনাজাইট আকরও থাকে—যাতে তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম রয়েছে। ১৯৫০ পর্যন্ত প্রতি বছর সবটা ইলমেনাইটই বিদেশে রপ্তানি হত। এখন অবশ্য যে ইলমেনাইট বালুতে ০·১% এর বেশী মোনাজাইট রয়েছে সেটাকে ভারত সরকারের পারমাণবিক বিভাগের নির্দেশে রপ্তানি করতে দেওয়া হয় না। কেরালা ছাড়াও অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যার সমুদ্র সৈকতেও ইলমেনাইট পাওয়া যায়।

যদিও এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই টাইটেনিয়াম ধাতুটির উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত হয়েছিল তবু ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ধাতুটির বিশেষ ব্যবহার হয় নি। তার কারণ ধাতুটিকে নিষ্কাশন করা যেমন দুষ্কর, তেমনি ব্যয়সাধ্য। টাইটেনিয়ামের গলনাঙ্ক ১৬৭০°C, কিন্তু অনেক কম উষ্ণতায়ই (প্রায় ৮০০°C) এটাতে আগুন ধরে যায় এবং ধাতুটি টাইটেনিয়াম অক্সাইড ও নাইট্রাইডে পরিণত হয়। সুতরাং লোহা বা তামার মত আকরিক থেকে বিগলন পদ্ধতিতে ধাতুটি পাওয়া সম্ভব নয়।

গত দেড়শ বছরে ধাতুটির অক্সাইড—অর্থাৎ টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড অবশ্য প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্বেতশুভ্র অক্সাইডটি একটি চমৎকার সাদা রঙ। জিঙ্ক অক্সাইড বা হোয়াইট লেড প্রভৃতি সাদা রঙের তুলনায় এর আবরণ-ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া রঙটি স্থায়ী, নিষ্ক্রিয় এবং অক্ষতিকর, সেইজন্য এর সমাদর অধিক। কাগজ শিল্পে, রবার শিল্পে, প্রসাধন-দ্রব্য প্রস্তুতিতে, কোন কোন প্লাস্টিকে, লিনোলিয়ামে, সেরামিক শিল্পে, এই অক্সাইডের চাহিদা যথেষ্ট।

১৯৪৭ সাল থেকে টাইটেনিয়ামের নানা আশ্চর্য গুণের জন্য উন্নত দেশগুলিতে ব্যয় সত্ত্বেও ধাতুটির উৎপাদন শুরু হয়। টাইটেনিয়াম অপেক্ষাকৃত হাল্কা। এর ঘনত্ব, ৪·৫১ গ্রাম/সিসি। সুতরাং এটি অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে একটু ভারী এবং লোহার চেয়ে অনেক হাল্কা। কিন্তু আশ্চর্য সম ওজনে টাইটেনিয়াম ইস্পাতের চেয়ে অধিক দৃঢ় এবং কঠোর। এজন্য যেখানে হাল্কা অথচ শক্ত ও ভারসহ যন্ত্রের প্রয়োজন, সেখানে টাইটেনিয়াম বা এর ইস্পাত-সংকর আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্রুতগতি উড়োজাহাজের কাঠামো ও ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈরী করতে অনেকক্ষেত্রেই ম্যাগনেলিয়ামের বদলে টাইটেনিয়াম ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। স্টীম টারবাইনের ব্লেডে, রেলের যন্ত্রাংশে, যুদ্ধাস্ত্রে, টাইটেনিয়ামের সংকর-ধাতুর প্রয়োজন বেড়েছে। ইস্পাত ছাড়াও ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে নানারকম সংকর-ধাতুতে টাইটেনিয়াম অংশ নেয়। অধিকন্তু

টাইটেনিয়ামের তাপসহতা খুব বেশী। উচ্চ তাপমাত্রাতেও এটা নমনীয় হয় না বা ক্ষয়ে যায় না। সেজন্য আজকাল জেট-ইঞ্জিন তৈরী করতে টাইটেনিয়াম ছাড়া চলে না।

সার্জনেরা আজকাল ভাঙা হাড় জোড়া দিতে কিংবা প্রতিস্থাপন করতে টাইটেনিয়াম ধাতুর নল বা দণ্ড ব্যবহার করেন। কারণ টাইটেনিয়ামের ঘনত্ব আর হাড়ের ঘনত্ব প্রায় সমান এবং টাইটেনিয়ামের অবক্ষয় নেই।

জলবায়ুতে ত নয়-ই, তীব্র-অ্যাসিড বা ক্ষারে, কিংবা লোনা জলেও টাইটেনিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না বা মরচে পড়ে না। এই কারণে রাসায়নিক কারখানার পাত্র, নল ইত্যাদির জন্য টাইটেনিয়ামের ডাক পড়েছে। জাহাজের নিম্নাংশে টাইটেনিয়ামের আবরণ দিলে প্রচুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বিদ্যুৎ-শিখায় টাইটেনিয়াম ধাতুকে গলিয়ে সাবধানে বাতাসের অনুপস্থিতিতে ঠাণ্ডা করলে এটা হীরকের মত উজ্জ্বল স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। কৃত্রিম উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে সেটি বিক্রী হয়।

৬

মূল্যবান বিরল ধাতু

কয়েকটি ধাতু আছে, তাদের পরিমাণ বেশী নয় এবং সাধারণ প্রয়োজনেও লাগে না। কিন্তু অনেক সময় একটি বিশেষ কাজের জন্য এসব ধাতু অপরিহার্য। আবার কখনও এসব বিরল ধাতু স্বল্প পরিমাণে কোন সংকরধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে তার একটি বিশেষ গুণ বাড়ানো যায়। তখন এগুলো খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে। সময় সময় বিশেষ গুণের জন্য এদের কোন কোন যৌগেরও যথেষ্ট কদর হয়।

এখানে এ রকম কয়েকটি ধাতুর বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

অ্যান্টিমনি (Sb)

সুইডেন, বোর্নিও এবং অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন শিলার মধ্যে অ্যাণ্টিমনি ধাতু রয়েছে। অ্যাণ্টিমনির প্রধান আকর স্টিবনাইটের (Sb_2S_3) বেশীর ভাগ রয়েছে চীনে এবং কিছু কিছু মেক্সিকো, বলিভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে। ভারতে কাংড়া জেলার লাহুল অঞ্চলে স্টিবনাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহারাষ্ট্রে ছোট একটি অ্যাণ্টিমনি উৎপাদনের কারখানা আছে। এখনও সেখানে বাইরে থেকে আমদানী করা আকরিক থেকে এই ধাতুটি তৈরী হচ্ছে।

এই রূপার মত চকচকে ধাতুটি (গলনাঙ্ক ৬৩০°C, ঘনত্ব ৬·৬৭) সীসার সঙ্গে মিশালে সীসার শক্তি এবং দৃঢ়তা বেড়ে যায়। এই সংকর তরল থেকে কঠিনাকার হওয়ার সময় এর আয়তন সামান্য বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সীসা-অ্যাণ্টিমনির সংকর প্রধানতঃ টাইপের ধাতুতে খুব প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে প্রায়ই একটু টিনও মিশিয়ে নেয়া হয়। অ্যাণ্টিমনিযুক্ত সীসা বুলেট, ব্যাটারীর প্লেট, বিদ্যুৎবাহী ক্যাবলের আবরকে সর্বদা ব্যবহার হয়। টিনের আলোচনায় ব্রিটানিয়া মেটাল, ব্যাবিট মেটাল প্রভৃতি অ্যাণ্টিমনিযুক্ত সংকর-ধাতুর কথা বলা হয়েছে। পয়টার সংকর-ধাতুতেও সময় সময় কিছু অ্যাণ্টিমনি মিশিয়ে দেওয়া হয়, উজ্জ্বলতা এবং দৃঢ়তা বাড়াবার জন্যে।

অ্যাণ্টিমনির দুইটি যৌগ ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয় ; "টার্টার এমেটিক" এবং "ইউরিয়া স্টিবামাইন"। কলকাতার ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের অব্যর্থ প্রতিষেধক এই ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করেন।

বেরিলিয়াম (Be)

বেরিলিয়াম ধাতুটি ধূসর শুভ্র, প্রায় ম্যাগনেসিয়ামের মত হাল্‌কা (ঘনত্ব, ১·৮৪) কিন্তু বেশ শক্ত। এর গলনাঙ্ক, ১২৮০°C। ভূত্বকের ০·০০৬ শতাংশ বেরিলিয়াম।

ধাতুটির প্রধান আকর বেরিল (beryl, $3BeO, Al_2O_3, 6SiO_2$) ব্রেজিল এবং আরজেনটিনাতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বেরিল বিরটাকারে থাকে। একবার প্রায় ২৫ টন ওজনের একটি বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার বেরিল পাওয়া গিয়েছিল। সামান্য ক্রোমিয়াম অক্সাইড থাকার জন্য বেরিলের রঙ প্রায়ই নীলাভ-সবুজ। স্বচ্ছ বেরিল স্ফটিক, এমারেল্ড এবং নীলাভ অ্যাকোয়া-মেরিন মণি-পাথর হিসাবে খুব মূল্যবান। টোপাজ, ক্রাইসোবেরিল খনিজেও বেরিলিয়াম রয়েছে।

বেরিলিয়াম ধাতুটির প্রধান ব্যবহার তামা, নিকেল প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে ত্যদের কাঠিন্য বৃদ্ধি করায়। ২·২৫ শতাংশ বেরিলিয়াম মিশ্রিত তামার সংকর-ধাতুকে পান দিয়ে নিলে তামার তুলনায় ছয় গুণ এবং সাধারণ ইস্পাতের তুলনায় দ্বিগুণ শক্ত হয়। বেরিলিয়ামের ভিতর দিয়ে এক্স্‌-রে অনায়াসে চলাচল করতে পারে, তাই এক্স-রে যন্ত্রের জানালায় এটি ব্যবহার করা হয়। হাল্‌কা অথচ শক্ত এবং যথেষ্ট তাপসহনশীল বলে বেরিলিয়াম-যুক্ত ধাতু-সংকর আজকাল রকেটের যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লীতে দ্রুত নিউট্রনের গতি সংযত করার জন্য বেরিলিয়ামের প্রয়োজন হয়। পারমাণবিক প্লুটোনিয়াম বোমার কেন্দ্রে বেরিলিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্লাটিনাম (Pt)

এই ধাতুটিও খুবই বিরল এবং এত মহার্ঘ যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ কাজে এর ব্যবহার হয় না। প্লাটিনামের সমধর্মী আরও পাঁচটি ধাতু আছে ঃ রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম, অস্‌মিয়াম এবং ইরিডিয়াম। এই ছয়টি ধাতু একত্রে মৌলসমাজে 'প্লাটিনাম গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। সবগুলিই প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং এদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার প্রায় একই রকমের। এদের মধ্যে অবশ্য প্লাটিনামই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূত্বকে প্লাটিনামের পরিমাণ ১×১০^{-৭} শতাংশ।

ইটালীর বিজ্ঞানী জুলিয়াস স্কালিজার ১৫৫৭ সালে প্রথম প্ল্যাটিনামকে

একটি নতুন ধাতু হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু প্রথম এই ধাতুটির প্রস্তুতি শুরু হয় আনুমানিক ১৭৫০ সালে। পৃথিবীতে প্রায় সবটা প্লাটিনাম পাওয়া যায় মৌলাবস্থায়। নদীর বালুতটে সোনার কণার মতই প্লাটিনাম কণা বালুকাতে মিশে থাকে। সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়। রাশিয়াতে উরাল পাহাড়েও প্লাটিনাম রয়েছে অনেকটা। মাঝে মাঝে প্লাটিনামের ডেলাও হয়ত মেলে। ১৮৪৩ সালে রাশিয়াতে প্রায় দশ কিলোগ্রাম ওজনের একটি প্লাটিনাম-পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। দুর্লভ একটি প্লাটিনাম আকরিক আছে, নাম স্পেরিলাইট ($PtAs_2$)। প্রকৃতিলব্ধ প্লাটিনামের সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই ইরিডিয়াম, অস্মিয়াম, রোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত হয়ে সংকর অবস্থায় থাকে।

প্লাটিনামের সবচেয়ে বড় উৎস রাশিয়ার উরাল পাহাড়। দঃ আফ্রিকা, কালোম্বিয়া, কানাডা এবং আঃ যুক্তরাষ্ট্রেও অনেকটা প্লাটিনাম সংগৃহীত হয়। কখনও কখনও নিকেল খনিজের সঙ্গে বা সোনার উৎসের মধ্যে কিছু প্লাটিনাম পাওয়া যায়। ভারতে প্লাটিনাম নেই। কোলারের সোনা-ধোয়া জলে প্লাটিনামের সামান্য সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের প্লাটিনাম উৎপাদনের গড় বার্ষিক পরিমাণ :

	রাশিয়া	দঃ আফ্রিকা	কানাডা	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	কলোম্বিয়া
গড় পরিমান (আউন্স)	১৭২৫০০০	৭৪২০০০	৪১০০০০	৩৬ ০০০	১৭০০০

প্লাটিনাম একটি আশ্চর্য ধাতু। ধাতুটির আগুনের শিখাতে কোনই পরিবর্তন হয় না, অ্যাসিড বা ক্ষারে কোন ক্ষতি হয় না। পিটিয়ে একে নানা আকার দেওয়া যায়। খুব সরু তার এবং অতি পাত্‌লা প্লাটিনামের পাত তৈরী করা যায়। সমস্ত মৌলের মধ্যে অস্মিয়াম সবচেয়ে ভারী এবং তারপরেই প্লাটিনাম, ঘনত্ব ২১'৪ গ্রাম/ সিসি।

প্লাটিনামের এবং কাচের প্রসারাঙ্ক প্রায় একই, সেজন্য কাচের সঙ্গে এই ধাতুটির তার বা পাত সহজেই জোড়া যায়। ল্যাবরেটরীর অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে, বৈদ্যুতিক সেলের ইলেকট্রোড হিসাবে, থার্মকাপলে, মূল্যবান জড়োয়া গয়না তৈরীতে প্লাটিনামের যথেষ্ট চাহিদা। দুই একটি রাসায়নিক শিল্পে প্লাটিনাম প্রভাবকরূপে (catalyst) ব্যবহৃত হয়। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে। প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের সংকর ধাতু কলমের মাথায় বসান হয়।

পারদ (Hg)

পারদের ইংরাজী নাম মারকারি আর রাসায়নিক নাম Hydrargyrum। এইটিই একমাত্র ধাতু যা সাধারণ তাপমাত্রাতে তরলাকারে থাকে। পারদ জলের

চেয়ে সাড়ে তের গুণ ভারী। যে পাত্রে থাকে তাকে সিক্ত করে না। এর প্রসারাঙ্কও যথেষ্ট। এই সকল কারণে পারদ তাপ এবং চাপ পরিমাপনে থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটারে সর্বদা ব্যবহার করা হয়। পারদ-বাষ্পের আর্ক-ল্যাম্প আলোর জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত। সোনা, রূপা, টিন, দস্তা প্রভৃতি প্রায় সব ধাতুই পারদে দ্রবীভূত হয়ে পারদ সংকর তৈরী করে। প্লাটিনাম পারদে দ্রবিত হয় না। সোনা ও রূপার পারদ সংকর দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। কস্টিক সোডা প্রস্তুতির শিল্প পদ্ধতিতে পারদ-ইলেকট্রোড প্রয়োজন হয়।

পারদ-যৌগেরও কিছু ব্যবহার আছে। স্বর্ণ-সিন্দুর (HgS) ঔষধ হিসাবে কবিরাজেরা যথেষ্ট ব্যবহার করেন। ক্যালোমেল বা মারকিউরাস ক্লোরাইডও ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। টমেটো, আলু, গম ইত্যাদিকে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ক্ষেতে পারদের যৌগ প্রয়োগ করা হয়।

খ্রীষ্টজন্মের অন্তত দেড় হাজার বছর পূর্বেও চীন ও ভারতে পারদ ব্যবহৃত হয়েছে। পারদের একটিই মাত্র আকরিক, নাম সিনাবার (HgS)। স্পেনে রয়েছে এই আকরিকের প্রধান ভাণ্ডার। চীন, ইটালী ও রাশিয়াতেও সিনাবার রয়েছে। ভারতে এর কোন আকর নেই।

বিসমাথ (Bi)

এই ধাতুটির আকর বিসমুথায়ানাইট বলিভিয়াতে পাওয়া যায়। সীসা, রূপা প্রভৃতি ধাতু উৎপাদনের পরে যে গাদ থাকে সেখান থেকে প্রায়ই বিসমাথ উদ্ধার করা হয়। এভাবেই ভারতে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীনে ধাতুটি সংগ্রহ করা হয়। ভারতে কোন বিসমাথ আকরিক নেই।

বিসমাথ সামান্য লালচে আভাযুক্ত সাদা ধাতু, খুব ভারী (ঘনত্ব, ৯.৮) এবং গলনাঙ্ক ২৭১°C, সীসা, টিন প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে এর কয়েকটি সংকর-ধাতু তৈরী করা হয়, যেগুলি অল্প তাপমাত্রাতেই গলে যায়।

সংকর ধাতু	গলনাঙ্ক(°C)	উপাদান Bi : Pb : Sn : Cd
উড্মেটাল	৭১°C	৪ : ২ : ১ : ১
রোজ মেটাল	৯৩.৮°C	২ : ১ : ১ : ০

যে জায়গায় সহসা আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে শীতল জলের পাইপ রাখা হয়। সেই পাইপের মাঝে মাঝে ছিপি থাকে এবং সেগুলো এইরকম ধাতুসংকর দিয়ে জুড়ে দেওয়া থাকে। হঠাৎ আগুন লাগলে যেই

তাপমাত্রা বাড়ে, জোড়ার মুখ আপনা থেকেই গলে খুলে যায় এবং ঠাণ্ডা জলস্রোতে আগুন নিভে যায়। স্বয়ংক্রিয় অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র! বয়লারের ছিপিতেও এরকম উপযুক্ত সংকর-ধাতু ব্যবহৃত হয়। পারাসেলসাস সে যুগে বিসমাথের যৌগ ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন। বিসমাথ সাব-নাইট্রেট এখনও পেটের রোগে ব্যবহার হয়।

ক্যাডমিয়াম (Cd)

ক্যাডমিয়াম একটি বিরল অথচ প্রয়োজনীয় ধাতু। ভূপৃষ্ঠে এর পরিমাণ ভূত্বকের ০˙০০০০৫ শতাংশ মাত্র। কমলা-হলুদ রঙের খনিজ গ্রিনোকাইট (CdS) ক্যাডমিয়ামের একমাত্র আকরিক। তবে দস্তার খনিজের মধ্যে সর্বদাই কিছু ক্যাডমিয়াম মিশ্রিত থাকে। দস্তা-উৎপাদনের সময় ক্যাডমিয়ামও পৃথক করে সংগ্রহ করা হয়। আমাদের রাজস্থানে যে দস্তা তৈরী হয় তাতে প্রায় ০˙২৩ শতাংশ ক্যাডমিয়াম রয়েছে। সেখানে থেকেই বছরে আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যাডমিয়ামের অধিকাংশ পাওয়া যায়; বছরে গড়ে ৫০ ~ ৬০ টন এই ধাতু উদ্ধার করা হয়।

ক্যাডমিয়াম উজ্জ্বল সাদা ধাতু, গলনাঙ্ক ৩২০˙৯°C। ক্যাডমিয়াম একাধিক প্রয়োজনে লাগে: (১) লোহা, ইস্পাত, তামা ইত্যাদির তৈরী জিনিসের উপরে ক্যাডমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয় ক্ষয় রোধের জন্য এবং সৌন্দর্যের জন্য। তড়িৎ-লেপনে ক্যাডমিয়ামের একটি পাত্লা কিন্তু দৃঢ় আস্তর পড়ে। (২) বিদ্যুৎ-পরিবহনের তামার তারে ০˙৯% ক্যাডমিয়াম মেশান থাকে। ক্যাডমিয়ামের মিশ্রণে তড়িৎ-পরিবাহিতা সামান্য কমে, কিন্তু তার অনেক শক্ত হয়। (৩) ক্যাডমিয়্যম-নিকেল সংকর ধাতু শক্তিশালী ইঞ্জিন তৈরীতে প্রয়োজন হয়। (৪) বিখণ্ডনকে সংযত করার জন্য পারমাণবিক চুল্লীতে ক্যাডমিয়াম দণ্ড ব্যবহার হয়। (৫) কোন কোন সেলে এবং ব্যাটারী-প্লেটে ক্যাডমিয়ামের ইলেকট্রোড থাকে।

জারকোনিয়াম (Zr)

জারকোনিয়াম ধাতুটির আকরিক হল ব্যাডিলাইট (ZrO_2) এবং জারকন ($ZrSiO_4$)। সিংহল ও ব্রেজিলে ব্যাডিলাইট পাওয়া যায় আর সিংহল, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েসিয়া, উরালে রয়েছে জারকন। ভূত্বকে জারকোনিয়াম বেশী

নেই, আনুমানিক ০·০২২ শতাংশ। আমাদের কেরালার সাগরবেলাতে যে কালো ইলমেনাইট বালু রয়েছে তাতে প্রায় ৫ শতাংশ জারকন আছে। এক সময়ে এই জারকন ইলমেনাইট থেকে আলাদা করে বিদেশে চালান যেত। বিদেশে জরেকন থেকে জারকন-ডাইঅক্সাইড (ZrO_2) তৈরী হয়। এই অক্সাইড খুব উঁচু উষ্ণতায়ও গলে না। সেইজন্য ধাতু গলাবার জন্য মুচি তৈরী করতে জারকন-ডাই অক্সাইড ব্যবহার হত। জারকনের পালিশ-করা একটু বড় টুকরো মানিক বলে গণ্য হয়। জারকোনিয়াম অক্সাইডের প্রথম সন্ধান পান ক্ল্যাপরথ (১৭৮৯)। এরও পরে বার্জেলিয়াস ১৮০৮ সালে খানিকটা অবিশুদ্ধ ধাতু তৈরী করতে পেরেছিলেন। জারকোনিয়ামের সঙ্গে সর্বদাই এর সমধর্মী এবং সমগোত্রীয় হ্যাফনিয়াম মিশ্রিত থাকে এবং এদের পৃথক করা খুব কষ্টসাধ্য। বাজারে যে জারকোনিয়াম পাওয়া যায় সেটা সর্বদাই হ্যাফনিয়াম মিশ্রিত।

জারকোনিয়াম সাদা ধূসর রঙের ধাতু; গলনাঙ্ক উঁচু, প্রায় ১৮০০°C। এই ধাতুটি অ্যাসিড বা ক্ষারে ক্ষয় হয় না। বিশুদ্ধ জারকোনিয়ামের ভিতর দিয়ে নিউট্রন অনায়াসে চলাচল করতে পারে। বাজারের সাধারণ জারকোনিয়ামের ভিতর দিয়ে নিউট্রন যেতে পারে না, হ্যাফনিয়াম থাকার জন্য। ঐ সকল গুণের জন্য জারকোনিয়াম আজকাল পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহার হচ্ছে। এই চুল্লীর ইউরেনিয়াম দণ্ডগুলি ধাতব খাপের মধ্যে ভরে দিতে হয়। কিছুদিন পরে যখন ইউরেনিয়াম দণ্ড পরিবর্তন করতে হয় তখন দণ্ডগুলিকে অ্যাসিডে গুলে সরিয়ে ফেলে খাপের মধ্যে নতুন ইউরেনিয়াম নিতে হয়। খাপটি এমন হতে হবে যাতে নিউট্রন সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া খোলটি তাপসহ হতে হবে এবং অ্যাসিডে বা রাসায়নিক দ্রাবকে অক্ষত থাকতে হবে। হ্যাফনিয়াম মুক্ত জারকোনিয়ামের ঐ সকল গুণ আছে তাই ইউরেনিয়াম দণ্ডগুলির খোল বিশুদ্ধ জারকোনিয়ামের পাত দিয়ে তৈরী করা হয়।

ফটো-ফ্লাস বালবে, রেডিয়ো-ভালভ টিউবেও জারকোনিয়াম প্রয়োজন হয়।

সেলেনিয়াম (Se) ও টেলুরিয়াম (Te) :

এই দুইটি মৌল খুবই বিরল, পৃথিবীতে এদের পরিমাণ ভূত্বকের ০·০০০০০০১ শতাংশেরও কম। টেলুরিয়াম ও সেলেনিয়ামের আচার আচরণে মিল যথেষ্ট এবং প্রকৃতিতে অনেক সময়েই তাদের একত্র পাওয়া যায়। রুমানিয়ার মুলার ফন রাইখেনস্টিন ১৭৮২ সালে শিলা থেকে টেলুরিয়াম আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর শিলা থেকে পাওয়া সেজন্য ক্ল্যাপরথ এর নাম দেন টেলুরিয়াম, গ্রীক

শব্দ- টেলাস্ অর্থ পৃথিবী। এরপর সমধর্মী এবং সমগোত্রীয় সেলেনিয়াম ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের বার্জেলিয়াস। টেলুরিয়ামের সঙ্গী বলে এর নাম দেন সেলেনিয়াম, গ্রীক শব্দ 'সেলেন' অর্থ চাঁদ। কেন না চাঁদও পৃথিবীর সঙ্গেই থাকে। মৌলাবস্থায় এই দুইটি ধাতুকে পাওয়া যায়। তাছাড়া, এদের কিছু কিছু যৌগ-আকরিক ও রয়েছে। যেমন, টেলুরিয়ামের আকর সিলভ্যানাইট (Ag, Au) Te_2, টেট্রাডিমাইট (Bi_2Te_3)। সেলেনিয়ামের প্রধান আকরিক হল জরগাইট (Cu_2Se), ক্রুকসাইট $(Cu, Tl, Ag)_2Se$ ইত্যাদি। সীসা, তামা ও রূপা এই ধাতুগুলিকে আকর থেকে উৎপাদন করে আবার তড়িৎ-পদ্ধতিতে শোধন করা হয়। শোধনের সময় বিশুদ্ধ ধাতু ক্যাথোডে জমা হয় এবং অ্যানোডে আবর্জনার গাদ জমে। এই গাদ থেকে সেলেনিয়াম এবং টেলুরিয়াম সর্বদা উদ্ধার করা হয়।

টেলুরিয়ামের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন প্রয়োগ নেই। কিন্তু সেলেনিয়ামের একটি বিশেষ গুণ আছে যার জন্য তার যথেষ্ট কদর। সেলেনিয়ামের তড়িৎ-বাহিতা প্রায় নেই। কিন্তু আলোর রশ্মি সেলেনিয়ামের উপরে পড়লে তার যথেষ্ট তড়িৎ-পরিবাহিতা দেখা দেয়। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে এই তড়িৎ-পরিবাহিতার মাত্রা বিভিন্ন হয়। এই গুণের জন্য আলোক-বিদ্যুৎ (photo electric) সেলে সেলেনিয়াম সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সেলেনিয়াম সেমি-কণ্ডাক্টার তাই টেলিভিশন ক্যামেরাতে এবং সৌর ব্যাটারীতে ব্যবহৃত হয়। সেলেনিয়াম ও টেলুরিয়ামের কিছু যৌগ রঙীন কাচ ও পর্সেলীনের জন্য প্রয়োজন হয়।

* * *

যে সকল ধাতু এবং ধাতুসংকর বিভিন্ন শিল্পে, যানবাহনে, প্রতিরক্ষায় এবং আমাদের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে তাদের কথাই এ পর্যন্ত বলা হল। আবার দেখা গেল কয়েকটি ধাতু যেমন, অ্যান্টিমনি, ক্যাড্মিয়াম, বেরিলিয়াম, প্রভৃতি, অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও বিশেষ বিশেষ কাজে প্রয়োজন হয়। আরও কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলো পৃথিবীতে অনেকটাই আছে কিন্তু ধাতু বা ধাতবসংকর হিসাবে তাদের বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। পক্ষান্তরে তাদের যৌগগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। উদাহরণ হিসাবে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোন কোন পারমাণবিক চুল্লীতে গলিত সোডিয়াম ধাতু তাপবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর যৌগগুলি প্রচুর প্রয়োজন ; যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য লবণ হিসাবে), সোডিয়াম কার্বনেট (সোডা এবং কাঁচ শিল্পে), সোডিয়াম সালফেট (ঔষধ হিসাবে), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (সাবান শিল্পে),

সোডিয়াম বোরেট (সোহাগা) ইত্যাদি। পটাসিয়াম লবণ জমির সার হিসাবে খুবই প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ধাতুর ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই কিন্তু এর অনেক যৌগের বিস্তর চাহিদা। যেমন, চুন, মার্বেলপাথর, চক, ব্লীচিং পাউডার, প্লাস্টার অফ্ প্যারিস ইত্যাদি।

এগুলো ছাড়া আরও অনেকগুলো ধাতু রয়েছে যেগুলো পৃথিবীতে অতি সামান্যই পাওয়া যায় এবং তাদের ব্যবহারিক কোন প্রয়োগ নেই যেমন, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম, স্ক্যাণ্ডিয়াম, ইটারবিয়াম, নাইয়োবিয়াম, হ্যাফনিয়াম, ট্যাণ্টালাম, গ্যালিয়াম, ইণ্ডিয়াম, থেলিয়াম, জারমেনিয়াম, ১৪টি বিরলমৃত্তিক ল্যান্থ্যানাইড গোষ্ঠির সমধর্মী ধাতু, সিরিয়াম, প্রেসিওডিমিয়াম ইত্যাদি। এদের আলোচনা ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ। তাই এদের বিষয়ে এখানে আর বিশেষ করে বলা হল না।

৭

তেজস্ক্রিয় ধাতু

পরমাণুর গঠন-শৈলীর বিষয় আজকাল সবাই জানে। যে কোন মৌলের পরমাণুই তিনরকম আদি কণা—প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন—দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুতে এই আদি কণাগুলোর সংখ্যা অবশ্যই বিভিন্ন।

পরমাণুর সবগুলি প্রোটন এবং নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে আর ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন ব্যাসের চক্রাকার পথে কেন্দ্রের চারদিকে সর্বদা অতি দ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রে কোন ইলেকট্রন থাকে না।

প্রোটন-কণা পরাধর্মী, এতে এক একক পজিটিভ বিদ্যুৎ রয়েছে। ইলেকট্রন-কণা অপরাধর্মী, এতে এক একক নেগেটিভ বিদ্যুৎ থাকে। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ, তার কোন বিদ্যুৎ-আধান নেই। প্রত্যেক পরমাণুর প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। সুতরাং পরমাণুর নীট কোন বিদ্যুৎ-মাত্রা নেই।

প্রোটন-কণা এবং নিউট্রন-কণার ওজন প্রায় সমান। সেই তুলনায় একটি ইলেকট্রনের ওজন এত কম যে ধর্তব্যই নয়। যেহেতু ইলেকট্রনের ওজন নগণ্য, অতএব একটি পরমাণুর ভর তার কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রন কণাগুলোর ভরের সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন আছে। অতএব হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর মোটামুটি একটি প্রোটন অথবা একটি নিউট্রনের ভরের সমান।

অতি ক্ষুদ্র বলে পরমাণুর ভর গ্রামে দেওয়া হয় না। পরমাণুর ভর প্রকাশ করার জন্য একটি নূতন একক ব্যবহৃত হয়। একটি কার্বন (^{12}C) পরমাণুর ১/১২-অংশ (এক দ্বাদশাংশ) হচ্ছে এই একক। এই-ই পারমাণবিক ভরের একক, atomic mass unit বা amu।

∴ পারমাণবিক ভরের একক ≡ একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রনের ভর।

একটি কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন এবং ৬টি নিউট্রন আছে। এদের সমবেত ভর ১২টি প্রোটন বা ১২টি নিউট্রনের ভরের সমান।

সুতরাং কোন পরমাণুর কেন্দ্রে যতগুলি মোট প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, সেই পরমাণুর ভর তত একক। যেমন, একটি সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে ১১টি প্রোটন এবং ১২টি নিউট্রন আছে। সুতরাং উহার ভর, ২৩।

গ্রামের হিসাবে,

১ amu = $\frac{1}{12}$ কার্বন পরমাণুর ভর ≡ ১·৬৬ × ১০$^{-২৪}$ গ্রাম।

যে সব মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রে অনেক বেশী সংখ্যক নিউট্রন আর প্রোটন থাকে সে সব পরমাণু অস্থায়ী হয় এবং আপনা থেকেই ভেঙে ভেঙে যায়। দেখা গেছে, কোন মৌলের পরমাণু যদি সীসার পরমাণুর চেয়েও গুরুভার হয়, তবে তার কেন্দ্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। এইসব স্বতঃ-ভঙ্গুর পরমাণুর কেন্দ্র থেকে অবিরত অদৃশ্য আল্‌ফা কণার রশ্মি (α-rays) অথবা বীটা-কণার রশ্মি (β-rays) বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কোন মৌলের পরমাণু থেকে α-কণা আর কোন মৌলের পরমাণু থেকে β-কণা বেরিয়ে আসবে সেটা নির্দিষ্ট। যেমন, রেডিয়াম থেকে সর্বদাই α-কণা আর অ্যাক্টিনিয়াম ধাতু থেকে সর্বদাই β-কণা উৎসারিত হয়। এই রশ্মি-বিকিরণ সর্বাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে থাকে এবং কোন ভাবেই এটা বন্ধ করা যায় না। পরমাণু-কেন্দ্র থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি-বিকিরণই "তেজস্ক্রিয়তা", আর যে সমস্ত মৌল থেকে এই বিকিরণ ঘটে তাদের বলা হয় "স্বভাব তেজস্ক্রিয়" মৌল। (বর্তমানে কৃত্রিম উপায়েও স্থায়ী মৌলকে তেজস্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।)

এই রশ্মির কণাগুলোর বিদ্যুৎ-আধান রয়েছে। প্রতিটি α-কণাতে দুইটি নিউট্রন ও দুইটি প্রোটন আছে। প্রোটন থাকার জন্য এর বিদ্যুৎ-ভার পরাধর্মী বা পজিটিভ। β-কণাগুলো বস্তুতঃ ইলেকট্রন কণা সুতরাং তার বিদ্যুৎভার অপরাধর্মী বা নেগেটিভ। এই কণা-রশ্মির সঙ্গে কিছু শক্তিশালী তরঙ্গ-রশ্মিও উৎসারিত হয়—তাদের বলা হয় গামা-রশ্মি (γ-rays)। এদের অবশ্য কোন তড়িতাধান নেই।

কোন মৌলের পরমাণু কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যাকে বলা হয় সেই মৌলের ক্রমাঙ্ক। যেমন, কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন আছে, তাই কার্বনের ক্রমাঙ্ক ৬। সীসার পরমাণু-কেন্দ্রে ৮২-টি প্রোটন রয়েছে বলে তার ক্রমাঙ্ক ৮২। প্রত্যেকটি মৌলের ক্রমাঙ্ক নির্দিষ্ট। ক্রমাঙ্কই মৌলের ধ্রুব পরিচয়। বিভিন্ন উৎস থেকে এলেও দুইটি পরমাণুর ক্রমাঙ্ক যদি একই হয় তবে তারা একই মৌলের হবে।

পরমাণু-চিহ্নের মাথায় পারমাণবিক ভর লেখা হয় আর চিহ্নের নীচে তার ক্রমাঙ্ক লেখা হয়; যথা,

$$^{12}_{6}C,\quad ^{23}_{11}Na,\quad ^{208}_{82}Pb,\quad ^{238}_{92}U$$

একটি মৌলের, স্থায়ী বা তেজস্ক্রিয়, সবগুলো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা

অর্থাৎ একই হতে হবে। অর্থাৎ, দুইটি পরমাণুর ক্রমাঙ্ক এক হলে তাদের একই মৌলের পরমাণু বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কোন মৌলের সবগুলো পরমাণুর ভর এক না-ও হতে পারে। বস্তুতঃ প্রায় প্রত্যেক মৌলেরই নানা ওজনের পরমাণু রয়েছে। একই মৌলের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুগুলোকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। যেমন,

$$^{12}_{6}C,\quad ^{14}_{6}C;\quad ^{208}_{82}Pb,\quad ^{206}_{82}Pb;\quad ^{238}_{92}U,\quad ^{235}_{92}U;$$ ইত্যাদি।

আইসোটোপগুলির ভর বা ওজন আলাদা কিন্তু স্বভাবে ও রাসায়নিক ধর্মে তারা সম্পূর্ণ অভিন্ন।

যখন কোন মৌলের পরমাণু কেন্দ্র থেকে একটি α-কণা বা β-কণা বেরিয়ে যায় তখন কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যা তথা ক্রমাঙ্ক বদ্‌লে যায়। এইজন্য সেই পরমাণুটির আর সেই মৌলত্ব থাকে না ; নতুন একটি মৌলের পরমাণুতে পরিণত হয়। হঠাৎ এক মৌল থেকে অপর একটি মৌল জন্ম নেয়। এই নূতন পরমাণুটির কেন্দ্রও যদি গুরুভার হয় তবে এটিও ভেঙে গিয়ে আর একটি নতুন মৌলের সৃষ্টি করবে। এমনি পরপর ভাঙন চলতে থাকবে যতক্ষণ না কেন্দ্রটি স্থায়িত্ব লাভ করে। রশ্মিকণা বেরিয়ে যেতে যেতে একসময়ে কেন্দ্রটি সীসার পরমাণুর সমপর্যায়ে আসে। অর্থাৎ প্রোটন-সংখ্যা সীসার সমান (৮২) হয়। তখন পরমাণুটি স্থায়িত্ব লাভ করে, পরমাণুর ভাঙন বন্ধ হয়। সীসা তো তেজস্ক্রিয় মৌল নয়।

একটি α-কণা বেরিয়ে গেলে কেন্দ্রের দুইটি প্রোটন কমে যায়, অতএব ক্রমাঙ্ক দুই হ্রাস পায়। ভর চার একক হ্রাস পায়। আবার একটি β-কণা উৎসারিত হয়ে গেলে, একটি নেগেটিভ আধান কমে তথা একটি পজিটিভ আধান কেন্দ্রে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং β-কণার উৎসারণে ক্রমাঙ্ক 'এক' বৃদ্ধি পায়। ওজনের কোন তারতম্য হয় না, কারণ β-কণার ভর নগণ্য। পরপর যদি একটি α-কণা ও দুইটি β-কণা বেরিয়ে যায় তবে ক্রমাঙ্ক পুনরায় আগের সমান হবে ; কিন্তু ওজন হ্রাস পাবে। সুতরাং আইসোটোপের সৃষ্টি হবে।

পরপর তেজস্ক্রিয় মৌল সৃষ্টির একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। কখন α-কণা আর কখন β-কণা বিচ্ছুরিত হয় সেটা উপরের তীর চিহ্নে নির্দেশ করা হয়েছে।

$$^{238}_{92}U_I \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}Ux_1 \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{91}Ux_2 \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{92}U_{II} \xrightarrow{\alpha} {}^{230}_{90}Io \xrightarrow{\alpha} {}^{226}_{88}Ra$$

$$\xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}Rn \xrightarrow{\alpha} {}^{218}_{84}RaA \xrightarrow{\alpha} {}^{214}_{82}RaB \xrightarrow{\beta} {}^{214}_{83}RaC \xrightarrow{\beta} {}^{214}_{84}RaC$$

$$\xrightarrow{\alpha} {}^{210}_{82}RaD \xrightarrow{\beta} {}^{210}_{83}RaE \xrightarrow{\beta} {}^{210}_{84}RaF \xrightarrow{\alpha} {}^{206}_{82}RaG$$ (সীসা)।

ইউরেনিয়াম (U_I) প্রকৃতিলব্ধ তেজস্ক্রিয় মৌল-এর পরমাণু কেন্দ্রে আছে ৯২টি প্রোটন আর ১৪৬টি নিউট্রন। এর কেন্দ্র থেকে একটি α-কণা বেরিয়ে গেলে মৌল তৈরী U_{XI} হয় এবং এটা থেকেও একটি β-কণা উৎসারিত হয়; U_{XII}-এর সৃষ্টি হয়। U_{XII} থেকেও একটি β-কণা চলে যায় এবং U_{II} মৌল উৎপন্ন হয়। U_{II}-মৌল থেকে α-কণা উৎসারণে আয়োনিয়াম (Io) মৌল হয়। এগুলো সবই তেজস্ক্রিয়। Io একটি α-কণা হারিয়ে রেডিয়ামে (Ra) পরিণত হয়। রেডিয়াম উৎপত্তির এই ইতিহাস। রেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত α-কণা বিকিরণের ফলে র‍্যাডন গ্যাস (Rn) হয়। এমনি করে একের পর এক নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলের সৃষ্টি ও লয় হতে হতে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী সীসাতে পরিণত হয়। তখন তেজস্ক্রিয়তা লোপ পায়।

অর্থাৎ অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষে ইউরেনিয়াম সীসাতে পরিণতি লাভ করে। একে বলা হয় ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় শ্রেণী। স্পষ্টতঃই U_I এবং U_{II}-এর ক্রমাঙ্ক একই (৯২), সুতরাং এরা আইসোটোপ। আবার RaB, RaD এবং RaG-এরা আইসোটোপ এবং সীসার সমধর্মী। এরকম থোরিয়াম ও অ্যাকটিনিয়াম থেকে উদ্ভূত আরও স্বভাব-তেজস্ক্রিয় মৌলের শ্রেণী রয়েছে।

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি অনেক তেজস্ক্রিয় ধাতু পৃথিবীতে রয়েছে। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামকেই প্রধানতঃ পৃথিবীর আদি তেজস্ক্রিয় মৌলরূপে গণ্য করা হয়। এদের ভাঙনের ফলেই প্রকৃতিতে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌলের উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে এদের পরিমাণ সামান্য হলেও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য এদের গুরুত্ব এখন খুবই বেশী। এই প্রধান দুইটি তেজস্ক্রিয় ধাতুর কথাই এখানে বলা হয়েছে।

ইউরেনিয়াম (U) :

১৭৮৯ সালে ক্ল্যাপরথ অস্ট্রিয়া থেকে পাওয়া একটি ভারী কালো খনিজ পিচব্লেন্ড বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি অজ্ঞাত নতুন ধাতুর অক্সাইডের সন্ধান

পান। তিনি অবশ্য মূল ধাতুটিকে তৈরী করতে পারেন নি। এর আট বছর আগে (১৭৮১) একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছিল, ইউরেনাস। সেটা অনুসরণ করে ক্ল্যাপরথ এই নতুন ধাতুটির নামকরণ করেন ইউরেনিয়াম। মূল ধাতুটি আবিষ্কার করার কৃতিত্ব ফরাসী রসায়নবিৎ পেলিগোর (১৮৪১)। প্রথমে ইউরেনিয়াম ক্লোরাইড তৈরী করে, তারপর সেটিকে সোডিয়ামের সাহায্যে বিজারিত করে তিনি ধাতুটি উৎপাদন করেন।

ইউরেনিয়ামের প্রধান আকরিক হল, পিচ্‌ব্লেণ্ড (U_3O_8) এবং কার্নোটাইট (ইউরেনিয়াম ভ্যানেডেট)। যদিও আরও বহু খনিজ পাথরে অল্পাধিক ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পারমাণবিক যুগে এখন এক-সহস্রাংশেরও কম পরিমাণ ইউরেনিয়াম যদি কোনও খনিজে থাকে তবে সেটাও মূল্যবান উৎস বলে ধরা হয়। পিচব্লেণ্ড প্রধানতঃ পাওয়া যায় কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ককেসাস, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে। কার্নোটাইট প্রধানতঃ রয়েছে আমেরিকার কলোরাডোতে। ভারতে সামারস্কাইট খনিজে সামান্য রয়েছে আর কেরালার মোনাজাইট বালুতে রয়েছে ০˙৫% ইউরেনিয়াম অক্সাইড। বিহারের সিংভূম জেলায় যেখানে তাম্রখনি রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গায় কিন্তু ইউরেনিয়ামের খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য পরিমাণ বেশী নয় ; ০˙৬%। রাজস্থানেও পেগমাটাইট পাথরে কিছু ইউরেনিয়াম রয়েছে। সবদেশেই এখন ইউরেনিয়াম থোরিয়ামের সমস্ত খনিজ সরকারী নিয়ন্ত্রণে। একটা আনুমানিক হিসাবে দেখা গেছে এখন পৃথিবীতে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন ইউরেনিয়াম খনিজ আছে। কোন দেশে কতটা ইউরেনিরাম তৈরী হচ্ছে সেটা জানা সম্ভব নয়। ১৯৬৮তে দেখা গেছে আমেরিকা ও অন্যান্য অকমিউনিস্ট দেশগুলোতে ২২ হাজার টন ইউরেনিয়াম অক্সাইড সংগৃহীত হয়েছিল। এর সমপরিমাণ সংগ্রহ কমিউনিস্ট দেশগুলোতেও হয়েছিল ধরে নেওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে ইউরেনিয়ামের এক বিরাট ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়াই সর্বাধিক পরিমাণ ইউরেনিয়ামের যোগান দেবে মনে হয়।

ইউরেনিয়াম অক্সাইডের উৎপাদন (১৯৬৮)

আঃ যুক্তরাষ্ট্র	আফ্রিকা	কানাডা	ফ্রান্স	গ্যাবন
১২৩৪০	৩৮৭০	৩৭০০	১৪৫০	৫৩০(টন)

ইউরেনিয়াম একটি চকচকে সাদা ভারী ধাতু (ঘনত্ব ১৮˙৭)। এর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্ম হল এর স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা। তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই ত হয়েছিল ইউরেনিয়ামের মাধ্যমে। ১৮৯৬

সালে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকরেল দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়ামযুক্ত কোন পদার্থ কাছে থাকলে সেটা থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে এসে কাগজের মোড়ক বা বাক্স ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফির প্লেটে কালো দাগ ফেলে। যে কোন অবস্থায় যে কোন ইউরেনিয়াম যৌগ থেকে একই হারে বিকিরণ হতে থাকে। বেকরেল এই অভূতপূর্ব ঘটনার নাম দেন রেডিয়ো-অ্যাকিটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। কিছু পরেই দেখা গেল যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম যৌগ থেকে যে রশ্মি বিকীর্ণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী জোরালো রশ্মি নির্গত হয় পিচব্লেণ্ড আকরিক থেকে যেখানে ইউরেনিয়ামের শতকরা ভাগ অনেক কম। নিঃসন্দেহে পিচব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াম ছাড়াও আরও শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে। ম্যাডাম কুরী এবং পিয়েরে কুরী পিচব্লেণ্ড তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে রেডিয়াম এবং পলোনিয়াম এই দুইটি অতি তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে যে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল তার তুলনা নেই। এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে ওঁরা মাত্র কয়েক গ্রেন রেডিয়াম বের করে-ছিলেন। এই সব গবেষণার জন্য কুরী দম্পতি এবং বেকরেল নোবেল পুরস্কার পান।

ইউরেনিয়ামের পরমাণু থেকে তিনটি α-কণা এবং দুইটি β-কণা বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে সেটি রেডিয়ামের পরমাণুতে পরিণত হয়। রেডিয়াম এবং তার থেকে যে রশ্মি বের হয়—সেগুলো ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। এই জন্য রেডিয়ামের প্রধান চাহিদা। বস্তুতঃ ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই রেডিয়ামের জন্যই প্রধানতঃ ইউরেনিয়াম তথা ইউরেনিয়াম-আকরিকের প্রয়োজন ছিল। ইউরেনিয়ামের অন্যান্য ব্যবহার তখন গৌণ ছিল।

ইউরেনিয়ামে সর্বদা তিনটি আইসোটোপ একত্র থাকে। এদের পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন ; ^{238}U = ৯৯·২৭৪% ; ^{235}U = ০·৭২% এবং ^{234}U = ০·০০৬%। শেষেরটি নগণ্য, আর ^{235}U সামান্য পরিমাণে আছে বটে তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম স্বাভাবিকভাবে যখন ভাঙ্গে তখন তার ওজন সামান্য হ্রাস পায়। একটি α-কণা বেরিয়ে যায় তাই চার একক ভর কমে যায়। পক্ষান্তরে যদি একটি নিউট্রন কণা দিয়ে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে জোরে আঘাত করা যায় তবে সেটা প্রায় মাঝামাঝি ভেঙে গিয়ে দুইটি বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে অটো হ্যান এবং ফ্রিজ স্ট্রাসম্যান এটি প্রথম করতে পেরেছিলেন। একে বলা হয় atomic fission বা পারমাণবিক বিখণ্ডন। উৎপন্ন পরমাণু দুইটির সঙ্গে দুই-তিনটি নিউট্রন কণাও তৈরী হয় এবং প্রচুর

তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। বিখণ্ডনের সময় অতি সামান্য একটু পদার্থ লোপ পায়। যে পদার্থটুকু লোপ পায় তার বিনিময়েই আইনস্টাইন সূত্র অনুসারে ($\epsilon = mc^2$) বিপুল তাপশক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, U-238 এরকম নিউট্রনের আঘাতে ভেঙে দু'টুকরো হয় না। একে ভাঙতে হলে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন প্রয়োজন। ইউরেনিয়ামে যে U-235 স্বল্প পরিমাণে রয়েছে, সেইটেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। বিখণ্ডনের ফলে নানা রকমের পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে, একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + {}^{1}_{0}n + {}^{1}_{0}n + Q \text{ (তাপশক্তি)}$$

নিউট্রন বেরিয়াম ক্রিপ্টন

বিখণ্ডনে যে দুইটি নিউট্রন-কণা তৈরী হল সেগুলো আবার প্রতিবেশী দুইটি U-235কে আক্রমণে করে ভেঙে দেয় এবং সেখান থেকে চারটি নিউট্রন কণা তৈরী হবে। সেগুলো আবার আরও চারগুণ U-235কে ভাঙবে। এরকম উত্তরোত্তর বেশী বেশী ভাঙন ও নিউট্রন-উৎক্ষেপ চলতে থাকবে। অর্থাৎ এক দ্রুত শৃংখল-বিক্রিয়ার (chain reaction) ফলে মুহূর্তে কোটি কোটি পরমাণু ভেঙে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ তাপের উদ্ভব হয়। এরকম পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য কিন্তু যথাসম্ভব বিশুদ্ধ U-235 চাই। অ্যাটম-বোমাতে তাই ব্যবহৃত হয়। ইউরেনিয়াম থেকে সেইজন্য বিশুদ্ধ U-235-কে পৃথক করে নিতে হয়। এক কিলোগ্রাম U-235-এর বিস্ফোরণ ০'০০০০০১ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে।

উৎপন্ন নিউট্রন-কণা যদি U-238-কে আঘাত করে তাহলে সেটা ভাঙে না ; শৃংখল-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। U-238 নিউট্রনকে শুষে নিয়ে প্রথমে নেপচুনিয়াম এবং তা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়ামে পরিণত হয়।

$$^{238}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{239}_{93}Np + \beta; \quad {}^{239}_{93}Np \rightarrow {}^{239}_{94}Pu + \beta$$

নেপচুনিয়াম প্লুটোনিয়াম

TNT এক অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক। ২০০০০ টন TNT এর সমতুল্য বিস্ফোরণ হয় এক কিলোগ্রাম ^{235}U-এর পারমাণবিক বিস্ফোরণে।

^{238}U থেকে যে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয় সেটাও ^{235}U-এর মতই অনুরূপ শৃঙ্খল-ক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। প্রথম যে অ্যাটম-বোমা হিরোসিমাতে ফেলা হয়েছিল (little boy, 6.8.45) সেটা ছিল ^{235}U দিয়ে তৈরী। আর নাগাসাকিকে ধ্বংস করা হয়েছে প্লুটোনিয়াম বোমা দিয়ে (Fat man, 9.8.45)।

আর একটা দিকও আছে। বিজ্ঞানীরা শৃঙ্খল-বিক্রিয়াটিকে সংযত করে বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে তার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। বিখণ্ডনের প্রতিস্তরেই প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে (atomic reactor) বিখণ্ডনকে ইচ্ছামত সংযত ও সীমিত করে উৎপন্ন শক্তিকে আজকাল অনেক দেশেই সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই শক্তি দিয়ে জাহাজ, সাবমেরিন, টারবাইন, কলকারখানা চালানো হচ্ছে। যখন সাধারণ জ্বালানি কয়লা, পেট্রোলিয়াম শেষ হয়ে যাবে, তখন এইটিই হবে শক্তির প্রধান উৎস।

ইউরেনিয়াম আজ মানব সমাজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে (১৯৮৩) ৫০০০০ হাজারেরও বেশী অ্যাটম বোমা মজুদ হয়েছে। ভবিষ্যতের কোন মহাযুদ্ধে এই চরম সমরোপকরণটি প্রয়োগ করলে সমস্ত জীবজগতের ধ্বংস অনিবার্য। অন্যদিকে যদি পারমাণবিক শক্তিকে কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাহলে সভ্যতার অগ্রগতি হবে। ইউরেনিয়াম কিভাবে ব্যবহৃত হবে—পৃথিবীর কল্যাণে না ধ্বংসে—সেটা মানুষের বিবেচনা আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে।

একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, আজকের জগতের যত অনর্থের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। তখন অবশ্য এই লেখার কালিকলম, কাগজ, ছাপাখানা থেকে উড়োজাহাজ পর্যন্ত যা কিছু বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সেটা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অবদান ত আমাদের ভাল-মন্দের বিচার করে নয়। প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদের সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাকে অধিগত করাই বিজ্ঞানের ধর্ম। বিজ্ঞানদেবীর এক হাতে রয়েছে অ্যাটম-বোমা আর মেসিন-গান আর অপর হাতে আছে পেনিসিলিন আর নাইলন। মানুষ এর কোনটি গ্রহণ করবে, কল্যাণ কি অকল্যাণ, সেটা তার বিবেচনাসাপেক্ষ। তার বুদ্ধির উপরেই মানবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

থোরিয়াম (Th)

ইউরেনিয়ামের মত থোরিয়াম ধাতুটিও তেজস্ক্রিয় এবং পারমাণবিক শক্তির উৎপাদনে প্রয়োজন। নরওয়েতে পাওয়া একটি কালো খনিজ থেকে থোরিয়ামকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস (১৮২৯), যার আরও চারটি মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব রয়েছে; সেলেনিয়াম, জারকোনিয়াম, সিলিকন আর সিরিয়াম। সুইডেনের পৌরাণিক দেবতা ওডিনের পুত্র থর ছিল প্রচণ্ড শক্তিধর। সেই থরের নামানুসারে বার্জেলিয়াস এই নব আবিষ্কৃত ধাতুর নাম দেন থোরিয়াম এবং ঐ খনিজের নাম হয় থোরাইট।

ইউরেনিয়ামের তুলনায় থোরিয়াম পৃথিবীতে অনেক বেশী আছে। কিন্তু সেটা প্রাচীন শিলার মধ্যে আকীর্ণ। লক্ষ লক্ষ বছরের জল বায়ুতে প্রাকৃতিক শিলাক্ষয়ে সেই সব খনিজ বিচূর্ণ হয়ে এসে সমুদ্র-সৈকতে স্থান পেয়েছে। এর প্রধান আকরিক মোনাজাইট—থোরিয়াম ফসফেট। আর একটি অপেক্ষাকৃত বিরল আকরিক থোরাইট। মোনাজাইটের সব চেয়ে বড় এবং প্রধান ও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে আমাদের কেরালার সাগর উপকূলের কালো বালিতে। এই বালুতে ইলমেনাইট ও জারকন ছাড়াও অন্ততঃ শতকরা ১ ভাগ মোনাজাইট রয়েছে। এ ছাড়া ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মোনাজাইট পাওয়া যায়। আগে আমাদের মনাজোইটকে বালু থেকে পৃথক করে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হত। ১৯৫১ সাল থেকে সরকারী নির্দেশে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে মোনাজাইট থেকে থোরিয়া (থোরিয়াম অক্সাইড) উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই উৎস থেকে বিরল-মৃত্তিক ধাতু সিরিয়াম, ল্যান্থানাম প্রভৃতিও কিছু সংগ্রহ করা হচ্ছে।

গ্যাসবাতির ম্যাণ্টেলে থোরিয়ার ব্যবহারের জন্য প্রধানতঃ মোনাজোইটের কদর ছিল। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদনের কাজে থোরিয়ামের চাহিদা বেশী।

সীমিত শক্তির নিউট্রন তেজষ্ক্রিয় স্বাভাবিক থোরিয়ামকে (^{232}Th) আঘাত করলে, থোরিয়াম সেটি গ্রাস করে (^{233}Th) আইসোটোপে পরিণত হয়। সেটিও তেজষ্ক্রিয় এবং ধীরে ধীরে পর পর দুই ক্ষেপে দুইটি β-কণা উৎসারিত করে ^{233}U-এর আইসোটোপ সৃষ্টি করে।

$$^{232}_{90}\text{Th} + {}^{1}_{0}\text{n} \rightarrow {}^{233}_{90}\text{Th} \xrightarrow{\beta} {}^{233}_{91}\text{Pa} \xrightarrow{\beta} {}^{233}_{92}\text{U}$$

^{235}U কিংবা ^{239}Pu প্লুটোনিয়ামের মত নিউট্রনের আঘাতে $^{233}_{92}$U পরমাণুর বিখণ্ডন হয় এবং যথারীতি শৃঙ্খল বিক্রিয়াও হয়। সুতরাং পারমাণবিক চুল্লীতে ^{233}U ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায়। এই কারণেই থোরিয়াম বিশেষ মূল্যবান।

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি থেকে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে α অথবা β-কণা উৎসারিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অ-তেজস্ক্রিয় মৌল সীসা বা বিসমাথ পাওয়া যায়। এর ফলে মৌলদের ক্রমাঙ্ক অবশ্যই হ্রাস পায়।

পৃথিবীতে পাওয়া মৌলদের মধ্যে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রই সর্বাধিক গুরুভার। এর ক্রমাঙ্ক, ৯২। এই কেন্দ্রকে নিউট্রন দিয়ে আক্রমণ করিয়ে উচ্চতর ক্রমাঙ্কের মৌল নেপচুনিয়াম ধাতু (ক্রমাঙ্ক ৯৩) পাওয়া গেছে। আবার নেপচুনিয়াম

β-কণা উৎসারিত করে আরও উচ্চতর ক্রমাঙ্কের (৯৪) প্লুটোনিয়াম দেয়। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে আরও অধিকতর গুরুভার উচ্চতর ক্রমাঙ্কের মৌল প্রস্তুত সম্ভব হয়েছে। এভাবে ৯৩ থেকে শুরু করে অন্ততঃ ১০৩ ক্রমাঙ্কের কৃত্রিম মৌল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই তেজস্ক্রিয় ধাতু। এদের প্রস্তুতিতে অবশ্য নিউট্রন-কণা, α-কণা, ডয়টেরিয়াম-কণা, কার্বন-কেন্দ্রক প্রভৃতি নানা শক্তিশালী ক্ষেপনক দিয়ে সুকৌশলে ভারী পরমাণুকে আঘাত করা প্রয়োজন হয়। ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলদের ক্রমাঙ্কসহ একটি সারণী দেওয়া হল। এদের বলা হয় অ্যাকিটনাইড মৌল শ্রেণী।

ইউরেনিয়ামত্তোর মৌল শ্রেণী

৯৩ নেপচুনিয়াম (Np)	৯৯ আইনস্টেনিয়াম (En)
৯৪ প্লুটোনিয়াম (Pu)	১০০ ফের্মিয়াম (Fm)
৯৫ আমেরিকিয়াম (Am)	১০১ মেণ্ডেলিভিয়াম (Md)
৯৬ কুরিয়াম (Cm)	১০২ নোবেলিয়াম (No)
৯৭ বার্কেলিয়াম (Bk)	১০৩ লরেন্সিয়াম (Lw)
৯৮ কালিফোর্নিয়াম (Cf)	

* * *

আজকের দিনের ধাতুর এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অতি প্রাচীনকালে ধাতুর সন্ধান পেয়েছিল বলেই মানুষ তখন তার আত্মরক্ষার উপায়ের উন্নতি করতে পেরেছিল, জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পেরেছিল, ছোট ছোট হাতিয়ার দা, কুড়াল পেয়ে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব করতে পেরেছিল, সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতিও সম্ভব হয়েছিল। আজ আরও ব্যাপকরূপে সেই ধাতুই সভ্যতার অগ্রগতিকে সাহায্য করছে। আজকের দিনে যানবাহনে, শিল্প-কারখানায়, প্রতিরক্ষায়, কৃষিতে, চিকিৎসায়, ছাপাখানায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা জিনিসে, মুদ্রাতে, সর্বত্র শুধু ধাতুর প্রাধান্য নয়, ধাতু অপরিহার্য। ধাতু আছে রক্ত কণিকার হেমোগ্লোবিনে, গাছের পাতার সবুজ ক্লোরোফিলে। তারপর মানুষ যখন ১৯৩৮ সালে পরমাণুকে ভেঙে বিজ্ঞানের নবতর যুগে প্রবেশ করল, তখন ধাতু এগিয়ে এল শক্তি-উৎপাদনে, যার উপর এখন ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নির্ভর করছে। ধাতুকে বাদ দিয়ে এখন আর দৈনন্দিন জীবনের কথা কল্পনা করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) বিজ্ঞানের ইতিহাস—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

(২) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ.

(৩) রসায়ন ও সভ্যতা—প্রিয়দারঞ্জন রায়

(৪) প্রাগ্ ইতিহাসের কথা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু

(৫) সভ্যতার আগে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু

(৬) ভারতের খনিজ সম্পদ—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) নবযুগের ধাতু চতুষ্টয়—ডঃ জগন্নাথ গুপ্ত

(৮) ভারতের খনিজ—রাজশেখর বসু

1. History of Chemistry in Ancient and Medieval India —P. Rây
2. Story of Civilisation. Vol I—Will Durrant
3. History of Chemistry—J. R. Partington
4. Discovery of the elements—Mary Elvira Weekes
5. Text Book of Inorganic Chemistry (6th Edn.) —J. R. Partington
6. Reader's digest, March. 1961